শ্রীশ্রী
চৈতন্যচরিতামৃতের
ভূমিকা
শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দনাথ
সংস্কৃত বুক ডিপো

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা

পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

কর্তৃক সম্পাদিত

এবং

তৎকর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

চতুর্থ সংস্করণ

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্তু

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

তৃতীয় সংস্করণে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধটী ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ" শীর্ষক প্রবন্ধে পরিশিষ্টে বিষয়টীর বিস্তৃত আলোচনা ছিল; এই সংস্করণে পরিশিষ্টের প্রবন্ধটীই ভূমিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য এই সংস্করণে কোনও কোনও স্থলে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোনও সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

নানা কারণে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতাস্থ "প্রাচ্যবাণী" অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশনভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। প্রাচ্যবাণীর কর্ত্তৃপক্ষের চরণে, বিশেষতঃ ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে, আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সুধীবৃন্দের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি এবং এই অযোগ্য অধমের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করার জন্য তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীহরিবাসর
১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
৪৭২ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ২৭শে জুলাই
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।
৪৬, রসারোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন,
কলিকাতা—৩৩।

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গদেশের সুধীসমাজ, বিশেষতঃ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের কাছে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ। তাঁর রচিত শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহ অশেষ জ্ঞানের আকর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনবদ্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য এই জ্ঞানকে আরও মহিমময় করেছে। আজকালকার এই দিনে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরের শেখায়"—এই উদাহরণেরই প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রশ্নোপনিষদ্ বলেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মনীষিণঃ॥"

এই মন্ত্রের মহাসত্য ডক্টর নাথের পবিত্র জীবনে মহনীয়, বরণীয় রূপ লাভ করেছে।

ডক্টর নাথ মহাশয়ের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে"র প্রথম দু'খণ্ড প্রাচ্যবাণী থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে। এই বিশালায়তন মহাগ্রন্থের এখনও অর্দ্ধেক প্রকাশের বাকী আছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-বিষ্ণুপ্রিয়ার আশীর্ব্বাদে পরের দু'টী খণ্ডও প্রাচ্যবাণী থেকে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে যাবে নিশ্চয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থ ব্যতীত ডক্টর নাথের "গৌর-তত্ত্ব" ও "গৌর-কৃপার বৈশিষ্ট্য" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয়ও অনন্ত জ্ঞানের আকর—স্বীয় ভাস্বরতায় হীরক খণ্ডের মত নিরন্তর জল জল করছে। মৎকৃত এই গ্রন্থদ্বয়ের সংস্কৃত অনুবাদও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে॥

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা" হ'লেও সর্ব্বদিক থেকে এ গ্রন্থকে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শনের একটী সার—সঙ্কলন বলা যেতে পারে। প্রতিটী ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারের মত অতি সমীচীন। বচনভঙ্গির অত্যধিক নিপুণতা এবং বিনয়ের মাধুর্য্যে এই মনীষীর লেখনী সর্ব্বদা উজ্জ্বল ব'লে তাঁর প্রতিবাদি-মত-বিরোধ অনেক সময় কঠোর হ'য়ে দেখা দেয়না; কিন্তু সত্যকে কোনও স্থানে তিনি ব্যক্তির ভয়ে পরিহার করেননি। আবার নিজের মতকেই একমাত্র অপরিহার্য্য মত ব'লেও তিনি ঘোষণা করেন নি। এতে তিনি "প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর" হননি, অথচ জগতের কাছে অবিকল সত্যকে ধ'রে দেওয়ার বিপুল আনন্দ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করেন নি॥

তাঁর ভূমিকা ও গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সহ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি বর্ত্তমান সমাজে যা'তে বিরলপ্রচার না হয়—তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমরা এই গ্রন্থের প্রকাশনে ব্রতী হয়েছি। বৃহদাকার এই গ্রন্থের অচিরে পুর্ণ প্রকাশ আমরা মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। ডক্টর নাথের অতুলনীয় ভক্তিনিষ্ঠা মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পুর্ণ ডালি মস্তকে ধারণ ক'রে জ্ঞানচর্চ্চা ও নিষ্কাম কর্ম্মসাধনের পুর্ণ মর্য্যাদা জগতে অভ্রান্ত ভাবে প্রচার ক'রবে, এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের সমস্ত প্রুফ সংশোধনের ভার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রামদাস কর্ম্মকার মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ ক'রে আমাদিগের পরম উপকার সাধন ক'রেছেন। তাঁহার অহেতুক প্রাণপণ পরিশ্রম ব্যতীত এই গ্রন্থ অল্প কয়েক মাসের মধ্যে কিছুতেই সুমুদ্রিত হ'তো না।

ডক্টর নাথের উদ্দেশ্যে তাঁর গত ৭৯ তম জন্মদিবসে যে সঙ্গীত-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রেছিলাম, তার কিয়দংশ এখানে পুনরুদ্ধৃত করছি:—

অশীতি-বর্ষ-দেশীয়— ভক্তায় লোকহিতায়
প্রিয়াগৌরৌ দত্তো জীবচ্ছক্তিম্।
অতিক্রম্য বর্ষশতং লভতাং যজ্ জ্যোতির্মূর্তং
নাথ আয়ুষ্কালং লসৎকীর্তিম্॥ ১
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণীং গৌরতত্ত্ব-সুরধুনীং
গৌর-কৃপা-বৈশিষ্ট্যামিতমিতিম্।
গৌড়-বৈষ্ণব-দর্শনম্ অচিন্ত্য-বেদ-বিজ্ঞানং
স্মরামি ভক্তিধারাং ভাগীরথীম্॥ ২
ভক্তি-কল্পতরুঃ স্বয়ং দদাতু পরমাশ্রয়ং
জ্ঞানলতাং তথা কর্মকাণ্ডম্।
জ্ঞান-কর্ম-সমন্বয়— ভক্তিধর্ম-মধুময়—
রূপধরং নৌমি নৃ-প্রকাণ্ডম্॥ ৩

ঝুলনপুনিমা,
২২শে আগষ্ট, ১৯৫৮,
(৫ই ভাদ্র, ১৩৬৫)

শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

ভূমিকার সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামী	১
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল	৭
গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব-বিচার	৩০
প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী	৪২
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (চরিতাংশ)	৫৮
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	৭২
শক্তিতত্ত্ব	৮৬
ধামতত্ত্ব ও পরিকরতত্ত্ব	৮৮
ভগবৎ-স্বরূপ	৯০
শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন	৯২
ব্রজেন্দ্র-নন্দন	৯৭
সৃষ্টিতত্ত্ব	১০১
শ্রীবলরাম	১০৯
প্রেমতত্ত্ব	১১০
শ্রীরাধাতত্ত্ব	১১২
গোপীতত্ত্ব	১১৬
পরম-স্বরূপ	১২২
জীবতত্ত্ব	১২৪
পুরুষার্থ	১৬০
সম্বন্ধ-তত্ত্ব	১৬৪
অভিধেয়-তত্ত্ব	১৬৮
প্রয়োজন-তত্ত্ব	১৭৭
সাধ্য	১৮০
সাধন	১৮৩
সাধন—বৈধীভক্তি	১৮৬
সাধন—রাগানুগা	১৮৭
অপরাধ	১৮৯
সাধন-ভক্তির প্রাণ	১৯০
সাধকের ভক্তিবিকাশের ক্রম	১৯২
সাধুসঙ্গ ও মহৎ-কৃপা	১৯৫
গুরুতত্ত্ব	১৯৭
প্রকট ও অপ্রকট লীলা	১৯৯
প্রকট ব্রজলীলা	২০০
যাদৃশী ভাবনা যস্য	২০৩
রায়রামানন্দ ও সাধ্যসাধন-তত্ত্ব	২০৫
প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত	২২৩
প্রণবের অর্থ-বিকাশ	২৪০
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর (তত্ত্বাংশ)	২৭৬
নবদ্বীপ-লীলা	২৯৬
নাম-মাহাত্ম্য	২৯৮
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার	৩০২
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব ও অদ্বয়তত্ত্ব	৩০৮
আচার	৩২১
ভক্তিরস	৩২৪
ধর্ম্ম	৩৩৩
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ	৩৩৬
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প সাম্প্রদায়িকতা	৩৫৯
ভজনাদর্শ—গৌড়ে ও বৃন্দাবনে	৩৬৬
অপ্রকট-ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ	৩৭৮
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ	৩৯৯
শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক দীক্ষাদান	৪০৪
প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়	৪০৬
ধর্ম্মে সার্ব্বজনীনতা	৪১৬
গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা	৪২১
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব	৪২৩
জ্যোতিষের গণনা	৪২৭
(ক) ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণাপঞ্চমী	৪২৮
(খ) ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণাপঞ্চমী	৪২৯
(গ) ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ	৪৩০
(ঘ) ১৪৯৫ শকের ২০শে বৈশাখ	৪৩২
(ঙ) ১৫৪১ শকের ২০শে বৈশাখ	৪৩৩
(চ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়	৪৩৪
(ছ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়	৪৩৫
ছয়গোস্বামী	৪৩৭-৪৪০

দ্রষ্টব্য। ভূমিকায় উদ্ধৃত প্রমাণের আকর-গ্রন্থের সঙ্কেত আদিলীলার প্রথমে দ্রষ্টব্য। শ্রী, ভা, দ্বারা সর্ব্বত্র বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীমদ্ভাগবত উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(পূর্ব্বেক সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত)

প্রভুপাদ **শ্রীলপ্রাণগোপালগোস্বামী** সিদ্ধান্তরত্ন। ** পরিপক্ক হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা—এই চারিটী থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। ** ভূমিকাংশটী অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য-পরিবর্জ্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অনুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। **দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে সুমীমাংসা করিয়াছ,** তাহা মনোরম হইয়াছে। ** তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্ব্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

প্রভুপাদ **শ্রীলরাধারমণগোস্বামী** বেদান্তভূষণ। ** এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। ** শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বাবু গৌরকৃপা তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দূষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা তাঁহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিরই অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। * **এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটী অপূর্ব্ব সম্পদ।**

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীলভাগবতকুমারগোস্বামী এম, এ, ; পি, এইচ্, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ** আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসক-গণের কণ্ঠহাররূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্ম্মের অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন; এ পথের যাঁহার ভাগ্যবান্ পথিক, তাঁহারা আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি-আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য **শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।**

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীলপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ** ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীলরাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। *** বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেইজন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার মধ্যে—যে সকল বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের উপর মূলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থ-পাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ** তাঁহার গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাটীও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)। ** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন

প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণব-জগতের সম্পদ বিশেষ।

পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়্দর্শনাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ, জ্যোতির্ভূষণ। * * * এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কিনা তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত-পরিবেশ, কি ভাষা-সন্নিবেশ * * সর্ব্বপ্রকারেই এই সংস্করণটী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। * *।

পণ্ডিত শ্রীযুত হরগোবিন্দ শর্ম্মাধিকারী ভক্তিতীর্থ। * * যেমনি তত্ত্ববিচারের পারিপাট্য, তেমনি লীলারস-আস্বাদনের উৎকর্ষ সুললিত ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থখানি পরম অপূর্ব্ব আস্বাদনের বস্তু হইয়াছে। * *।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। * * প্রকাশ্য বিষয়ে আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও বহুগবেষণা এই প্রাচীন পুস্তককে অভিনব ভূষণে ভূষিত করিয়াছে।

ডকটর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট্ (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আপনার গভীর পাণ্ডিত্য ও শুদ্ধ-ভক্তিভাব দ্বারা উদ্ভাসিত সংস্করণখানি বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে একটী অতি গৌরবের বস্তু হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত দার্শনিক পুস্তকের সম্যক্ প্রণিধানের জন্য গুরুর উপদেশ আবশ্যক; আপনার ভূমিকায় ও বিস্তৃত টীকায় সাধারণ পাঠকের জন্য সেই আবশ্যকতা পূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ আপনার ভূমিকাসম্বন্ধে * * বলা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহাকে সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্পুট। * * আপনার পুস্তক চিরকাল সঙ্গে রাখিবার বস্তু।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কে, টি., আই. ই, এম, এ, এল, এল, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার। * * আপনার ন্যায় ভক্তিমান্ ভাগবতের দ্বারাই এই দুরূহ কার্য্যসম্পাদন সম্ভব। প্রবৃত্তি, ভক্তি ও যোগ্যতা একাধারে আপনাতে বর্ত্তমান্।

আনন্দবাজার পত্রিকা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাধাগোবিন্দবাবু বিরাট আকারে চরিতামৃতের সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। * * বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অমর কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। * * ভূমিকায় গ্রন্থকার বৈষ্ণব-দর্শনসম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতেরই যোগ্য হইয়াছে। * *

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী। * * এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণ আর কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। আপনার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ভক্ত অভক্ত, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই চমৎকৃত হয়েন। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ কৃপাবলে এরূপ মনোমুগ্ধকর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ কল্পনাতীত সরল প্রাঞ্জল বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া যথার্থই বৈষ্ণব-জগতের পরম-উপকার সাধন করিলেন। * *।

শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর রায়। আপনার সম্পাদিত শ্রীগ্রন্থখানি যে কিরূপ সুখপাঠ্য হইয়াছে, তাহা যিনি নিজে পাঠ না করিয়াছেন, তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ভূমিকাটীতে যে বিষয়গুলি সংযোজিত করিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকা। (শ্রীলহরিদাস গোস্বামী)। * * ভূমিকায় সুযোগ্য গ্রন্থকার মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মৌলিক বিষয়গুলি সমস্তই বিশদ সরল বাংলাভাষায় আলোচনা করিয়া একত্রিশটী সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এবং পূজ্যপাদ গোস্বামিচরণগণাদৃত ও সমালোচিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। * * প্রকটাপ্রকটলীলায় স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবের স্বরূপ যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা বড়ই উপাদেয়। * * শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের গোস্বামিশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে এই শ্রীগ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, ইহাই সাধু-বৈষ্ণব মহাজনগণের অভিমত। * * *।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী

আবির্ভাব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে তাঁহার আবির্ভাব। কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ইংরেজী সংস্করণে লিখিয়াছেন—১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কবিরাজী-ব্যবসায় দ্বারা ভগীরথ অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। কবিরাজ-গোস্বামীর বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; শ্যামাদাস-নামে কৃষ্ণদাসের এক সহোদর ছিলেন; তিনি কৃষ্ণদাস অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। পতিবিয়োগের পরে বিধবা সুনন্দা দুইটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন; কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই; অল্প কয়মাস পরেই তিনিও পতির অনুসরণ করিলেন। শিশুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তখন আত্মীয়-স্বজনের উপর পতিত হয়। কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই অত্যন্ত শান্ত, শিষ্ট ও গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন।

উৎসব। দীনেশবাবু উক্ত বিবরণ কোথায় পাইয়াছেন, জানি না; তিনিও কোনও প্রমাণাদির উল্লেখ করেন নাই। উহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাও বলা যায় না। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ ১৪৩৯ শকাব্দের সমান। ১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোভাব। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর তিরোভাব তাহারও পরে। ১৪৩৯ শকাব্দে যদি কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হওয়ার কথা। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, কবিরাজের বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখনই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সেবক মীনকেতন রামদাস কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হয়েন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, এক অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন-উপলক্ষেই মীনকেতন কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কবিরাজের ভ্রাতার সঙ্গে মীনকেতনের একটু বাদানুবাদ হয়; বাদানুবাদের কারণ এই যে—কবিরাজের ভ্রাতা মহাপ্রভুকে মানিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি তাঁহার তত বিশ্বাস ছিল না; ইহাতে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধ-কুক্কুটীন্যায় তোমার প্রমাণ॥ কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড। একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥ ১।৫।১৫৩-১৫৫॥"

এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যখন মীনকেতন কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন—তাহা হইতেও বুঝা যায়, ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই কবিরাজ-গোস্বামী পরম-বৈষ্ণব ছিলেন।

যাহা হউক, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৩৯ শকাব্দেই যদি কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনোৎসব-সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত-প্রভু যে প্রকট ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও হয়তো প্রকট ছিলেন, না থাকিলেও বেশীদিন পূর্ব্বে অপ্রকট হয়েন নাই। তাহাই যদি হয়,

কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় পরমবৈষ্ণব কি তৎপূর্ব্বে কোনও সময়েই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না ? কিন্তু তিনি যে কখনও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছেন, এরূপ কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্তও সমগ্র চরিতামৃতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মীনকেতন-রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাওয়ার পরে সেই রাত্রিতেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু স্বপ্নযোগে কবিরাজ-গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছেন বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাসম্বন্ধে তিনি এক সুবিস্তৃত বর্ণনা দান করিয়াছেন।. যদি তিনি কখনও শ্রীনিতাইচাঁদের প্রকটকালে তাঁহার দর্শন পাইতেন, তাহা হইলে তিনি যে তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর দর্শন সম্বন্ধেও কোনও কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, তিন প্রভুর কাহারও সঙ্গেই প্রকটকালে কবিরাজ-গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় নাই। যদি মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় তাঁহার বয়স ১৬ বৎসরই হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত—বিশেষতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বপ্নাদেশে তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন যাত্রাকালে একবার আদেশ-দাতা নিতাইচাঁদের চরণধূলা নিশ্চয়ই লইয়া যাইতেন। এ সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরেই কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম এবং যখন তাঁহার গৃহে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তখন তিন প্রভুর মধ্যে কেহই প্রকট ছিলেন না।

উৎসব-সময়ে কবিরাজ-গোস্বামীর বয়স যদি ১৬ বৎসর হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যামদাসের বয়স তখন ১৪ বৎসর হওয়ার কথা; কিন্তু ১৪ বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ এবং ভজনবিজ্ঞ মীনকেতন-রামদাসের সঙ্গে বাদানুবাদ সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। তাই আমাদের অনুমান— শ্যামদাসের এবং কৃষ্ণদাসের বয়স তখন আরও বেশী ছিল।

আমাদের অনুমান ১৪৫০ শকের বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই কবিরাজ-গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল। পরবর্ত্তী "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নাদেশ। যাহাহউক, নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করার জন্য কবিরাজ-গোস্বামী অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তনোপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করেন। ইহাতে প্রভু প্রীত হইয়া রাত্রিতে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন:—"অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস! না করত ভয়। বৃন্দাবন যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥ ১।৫।১৭৩॥"

বৃন্দাবন-যাত্রা, গোস্বামীদের শরন। এইরূপ বলিয়াই শ্রীনিতাইচাঁদ অন্তর্হিত হইলেন; কবিরাজ মনে করিলেন, "মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।" প্রভাতে তিনি স্বপ্নাদেশের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিলেন এবং তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারাও কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন:—"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥ ১।১।১৮-১৯॥"

গ্রন্থ-প্রণয়ন। বাস্তবিক শ্রীপাদ গোস্বামীদের প্রসাদে কবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই তাঁহার জ্ঞানগরিমার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয়-লীলাত্মক "শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্" নামক সংস্কৃত কাব্য এবং বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নাম্নী সংস্কৃত টীকাই বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রচলিত। তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থই বোধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার বিবরণ ও বৈষ্ণবাদেশ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মুরারিগুপ্তের কড়চা (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্), কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যম্, লোচনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতই সবিশেষ পরিচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবনদাস

ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতির সহিত পাঠ করিতেন ; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিশেষভাবে বর্ণিত না হওয়ায় গৌরগত-প্রাণ বৈষ্ণবমণ্ডলীর গৌর-লীলা-রসাস্বাদন-পিপাসার তৃপ্তি হইত না। ক্রমেই তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা অতি বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামীকেই প্রভুর শেষলীলা বর্ণনার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। এই সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক পণ্ডিত শ্রীহরিদাসই অগ্রণী হইয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে গ্রন্থপ্রণয়নে আদেশ করিলেন। ইনি ছিলেন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুশিষ্য এবং শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য। পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসের সঙ্গে এই ব্যাপারে আর যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীল যাদবাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী এবং তাঁহার শিষ্য গোবিন্দ-পূজক শ্রীল চৈতন্যদাস, শ্রীল মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল প্রেমী কৃষ্ণদাস এবং আচার্য্য-গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর নামই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। (১।৮।৪৫-৭২॥)

মদনগোপালের আদেশ—কবিরাজ-গোস্বামী তখন অতি বৃদ্ধ ; চক্ষুতে ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শুনেন না ; লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।" বৈষ্ণবের আদেশ পাইয়া তিনি কি করিবেন; স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত-অন্তরে শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন। সেস্থানে গোসাঞিদাস-পূজারী-নামক জনৈক বৈষ্ণব শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী যাইয়া মদনগোপালের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। অকস্মাৎ "প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল"—মদনগোপালের কণ্ঠ হইতে একছড়া ফুলের মালা খসিয়া পড়িল ; গোসাঞিদাস-পূজারী সেই মালা আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীর গলায় পরাইয়া দিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী মনে করিলেন—মাল্যদানের ব্যপদেশে শ্রীমদনগোপাল গ্রন্থ-প্রণয়নের আদেশই দিলেন। তাই অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সেস্থানেই তিনি গ্রন্থারম্ভ করিয়া দিলেন। "আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।" (১।৮।৭২ ॥)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিলীলা, সন্ন্যাসের পর নীলাচল-বাসের প্রথম ছয় বৎসর মধ্যলীলা এবং শেষ অষ্টাদশ বৎসর অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ—কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নিজে সে সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই ; তাঁহার গ্রন্থও প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে কেবল অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও উক্তি হইতেই তিনি গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কাব্য, স্বরূপদামোদরের কড়চা, দাসগোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শ্রীরূপ সনাতন-দাসগোস্বামী প্রভৃতি গৌর-পার্ষদদের মৌখিক উক্তিই কবিরাজ-গোস্বামীর প্রধান অবলম্বন ছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কবিরাজ গোস্বামী সে সকল লীলা আর বিশেষভাবে বর্ণনা করেন নাই, সূত্রাকারে উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা বর্ণিত হয় নাই, তাহাই তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ("গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব-বিচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষত্ব।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবনাখ্যান অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই বেশী। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এই গ্রন্থখানিকে সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্পুট। তাই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বৈষ্ণবের নিকটে পরম

আদরণীয়, বেদবৎ মান্য। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারেরও একটী অপূর্ব্ব রত্ন বিশেষ; কবিত্বের সহিত দার্শনিক-তত্ত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সরস সমাবেশ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না; এই গৌর-লীলা-রস-নিষিক্ত গ্রন্থখানির আর একটী অদ্ভুত বিশিষ্টতা এই যে, ইহা যতই পাঠ করা যায়, ততই পাঠের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়, ততই যেন অধিকতররূপে ইহার মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন :—

"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্‌ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় বড় হিত॥ ২।২।৭৬"

এই বাঙ্গালা গ্রন্থখানির সংস্কৃত-টীকা লিখিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার অপূর্ব্ব-বিশেষত্বের একটা স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। *

কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু—কবিরাজ-গোস্বামী কাহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা বিচারসাপেক্ষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের—"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥ ১।১।১১"—এই পয়ার অবলম্বনে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-পাদ বলেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। আবার অন্ত্যলীলার ৩০শ পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥ ৩।২০।৮৮॥" এবং "শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ। ৩।২০।১৬৬॥" ইহা হইতে কেহ কেহ বলেন, শ্রীলরঘুনাথ-গোস্বামীই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ" ইত্যাদি আদিলীলার প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত পয়ারের "মুঞি যাঁর দাস" বাক্য এবং "স্বরূপ-প্রকাশ" শব্দের অন্তর্গত "প্রকাশ"-শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াই চক্রবর্ত্তি-পাদ সিদ্ধান্ত করিয়াচেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু; কারণ, দীক্ষাগুরুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া মনে করিবার কথা কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। ১।১।২৬॥" আর নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "প্রকাশ" নহেন, "বিলাস"; তথাপি কবিরাজ-গোস্বামী তাহাকে "প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করায় চক্রবর্ত্তিপাদ অনুমান করিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহার দীক্ষাগুরু। কিন্তু পয়ারের টীকায় আমরা দেখাইয়াছি—"তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"—এই পয়ারে দীক্ষাগুরুকে যে শ্রীচৈতন্যের "প্রকাশ" বলা হইয়াছে, তাহা "পারিভাষিক প্রকাশ" নহে। প্রত্যেকের গুরুই যদি শ্রীচৈতন্যের পারিভাষিক প্রকাশ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আকৃতি-বর্ণ-বেশ-ভূষাদি সমস্তই অবিকল শ্রীচৈতন্যের ন্যায় হইত; তাহা যখন হয় না, হইতেও পারে না, এবং শ্রীগুরুদেব যখন স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬ টীকা দ্রষ্টব্য), তখন, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, দীক্ষাগুরুকে শ্রীভগবানের পারিভাষিক প্রকাশ বলিয়া মনে করিবে না— পরন্তু প্রকাশ-শব্দের সাধারণ-

* শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ বাংলা সালে কলিকাতাস্থিত ৯৮নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট হইতে চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক শ্রীল মাখনলাল ভাগবতভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিজের একটি টীকা এবং তদতিরিক্ত একটি সংস্কৃত-টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভাগবতভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সংস্কৃত টীকাটী "শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃত।" কিন্তু তিনি টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কোনও পরিচয় দেন নাই। এই টীকার কোনও কোনও অংশ আমরা গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতেও চক্রবর্ত্তিপাদের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি। যাহাহউক, "বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী" শুনিলেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রায় সকলের মনেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহুগ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কথাই জাগে। তাই কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকারও তিনিই; আবার কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ শ্রীগ্রন্থের সংস্কৃত-টীকাটী দেখিলে ইহা সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা নহে বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। ভাগবতভূষণ মহাশয়ও এই টীকার সকল অংশের অনুসরণ করেন নাই। চক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থের টীকাতে প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি এবং উপসংহারেও বিশেষ উক্তি কিছু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই টীকায় সে সমস্ত কিছু নাই। দু'য়েক স্থলে এমন কথাও আছে, যাহা চক্রবর্ত্তিপাদের সর্ব্বজন-বিদিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আরও কয়েকটী কারণে মনে হয়, এই সংস্কৃত-টীকা হয়তো অপর কোনও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা মনে করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পরিশিষ্টে এই সংস্কৃত-টীকাটী সন্নিবিষ্ট করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এই টীকার প্রতিলিপিও করিয়াছিলাম। কিন্তু উল্লিখিত কারণে, বিশেষতঃ গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং কোনও কোনও ভক্তের পরামর্শে, তাহা মুদ্রিত হইল না।

অর্থে "আবির্ভাব" বলিয়াই মনে করিবে। বস্তুতঃ ১।১।১১ এবং ১।১।২৬ এতদুভয় এবং ১।১।৩৫ পয়ারেও কবিরাজ-গোস্বামী "আবির্ভাব"-অর্থে "প্রকাশ"-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হয়, নচেৎ অনেক বিরোধ উপস্থিত হইবে।

যাহা হউক, ১।১।১১ পয়ারে "স্বরূপ প্রকাশ"-শব্দের যদি "স্বরূপের আবির্ভাব" অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কেবল "মুক্তি যাঁর দাস"-বাক্য হইতেই শ্রীনিত্যানন্দকে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলার বিশেষ হেতু থাকে না; যে কোনও ভক্তই নিজেকে শ্রীনিত্যানন্দের দাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবই—"বিলাসরূপ" আবির্ভাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রকটকালে যে তাহার সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাক্ষাৎ না হইয়া থাকিলে দীক্ষাগ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং শ্রীমন্নিত্যানন্দকে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না।

পক্ষান্তরে, অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদের দুইটী (৮৮ এবং ১৩৬) পয়ারেই কবিরাজ- স্বয়ং স্পষ্ট কথায় শ্রীরঘুনাথকে "গুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরঘুনাথই যে তাঁহার দীক্ষাগুরু, তাহাই মনে হয়। কিন্তু কোন্ রঘুনাথ? রঘুনাথদাস গোস্বামী? না কি রঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামী?

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "কবিরাজ-পরিবার" বলিয়া পরিচিত একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পরিবার আছে; এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কবীশ্বর শ্রীল রূপ কবিরাজ-গোস্বামী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সমসাময়িক এবং আত্মীয় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই কবিরাজ-পরিবারের গুরুপ্রণালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ছিলেন শ্রীল রূপ কবিরাজ-গোস্বামীর পরমগুরু এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামীর শিষ্য। গুরু পরম্পরা-প্রাপ্ত একটী প্রাচীন বৈষ্ণব-পরিবারের গুরু-প্রণালিকাকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু দেখা যায় না—বিশেষতঃ ইহা যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের অনুকূল। তাই আমাদের মনে হয়, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামীই "শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিকৃত "শ্রীমদ্রঘুনাথভট্ট-গোস্বাম্যষ্টকম্"* নামক একটী অষ্টক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেই লিখিয়াছেন—রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু। অষ্টকের দুইটী শ্লোকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্রূপপদারবিন্দমতুলং মামার্পিতঃ স্বাশ্রয়াৎ। নিত্যানন্দকৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোঽভবং তং শ্রীমদ্রঘুনাথভট্টমনিশং প্রেম্না ভজে সাগ্রহম্॥—যিনি করুণাবশতঃ আমাকে স্বচরণে আশ্রয় দান করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর চরণকমলে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাবলেই যাঁহাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, প্রেম ও আগ্রহের সহিত অহর্নিশি আমি সেই শ্রীমদ্ রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীকে ভজন করি।" এই শ্লোকে "মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা"-বাক্যে দীক্ষার কথা জানা যায়। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপেই তিনি ভট্ট-গোস্বামীকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "যঃ কোঽপি প্রপঠেদিদং মম গুরোঃ প্রীত্যাষ্টকং প্রত্যহং শ্রীরূপঃ স্বপদারবিন্দমতুলং দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ। তস্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবদ্বন্দস্য সেবামৃতং সম্যগ্ যচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নান্যদ্ যতো ভো নমঃ॥—যিনি প্রীতির সহিত প্রত্যহ আমার গুরুর এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অতুলনীয় স্বপদারবিন্দ দান করিয়া বৃন্দাবনে ব্রজযুবদ্বন্দ্বের সেবামৃত—যাহা হইতে প্রিয়তর আর কিছু নাই, সেই সেবামৃত—আগ্রহের সহিত সম্যক্ প্রকারে দান করিয়া থাকেন।"

দৈন্য।—কবিরাজ-গোস্বামীর পাণ্ডিত্য এবং ভজন-নিষ্ঠত্ব আদর্শ-স্থানীয়; আবার তাঁহার দৈন্য এবং বিনয়ও আদর্শ স্থানীয়। সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

---

* শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে এই অষ্টক আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাই দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার উল্লেখ সম্ভব হয় নাই।

"জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥ ১।৫।১৮৩-৮৪॥"

অসাধারণ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ-গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া তিনি লিখিলেন :—

"আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলি সমান। * * * * শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত, শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥ ইহা সভার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয়—তেঁহ অতি কৃপা করে। শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি॥ ৩।২০।৮৩-৯০॥"

গ্রন্থসমাপ্তি।—১৫৩৭ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে এই গ্রন্থের লিখন সমাপ্ত হয়। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তি কাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

———

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

জ্যোতিষের গণনা।—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল-সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায়—একটী চরিতামৃতেরই শেষভাগে এবং অপরটী নিত্যানন্দদাস কৃত প্রেমবিলাসের ২৪ শ বিলাসে। চরিতামৃতের শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থসমাপ্তি; কিন্তু প্রেমবিলাসের শ্লোক অনুসারে ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে।

চরিতামৃতের শ্লোকটী এই :—"শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"—অর্থাৎ ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) সম্পূর্ণ হইল।

প্রেমবিলাসের শ্লোকটী এই:—"শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ—অর্থাৎ ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) সমাপ্ত হইল।

অনেকে অনেক স্বকপোল-কল্পিত বিষয় মূল প্রেমবিলাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রেমবিলাসেরই নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ডাক্তার দিনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাহা বলিয়া থাকেন। প্রথম ১৬ বিলাসের পরবর্ত্তী অংশের উপরে তাঁহার আস্থা নাই (১)। কোনও কোনও স্থলে প্রেমবিলাসের সাড়েচব্বিশ বিলাস পর্য্যন্তও পাওয়া যায়; কিন্তু অতিরিক্ত অংশ যে কৃত্রিম, তাহা সহজেই বুঝা যায়—ইহাই অনেকের মত। বহরমপুরের সংস্করণেও বিশ বিলাসের বেশী রাখা হয় নাই। অথচ উল্লিখিত "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ"-শ্লোকটি পাওয়া যায় ২৪শ বিলাসে—যাহার কৃত্রিমতা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং উক্ত শ্লোকটীও যে কৃত্রিম, এরূপ সন্দেহ অস্বাভাবিক নহে। অথচ এই শ্লোকটীর উপরেই কেহ কেহ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা হইবে।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক পুস্তকে চরিতামৃতের "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ"-শ্লোকানুসারেই ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত "শাকে সিন্ধগ্নি"-শ্লোকটী যে "চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে," তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (২)। তথাপি কিন্তু স্থানান্তরে তিনি ১৫০৩ শককেই সমাপ্তিকাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও এরূপ মনে করার হেতু কিছুই দেখান নাই (৩)। আরও কেহ কেহ ১৫০৩ শককেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়াছেন।

বীরভূম শিউড়ির লব্ধপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিক শ্রীযুত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের "রতনলাইব্রেরী"তে চরিতামৃতের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে; মিত্রমহাশয়ের সৌজন্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এসমস্ত পাণ্ডুলিপিতে—এমন কি ১৭৮ বৎসরের পুরাতন একখানা পাণ্ডুলিপিতেও—শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটীই দেখিতে পাওয়া যায়। একশত বৎসরের প্রাচীন একখানা পুঁথিতে গ্রন্থশেষে এরূপও লিখিত আছে—"গ্রন্থকর্ত্তুঃ শকাব্দা ১৫৩৭॥ শ্রীচৈতন্যস্য জন্মশকাব্দা ১৪০৭॥ অপ্রকটশকাব্দা ১৪৫৫॥ শকাব্দা (লিপিকাল) ১৭৫৫॥" অবশ্য চরিতামৃতের সমস্ত সংস্করণে বা সমস্ত পুঁথিতেই যে সমাপ্তিকালবাচক শ্লোকটী পাওয়া যায়, তাহা নহে; যে সমস্ত সংস্করণে বা পুঁথিতে সমাপ্তিকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়, সে সমস্তে "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ" শ্লোকই পাওয়া যায়।

শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ শ্লোকটী চরিতামৃতের কোনও সংস্করণে বা পুঁথিতেই পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জানি না। শিবরতন মিত্রমহাশয়ও তাঁহার সাহিত্যসেবকে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই সমাপ্তিকাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (৪)।

---

(১) Vaisnava Literature. P. 171

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ সংস্করণ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৩) Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, P. 63.

(৪) সাহিত্যসেবক, ১২৫ পৃষ্ঠা।

যাহা হউক, ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই, হইতে পারেও না, চরিতামৃতের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত-শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।" কিন্তু গোপালচম্পূর পূর্ব্বার্দ্ধ বা পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১০ শকে বা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তরার্দ্ধ বা উত্তরচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১৪ শকে বা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে—গ্রন্থশেষে গ্রন্থকারই একথা লিখিয়াছেন (৫)। সুতরাং ১৫১০ বা ১৫১৪ শকের পূর্ব্বে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে না। সুতরাং ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে নাই, অন্ততঃ মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও হয় নাই, চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেই তাহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং প্রেমবিলাসের শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ শ্লোকটী যে কৃত্রিম, তাহাও চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমাপ্তিকাল-বাচক দুইটী শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক কৃত্রিম বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় অপর শ্লোকটীই অকৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকল সময়ে নিরাপদ নহে; তাহাতে দৃঢ়তার সহিত কোনও কথা বলাও সঙ্গত হয় না। এস্থলে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনও আমাদের নাই। শ্লোক দুইটীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, একটী শ্লোক কৃত্রিম এবং আর একটী শ্লোক অকৃত্রিম। জ্যোতিষের গণনায় এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয় শ্লোকেই লিখিত হইয়াছে—জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোক দুইটীর পার্থক্য কেবল শকাঙ্কে—চরিতামৃতের শ্লোক বলে ১৫৩৭ শকে, আর প্রেমবিলাসের শ্লোক বলে ১৫০৩ শকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উভয় শকেই জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হইতে পারে কিনা; না পারিলে কোন্ শকে হইতে পারে। দুই শকের কোনও শকেই যদি জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোনও শ্লোকই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি একটী মাত্র শকে তাহা হইয়া থাকে, তবে সেই শককেই সমাপ্তিকাল বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারিবে এবং অপরটীকে বাদ দিতে হইবে।

জ্যোতিষের গণনায় দেখা গিয়াছে, ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠমাসকে সৌরমাস ধরিলেও না, চান্দ্রমাস ধরিলেও না। কিন্তু ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারেই হইয়াছিল; সেদিন প্রায় ৫৬ দণ্ড পঞ্চমী ছিল; এস্থলেও কিন্তু চান্দ্রমাস ধরিলে হয় না, সৌরমাস (বা গৌণ চান্দ্রমাস) ধরিলে হয়।

জ্যোতিষের গণনায় রায়বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, মহাশয় একজন প্রাচীন প্রামাণ্য ব্যক্তি। আমাদের গণনার ফল তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলে তিনিও স্বতন্ত্রভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। বিদ্যানিধি-মহাশয়ের গণনা-প্রণালী আমাদের গণনা-প্রণালী হইতে ভিন্ন ছিল; তথাপি কিন্তু উভয়ের গণনার ফল একরূপই হইয়াছে। গণনা যে নির্ভুল, ইহা বোধ হয় তাহার একটী প্রমাণ (৬)। (আমাদের "জ্যোতিষের গণনা" ভূমিকার শেষভাগে দ্রষ্টব্য)।

---

(৫) পূর্ব্বচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছে:—"সম্বৎ পঞ্চকবেদষোড়শযুতঃ শাকঃ দশেষেকভাগ্ জাতঃ যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।—যখন ১৬৪৫ সম্বৎ এবং ১৫১০ শকাব্দা, তখনই এই গোপালচম্পূ বিলিখিত হইল।"

উত্তরচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছে:—"পবন-কলামিতি সম্বন্দিন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ। জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণামচকার বৈশাখে॥ অথবা। বিদ্যাশরেন্দু শাকমিতি প্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ।—বৃন্দাবনস্থ জীবনামা কোনও ব্যক্তি ১৬৪৯ সম্বতে, অথবা ১৫১৪ শকাব্দার বৈশাখমাসে এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছেন।"

(৬) বিগত ১৬।৬।৩৩ ইং তারিখে বিদ্যানিধিমহাশয় লিখিয়াছেন—"* * * দেখিতেছি আপনার গণনাই ঠিক। ১৫৩৭ শকে সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিলে অসিত পঞ্চমীতে রবিবার হইয়াছিল। রবিবারে পঞ্চমী প্রায় ৪২ দণ্ড ছিল। এখন বিবেচ্য, সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিতে পারি

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল—প্রেমবিলাসের শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে চরিতামৃত-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের প্রতিকূল এবং ঐ শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হওয়ার কথাও জ্যোতিষের গণনায় সমর্থিত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকটী যে কৃত্রিম, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। আর চরিতামৃতের শ্লোকানুসারে ১৫৩৭ শকে গ্রন্থ-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণেরও অনুকূল এবং উক্ত শ্লোকানুসারে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীও রবিবারেই হইয়াছিল বলিয়া জ্যোতিষের গণনায়ও পাওয়া যায়; সুতরাং এই শ্লোকটী যে সম্যক্‌রূপেই নির্ভরযোগ্য এবং ইহা যে অকৃত্রিম, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার কখনও গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ লিখিতে ভুল করিতে পারেন না; কারণ, যে দিন গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, ঠিক সেই দিনই তিনি তারিখ লিখিয়া থাকেন; তাহাতে সন, মাস, তিথি, বারাদির ভুল থাকা সম্ভব নয়। অন্য কেহ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন সময়ে তাহা লিখিতে গেলেই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। প্রেমবিলাসের শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ-শ্লোকটী ভ্রমাত্মক বলিয়া তাহা যে চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর চরিতামৃতের শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটীতে কোনওরূপ ভ্রম নাই বলিয়া—চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে এবং জ্যোতিষের গণনাতেও ইহা সমর্থিত হয় বলিয়া ইহা যে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত, তাহাও নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। সুতরাং ১৫৩৭ শকে অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটী গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত হইয়া থাকিলে চরিতামৃতের সকল প্রতিলিপিতে তাহা না থাকার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। কোনও একজন লিপিকর হয়তো ভ্রমে এই শ্লোকটি লিখেন নাই; তাঁহার প্রতিলিপি দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও প্রতিলিপিতেই আর ঐ শ্লোকটী থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে উক্ত শ্লোকহীন প্রতিলিপিও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এইরূপ হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। চরিতামৃতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোকের (৫-১৪ শ্লোকের) উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্"-কথাটী চরিতামৃতের কোনও কোনও প্রতিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে কেহ কেহ হয়তো মনে করিয়া থাকেন, কবিরাজ-গোস্বামীর মূলগ্রন্থে উল্লিখিত "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্"-কথাটী ছিল না—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ"-প্রভৃতি শ্লোক কয়টী কবিরাজ-গোস্বামীরই রচিত, স্বরূপদামোদরের রচিত নহে। কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কিছু হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং উক্ত শ্লোক কয়টী যে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরেরই রচিত, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ চরিতামৃতে পাওয়া যায়। একটীমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। উল্লিখিত শ্লোকসমূহের দ্বিতীয় শ্লোক অর্থাৎ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ

কিনা। বোধ হয় পারি। কবি বঙ্গদেশের, সৌরমাস গণিতেন।" এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"বোধ হয় সৌরমাস ধরিতে পারি।" কিন্তু পরের দিন ১৭।৬।৩৩ ইং তারিখেই আবার এক পত্রে তিনি লিখিলেন—"গতকল্য আপনাকে পত্র লিখিবার পর মনে হইল সৌর জ্যৈষ্ঠ মাস করিলে কবির অনবধানতা প্রকাশিত হয়। মাসের নাম না থাকিলে তিথি অর্থহীন। 'বোধ হয়' করিবার প্রয়োজন নাই। কবি জ্যৈষ্ঠ মাস গৌণচান্দ্র ধরিয়াছেন। যেটা মুখ্য বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ, সেটা গৌণ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ। বৈশাখী পূর্ণিমার পর গৌণ জ্যৈষ্ঠ মাস আরম্ভ। উত্তর ভারতে গৌণচান্দ্র গণিত হইতেছে। অতএব গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের অসিত পঞ্চমীতে রবিবার ছিল। হয়ত সৌর জ্যৈষ্ঠ বলাও কবির অভিপ্রেত ছিল।"

যাহাহউক, বৈশাখী পূর্ণিমার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কৃষ্ণাপঞ্চমী, তাহাই গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমী এবং ১৫৩৭ শকে তাহা রবিবারে হইয়াছিল।

সূর্য্য যতদিন বৃষরাশিতে থাকে, আমাদের পঞ্জিকার জ্যৈষ্ঠমাসও ততদিনব্যাপী এবং এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসকেই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছি। ১৫৩৭ শকে গৌণচান্দ্রজ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীও আমাদের পঞ্জিকানুযায়ী জ্যৈষ্ঠমাসে (এবং রবিবারে) হইয়াছিল; তাই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছি।

শ্লোকটীতে (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের তিনটী মুখ্য কারণ বিবৃত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যাইয়া সূচনায় চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—' * • * অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ স্বরূপগোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ। আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৯০-৯২ পয়ার॥' ষষ্ঠ শ্লোকে অবতারের যে তিনটী মুখ্যকারণের কথা বলা হইয়াছে, সেই তিনটী কারণ যে স্বরূপ-গোস্বামী ব্যতীত অপর কেহ জানিতেন না, স্বরূপ-গোস্বামী হইতেই যে সেই তিনটী কারণের সংবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত পয়ার সমূহে কবিরাজ-গোস্বামীই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর কথাতেই জানা যাইতেছে—শ্লোকটী স্বরূপ-দামোদরেরই রচিত। উক্ত ষষ্ঠ শ্লোক কেন, আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ম হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্লোকই যে স্বরূপদামোদরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ করার হেতু কিছু দেখা যায় না। লিপিকর-প্রমাদবশতঃই সম্ভবতঃ কোনও কোনও প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোক সমূহের উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্" কথাটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, লিপিকরপ্রমাদ-বশতঃই যে কোনও কোনও প্রতিলিপিতে "শাকে সিন্ধগ্নি" শ্লোকটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে; এইরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না।

যাঁহারা ১৫০৩ শকের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হইয়াছে মনে না করিলে প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দের উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে না। সঙ্গতি থাকে কিনা বিবেচনা করা দরকার।

ভক্তিরত্নাকরাদির যে বিবরণের সহিত চরিতামৃতের সমাপ্তিকালের কিছু সম্পর্ক থাকা সম্ভব, তাহার সার মর্ম্ম এই। গঙ্গাতীরে চাখন্দি গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। উপনয়নের পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; তখন তিনি মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীপাদগোপালভট্ট-গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত হন এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। শ্রীনিবাসের পরে নরোত্তমদাস এবং শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনজনে কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে থাকার পরে একই সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারার্থ বাঙলাদেশে প্রেরিত হয়। গ্রন্থগুলিকে চারিটী বাক্সে ভরিয়া, বাক্সগুলিকে মমজমা দিয়া ঢাকিয়া দুইখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে শ্রীজীব শ্রীনিবাসাদির সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন, তখন বনবিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বীরহাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুদল ধনরত্ন মনে করিয়া গাড়ীসহ গ্রন্থবাক্সগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তখন নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া গ্রন্থোদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরেই থাকিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ উপলক্ষে রাজা বীরহাম্বীরের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হয়। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং শ্রীনিবাসের চরণাশ্রয় করিয়া সমস্ত গ্রন্থ ফিরাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরে গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পরে পরে দুইটী বিবাহ করেন। বিবাহের ফলে তাঁহার ছয়টী সন্তান জন্মিয়াছিল। গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার প্রায় একবৎসর পরে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়াও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়। যাহাহউক, বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের দেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে খেতুরীর বিরাট মহোৎসব হইয়াছিল। এই মহোৎসবে নিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনীও উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, এই মহোৎসবের পরে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে নিত্যানন্দতনয় বীরচন্দ্রগোস্বামীও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের দেশে ফিরিয়া আসার পরে তাঁহার নিকটে এবং আরও দু-একজন বঙ্গদেশীয় ভক্তের নিকটে শ্রীজীবগোস্বামী পত্রাদি লিখিতেন। এরূপ কয়েকখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহাহউক, ১৫০৩ শকেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই তিনটী অনুমান :—প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত এবং বনবিষ্ণুপুরে অপহৃত গোস্বামিগ্রন্থ সমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতও ছিল ; দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই কবিরাজ-গোস্বামী তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং তৃতীয়তঃ, ১৫০৩ শকেই (১৫৮১ খৃষ্টাব্দেই) গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। এই তিনটী অনুমান বিচারসহ কিনা, আমরা এখানে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বলিয়া রাখা উচিত, আমরা এস্থলে এই প্রবন্ধে যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের উল্লেখ করিব, তাহাদের প্রত্যেকখানিই বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক।

শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে চরিতামৃত ছিল কিনা ?

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত যে সমস্ত গ্রন্থ বনবিষ্ণুপুরে চুরি হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া না গেলেও ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাস হইতে তাহাদের একটা দিগ্‌দর্শন যেন পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বকাহিনী যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, গৌড়ে রূপসনাতনের গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহার জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল (১ম বিলাস, ৪, ১২ পৃষ্ঠা)। শ্রীনিবাসের প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশের মধ্যেও তদ্রূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায়—"যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ-সনাতন। তুমি গেলে তোমারে করিবে সমর্পণ॥ (৪র্থ বিলাস, ৩৩ পৃষ্ঠা)।" গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করার সময়েও শ্রীজীব তাহাই জানাইয়াছেন—"মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম। গৌড়দেশে কেহত না জানে ইহার মর্ম্ম॥ এই সব গ্রন্থ লইয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়। (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪১ পৃষ্ঠা)।" গ্রন্থপ্রেরণ প্রসঙ্গে রূপ-সনাতনের গ্রন্থ সম্বন্ধে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদের নিকটে শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন—"লক্ষ গ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥ অগ্রদেশ হৈতে প্রভুর নিজাজ্ঞা গৌড়দেশ। সর্ব্বমহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥ এধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। যেমন হয়েন তার করহ প্রকার॥ (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪৩ পৃঃ)।" গ্রন্থপ্রেরণের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত মথুরাবাসী স্বীয় সেবক মহাজনকে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়াও শ্রীজীব বলিয়াছিলেন—"মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥ রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে বৈষ্ণব আচার। তিঁহ গৌড়দেশে লঞা করিব প্রচার॥ (প্রেমবিলাস, ১২ বিলাস, ১৪৫ পৃঃ)।" বৃন্দাবনত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস যখন স্বীয়গুরু গোপালভট্ট-গোস্বামীর নিকটে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাসের গৌড়-গমনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভট্টগোস্বামীও বলিয়াছিলেন—'শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে। (১২শ বি, ১৫৯ পৃঃ)।" শ্রীজীবগোস্বামী নিজ হাতে গ্রন্থরাজি সিন্ধুকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন; কি কি গ্রন্থ সিন্ধুকে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাও প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়। শ্রীজীব "সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর। থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥ বহুলোক লৈয়া সিন্ধুক আনিল ধরিঞা। গাড়ির উপরে সব-চড়াইল লঞা॥ (১৩শ বিলাস, ১৬২ পৃঃ)।" আবার মথুরাতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীনিবাসকে বিদায় দেওয়ার সময়ও শ্রীজীব বলিয়াছেন—"চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে। বর্ণন করিলা প্রেম সনাতন তাতে॥ সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম প্রকাশ তোমাতে। প্রকাশ করিতে দোঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ (১৩শ বিলাস, ১৬৩ পৃঃ)।" গোস্বামিগ্রন্থের পেটারায় অমূল্যরত্ন আছে বলিয়া হাতগণিতা প্রকাশ করাতেই বীরহাম্বীরের লুব্ধ দস্যুগণ গ্রন্থ-পেটারা চুরি করিয়াছিল; এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াও প্রেমবিলাসকার বলিয়াছেন, পেটারায় যে অমূল্যরত্ন ছিল, তাহা সত্যই; যেহেতু—"শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ। কত প্রেমধন আছে, তাহার তরঙ্গ॥ (১৩শ বি, ১৬৮ পৃঃ)।" শ্রীনিবাসের সহিত বীর হাম্বীরের সাক্ষাৎ হইলে রাজা যখন তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাস নিজেও বলিয়াছেন—"শ্রীনিবাস নাম; আইল বৃন্দাবন হইতে। লক্ষগ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥ গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার। চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥ (প্রেমবিলাস, ১৩শ বি, ১৭৭ পৃঃ)।"

প্রেমবিলাস হইতে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থ-পেটারায় শ্রীরূপের গ্রন্থই ছিল বেশী, শ্রীসনাতনের এবং শ্রীজীবের গ্রন্থও কিছু কিছু ছিল। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গ্রন্থের কোনও আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ভক্তিরত্নাকর কি বলে, তাহাও দেখা যাউক।

শ্রীনিবাসের জন্মের পুর্ব্বাভাসে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দকে বলিয়াছেন—"শ্রীরূপাদিদ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাসদ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব।। (ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৭১ পৃষ্ঠা)।" শ্রীনিবাস মথুরায় উপনীত হইলে শ্রীরূপ-সনাতন স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া। অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া।। (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৪-৫ পৃষ্ঠা)।" পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—"যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সাজ কৈল। সে সব গ্রন্থের নাম পুর্ব্বে জানাইল।। নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথো দিয়া। মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস মুখ চাইয়া।। রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব। বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব ॥ (৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৭০ পৃঃ)।" পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থ সমূহের নাম পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইরূপই এই কয় পয়ার হইতে জানা যায়। উল্লিখিত ভক্তিরত্নাকরের ৭১ এবং ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় যে কেবল রূপ-সনাতনের গ্রন্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার প্রথম তরঙ্গের ৫৬-৬০ পৃষ্ঠায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এবং শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর অনেক গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ৪৭০ পৃষ্ঠার পুর্ব্বে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও স্থলে গ্রন্থতালিকা আছে বলিয়া জানি না। ৫৬-৬০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থও শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত হয় নাই, সংশোধনাদির নিমিত্ত কতকগুলি গ্রন্থ শ্রীজীব রাখিয়া দিয়াছিলেন—৪৭০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত পয়ার এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। যাহা হউক, প্রেরিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হইল, কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতের উল্লেখ বা ইঙ্গিতও তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গ হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থারম্ভ শুনাইলেন। ৫৭০ পৃঃ।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনবাসের পরে শ্রীনিবাস যখন গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া দেশের দিকে রওনা হন, তখন গোপালচম্পূর লেখার আরম্ভই হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই শ্রীজীবকৃত গোপালচম্পূর উল্লেখ আছে। "গোপালচম্পূনামে গ্রন্থমহাশূর। ২।১।৩৯॥" আবার আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কবিরাজ-গোস্বামী উত্তরচম্পূর (গোপালচম্পূর শেষার্দ্ধের) কান্তাভাবসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলা প্রকটনের হেতু নির্ণয় করিয়াছেন (১।৪।২৫-২৬)। সুতরাং গোপালচম্পূ-সমাপ্তির পরেই যে শ্রীচরিতামৃতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের প্রথমবার দেশে আসার সময়ে গোপালচম্পূর লেখাই যখন আরম্ভ হয় নাই, তখন সেই সঙ্গে চরিতামৃত আনয়নের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এক্ষণে কর্ণানন্দের কথা বিবেচনা করা যাউক। কর্ণানন্দ অকৃত্রিম গ্রন্থ কিনা, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; সন্দেহের কারণ পরে বলা হইবে। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে চরিতামৃত ছিল, কর্ণামৃত হইতেও তাহা জানা যায় না। শ্রীনিবাসের জন্মের পুর্ব্বাভাস-বর্ণনপ্রসঙ্গেও ভক্তিরত্নাকরেরই ন্যায় কর্ণানন্দ বলিয়াছে—শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থ প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রন্থ-প্রেরণ-প্রসঙ্গেও শ্রীজীব সেই উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিবাসকে আদেশ করিয়াছেন (কর্ণানন্দ, ৬ষ্ঠ নির্য্যাস, ১১০ পৃঃ); তাঁহার সঙ্গে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। তবে, শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন, একস্থলে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। "গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল প্রকটন॥ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ। যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥ শ্রীভট্টগোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ। রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত যত গ্রন্থচয়। কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে। বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥ (১ম নির্য্যাস, ৩ পৃঃ)।" এস্থলে চরিতামৃতের উল্লেখ না থাকিলেও কবিরাজ-গোস্বামীর "রসময় গ্রন্থ" সমূহের উল্লেখ আছে। চরিতামৃত এসমস্ত রসময়

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। উল্লিখিত পয়ারসমূহে গ্রন্থের নাম নাই, গ্রন্থকারের নাম আছে; কয়েক পয়ার পরে কয়েকখানি গ্রন্থের নামও কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বৈষ্ণব-তোষণীর উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবতোষণী কিন্তু প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ছিল না, কয়েক বৎসর পরে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছে—তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৩ পৃষ্ঠা)। কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থসমূহও পরে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়; কারণ, প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর কোনও গ্রন্থ ছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস বা কর্ণানন্দ হইতেও জানা যায় না। যাহাহউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবারে আনীত গ্রন্থসমূহ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত পয়ার-গুলি কর্ণানন্দে লিখিত হয় নাই, বনবিষ্ণুপুরে অপহৃত গ্রন্থসমূহের প্রসঙ্গেও লিখিত হয় নাই; শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত কয় পয়ারে বলা হইয়াছে। বহুবার বহু সময়ে প্রচারার্থ বহুগ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামৃতও পরবর্ত্তী কালেই তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকিবে—এরূপ মনে করিলেও উক্ত পয়ারসমূহের মধ্যে কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা যাইবে না। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। চরিতামৃত লেখার সময়ে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছুকাল পরেও তাঁহার তত বেশী বয়স হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে তিনি চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন জরাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন; আদিলীলা শেষ করিয়া মধ্যলীলা আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়; তৎকালীন শরীরের অবস্থা অনুভব করিয়া অন্ত্যলীলা লিখিতে পারিবেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামীও বোধ হয় ভরসা পান নাই। তাই মধ্যলীলার প্রারম্ভেই অন্ত্যলীলার সূত্র লিখিয়া কৈফিয়তস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন—"শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ, যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥ আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয়। না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥ এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহামধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥ (চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)।" গ্রন্থশেষেও তিনি লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল—রাত্রিদিনে মরি॥ (অন্ত্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ)।"

কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য্য যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন এবং তাহার পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা চরিতামৃতে বর্ণিত অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, তখনও যে তিনি রাধাকুণ্ড হইতে চৌদ্দ মাইল হাটিয়া বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে পারিতেন, ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে তাহা জানা যায়।

বৃন্দাবন ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস-গোস্বামীর সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। (ভক্তি-রত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। এবং বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবাদির সঙ্গে গ্রন্থের গাড়ীর অনুসরণ করিয়া তিনি মথুরায়ও গিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪৮৭ পৃষ্ঠা)। শ্রীনিবাসের দেশে আসার কিছুকাল পরে খেতুরীর মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের পরে নিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহার বৃন্দাবনে আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী সাত ক্রোশ পথ হাটিয়া রাধাকুণ্ড হইতে যে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহাও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (একাদশ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃঃ)। বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবামাতা রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন; কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহারই সঙ্গে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া একটু তাড়াতাড়ি করিয়া "অগ্রেতে আসিয়া। দাস-গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া॥ অবসর পাইয়া কয়য়ে নিবেদন। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥" (ভঃ রঃ ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃঃ)। ইহার পরেও আবার নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র-গোস্বামী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; তাঁহার বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত

পূর্ব্বেই "সর্ব্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন ॥ শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে। আগুসরি লইতে আইসে সর্ব্বজনে ॥ শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্য-প্রেমময়। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গুণের আলয় ॥ ইত্যাদি ॥" (ভঃ রঃ ১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃষ্ঠা)। এস্থলে দেখা যায়, যাঁহারা প্রভু-বীরচন্দ্রকে বৃন্দাবনে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার নিমিত্ত শ্রীজীবাদির সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীও ছিলেন। তিনি থাকিতেন রাধাকুণ্ডে; আর শ্রীজীব থাকিতেন বৃন্দাবনে, সাতক্রোশ দূরে। এত দীর্ঘপথ হাটিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বীরচন্দ্রপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে। ইহার পরে বীরচন্দ্রপ্রভু যখন লীলাস্থলী দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি—"গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে। শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজের কুটীরে ॥ তথা হৈতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা ॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃঃ)।" তাঁহারা রাধাকুণ্ড হইতে সোজাসুজি বৃন্দাবনে আসেন নাই; কাম্যবন, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম, খদিরবন, যাবট ও গোকুলাদি দর্শন করিয়া ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে বৃন্দাবনে পৌছেন। (ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২-২৬ পৃঃ)। কবিরাজ-গোস্বামীও এসকল স্থানে গিয়াছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্ত্তিক-ব্রত-পূরণের মহোৎসব-উপলক্ষে করিরাজ-গোস্বামী যে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, প্রেমবিলাস হইতেও তাহা জানা যায় (১২ বিলাস, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

এসমস্ত উক্তি হইতে অনুমান হয়, চরিতামৃতের মধ্যলীলার লিখনারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, তিনি যত "বৃদ্ধ ও জরাতুর" হইয়াছিলেন, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছুকাল পরেও তাঁহার তত বয়স হয় নাই, তিনি তত "বৃদ্ধ ও জরাতুর"—তত চলচ্ছক্তিহীন—হন নাই। তাহাতেই অনুমান হয়, তখনও তাঁহার চরিতামৃত লেখা শেষ হয় নাই—মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও হয় নাই। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃত ছিল না এবং বনবিষ্ণুপুরে যে তাহা অপহৃত হয় নাই' তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা

বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামিগ্রন্থ-সমূহ অপহৃত হওয়ার পরেও কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা, তাহারই আলোচনা এক্ষণে করা হইবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—গ্রন্থচুরির পরেও গ্রন্থপ্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত গ্রন্থবাহী গাড়ী, গাড়োয়ান এবং মথুরাবাসী গ্রন্থপ্রহরিগণ বনবিষ্ণুপুরেই ছিল। গ্রন্থপ্রাপ্তির পরে গ্রন্থচুরির, গ্রন্থপ্রাপ্তির এবং রাজা বীরহাম্বীরের মতিপরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীজীবের নামে এক পত্র লিখিলেন; এই পত্র সহ প্রহরিগণ বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়; যে গাড়ীতে গ্রন্থসমূহ আনা হইয়াছিল, সেই গাড়ীও প্রহরিগণের সঙ্গেই গোস্বামিগণের নিমিত্ত বীরহাম্বীরের প্রেরিত উপঢৌকন সহ বৃন্দাবনে ফিরিয়া যায়। পত্র ও উপঢৌকন পাইয়া গোস্বামিগণ বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন; গ্রন্থচুরির সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্তির সংবাদও পাওয়াতে চুরির সংবাদের নিদারুণ আঘাত গোস্বামীদিগকে মর্ম্মাহত করিতে পারে নাই।

যাহাহউক, শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃন্দাবনত্যাগের পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী যথাবস্থিতদেহে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার একাধিক স্পষ্ট উল্লেখও ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন (ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)। ইহার পরের বৎসরেই (১১),

---

(১১) অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসরেই যে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরে অবশ্য ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমবারের বৃন্দাবনত্যাগ এবং দ্বিতীয়বারে বৃন্দাবনযাত্রার মধ্যবর্ত্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরা বিবেচনা করিয়া এবং শ্রীনিবাসকে পুনরায় বৃন্দাবনে দেখিয়া "এত শীঘ্র ইঁহার গমন হইল কেনে" (ভক্তিরত্নাকর, ৫৬২) ভাবিয়া বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিবৃন্দের বিস্ময়ের কথা বিবেচনা করিয়াই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসর অনুমিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের শেষভাগে যাত্রা করিয়া (ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ) মাঘমাসে বসন্ত-পঞ্চমীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য পুনরায় বৃন্দাবনে উপনীত হন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৬৮।৬৯ পৃঃ)। যে অগ্রহায়ণে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পুনর্যাত্রা করেন, তাহার পরের পৌষমাসের শেষভাগে রামচন্দ্র-কবিরাজও বৃন্দাবন যাত্রা করেন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ)। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডতীরে রামচন্দ্র-কবিরাজের—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যতজন। তা সভা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন। (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭৭ পৃঃ)।" ইহার পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্য দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে খেতুরীর মহোৎসব। এই উৎসবের পরে জাহ্নবামাতাগোস্বামিনী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন ; এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃঃ) এবং বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সঙ্গে পুনরায় রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন (১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃঃ)। ইহারও পরে প্রভু বীরচন্দ্র (বা বীরভদ্র)-গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনও কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের সঙ্গে বীরভদ্র-প্রভুকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন (১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃঃ) এবং বীরভদ্র যখন রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে নানালীলাস্থল দর্শন করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃঃ)।

গ্রন্থচুরির বহুদিন পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, স্বয়ং জীবগোস্বামীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। শ্রীজীবের লিখিত যে পত্রগুলি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ পত্রখানি গোবিন্দ-কবিরাজের নিকটে লিখিত ; এই পত্রখানিতে শ্রীলকৃষ্ণদাস-কবিরাজের নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। "ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ॥" এস্থলে কৃষ্ণদাসশব্দে যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজকেই বুঝাইতেছে, ভক্তিরত্নাকর হইতেই তাহা জানা যায়। উক্ত পত্রের শেষে লিখিত হইয়াছে—"পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রচার॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৬ পৃষ্ঠা)।"

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অতীব প্রাঞ্জল, মধুর, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিস্তৃত। কবিরাজ-গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধীয় কোনও কথাই ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রথমবার বৃন্দাবনত্যাগের – অথবা বন-বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরেও বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র-কবিরাজ, জাহ্নবামাতা এবং বীরচন্দ্র-গোস্বামীর সহিত কবিরাজের সাক্ষাতের কথা ভক্তিরত্নাকরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখা যায় না। অধিকন্তু, গোবিন্দ-কবিরাজের নিকটে লিখিত শ্রীজীব-গোস্বামীর পত্রখানিকে কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। গোবিন্দ-কবিরাজ ছিলেন রামচন্দ্র-কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; প্রথমে তিনি শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে দেশে আসিলে পর রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার (শ্রীনিবাসের) পরিচয় হয়। তারপর রামচন্দ্রের দীক্ষা ; তারপর শ্রীনিবাসের পুনর্বৃন্দাবন গমন, ও রামচন্দ্রেরও বৃন্দাবন গমন। তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দের দীক্ষা। দীক্ষার পরেই গোবিন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বন্ধীয় পদ রচনা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠান। সেই পদ আস্বাদন করিয়া বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মে ; উল্লিখিত পত্রেই শ্রীজীব সেই আনন্দের কথা গোবিন্দ-কবিরাজকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবনত্যাগের অনেকদিন পরের এই চিঠি। সুতরাং শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের অনেক পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, ভক্তিরত্নাকর হইতে নিঃসন্দেহরূপেই তাহা জানা যাইতেছে।

এক্ষণে প্রেমবিলাসের উক্তি বিবেচনা করা যাউক। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়,—গ্রন্থচুরির পরে গ্রাম হইতে কালি কলম-কাগজ সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামীর নামে শ্রীনিবাসাচার্য্য এক পত্র লিখিয়া গ্রন্থচুরির সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই পত্র লইয়া গাড়োয়ানদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। (প্রেমবিলাস, ১৩শ বিলাস, ১৬৭ পৃষ্ঠা)। ইহারা পত্র নিয়া শ্রীজীবের নিকটে দিল ; মুখেও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায় :—"শ্রীজীব পড়িল, পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ-গোসাঞির স্থানে সকল কহিল। শ্রীভট্ট গোসাঞি শুনিলেন সব কথা। কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥ রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুইজনে। কান্দিয়া কান্দিয়া

পড়ে লোটাইয়া ভূমে ॥ কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ। কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন ॥ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে। অন্তর্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে ॥ কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ ॥ বিরহ-বেদনা কত সহিব পরাণে। মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমাবিনু আর কেবা আমার আছয় ॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণা হৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয় ॥ প্রভুরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলা প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি। তোমরা করহ দয়া মোর কেহ নাই। শ্রীদাস গোসাঞি দেহ নিজ পদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান ॥ বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস। মরমে রহল শেল না পুরল আশ ॥ তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার। ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর ॥ তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এদুঃখ সহিয়া ॥ নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে ॥ অহে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান। রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্ ॥ যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। মুদ্রিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ ॥—প্রেমবিলাস, ১৩শ বিলাস, ১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা।"

প্রেমবিলাসের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন:—"এই পুস্তক (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) লেখার পর তাঁহার (কবিরাজ গোস্বামীর) জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—একথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্তলিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে; এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন *—'রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে ॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে ॥'—প্রেমবিলাস।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)।

দীনেশবাবু উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা দরকার। কবিরাজের স্বহস্তলিখিত শ্রীচরিতামৃত পুঁথি যে শ্রীনিবাসের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, এই সংবাদ দীনেশবাবু কোথায় পাইলেন, উল্লেখ করিলে ভাল হইত। প্রেমবিলাসে, বা ভক্তিরত্নাকরে, এরূপ কোনও উক্তি দেখা যায় না। আর, গ্রন্থচুরির সংবাদ পাইয়াই যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন, একথাও উল্লিখিত কতিপয় পয়ার হইতে বুঝা যায় কিনা, দেখা যাউক।

গ্রন্থচুরির সংবাদে লোকনাথ-গোস্বামী, গোপালভট্টগোস্বামী প্রভৃতিও অনেক মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন, অনেক কাঁদিয়াছেন। দাস-গোস্বামী এবং কবিরাজ-গোস্বামী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়াছেন। তারপরে গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গে "কি করিল কিবা হৈল" বলিয়াও কবিরাজগোস্বামী অনেক ভাবিয়াছেন। এসকল কথা বলিয়া তাহার পরেই প্রেমবিলাসে বলা হইয়াছে—"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-ইত্যাদি। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি—গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়েও

---

*Bankura Gazetteer এর ২৫ পৃষ্ঠায় ওমেলি সাহেবও লিখিয়াছেন—"Two Vaishnava works the Prem-vilasa of Nityananda Das (alias Balaram Das) and the Bhaktiratnakara of Narahari Chokrabartty, relate that Srinivasa and other bhaktas left Brindaban for Gour with a number of Vaisnava manuscripts, but were robbed on the way by Bir Hamber. This news killed the old Krsshnadas Kaviraj, author of the Chaitanya Charitamrita."

কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, স্বচ্ছন্দে তিনি সাত ক্রোশ পথ যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন। তখনও জরাবশতঃ তিনি চলচ্ছক্তিহীন হন নাই। ইহার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই গ্রন্থচুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া থাকিবে ; এই অল্প সময়ের মধ্যেই হঠাৎ জরা আসিয়া তাঁহাকে যে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার যে "জরা কালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-অবস্থার সময়েও দুইটি বিবরণ উক্ত পয়ার কয়টি হইতে জানা যায় ; প্রথমতঃ, কুণ্ডতীরে বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কবিরাজ কুণ্ড মধ্যে ঝাঁপ দিলেন ; দ্বিতীয়তঃ দাস-গোস্বামীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার বদনে স্বীয় নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া, "যেই গণে স্থিতি তাহা ভাবনা করিতে করিতে" অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলার স্মরণে সখীমঞ্জরীদের যে যূথের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে চিন্তা করিতেন, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সেই যূথে নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিতে করিতে মুদিত নয়নে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। যদি তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবার জন্যই কুণ্ড মধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাকেন এবং তাহাতেই যদি তাঁহার তিরোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে দাস-গোস্বামীর চরণে প্রাণনিষ্ক্রামণের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর দাস-গোস্বামীর চরণ-তলেই যদি তাঁহার প্রাণনিষ্ক্রামণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। একই সময়ে একই ব্যক্তির লেখনী হইতে পরস্পর-বিরোধী এইরূপ দুইটি বিবরণের কোনওটীর উপরেই আস্থা স্থাপন করা যায় না।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। আকস্মিক দুঃসংবাদ শ্রবণে যাঁহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়, সাধারণতঃ সংবাদ-শ্রবণ মাত্রেই তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে না। উদ্ধৃত পয়ার সমূহ হইতে, গ্রন্থচুরির সংবাদ-প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না ; তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ—মর্ম্মভেদী দুঃখ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পয়ার সমূহ হইতে জানা যায় না। কবিরাজ-গোস্বামীর মত একজন ধীর স্থির ভজনবিজ্ঞ ভগবদ্‌গতচিত্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ যে নষ্ট বস্তুর শোকে যোগাড়যন্ত্র করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহা কিছুতেই আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। উল্লিখিত পয়ার কয়টী হইতে তাহা বুঝাও যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহা তাঁহার ন্যায় সিদ্ধভক্তের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। হরিদাসঠাকুরও ঠিক এইভাবেই মহাপ্রভুর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বীয় নয়নদ্বয় প্রভুর বদনে স্থাপন করিয়া মুখে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম" উচ্চারণ করিতে করিতে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শীঘ্রই লীলাসম্বরণ করিবেন বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিবেন না মনে করিয়াই হরিদাস-ঠাকুর স্বেচ্ছায় ঐভাবে নির্য্যাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাসগোস্বামীর চরণে কবিরাজ-গোস্বামীর যে নির্য্যাণের কথা প্রেমবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়—বিরহবেদনায় অধীর হইয়াই তিনি এরূপ করিয়াছেন বলিয়া প্রেমবিলাস বলে।

যে বিরহবেদনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-বেদনা ; তাই এই বেদনার নিরসনের উদ্দেশ্যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদির, শ্রীরূপ-সনাতনাদির কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন —"কোথা গেলে প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ" বলিয়া। তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ হারাণের কথার আভাসও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, গ্রন্থচুরির সংবাদে তিনি কাঁদিয়াছেন সত্য ; অন্য গোস্বামীরাও কাঁদিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন ; দাসগোস্বামীও তাহা করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদির অমূল্য গ্রন্থরাজির এই পরিণামের কথা শুনিলে যে কোনও ঐকান্তিক ভক্তেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের যে বর্ণনা প্রেমবিলাসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অবিসংবাদিতভাবে ইহা বুঝা যায় না যে—তাঁহার চরিতামৃত-অপহরণের সংবাদেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই—গোস্বামীদের গ্রন্থচুরির সংবাদ-প্রাপ্তিতে তাঁহার ভক্তি-কোমল-চিত্তের ব্যাকুলতার কথা বর্ণন করিতে করিতেই, তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রেমব্যাকুলতার কথা গ্রন্থকারের স্মৃতিপথে উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণবিরহ-

ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া অন্তিম-সময়ে—গ্রন্থচুরির বহুবৎসর পরে, বৃদ্ধকালে—তিনি কিরূপ ভক্তজনোচিতভাবে অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক কথার প্রসঙ্গে অনুরূপ অন্য কথা বর্ণন করার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালের গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়; প্রেমবিলাসেও তাহার অভাব নাই।

তবে কি "কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন"-পর্য্যন্ত গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া "জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়সে কবিরাজের স্বাভাবিক অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে? তাহাই। এইরূপ অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। অন্তিম-সময়ে এইভাবে অন্তশ্চিন্তিত দেহ লীলা-স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগের সৌভাগ্য বৈষ্ণবমাত্রেরই কাম্য।

কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে এক অসঙ্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়, দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বে কবিরাজ-গোস্বামী তিরোধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর পূর্ব্বে দাস-গোস্বামীর তিরোভাবই বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা।

এসমস্ত কারণে, প্রেমবিলাসের উল্লিখিত পয়ার-সমূহের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। ঐ উক্তিগুলি গ্রন্থকারের লিখিত হইলেও, উহা হইতে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যায় না।

গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা অন্য ভাবেও বুঝিতে পারা যায়। অগ্রহায়ণের শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করেন। কখন তিনি বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোথাও না থাকিলেও অনুমান করা চলে। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, দ্বিতীয়বার যখন শ্রীনিবাস যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তখন তিনি "মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস শেষে" যাত্রা করিয়া "মাঘশেষে বসন্ত পঞ্চমী দিবসে" বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন (৯ম তরঙ্গ, ৫৭২, ৫৬৯ পৃষ্ঠা); যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন পদব্রজে যাইতে দুইমাস লাগিয়াছিল। বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনের পথ আরও কম; সুতরাং বনবিষ্ণুপুর হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাইতে দুইমাসের বেশী সময় লাগিতে পারে না। বৃন্দাবন হইতে গোগাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিতে কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে, এজন্য যদি চারিমাস সময় ধরা যায়, তাহা হইলে চৈত্রমাসে গ্রন্থচুরি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রেমবিলাসের মতে চুরির অল্প পরেই বৃন্দাবনে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল; সংবাদ পৌঁছিতে দুইমাস সময় লাগিয়াছিল মনে করিলে জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়; ঐ সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব হইয়া থাকিলে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যেই তাহা হইয়া থাকিবে। কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী। তিরোভাবের সময় হইতে বৈষ্ণব-সমাজ এই শুক্ল দ্বাদশীতেই কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-উৎসব করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং পঞ্জিকার উক্তিতে ভুল থাকিতে পারে না। অথচ প্রেমবিলাসের উক্তি অনুসারে, গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়া থাকিলে আষাঢ়ের মধ্যেই তাহা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজের চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পঞ্জিকার উক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া প্রেমবিলাসের কিম্বদন্তীমূলক উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

গ্রন্থচুরির বহুকাল পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এসমস্ত প্রমাণকে—বিশেষতঃ শ্রীজীবের পত্রের উক্তিকে—কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

অনেকেই অনেক স্বকপোলকল্পিত বিষয় মূল প্রেমবিলাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রেমবিলাসেরই নামে যে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেম-বিলাসের যে অংশ কৃত্রিম বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, সম্পাদক ও সমালোচকগণ যে সেই অংশ তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে পুস্তকের উপরে প্রক্ষেপকারীদের

এত অত্যাচার চলিয়াছে তাহাতে দু-একটী কৃত্রিম বস্তু যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে না, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ একরূপ হইলেও এই সন্দেহের অবকাশ দূর হয় না; প্রাচীনকালেও প্রক্ষেপকারীর অভাব ছিল না, সুযোগ তো যথেষ্টই ছিল। প্রাচীন পুঁথির কোনও কোনও বর্ণনা আবার ভিত্তিহীন কিম্বদন্তীর উপরেও প্রতিষ্ঠিত। কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও যে প্রচ্ছন্ন প্রক্ষেপ নহে, কিম্বা তাহা যে ভিত্তিহীন কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাই বা কে বলিবে? শ্রীজীবের পত্রের সঙ্গে যখন ইহার বিরোধ দেখা যায়, তখন ইহার বিশ্বাসযোগ্যতাসম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে।

যাহাহউক কর্ণানন্দ সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিয়াই এবিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। কর্ণানন্দ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের কন্যা হেমলতা-ঠাকুরাণীর শিষ্য প্রসিদ্ধ পদাকর্ত্তা যদুনন্দনদাস ঠাকুরই কর্ণানন্দের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৫২৯ শকে (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ণানন্দেই প্রকাশ। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে, বীরহাম্বীরের রাজত্বকালে ১৫২২ শকের কাছাকাছি কোনও সময়ে শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছেন; তাহার পরে তাঁহার বিবাহ, তাহার পরে সন্তান-সন্ততির জন্ম। সুতরাং ১৫২৯ শকে হেমলতা-ঠাকুরাণীর জন্মও হয়তো হয় নাই; অথচ এই হেমলতার আদেশেই নাকি তদীয় শিষ্য ১৫২৯ শকে এই পুস্তক লিখিয়াছেন! গ্রন্থকার তারিখ লিখিতে ভুল করিয়াছেন—একথাও বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ লিখিতে গ্রন্থকর্ত্তার ভুল হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস কর্ণানন্দ একখানা কৃত্রিম গ্রন্থ; এরূপ বিশ্বাসের কয়েকটী হেতু পরবর্ত্তী "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইহা যে ভক্তিরত্নাকরেরও পরের লেখা, কর্ণানন্দের মধ্যেই তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রথম নির্য্যাসের ৫-৬ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজের প্রথম পরিচয়ের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গের ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনার সহিত তাহার প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল দেখা যায়। উভয় পুস্তকেই রামচন্দ্র-কবিরাজের রূপ বর্ণনা একরূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপমা একরূপ এবং অধিকাংশ স্থলে শব্দাদিও প্রায় একরূপ। কেবল—'কন্দর্পসমান'-স্থলে 'মন্মথ-সমান', 'হেমকেতকী'-স্থলে 'স্বর্ণকেতকী', 'গন্ধর্ব্বতনয় কিবা অশ্বিনী-কুমার' স্থলে "কামদেব কিবা অশ্বিনীকুমার। কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্বপুত্র আর॥" ইত্যাদিরূপ মাত্র প্রভেদ। ইহাতে মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখিয়াই কর্ণানন্দের এই অংশ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর অবস্থাসম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ভক্তিরত্নাকরের উক্তির একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও কর্ণানন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন, গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তিতেই কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব। ভক্তিরত্নাকরের মতে গ্রন্থচুরির বহুকাল পরেও কবিরাজ প্রকট ছিলেন। কর্ণানন্দ এই দুই রকম উক্তির সমন্বয় করিতে যাইয়া হেমলতাঠাকুরাণীর মুখে বলাইয়াছেন যে, গ্রন্থচুরির সংবাদে কবিরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার পরেও তিনি প্রকট ছিলেন (কর্ণানন্দ, ৭ম নির্য্যাস, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

এসমস্ত কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকরের পরেই কর্ণানন্দ লিখিত হইয়াছে। আবার পুস্তকমধ্যে পুস্তক-সমাপ্তির তারিখ ১৫২৯ শক দেখিলে ইহাও মনে হয় যে, প্রেমবিলাসের যে অতিরিক্ত অংশ একেবারে কৃত্রিম বলিয়া দীনেশবাবু প্রভৃতি তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারও পরে কর্ণানন্দ লিখিত। কারণ, ঐ কৃত্রিম অংশেই লিখিত হইয়াছে, ১৫০৩ শকে চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে। কর্ণানন্দলেখক তাহাই বিশ্বাস করিয়া চরিতামৃত হইতে অনেক উক্তি তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুস্তকখানিতে প্রাচীনত্বের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থসমাপ্তির সময় ১৫২৯ দিয়া পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসের উপরে গ্রন্থকর্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। কি উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাঁহারও যথেষ্ট প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়; "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা গোপালচম্পূ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—অপ্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বকীয়ভাবই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত। শ্রীজীবের অপ্রকটের কিছুকাল পরে

এই মতের বিরোধী একটা দলের উদ্ভব হয়। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে তিনিই এই বিরোধীদলের অগ্রণী হইয়া অপ্রকটে পরকীয়াবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীজীবের মত ভ্রান্ত, একথা বলিতে কেহই সাহসী হন নাই; চক্রবর্ত্তি-পাদ প্রমুখ বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন—শ্রীজীব স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিলেও পরকীয়াবাদই ছিল তাঁহার হার্দ্দ, অথবা শ্রীজীবের লেখার যথাশ্রুত অর্থে প্রকটলীলায় স্বকীয়াবাদ সমর্থিত হইলেও তাঁহার লেখার গূঢ় অর্থ পরকীয়াবাদের অনুকূল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শ্রীজীবের কোনও লেখারই পরকীয়াভাবাত্মক গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে এপর্য্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। এরূপ চেষ্টা সম্ভবও নয়; কারণ, সূর্য্য শব্দের গূঢ় অর্থ অমাবস্যার চন্দ্র—একথা বলাও যা, গোপালচম্পূর গূঢ় তাৎপর্য্য পরকীয়াবাদ—একথা বলাও তা। বিশেষতঃ, ইহা কেবল শ্রীজীবেরই মত নহে শ্রীরূপ-সনাতনেরও যে এই মত, তাহা শ্রীজীবই বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতেও তাহা জানা যায়। আর কেবল গোপালচম্পূতেও নহে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীজীবকৃত টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীবকৃত টীকা, গোপালতাপনী শ্রুতি, লোচনরোচনী টীকা, গৌতমীয়তন্ত্রাদি সমস্ত গ্রন্থেই অকপটে স্বকীয়া-ভাবের কথা পাওয়া যায়। কর্ণানন্দ যে শ্রীজীবের মতের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কাহারও দ্বারা লিখিত হইয়াছে, এই পুস্তিকাখানি তাড়াতাড়ি ভাবে পড়িয়া গেলেও তাহা সহজে বুঝা যায়।

যাহা হউক, কৃত্রিমই হউক, আর অকৃত্রিমই হউক, কর্ণানন্দ একথা বলে না যে, গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বরং গ্রন্থচুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পরেও যে তিনি প্রকট ছিলেন, তাহাই কর্ণানন্দ হইতে জানা যায়।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময় নির্ণয়

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের আলোচনায় সাধারণতঃ সাধ্যসাধন তত্ত্ব, ভক্তির বিকাশ, ভাবের পুষ্টি, ভক্ত ও ভগবানের গুণকীর্ত্তনাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাঁহারা কদাচিৎ তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপকরণ কিছু পাওয়া গেলেও, তাহার সাহায্যে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায়ই দুষ্কর। অথচ তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয় সময় সময় একরূপ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। তাই যাহা কিছু উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হয়। প্রেমবিলাসাদি পুস্তকের উক্তি হইতে শ্রীনিবাসের সময় নির্ণয় করিতে আমরাও তদ্রূপ চেষ্টা করিব।

বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দিরেই যে শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৭ পৃষ্ঠা। প্রেমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস, ৬১ পৃঃ)। এই ঘটনা হইয়াছিল রূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে। অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহই যে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সুতরাং রূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে গোবিন্দজীর যে মন্দিরে শ্রীজীবাদির সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা যে মানসিংহের নির্ম্মিত মন্দিরই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে—এই মন্দির কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে জানা যায়, আকবরসাহের রাজত্বের ৩৪শ বর্ষে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরসাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বের ৩৪শ বর্ষ হইল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনও লিখিয়াছেন, গোবিন্দজীর মন্দিরে যে প্রস্তর-ফলক আছে, তাহা হইতে জানা যায়, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল (১)। ইহা হইতে বুঝা যায় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের (অর্থাৎ ১৫১২ শকাব্দার) পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই।

(১) Vaisnava Literature, p. 170.

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। সেইদিন রাত্রিকাল ছিল "বৈশাখী পুর্ণিমানিশি শোভা চমৎকার। (১৩৮ পৃঃ)।" পরের দিন (অর্থাৎ প্রতিপদের দিন) প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপণ করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীজীবের সাক্ষাতে গেলেন; শ্রীজীব তাঁহাকে নিয়া রাধাদামোদর বিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং "শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি সেইখানে। তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥ (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৯ পৃঃ)।" শ্রীজীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই শ্রীনিবাস তখন ভট্ট-গোস্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। দ্বিতীয়াতে দীক্ষা দিবেন বলিয়া ভট্টগোস্বামী অনুমতি দিলেন। তখন "শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া। আইলা আপন বাসা অতি হৃষ্ট হৈয়া॥ কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি। করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাঞি॥ ** তারপর দিন স্নান করি শ্রীনিবাস। শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ॥" তখন ভট্ট গোস্বামী "শ্রীনিবাসে শ্রীরাধাচরণ সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব্ব বিধানে। ভক্তি রত্নাকর, ১৪৪ পৃঃ।" এসমস্ত উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখ পুর্ণিমার দিন শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে উপনীত হইয়াছিলেন এবং ২২শে তারিখে কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামীর নিকটে তিনি দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই; ১৫১২ শকের ২০শে বৈশাখ পুর্ণিমা ছিল না; ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখও ছিল শুক্লা চতুর্থী। ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পুর্ণিমা ছিল প্রায় ২১ দণ্ড। সেই দিন সোমবারও ছিল। ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রতিপদ ছিল প্রায় ১৬ দণ্ড এবং ২২শে বৈশাখ বুধবার দ্বিতীয়া ছিল প্রায় ১১ দণ্ড। সুতরাং মনে করা যায় যে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবারেই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন এবং ২২শে বৈশাখ বুধবার দ্বিতীয়ার মধ্যে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—শ্রীনিবাস ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১৫১৩ শকে) বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন (২); কিন্তু ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখ পুর্ণিমা ছিল না, তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই ১৫১৩ শকে তাঁহার বৃন্দাবন গমন স্বীকার করিলে ভক্তিরত্নাকরের উক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না। ১৫১৪ শকের পরে আবার ১৫৪১ শকের ২০শে বৈশাখ রবিবারে ৩৭ দণ্ডের পরে পুর্ণিমা ছিল। কিন্তু অত বিলম্বে—১৫৪১ শকে—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন একেবারেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বিষ্ণুপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বা ১৫৪৪ শকাব্দায় রাজা বীরহাম্বীর মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাসের কয়েকবৎসর বৃন্দাবনে অবস্থিতির পরে গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ, তারপর গ্রন্থচুরি, তারপর তৎকর্ত্তৃক বীরহাম্বীরের দীক্ষা এবং তাহারও কয়েকবৎসর পরে মন্দির-প্রতিষ্ঠা। শ্রীনিবাস ১৫৪১ শকে বৃন্দাবনে গিয়া থাকিলে এত সব ব্যাপারের পরে তিন বৎসরের মধ্যে ১৫৪৪ শকে মল্লেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুতরাং ১৫৪১ শকে—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন বিশ্বাসযোগ্য নহে (৩)। ১৫১৪ শকের পুর্ব্বে ১৪৯৫ শকেও ২০শে বৈশাখ পুর্ণিমা ছিল প্রায় ৪২ দণ্ড, শুক্রবার। ১৪৯৫ শক হইল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৪৯৫ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন স্বীকার করিতে গেলে একটী ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা এই।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, রূপ-সনাতনের অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছেন; ইহাতে কোনওরূপ মতভেদ নাই। পঞ্জিকা হইতে জানা যায়—আষাঢ়ী পুর্ণিমায় সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। ১৪৯৫ শকের বৈশাখের পুর্ব্বে তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিলে মনে করিতে হইবে ১৪৯৪ শকে

---

(২) Vaisna Literature. P. 171.

(৩) ১৫৩৩ শকের ২০শে বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পরে ৫।৬ দণ্ড পুর্ণিমা ছিল; এই বৎসরেও শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়া ছিলই না; সুতরাং ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়ায় দীক্ষার কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাস গেলেও ১৫৪৪ শকে বীরহাম্বীরকর্ত্তৃক মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনগমন সম্ভব নয়।

বা তাহার পূর্ব্বে কোনও শকেই আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে তাঁহাদের অন্তর্ধান হইয়াছিল। ১৪৯৪ শকের পৌষে ইংরেজী ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ; সুতরাং ১৪৯৪ শকের আষাঢ়-শ্রাবণ পড়িয়াছে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে; তাহা হইলে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে রূপ-সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল—১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রকট ছিলেন না—ইহাই মনে করিতে হয়; কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে; কারণ, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবরসাহ যে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা (৪)। কাজেই ১৪৯৫ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমন সম্ভব নয়। বিশেষতঃ ১৪৯৫ শকে গোবিন্দজীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অথচ গোবিন্দজীর মন্দিরেই শ্রীনিবাস সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীবাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এ সমস্ত কারণে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবার পুর্ণিমার দিনই শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

এখানে দেখিতে হইবে, গোস্বামীগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস কোন্ সময়ে বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, যাঁহাদের আদেশে ও অনুরোধে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, ভূগর্ভ গোস্বামী ছিলেন তাঁহাদের একতম। চরিতামৃতের আদিলীলার ৮ম পরিচ্ছেদেও ভূগর্ভগোস্বামীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। চরিতামৃত লিখিতে প্রায় ৮।৯ বৎসর লাগিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন। আর, পুর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছে; তাহা হইলে ১৬০৭ কি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় এবং আদির ৮ম পরিচ্ছেদ—যাহাতে ভূগর্ভগোস্বামীর উল্লেখ আছে, তাহা—১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা; তখনও ভূগর্ভগোস্বামী প্রকট ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের যে কয়খানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম পত্র খানিতে ভূগর্ভগোস্বামীর তিরোভাবের কথা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই পত্রখানিও ১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পরে কি কাছাকাছি কোনও সময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এই পত্রে শ্রীনিবাসের প্রথমপুত্র বৃন্দাবনদাস পড়াশুনা কিছু করিতেছেন কিনা, শ্রীজীবও তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং সেই সময় বৃন্দাবনদাসের পড়াশুনার বয়স—অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৬০১ কি ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে শ্রীনিবাসের বিবাহ অনুমান করা যায়। গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার অল্প কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাসের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল; সুতরাং ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন মনে করা যায় (১১)।

অন্যান্য প্রমাণ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কিনা; তাহা দেখা যাউক। বীরহাম্বীরের রাজত্বকালেই যে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মতভেদ নাই। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত বীরহাম্বীর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাসের আগমন-সময়ে বীরহাম্বীরের বয়সই বা কত ছিল।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া যে সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে বীরহাম্বীরের সভায় নিত্য ভাগবত পাঠ হইত; রাজা নিত্যই শুনিতেন। শ্রীনিবাস যেদিন সর্ব্বপ্রথম রাজসভায় উপনীত হইলেন, সেইদিন রাজা তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং কোন্ স্থান পাঠ করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, বীরহাম্বীর তখন বালক মাত্র ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি ছিল বলিয়া অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না; কারণ, তদপেক্ষা কম বয়সে নিত্য ভাগবত-শ্রবণের প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই সময়ে তাঁহার রাণীর সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও বুঝা যায়, তিনিও তখন বালিকা বা কিশোরী মাত্র ছিলেন না। ভক্তিরত্নাকর হইতে

---

(৪) Crawe's Histroy of Mathura. P. 241 quoted in Vaisnava Literature. P. 27.

(১১) দীনেশবাবুও বলেন, ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন এবং রাজা বীরহাম্বীরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন Vaisnava Literature P. 129.

জানা যায়, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার বৎসরখানেক পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন ; ফিরিবার পথে বিষ্ণুপুরে অপেক্ষা করিয়া বীরহাম্বীরের পুত্রকে তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন ; দীক্ষার পরে শ্রীজীব এই রাজপুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গোপালদাস ; ভক্তিরত্নাকরমতে তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ধাড়ী হাম্বীর (১২)। যাহা হউক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দীক্ষা হয় না ; দীক্ষার সময়ে এই রাজপুত্রের বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর ছিল মনে করিলেও গ্রন্থচুরির সময়ে তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর ছিল বলিয়া জানা যায় ; তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহার পিতা বীরহাম্বীরের বয়সও প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বলিয়া মনে করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে বীরহাম্বীর সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি আছে কি না।

বনবিষ্ণুপুরে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে ; তাহাদের কতকগুলিতে নির্মাণসময় খোদিত আছে, কতকগুলিতে নাই। যে সকল মন্দিরে নির্মাণকাল খোদিত আছে, তাহাদের একটির নাম মল্লেশ্বর-মন্দির ; খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীর কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১) ; ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও লিপি পাওয়া যায় না। এই লিপি অনুসারে বুঝা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দেও বীরহাম্বীরের রাজত্ব ছিল।

আবার, আবুল ফজল লিখিত আকবর-নামা হইতে জানা যায়, আকবরের রাজত্বের ৩৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে কুতলুখাঁ-পক্ষীয়দের সহিত যুদ্ধে মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপন্ন হইলে হাম্বীর জগৎসিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন (২)। বাঁকুড়া গেজেটিয়ার হইতেও জানা যায়—আফগানগণ উড়িষ্যা দেশ জয় করিয়া কুত্‌লুখাঁর সৈন্যাধ্যক্ষত্বে যখন মেদিনীপুরেও অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তখন—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—বীরহাম্বীর মোগলদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আফগান-সৈন্যগণের অতর্কিত নৈশ আক্রমণে মোগল-সেনাপতি জগৎসিংহ যখন আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বীরহাম্বীর তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদে বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন (৩)। এসমস্ত ঐতিহাসিক উক্তি হইতে বুঝা যায়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দেও বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেশ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ; সুতরাং এই সময়ে—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫।২৬ বৎসর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলেও ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তি হইতেও যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকে) বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল এবং অন্ততঃ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ (১৫১৩ শক হইতে ১৫৪৪ শক) পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় (৪)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১৫২১ কি ১৫২২ শকাব্দে) শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন ; উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, ঐসময়ে বীরহাম্বীরেরই রাজত্ব ছিল ; ১৫২১ কি ১৫২২ শকে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে আগমন বা গ্রন্থচুরি হইয়াছিল মনে করিলেই ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তির সহিত

---

(১২) বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের মতে ধাড়ীহাম্বীর ছিলেন বীর হাম্বীরের পিতা। Bankura Gazetteer. P. 25.

(১) Bankura Gazetteer, by L. S. S. O.'Malley, P. 158.

(২) Akbarnama, translated by H. Beveridge Vol III, P. 879.

(৩) Bankura Gazetteer by L. S. S. O'Malley P. 25 ; Akbarnama, translated by Dowson Vol. Vl. P, 86.

(৪) The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616—Bankura Gazetteer, P. 26.

হাণ্টার সাহেব বলেন, বীরহাম্বীর ৮৭৮ মল্লাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তের বৎসর বয়সে ৮৮১ মল্লাব্দে বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (The Annals of Rural Bengal, by W. W. Hunter, Appendix E. p, 445).

ঐতিহাসিক প্রমাণের সঙ্গতি দেখা যায়। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ১৫১৪ শকে ; ১৫২২ শকে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থিতিকাল হয় ৮ বৎসর ; ইহা অসম্ভব নয়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাহার ফলে আচার্য্য উপাধি লাভ করেন ; তাঁহার উপাধি লাভ করার পরে নরোত্তম-দাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ; তাহার পরে শ্যামানন্দ গিয়াছিলেন ; তাঁহারা উভয়েও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন ; তিনজনে একসঙ্গে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থস্থানও দর্শন করিয়াছেন। পরে তিনজন একসঙ্গে দেশে রওনা হইয়াছিলেন—ভক্তিরত্নাকর হইতে এইরূপই জানা যায়। এই অবস্থায় শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থিতির কাল আট বৎসর হওয়া বিচিত্র নহে। দীনেশবাবুও বলেন, শ্রীনিবাস ৬।৭ বৎসরের কম বৃন্দাবনে ছিলেন না (৫)।

এসমস্ত যুক্তি-প্রমাণে আমাদের মনে হয়, ১৫২২ শকে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির সময়ের সহিত শ্রীনিবাসের জন্ম-সময়েরও একটু সম্বন্ধ আছে। ভক্তিরত্নাকরের একস্থলের উক্তি অনুসারে তাঁহার জন্মসময় সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, তাহাতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন যেন অসম্ভব বলিয়া মনে নয়। তাই তাঁহার জন্মসময় সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপরিহার্য্য।

শ্রীনিবাস যখন প্রথম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, ভক্তিরত্নাকরের মতে তখন তাঁহার "মধ্যযৌবন" (৪র্থ তরঙ্গ ১৩২ পৃষ্ঠা) ; স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবের নিকটে "অল্প বয়স নেত্রে ধারা নিরন্তর" বলিয়া শ্রীনিবাসের পরিচয় দিয়াছেন (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। প্রেমবিলাস হইতেও জানা যায়, বৃন্দাবনযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনিবাস যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে "অল্প বয়স অতি সুকুমার" এবং "বালক"-মাত্র দেখিয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা) এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবক ঈশানও তখন "উঠ উঠ বটু শীঘ্র করহ গমন" বলিয়া শ্রীনিবাসের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৪২ পৃষ্ঠা) এসমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীজীবের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় শ্রীনিবাসের বয়স বিশ বৎসরের অধিক ছিল না—হয়তো ষোল হইতে বিশের মধ্যেই ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ১৪৯৪ শক হইতে ১৪৯৮ শকের (১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

পঞ্জিকায় দেখা যায়, বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীনিবাসের আবির্ভাব। প্রেমবিলাসও তাহাই বলে (১ম বিলাস, ১৯ পৃষ্ঠা)। ভক্তিরত্নাকর বলে—বৈশাখী পূর্ণিমা রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাসের জন্ম (২য় তরঙ্গ, ৭৩ পৃষ্ঠা) ; রোহিণী নক্ষত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে ; কারণ, বৈশাখী পূর্ণিমা কখনও রোহিণী নক্ষত্রে হইতে পারে না।

যাহা হউক, ১৪৯৪—১৪৯৮ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছে মনে করিলে, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধীয় উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা যাউক।

বিশ্বকোষে মল্লরাজাদের নামের তালিকা, রাজত্বকাল, এবং রাজপুত্রদের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং শেষ ভাগে কোনও কোনও রাজার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণীও দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বীর-হাম্বীরের জন্ম ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হাণ্টার সাহেবের উক্তির অনুরূপ। কিন্তু এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে; তাহার কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণপ্রয়োগে আমরা দেখাইয়াছি। বিশ্বকোষে রাজবংশের তালিকায় লিখিত হইয়াছে, বীর-হাম্বীর তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহা সম্ভব। আমরা দেখাইয়াছি, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত ছিল, উহাতেই ৩১।৩২ বৎসর পাওয়া যায়; ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা ১৬২২ খৃষ্টাব্দের পরেও তাঁহার রাজত্ব কিছুকাল থাকা অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন ; হাণ্টার সাহেবের মত সত্য হইলেও, ১৫৯৯।১৬০০ খৃষ্টাব্দ বীর-হাম্বীরের রাজত্বের মধ্যেই পড়ে।

ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে ; হাণ্টার ইত্যাদির প্রাচীন মতের আলোচনা এখন অনাবশ্যক। ১৪।৮।৩৩ ইং তারিখের পত্র। এই প্রবন্ধ-রচনায় ভট্টশালী মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ।

(৫) Vaisnava Literature, P. 39.

ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে জানা যায়, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া দেশে আসার পরে শ্রীনিবাস একবার বিবাহ করেন; তাহার কিছুকাল পরে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার ছয়টী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ১৪৯৪-৯৮ শকে জন্ম হইয়া থাকিলে গ্রন্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসার সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল চব্বিশ হইতে আটাইশের মধ্যে। এই বয়সে বিবাহাদি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এস্থলে ভক্তিরত্নাকরের একটি উক্তি বিশেষভাবে বিবেচ্য; কারণ, শ্রীনিবাসের জন্মসময়-নির্ণয়ে এই উক্তির উপর অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—পিতার মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার চরণদর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের উৎকণ্ঠা জন্মে। তাই পিতৃবিয়োগের পরে তিনি পুরী রওনা হন; প্রভু তখন পুরীতে ছিলেন; কিন্তু পুরীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুনিলেন যে, মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। একথা যদি সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়; যে বৎসর মহাপ্রভু অপ্রকট হন, সেই বৎসরেই—১৪৫৫ শকেই—শ্রীনিবাস পুরী গিয়াছিলেন; অতদূরের পথ হাঁটিয়া গিয়াছিলেন; তাই তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনর বৎসর ছিল বলিয়া মনে করিলে প্রায় ১৪৪০ শকেই তাঁহার জন্ম ধরিতে হয়। তাহা হইলে, বৃন্দাবনে পৌঁছিবার সময়ে তাঁহার—সেই "মধ্য যৌবনের" এবং "অল্পবয়স বটুর" বয়স ছিল ৭৪ বৎসর !! এবং ইহাও তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে বাস করার পরে দেশে ফিরিয়া প্রায় বিরাশী তিরাশী বৎসর বয়সের পরে একে একে দুইটী বিবাহ করিয়া তিনি ছয়টী সন্তানের জনক হইয়াছিলেন !!! এসকল কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের পুরীগমনের কথা প্রেমবিলাস কিন্তু বলেন না। গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের তিরোভাবের পরেই যে শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে নহে—প্রেমবিলাস হইতে তাহাই বরং মনে হয়। ঠাকুর নরহরির কৃপায় শ্রীনিবাসের গৌর-অনুরাগ জাগিয়া উঠিলে তিনি গৌরবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "চৈতন্যপ্রভুর নাহি হৈল দরশন। নিত্যানন্দ প্রভুর নাহি দেখিল চরণ॥ অদ্বৈত আচার্য্যরূপ-আর না দেখিল। স্বরূপ-রায় সনাতন রূপ না পাইল (ক)। ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন॥ ঊর্দ্ধমুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ। পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখ-বাদ॥ (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৮ পৃষ্ঠা)।" এসকল উক্তি হইতে মনে হয়, গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের তিরোভাবের পরেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরে দেশে আসার সময়ে বা তাহার অল্পকাল পরেও যে শ্রীনিবাসের বয়স যৌবনের সীমার মধ্যে ছিল, প্রেমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসার পরে শ্রীনিবাস সরকার-নরহরিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডে গেলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন - কিছুকাল যাজিগ্রামে থাকিয়া তোমার মায়ের সেবা কর; আর "বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। * * *। শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্বতত্ত্ব জানে। ঘুচাইল লাজাদি কহিয়া কত তানে॥ (৭ম তরঙ্গ, ৫২৪ পৃষ্ঠা)।" শ্রীনিবাস তখন যদি বিরাশী-তিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ হইতেন, তাহাহইলে সরকার-ঠাকুর উপযাচক হইয়া তাঁহাকে বিবাহের উপদেশ দিতেন না এবং বিবাহের প্রস্তাবেও

(ক) এই পয়ার হইতে মনে হয়, রূপ-সনাতনেরও তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাসের জন্ম। কিন্তু তাহা নহে। যে সময়ে শ্রীনিবাস উক্তরূপ খেদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তৎকালীন বৈষ্ণব-মহাত্মাদিগের বিশেষ সংবাদ তিনি রাখিতেন বলিয়া প্রেমবিলাস হইতে জানা যায় না। তখন তাঁহার তদনুকূল বয়সও ছিল না। উপনয়নের কিছুকাল পরেই ঠাকুর নরহরির কৃপায় গৌর-প্রেমের স্ফুরণে শ্রীনিবাস উক্তরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনও বুঝি প্রকট ছিলেন না। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই আকাশবাণীতে তিনি জানিতে পারিলেন, রূপ-সনাতন তখনও প্রকট ছিলেন; কিন্তু তাহাদের তিরোভাবের বেশী বিলম্ব ছিল না। বৃন্দাবনে রসশাস্ত্র রূপ-সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥ * * * শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশন। বিলম্ব হৈলে দুই ভাই দর্শন না পাবে। (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৯ পৃষ্ঠা)।"

শ্রীনিবাস লজ্জিত হইতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে এরূপ লজ্জা যৌবনসুলভ-লজ্জা মাত্র। প্রেমবিলাস হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন ও সুলোচন-ঠাকুর এক উৎসব উপলক্ষে যাজিগ্রামে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীনিবাস "আচার্য্যের প্রতি হাসি হাসি॥ যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে। পাণিগ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে॥" তারপর, সেই গ্রামের ভূমধ্যকারী বিপ্র-গোপালদাসের কন্যার সহিত শ্রীনিবাসের বিবাহ হয়। ইহা হইল তাঁহার প্রথম বিবাহ। তাহার পরে, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে রঘু-চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহ-ব্যাপারে একটু রহস্য আছে। পদ্মাবতী নিজেই আচার্য্য-ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আচার্য্যের নিকট আত্মদান করার নিমিত্ত তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া পদ্মাবতী নিজেই স্বীয় "পিতারে কহিল যদি কর অবধান। আচার্য্য ঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান॥ (১৭শ বিলাস, ২৪৯ পৃষ্ঠা)।" প্রায় নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে নিজের বিবাহের নিমিত্ত একজন সুন্দরী কিশোরীর এত আগ্রহ জন্মিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আচার্য্য তখনও যুবক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপসনাতনের তিরোভাবের সময়-সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। প্রেম-বিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় আগে সনাতন-গোস্বামীর এবং তাহার পরে রূপ-গোস্বামীর তিরোভাব।

কেহ কেহ বলেন, ১৪৮০ শকে সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল; কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ১৪৯৫ শকেও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৫ শকে) মোগল-সম্রাট্ আকবরসাহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা (৭)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহাতে বুঝা যায়, ১৫১২ শকেও তাঁহারা প্রকট ছিলেন। আবার, ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫১২ ও ১৫১৪ শকের মধ্যেই তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস প্রথমবারে মথুরায় প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, পথিক লোকগণ বলাবলি করিতেছে "এই কতদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন। মোসবার নেত্র হইতে হৈলা অদর্শন। এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি। দেখিয়া আইনু সে দুঃখের অন্ত নাই। (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৩ পৃঃ)।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিবাসের মথুরায় পৌঁছিবার অল্প পূর্ব্বেই শ্রীরূপের তিরোভাব হইয়াছে এবং তাহার অল্প আগেই শ্রীসনাতনেরও তিরোভাব হইয়াছে। প্রেমবিলাস কিন্তু সময়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণই দিতেছেন। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যেদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন, তাহার চারিদিন পূর্ব্বে শ্রীরূপের এবং তাহারও চারিমাস পূর্ব্বে শ্রীসনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল (৫ম বিলাস, ৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)। একথা সত্য হইলে ১৫১৪ শকের বৈশাখে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপের এবং ১৫১৩ শকের মাঘে সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল মনে করা যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১৪ শকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। তাঁহাদের তিরোভাবের সময় হইতেই উক্ত দুই তিথিতে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের তিরোভাব-উৎসব করিয়া আসিতেছে; তাই প্রেমবিলাসের উক্তি অপেক্ষাও ইহার মূল্য বেশী—ইহা চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মনে করিতে হইবে ১৫১৩ শকাব্দার (১৫৯১ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীপাদ সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল (৮)।

---

(৭) Growse's History of Mathura. P, 241, quoted in Vaisnava Literature P, 27.

(৮) দীনেশ বাবু বলেন -১৫৯১ খৃষ্টাব্দের (১৫১৩ শকের) কাছাকাছি কোনও সময়ে রূপসনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল। Vaisnava Literature P, 40.

১৪৩৬ শকে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়াছিলেন; তখন সনাতন-গোস্বামীর বয়স চল্লিশের কম ছিল বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং ১৩৯৬ শকে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও শকে জন্ম হইয়া থাকিলে ১৫১৩ শকে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ১১৭ বৎসর। শ্রীরূপের বয়স দুই তিন বৎসর কম হইতে পারে। এত দীর্ঘ আয়ুষ্কাল তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে জানা যায়, অদ্বৈত-প্রভুও সওয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের তিনজনের দেশে ফিরিয়া আসার প্রায় বৎসর দুই পরেই বিখ্যাত খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর পড়িলে মনে হয়। খুব সম্ভব, ১৫২৩ ও ১৫২৪ শকের (১৬০১-১৬০২ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোনও সময়ে এই মহোৎসব হইয়া থাকিবে (১)।

এইরূপে দেখা যায়, ভক্তিরত্নাকরাদিগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত—উপরের আলোচনায় শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার অসঙ্গতি কিছু নাই। বিশেষতঃ রাজা বীরহাম্বীরের রাজত্বের সময়, মানসিংহকর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণের সময় এবং শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সহিত মোগল-সম্রাট্ আকবর-সাহের সাক্ষাতের সময়—এই তিনটী সময় ইতিহাস হইতেই গৃহীত হইয়াছে, অনুমান বা বিচার বিতর্কদ্বারা নির্ণীত হয় নাই, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। আর, শ্রীনিবাসের সময়নির্ণয়মূলক আলোচনাও এই তিনটী সময়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; জ্যোতিষের গণনার সাহায্যও সময় সময় লওয়া হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহার সারমর্ম্ম এই:—১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৪—১৪৯৮ শকে) তাঁহার জন্ম, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বৃন্দাবনে আগমন এবং ১৫৯৯—১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১৫২১—১৫২২ শকে) গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন হইয়াছিল।

এক্ষণে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে—১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীরের দস্যুদলকর্ত্তৃক গোস্বামিগ্রন্থ অপহরণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ১৫০৩ শকে গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলে তাহারও ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৫ কি ১৪৯৬ শকে অর্থাৎ ১৫৭৩ কি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বৃন্দাবনে গমনও স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে রূপ-সনাতনের অপ্রকটও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর-সাহের বৃন্দাবন-গমন সময়ে এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহকর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণ-সময়েও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীর-হাম্বীরও বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহার নিয়োজিত দস্যুদল কর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি এবং তাঁহার রাজসভায় ভাগবত-পাঠও সম্ভব নয়।

যাঁহারা মনে করেন, ১৫০৩ শকেই শ্রীনিবাস গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের দুইটী উক্তি তাঁহাদের অনুকূল। এই দুইটী উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

একটী উক্তি এইরূপ। গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে আসার প্রায় একবৎসর পরে শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা। (৯ম তরঙ্গ, ৫৭০ পৃঃ)।" এই উক্তির মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বেই শ্রীজীব গোপালচম্পূ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যতটুকু লেখা হইয়াছিল, ততটুকুই তিনি শ্রীনিবাসকে পড়িয়া শুনাইলেন। ১৫০৩ শকে যদি শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা ১৫০৪ শকের কথা। ১৫১০ শকে পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১৫০৪ শকে তাহার আরম্ভ অসম্ভব নয়।

---

[১] দীনেশ বাবু বলেন ১৬০২ ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল (Vaisnava Literature P 127)

অপর উক্তিটী এইরূপ। ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাসের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"অপরঞ্চ। * * * সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূর্লিখিতাস্তি কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।—সম্প্রতি উত্তরগোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।" এই পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র বৃন্দাবন-দাসের প্রতি এবং তাহার ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ জানান হইয়াছে। ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে উত্তরগোপালচম্পূর লেখা শেষ হয় ; পত্রে "উত্তরচম্পূ সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে" বলাতে মনে হয়, ঐ পত্রখানিও ১৫১৪ শকেই লিখিত হইয়াছে। ১৫০৩ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া থাকিলে ১৫১৪ শকে শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যার জন্ম অসম্ভব নয়। কিন্তু ১৫২১-২২ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিলে গোপালচম্পূসম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত উক্তিদ্বয় বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত উক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উক্তিটী ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকারের কথা ; উহা কিম্বদন্তীমূলকও হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত কথাটী পাওয়া যায় শ্রীজীবের পত্রে ; তাই ইহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে এই উক্তিটীর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণও ভক্তিরত্নাকরেই পাওয়া যায়। তাহা এই।

যে পত্রে ঐ কথা কয়টী আছে, তাহা হইতেছে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্র যে দ্বিতীয় পত্রের পূর্ব্বে লিখিত, তারিখ না থাকিলেও তাহা পত্র হইতেই জানা যায়। প্রথমতঃ, প্রথম পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র কেবল বৃন্দাবন দাসের প্রতিই শ্রীজীব আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন ; কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে বৃন্দাবন-দাসের ভ্রাত-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন ; ইহাতে মনে হয়, প্রথম পত্র লেখার সময়ে বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতাভগিনীদের কথা শ্রীজীব জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—"হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে ; তাই এখন তাহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল না।" দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে আপনার (শ্রীনিবাসের) নিকটে যে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার অধ্যাপন যদি আরম্ভ হইয়াথাকে, তাহা হইলে ভাষ্য-বৃত্ত্যাদি অনুসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রথমপত্রে শ্রীজীবকৃত সংশোধনের কথা আছে; সংশোধনের পরেই তাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে ; তাহার পরে দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রথম পত্রের পরেই যে দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গোপালচম্পূ সম্বন্ধে প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—"উত্তরচম্পূর সংশোধন কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে ; সম্প্রতি বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে ; তাই পাঠান হইল না ; দৈবানুকূল হইলে পরে পাঠান হইবে। (ভক্তিরত্নাকর ১০৩১ পৃষ্ঠা)।" ভাদ্রমাসে এই পত্র লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমভাগে শ্যামদাসাচার্য্য নামক জনৈক ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন "সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্য চ বৈষ্ণবতোষণী-দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীগোপালচম্পূপুস্তকানি তত্রামিভির্নীয়মানানি সন্তি।" বিচারমূলক সংশোধনের পরে বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গমসঙ্গমনী এবং গোপালচম্পূ যে শ্যামদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইল। প্রথম পত্রের লিখিত উত্তরচম্পূর সংশোধনের কিঞ্চিৎ অবশেষের কথা স্মরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ উভয়ই অর্থাৎ সমগ্র গোপালচম্পূগ্রন্থই শ্যামদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল ; পূর্ব্বচম্পূ বা উত্তরচম্পূ না লিখিয়া তাই শ্রীজীব দ্বিতীয় পত্রে "শ্রীগোপালচম্পূই" লিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এই দ্বিতীয় পত্রেরই শেষভাগে "অপরঞ্চ" দিয়া লিখিত হইয়াছে—সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূর্লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।" প্রথম পত্রে শ্রীজীব লিখিলেন, সংশোধনের অল্পবাকী—এত অল্পবাকী যে, ইচ্ছা করিলে তখনই সংশোধন শেষ করিয়া পাঠাইতে পারিতেন, বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পাঠাইলেন না ; সুতরাং গ্রন্থের লেখা যে তাহার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমাংশের উক্তিও ইহার অনুকূল ; কিন্তু শেষাংশে লেখা হইল—উত্তরচম্পূর লেখা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, বিচারমূলক সংশোধনের তখন আরম্ভও হয় নাই। এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি শ্রীজীবের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। অধিকন্তু, এই উক্তি সত্য হইলে দ্বিতীয় পত্রেও ১৫১৪ শকে (উত্তরচম্পূ সমাপ্তির বৎসরে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয় এবং ১৫১৪ শকেই শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল বলিয়াও

মনে করিতে হয়। কিন্তু ১৫১৪ শকের অর্থাৎ বীরহাম্বীরের রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনই সম্ভব নয়, তাহা পূর্ব্ব আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে। তাই আমাদের মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্রের শেষাংশে "সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূলিখিতাস্তি" ইত্যাদিরূপে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, অথবা লিপিকর-প্রমাদবশতঃ অন্য কোনও গ্রন্থের স্থলে তাহাতে "শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ"-লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—যে তিনটী অনুমানকে ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ১৫০৩ শকেই চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছিল, সেই তিনটী অনুমানের একটীও বিচারসহ নহে; অর্থাৎ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছিল না, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীও অন্তর্ধান প্রাপ্ত হন নাই এবং ১৫০৩ শকেও শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসেন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্ত অনুমান তিনটী সত্য না হইলেই কি সিদ্ধান্ত করা যায় যে ১৫০৩ শকে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই? ১৫০৩ শকে লেখা শেষ হইয়া থাকিলেও শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাহা প্রেরিত না হইতেও পারে। একথার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে—চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত উক্ত তিনটী অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত নহে; প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১৫৩৭ শকে গ্রন্থশেষ হইয়াছিল; আর পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, চরিতামৃত শেষ করার সময়ে—এমন কি মধ্যলীলার লিখন আরম্ভ করার সময়েই—কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স ছিল, ১৫০৩ শকের কথা তো দূরে, ১৫২১-২২ শকে শ্রীনিবাস যখন গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার (কবিরাজ-গোস্বামীর) তত বয়স হয় নাই; সুতরাং ১৫২১-২২ শকেও চরিতামৃতের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না।*

চরিতামৃত-সমাপ্তির পরে কবিরাজ-গোস্বামী বেশীদিন প্রকট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থসমাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়স আশী-নব্বই এর মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। সুতরাং ১৪৫০ শকের বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।

---

*সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা লিখিয়া তাহার পরে লিখিয়াছেন—

Krisnadas Kaviraja's work. Caitanya Caritamrita, was written long afterwards. Though there is some dispute regarding the actual date of its completion, it is well-right certain that it was in **Saka** 1537 (A.D. 1616). The other date, found in **Prema-vilasa**, is **sake** 1503 (A,D. 1581). and this has been very well-combatted by Professor Radha Govinda **Nath** in his learned edition of the work—**A History of Indian Philosophy**, by. S. N. Dasgupta Vol. IV, (1955). p-385

গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব বিচার

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহারও প্রায় সাত আট বৎসর পরে ১৫৩৭ শকাব্দায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের এত দীর্ঘকাল পরে লিখিত বলিয়াই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত ঘটনাবলির ঐতিহাসিক মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতগ্রন্থাদি অপেক্ষা কম হইবে, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ নাই; বরং কোনও কোনও ব্যাপারে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক মূল্য বেশী, তাহাই এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য বেশী হওয়ার হেতু এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বহু প্রামাণিক ব্যক্তির সমালোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ কবিরাজগোস্বামীর যত হইয়াছিল, অপর চরিতকার সকলের তত হইয়াছিল কিনা, নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

কবিরাজ-গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী গৌর-চরিতকারদের তিনজনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপুর এবং বৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় লিখিত, নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্; ইহা অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, অধিকাংশ ঘটনাই সূত্রাকারে উল্লিখিত; এজন্য সাধারণতঃ এই গ্রন্থখানিকে কড়চা বলা হয়—মুরারিগুপ্তের কড়চা। কিন্তু এই গ্রন্থের একটী বিশেষত্ব আছে। মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং নবদ্বীপবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে সংঘটিত প্রায় সমস্ত ঘটনারই মুরারিগুপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে কড়চার উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষরূপে শ্রদ্ধেয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহকে তাঁহার আদিলীলা বলা হয়; এই আদিলীলার যে সমস্ত ঘটনা মুরারিগুপ্তের কড়চায় উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না; কিন্তু আদিলীলার যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ কড়চায় দৃষ্ট হয় না, অথচ পরবর্ত্তী চরিতকারদের কাহারও কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মুরারিগুপ্ত উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে সে সমস্ত ঘটনা অনৈতিহাসিক—এরূপ মনে করাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, কোনও চরিতকার তাঁহার বর্ণনায় চরিতের সকল ঘটনাই যে লিপিবদ্ধ করেন, একথা বলা চলে না।

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন; এই চব্বিশ বৎসর তিনি নীলাচলেই ছিলেন; কেবল প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে একবার, বাঙ্গালাদেশে একবার এবং ঝারিখণ্ডের পথে বারাণসী ও প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে একবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই চব্বিশ বৎসরের লীলাকে কবিরাজগোস্বামী শেষ লীলা বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ ২।১।১২)। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে মুরারিগুপ্ত নবদ্বীপেই থাকিতেন; কেবল রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন এবং বর্ষার চারিমাস সে স্থানে অবস্থান করিতেন। তাই মহাপ্রভুর শেষ লীলার সমস্ত ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; সুতরাং শেষলীলার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও উক্তির সহিত যদি অপর চরিতকারের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়ের জন্য সতর্ক বিচারের প্রয়োজন হইবে।

কর্ণপূরের গ্রন্থ। কবিকর্ণপুর গৌর-চরিত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্। উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাঁহার মহাকাব্য মুরারিগুপ্তের কড়চা অবলম্বনেই লিখিত, একথা কর্ণপুর নিজেই তাঁহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রামাণ্যত্ব মুখ্যতঃ কড়চার প্রামাণ্যত্বের উপরই নির্ভর করে। ইহাতে নূতন কথাও কিছু আছে; কিন্তু তাঁহার নাটকেই নূতন কথা বেশী দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও গৌর-চরিতের সমস্ত ঘটনা বর্ণিত বা উল্লিখিত হয় নাই; যে সমস্ত ঘটনা-বর্ণিত বা উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার কল্পিত নয়, একথা গ্রন্থ শেষে কর্ণপুর নিজেই বলিয়াছেন—"সুধিয়ঃ

চরিতমিদং কল্পিতং নো বিদন্তু।” কিন্তু ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক হইলেও গ্রন্থের নাটকীয়ভাব রক্ষার নিমিত্ত এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত গ্রন্থকারকে কলি, অধর্ম্ম, ভক্তি, মৈত্রী, বিরাগ প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

কবি-কর্ণপূরের নাম পরমানন্দ সেন, কর্ণপুর তাঁহার উপাধি। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে তাঁহার জন্ম। প্রভুর তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স সতর আঠার বৎসরের বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কবিরাজ-গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলাকে মধ্যলীলা এবং পরবর্ত্তী আঠার বৎসরের লীলাকে অন্ত্যলীলা বলিয়াছেন (২।১।১৩-১৫)। আবার অন্ত্যলীলার আঠার-বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরে প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন; কিন্তু শেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরার ভিতরে রাধাভাবের নিবিড় আবেশে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিরহের স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

আদি ও মধ্যলীলার সময়ে কর্ণপূরের জন্মই হয় নাই; অন্ত্যলীলার প্রারম্ভে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে। পিতামাতার সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া থাকিবেন এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরে—যে সময় মহাপ্রভু কোনও কোনও সময়ে গম্ভীরার বাহিরে ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন, তখন—কর্ণপুর প্রভুর কোনও কোনও লীলা দর্শন করিয়াও থাকিবেন এবং তাঁহার পিতার মুখে কোনও তথ্যাদি শুনিয়াও থাকিবেন। সে সমস্ত লীলার এবং তথ্যাদির মর্ম্ম অবগত হওয়া চারি পাঁচ বা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক সাধারণ বালকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইলেও কর্ণপূরের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন—বিশেষতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র—ব্যক্তির পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব ছিল না। মহাপ্রভুর শেষ দশ বার বৎসরের গম্ভীরা-লীলা রথযাত্রা উপলক্ষে, প্রতিবৎসর চারিমাস ধরিয়া কর্ণপুর নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন; কিন্তু এই লীলাতে ভাব-বৈচিত্র্যই ছিল বেশী, ঘটনাবৈচিত্র্য তত বেশী বোধ হয় ছিল না। আদি ও মধ্যলীলাতেই ঘটনা-বৈচিত্র্য অনেক বেশী ছিল; কর্ণপুর এ সমস্ত লীলা নিজে দর্শন না করিয়া থাকিলেও তাঁহার পিতামাতার মুখে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের মুখে তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনিয়াছেন; মুরারিগুপ্তের গ্রন্থও তিনি পড়িয়াছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। নাটকের শেষে তিনি নিজেও একথা লিখিয়া গিয়াছেন :—

“শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতম্। জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেন্বং ময়া ॥” শ্রীচৈতন্যলীলা তিনি যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা “যথামতি”—অর্থাৎ একই ঘটনা সম্বন্ধে একাধিক বিভিন্ন বর্ণনা শুনিয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান ও বিচার পুর্ব্বক যাহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই তিনি স্বীয়গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকে কিন্তু তিনি কেবল আদিলীলা ও মধ্যলীলার কয়েকটী ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন—এসমস্তই বোধ হয় তাঁহার শ্রুতলীলার অনুসন্ধান ও বিচারমূলক “যথামতি” বর্ণনা। অবশ্য দশম অঙ্কে বর্ণিত লীলা দৃষ্ট ও শ্রুত উভয়ই হইতে পারে। এই অঙ্কে রথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলযাত্রা জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদর্শন, গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলিলীলা, জগন্নাথদেবের রথযাত্রাদর্শন, হোরাপঞ্চমীদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণপূরের জন্মের পুর্ব্বে এবং পরেও মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমাগত বৈষ্ণবদের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা প্রতিবৎসরেই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার মহাকাব্যেও আদি ও মধ্যলীলার ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাসঠাকুর বাঙ্গালাভাষায় পয়ারাদি ছন্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। এই গ্রন্থের পুর্ব্ব-নাম ছিল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল; কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যমঙ্গল-নামেই এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ আদি ১ম।”

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবীর বয়স ছিল চারি কি পাঁচ বৎসর মাত্র। সুতরাং সন্ন্যাসের কয়েক বৎসর পরে—সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুরেরও পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়া থাকিবে। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই প্রভুর আদি ও মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলারও কিছু অংশ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। নীলাচলে যাইয়া তিনি যে কখনও মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। সুতরাং মহাপ্রভুর কোনও প্রকটলীলারই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তবে নবদ্বীপের ভক্তদের মুখে এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মুখেও প্রভুর বহু লীলার কথা তিনি শুনিয়া থাকিবেন; এইরূপে শুনা-কথাই তাঁহার গ্রন্থের উপজীব্য; একথা তিনি নিজেও লিখিয়াছেন, "বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে। তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥ আদি, ১ম।"

মুরারিগুপ্তের কড়চাও অবশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অর্থাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; বৃন্দাবনদাস অপরাপর যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী বা নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ভক্তের নিকটে গৌর-চরিত শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশও সম্ভবতঃ নবদ্বীপ-লীলারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; সুতরাং বৃন্দাবনদাসবর্ণিত নবদ্বীপ-লীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী লীলাসমূহের বিবরণ বৃন্দাবনদাস কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে শুনিয়াছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না।

যাহা হউক, মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরের গ্রন্থ অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ বোধহয় এই যে—প্রথমতঃ, ইহা বাঙ্গালাভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রন্থে সরল সরস ও মধুর ভাষায় মহাপ্রভুর লীলা ও ভক্তিমাহাত্ম্যাদি একটু বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণও সর্বদা এই গ্রন্থের আস্বাদন করিতেন; কিন্তু এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা নাই; অথচ শেষলীলা আস্বাদনের জন্য বৈষ্ণবদের লিপ্সাও ছিল অত্যন্ত বলবতী; এজন্য তাঁহারা শেষলীলা বর্ণনের নিমিত্ত কবিরাজগোস্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার সূচনা হয়।

স্বরূপদামোদরের কড়চা। আদিলীলা সম্বন্ধে মুরারিগুপ্তের উক্তি এবং তাঁহার উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের উক্তি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যেমন নির্ভরযোগ্য, প্রভুর শেষলীলাসম্বন্ধেও স্বরূপদামোদরের উক্তি তেমনি নির্ভরযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে পর স্বরূপদামোদর আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে স্বীয় অন্তর্ধান পর্য্যন্তই তিনি নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর নীলাচল-সঙ্গীদের মধ্যে স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ এই দুইজনই ছিলেন তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফূর্ত্তিতে তিনি যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, এই দুইজনের নিকটেই প্রভু তাঁহার মর্ম্মপীড়া জ্ঞাপন করিতেন এবং এই দুইজনই নানা উপায়ে তাঁহার সান্ত্বনা বিধানের প্রয়াস পাইতেন। এই দুইজনের মধ্যে আবার স্বরূপদামোদরই ছিলেন প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মজ্ঞ; প্রভুর মুখ দেখিলেই যেন তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাকে "সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপই" বলিয়াছেন (২।১০।১০৯)। তিনি ছিলেন পরম বিরক্ত, মহাপণ্ডিত, রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল, পরম রসজ্ঞ, আবার নিরপেক্ষ সমালোচক। কেহ কোনও নূতন গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্য লইয়া আসিলে "স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু" শুনিতেন (২।১০।১১০)। সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাসাদি কোথাও থাকিলে তিনি তাহা প্রভুকে শুনাইতেন না। এই স্বরূপদামোদর একখানি কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চা আজকাল পাওয়া যায় না; কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বহুস্থলে এই কড়চার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কড়চার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ চৈঃ চঃ ১।১৩।১৫॥" কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যের পরবর্ত্তী সমস্ত লীলাকেই অর্থাৎ সন্ন্যাস হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত সমস্ত

লীলাই শেষলীলার অন্তর্ভুক্ত (১।১৩।১৩ এবং ২।১।১২)। স্বরূপদামোদর এই সমস্ত লীলাই সূত্রাকারে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাহা হউক, স্বরূপদামোদরের কড়চায় উল্লিখিত লীলাসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে, এই গ্রন্থের উপাদান গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হইতে প্রাপ্ত কি না তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এস্থলে তাহাই করা হইতেছে।

শেষলীলাকে এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(ক) সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি পর্য্যন্ত, (খ) নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (গ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, (ঘ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে গৌড়দেশে গমনের জন্য নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (ঙ) গৌড়-ভ্রমণ, (চ) গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (ছ) ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন, বারাণসীতে ও প্রয়াগে অনুষ্ঠিত লীলা, এবং (জ) বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিরোভাব পর্য্যন্ত—লীলা।

এসমস্ত লীলাসম্বন্ধে স্বরূপদামোদর কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করিলেন, এক্ষণে তাহাই অনুসন্ধান করা যাউক।

(ক) কাটোয়াতে সন্ন্যাসের সময়ে, কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে এবং শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসার সময়ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এবং মুকুন্দদত্ত যে সর্বদা প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, এসম্বন্ধে মতভেদ নাই*। স্বরূপ-দামোদরের নীলাচলে আসার সময় পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও কিছুকাল এই দুইজন নীলাচলে ছিলেন। ইঁহাদের নিকটে এই সময়ের লীলাকথা অবগত হওয়া স্বরূপদামোদরের পক্ষে অসম্ভব ছিলনা। ইঁহারা সার্বভৌমাদির নিকটেও এ সকল কাহিনী বর্ণন করিয়া থাকিবেন। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসর শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণও নীলাচলে আসিতেন। ইঁহাদের সকলের নিকটেই স্বরূপদামোদর গৌরের অনেক কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন। অবসর সময়ে গৌর-কথার আলোচনাতে সময় কর্ত্তন করাকেই গৌরভক্তগণ সময়ের সদ্ব্যবহার এবং ভজনের অনুকূল অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন।

(খ) নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগপর্য্যন্ত সময়ের সমস্ত লীলাই শ্রীনিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত এবং সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদি নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকটে স্বরূপদামোদর এই সকল লীলা-কাহিনী অবগত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন।

(গ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-লীলা। প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানাইবার জন্য কৃষ্ণদাস গৌড়ে প্রেরিত হন; ইহার পরে তিনি নীলাচলে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন কিনা এবং তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল কিনা, নির্ভরযোগ্যভাবে বলা যায় না।

তাঁহার নিকটে কোনও বিষয় জানিবার জন্য যে কাহারও কৌতুহল হয় নাই এবং কৌতুহল হইয়া থাকিলে, কৃষ্ণদাস যে তাহা পরিতৃপ্ত করেন নাই, ইহা মনে করা যায় না। অন্ততঃ যে যে ঘটনায় তিনি নিজে জড়িত ছিলেন, সেই সেই ঘটনা যে তিনি বিবৃত করিয়াছেন, ইহা অনুমান করা যায়।

---

* কাটোয়াতে সন্ন্যাসের সময়ে প্রভুর সঙ্গী :—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুকুন্দ দত্ত—চৈঃ চঃ ১।১৭।২৬৬। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, ব্রহ্মানন্দ—চৈঃ ভাঃ ২।২৬।

কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসার পথে সঙ্গী:—নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ—চৈঃ চঃ ২।৩।৯। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ভারতী—চৈঃ, ভাঃ ৩।১।

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার সঙ্গী:—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত—চৈঃ চঃ ২।৩।২০৬। নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ—চৈ: ভাঃ ৩।২!

ও মুকুন্দের নাম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাওয়ার পথে একবার এবং দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একবার—এই দুইবার মহাপ্রভু গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে—রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন উভয়ের মিলন হইয়াছিল, তখন প্রভু নিজের সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী রায়রামানন্দের নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন, একথা মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৩।১৬।১০) এবং কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।৯।২৯৫) বলিয়াছেন। আবার দাক্ষিণাত্য হইতে যেদিন প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, সেইদিন রাত্রিতে তিনি নিজগণের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌমের নিকটে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, একথা কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া গিয়াছেন (২।৯।৩২৭)।

রায়রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, পরবর্ত্তী কালে প্রভু নিজেও যে প্রসঙ্গক্রমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে কোনও কোনও কাহিনী স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক হইবে না।

(ঘ) দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন; এ সময়ের সমস্ত লীলাই স্বরূপদামোদর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

(ঙ) গৌড়-ভ্রমণ-লীলা। গৌড়-গমন-সময়ে প্রভুর সঙ্গে বহু ভক্ত চলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গদাধর পণ্ডিত কটক পর্য্যন্ত এবং রামানন্দরায় রেমুণা পর্য্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিয়াছেন—"প্রভুসঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর। জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥ হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ। প্রধান কহিল, সভার কে করে গণন ॥২।১৬।১২৬-১২৮।"

উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর গৌড়-ভ্রমণ-সময়ে স্বরূপদামোদরও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং সমস্ত লীলাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গৌড়-ভ্রমণে প্রভু অল্প কয়েকমাস মাত্র নীলাচলের বাহিরে ছিলেন।

গৌড়-ভ্রমণে স্বরূপদামোদর যদি প্রভুর সঙ্গী নাও হইতেন, তাহা হইলেও তিনি গৌড়-ভ্রমণ-লীলার কাহিনী প্রভুর সঙ্গী বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে এবং রথযাত্রাকালে নীলাচলে সমাগত, পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির মুখে এবং আরও অন্যান্যের মুখেও শুনিবার সুযোগ পাইতেন। রাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাস, শিবানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির সকলের গৃহেই প্রভু গৌড়-ভ্রমণ উপলক্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহ হইতে তিনি রামকেলিতেও গিয়াছিলেন; সে স্থানে শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হন। পরে রূপ ও সনাতন পৃথক্ ভাবে নীলাচলে গিয়া কয়েকমাস করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁহাদের বেশ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল।

(চ) গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নীলাচলেই ছিলেন; এ সময়ের সমস্ত লীলারই স্বরূপদামোদর স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী।

(ছ) ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনগমন, কাশীতে ও প্রয়াগে অবস্থান। প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি সমস্ত লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও তিনি নীলাচলেই থাকিতেন (চৈঃ চঃ ১।১০।১৪৪); তাঁহার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের এবং নীলাচলবাসী অন্যান্য ভক্তদেরও হইয়াছিল। কয়েকটী প্রধান লীলার কথা অন্য প্রামাণ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। প্রয়াগে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন হয় এবং সেস্থানে দশদিন পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।১৯।১২২)। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়েলগ্রামে বল্লভভট্টের গৃহে প্রভু যখন গিয়াছিলেন, শ্রীরূপ তখনও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন (২।১৯।৮১-৮২); শ্রীরূপ যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রয়াগ-লীলার কাহিনী বিস্তৃতভাবে জানিবার সুযোগই স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল। বারাণসী-লীলারও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত স্বরূপদামোদরের নীলাচলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী।

বারাণসীতে তপনমিশ্রের গৃহেই প্রভু ভিক্ষা করিতেন এবং তখন রঘুনাথভট্ট তাঁহার নানাপ্রকার সেবা করিতেন। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার পথে কাশীতে প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।২৫।২); এই সময়ের কাশীর সমস্ত লীলারই সনাতন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধারের পরে সনাতন বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

(জ) বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিরোভাব পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন। এই সময়ের সমস্ত লীলারই স্বরূপ-দামোদর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

শেষলীলার সময় চব্বিশ বৎসর; ইহার মধ্যে কয় বৎসর স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাহা দেখা যাউক।

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে প্রভুর গার্হস্থ্য লীলার অবসান এবং শেষলীলার আরম্ভ। ঐ সময় সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া প্রভু ফাল্গুনমাসে নীলাচলে আসেন (চৈঃ চঃ ২।৭।৩) এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই তিনি দক্ষিণ যাত্রা করেন (২।৭।৫); দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে প্রভুর দুই বৎসর লাগিয়াছিল (২।১৬।৮৩)। সম্ভবতঃ ১৪৩৪ শকের বৈশাখ মাসেই প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন এবং ইহার অল্পকাল পরে, রথযাত্রার পুর্ব্বেই, স্বরূপ-দামোদর আসিয়া মিলিত হন। ১৪৩১ শকের ফাল্গুন হইতে ১৪৩৪ শকের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রায় দুইবৎসর চারিমাস সময় হয়; শেষলীলার দুইবৎসর চারিমাস অতিবাহিত হইয়া গেলে স্বরূপদামোদর প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। শেষলীলার এই সময়টা তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না।

ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার উপলক্ষে যে সময়টা প্রভু নীলাচলের বাহিরে ছিলেন, সেই সময়েও স্বরূপদামোদর প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। ১৪৩৭ শকের শরৎকালে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন (২।১৭।২); প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘীপুর্ণিমা উপলক্ষে প্রয়াগে আসেন (২।১৮।১৩৬) এবং সেখানে দশদিন থাকিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করেন (২।১৮।২১২) ও শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন (২।১৯।১২২)। তারপর কাশীতে আসেন এবং সেস্থানে দুইমাস থাকিয়া সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করেন ও শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দেন (২।২৫।২)। সনাতনকে শিক্ষাদানের পরেও প্রভু দিন পাঁচেক কাশীতে ছিলেন (২।২৫।১৩৯)। ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি বারাণসীতে আসিয়াছিলেন মনে করিলে প্রায় বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তিনি সেস্থানে ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; তারপরে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ১৪৩৮ শকের বৈশাখের শেষ বা জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগেই বোধ হয় তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে ১৪৩৭ শকের শরৎকাল হইতে ১৪৩৮ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত প্রায় আটমাসকাল প্রভু নীলাচলের বাহিরে ছিলেন এবং এই সময়টাতেও স্বরূপদামোদর তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

এইরূপে দেখা গেল, স্বরূপদামোদরের নীলাচলে আগমনের পূর্ব্বে দুইবৎসর চারিমাস এবং পরে—প্রভুর ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাতায়াতের আটমাস, শেষলীলার মোট এই প্রায় তিনবৎসর তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না; শেষলীলার বাকী একুশ বৎসরই তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

তাহা হইলে দেখা গেল, শেষলীলার চব্বিশ বৎসরের মধ্যে একুশবৎসরের লীলাই স্বরূপদামোদর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেবল তিনবৎসরের লীলার বিবরণ তাঁহাকে অপর প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে, এবং মহাপ্রভুর মুখে শুনিয়াছেন, এরূপ নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট হইতে, সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং মুরারিগুপ্তের কড়চায় বর্ণিত আদিলীলার ন্যায় স্বরূপদামোদরের কড়চাও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদানসংগ্রহ। মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও স্বরূপদামোদরের সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর ছিল। ইঁহাদের উল্লিখিত কোনও কোনও বর্ণনার পরিপুষ্টি সাধনের উপযোগী বিবরণ এবং আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উপায়ও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার প্রধান পার্ষদ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবিরাজগোস্বামীর যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের তিরোভাবের পুর্ব্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল

কিনা, বলা যায় না ; হইয়া থাকিলেও তখন বোধ হয় তাঁহার বয়স খুবই কম ছিল ॥ কিন্তু তিনি যে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বগৃহে ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তখনও তাঁহার অকপট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তাঁহার জন্মস্থানও ছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে ; নবদ্বীপ হইতে এস্থান খুব বেশী দূরে নহে। সুতরাং গৃহে অবস্থান কালেও তিনি যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহাও অনুমান করা যায়।

অনুমান বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যান, আর দেশে ফিরেন নাই। বৃন্দাবনে যাইয়া তিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, প্রভৃতির সহিত মিলিত হন ; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রায় সকলেই মহাপ্রভুর কোনও না কোনও লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, তখন আরও অনেক বৈষ্ণব সেখানে ছিলেন। এই সমস্ত বৃন্দারণ্যবাসী বৈষ্ণবদের একটা নিয়ম ছিল এই যে, তাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মহাপ্রভুর লীলার কথা চিন্তা করিতেন এবং আলাপ-আলোচনাও করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীরূপ-সনাতনাদিও প্রত্যহ "চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন। ২।১৯।১১৯॥" রঘুনাথদাস-গোস্বামীও প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন (১।১০।৯৮)" করিতেন। ভক্তিরত্নাকরেও অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় (৯৪৬ পৃঃ)। এইরূপে প্রত্যহ চিন্তার ফলে প্রত্যেক লীলাই তাঁহাদের স্মৃতিপটে সদ্যোদৃষ্টবৎ জাজ্জ্বল্যমান থাকিত ; আর প্রত্যহ গৌরচরিত্র কথনের ফলে—আলাপ-আলোচনার ফলে—সকলেই সকল লীলার কথা অবগত হইতে পারিতেন এবং কাহারও কথিত বা শ্রুত লীলা-কাহিনীর মধ্যে কোনও অংশ অলীক, অতিরঞ্জিত বা অনুমানমূলক থাকিলে তাহাও বর্জ্জিত বা সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থাকিত। এইরূপে বৃন্দাবনের এই বৈষ্ণব গোষ্ঠিতে আলাপ-আলোচনার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী পরিণামে যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা যে সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত পরিমার্জ্জিত খাঁটী সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই সকল বৈষ্ণবদের সকলেই ছিলেন সত্যানুসন্ধিৎসু এবং সত্যনিষ্ঠ। কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহও এই বৈষ্ণব-গোষ্ঠির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যই।

কাহার নিকট হইতে কবিরাজ-গোস্বামী কোন্ লীলা বর্ণনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন:—"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ এই দুইজনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৩।১৪-১৬ ॥

অন্যত্র—"দামোদরস্বরূপ আর গুপ্তমুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ সেই অনুসারে লিখি- লীলাসূত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥ গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তেহোঁ ছাড়িল যে যে স্থান। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ প্রভুর লীলামৃত তেহোঁ কৈল আস্বাদন। তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥—শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৩।৪৪-৪৮ ॥'

আবার—"বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল। সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল। ৩।২০।৮৪-৮৫ ॥ চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান। তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান ॥ তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা। ৩।২০।৭৯-৮০ ॥"

অন্যত্র—"চৈতন্য-লীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেহোঁ থুইলা রঘুনাথর কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ২।২।৭৩ ॥"

আবার—"স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথদাস। এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ। সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥ ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।

সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন॥ স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার। তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার। ৩।১৪।৬—৯।”

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের অধিপতির পুত্র। নবদ্বীপের সঙ্গে ইঁহার পিতা গোবর্দ্ধনদাস এবং জ্যেঠা হিরণ্যদাসের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার কথা শুনিয়াই রঘুনাথ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ তাঁহার ছিল। গৌড়-ভ্রমণ-সময়ে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন ইনি শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন এবং উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন। প্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ইনি স্বরূপদামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেন। এই সময়ের সমস্ত লীলারই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এ সমস্ত লীলাকথাপূর্ণ অনেক শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রও তিনি লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে স্বরূপদামোদরও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তখন শ্রীল রঘুনাথদাস বৃন্দাবনে আসেন। স্বরূপদামোদরের কড়চাও সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সঙ্গেই শ্রীবৃন্দাবনে আনেন। ইনি এবং কবিরাজ-গোস্বামী শেষ বয়সে এক সঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। যে সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইতেছিল, সেই সময়ে ইনি ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর নিত্যসঙ্গী ; ইনি কবিরাজ-গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরুও ছিলেন। গ্রন্থলেখার সময়ে বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে ইঁহার সঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর যে আলাপ-আলোচনা হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দাসগোস্বামীর স্তবাদি হইতে অনেক শ্লোকও কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সনাতন-গোস্বামী এবং রঘুনাথভট্টগোস্বামী। বারাণসী-লীলা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে রূপগোস্বামীও বৃন্দাবন হইতে বারাণসীতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে দশদিন ছিলেন। সেখানে তিনি তপনমিশ্র, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্রশেখরের মুখে প্রভুর বারাণসী-লীলার সমস্ত বিবরণই অবগত হইয়াছিলেন (২।২৫।১৬৮-১৭৩)। এই তিনজনের অন্তরঙ্গ সঙ্গের সৌভাগ্য কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মুখে—বিশেষতঃ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিবর্গের দৈনন্দিন গৌরলীলা আলোচনা প্রসঙ্গে—প্রভুর বারাণসী লীলার কথাও কবিরাজ জানিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তি বা বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়া কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, স্থলবিশেষে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ হইতেও তাহার সমর্থক শ্লোকাদি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই ; অন্ততঃ তাঁহার গ্রন্থে কোথাও তিনি এই কড়চার উল্লেখ করেন নাই। দেখার সম্ভাবনাও বোধহয় বিশেষ ছিল না। তাহার হেতু এই। স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চা একসময়ে লিখেন নাই (কড়চা শব্দ হইতেই তাহা অনুমিত হয় ; কড়চা-শব্দে সাধারণতঃ সাময়িক-লিপি বুঝায়)। যখন যে লীলার কথা শুনিয়াছেন বা যে লীলা দর্শন করিয়াছেন, তখনই সম্ভবতঃ সূত্রাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে, মনে হয়, এই কড়চা বহুবৎসরের সংগ্রহ। কড়চার আরম্ভ-সময়ে কর্ণপুর ছিলেন শিশু; স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের সময়েও তাঁহার বয়স কৈশোর অতিক্রম করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত—এইরূপ প্রসিদ্ধিই তখন তাঁহার ছিল এবং তজ্জন্য স্বরূপদামোদরাদি প্রবীণ বৈষ্ণবদের স্নেহ-কৃপার পাত্রই তিনি ছিলেন ; কিন্তু তখনও প্রভুর চরিতকাররূপে তাঁহার কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না। স্বরূপদামোদরের অপ্রকটের অনেক পরেই তিনি গ্রন্থ লিখেন। সুতরাং গৌরের তত্ত্ব বা লীলাদি সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরাদির সঙ্গে তাঁহার যে তখন কোনওরূপ আলোচনাদি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায় না। এইরূপ আলোচনার অবকাশ থাকিলে হয়তো স্বরূপদামোদর তাঁহাকে কড়চা দেখাইতেন। আর স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে রঘুনাথদাসগোস্বামীর সঙ্গেই সম্ভবতঃ এই কড়চা বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে। তদবধি এই অমূল্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনেই থাকিয়া যায়। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে বা তাহারও পরে, যে সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবন

হইতে গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে যে এই গ্রন্থ ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ গৌড়দেশে আসেই নাই। সম্ভবতঃ এজন্যই স্বরূপদামোদরের কড়চার কোনও প্রতিলিপি বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায় না।

কিন্তু কবিরাজগোস্বামী যে এই কড়চা পাইয়াছিলেন এবং তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণও যে এই কড়চার কথা জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই নাই। কড়চার অস্তিত্বসম্বন্ধে মুখ্যতম সাক্ষী ছিলেন—কড়চাকার স্বরূপদামোদরের ষোল বৎসরের—এবং কড়চাকারের অন্তর্দ্ধান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার—নিত্যসঙ্গী-রঘুনাথদাস-গোস্বামী। কবিরাজ যদি এই গ্রন্থ না-ই দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার শিক্ষাগুরু এই রঘুনাথদাস-গোস্বামীর সঙ্গে গ্রন্থলেখাকালে একই স্থানে থাকিয়া—বিশেষতঃ যাঁহাদের আদেশে তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই আস্বাদনের জন্য তাঁহাদেরই নিকটে যাইবে জানিয়াও—যে তিনি স্বরূপদামোদরের কড়চার দোহাই দিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি কথা এবং স্বরূপদামোদরের নামে চালাইবার উদ্দেশ্যে স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে যাইবেন, এইরূপ অনুমান করিলে কবিরাজগোস্বামীর বৈরাগ্যের ও ভজননিষ্ঠারই অবমাননা করা হয় এবং যে সমস্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ তাঁহার উপরে গৌরলীলা বর্ণনের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অমর্য্যাদা করা হয়। কবিরাজগোস্বামীর কথা তো দূরে, যাঁহারা প্রতিষ্ঠা বা অর্থের লোভে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সে সমস্ত সাধারণ লোকের পক্ষেও ঐরূপ একটা দুঃসাহসের কাজ কল্পনার অতীত।

সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুর স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই। রামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ। যাহাহউক, কবিকর্ণপুর স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই বলিয়া, কড়চায় যে ঘটনার একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে, সেই ঘটনার কথা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে যিনি প্রথম শুনিয়াছেন, তাঁহার মুখে শুনিবার সুযোগ কর্ণপুরের না হইয়া থাকিলে, সেই ঘটনার বিবরণ কবিরাজগোস্বামীর লেখা অপেক্ষা কর্ণপুরের লেখায় যদি অসম্পূর্ণ বা একটু অন্যরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহা অস্বাভাবিক হইবে না। ইহার একটা নিদর্শন পাওয়া যায়—মহাপ্রভুর সঙ্গে রায়রামানন্দের মিলন-প্রসঙ্গের বর্ণনায়। এই মিলন-প্রসঙ্গের নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানিতেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দ। ইঁহাদের মুখে শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদিও জানিতেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও জানিতেন; তাঁহার নিকটে প্রভুই সমস্ত কথা বলিয়াছেন (২৷৯৷৩২৭-২৯)। ইঁহাদের কাহারও নিকটেই এই বিবরণ শুনার সুযোগে যে কর্ণপুরের থাকার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও নিকটে কর্ণপুরের পিতা সেন-শিবানন্দ হয়তো কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার মুখে কর্ণপুর যাহা শুনিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়াছেন। আর কবিরাজগোস্বামী এই বিবরণ লিখিয়াছেন—স্বরূপদামোদরের কড়চা অবলম্বনে; তাহা কবিরাজ স্পষ্টাক্ষরেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে ॥ ২৷৮৷২৬৩ ॥" সুতরাং এই মিলন-লীলার বর্ণনায় কর্ণপুর অপেক্ষা কবিরাজের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। উভয়ের বর্ণনার একটু পার্থক্য আছে; তাহা এই।

রামানন্দমিলন-প্রসঙ্গে মুখ্য আলোচ্যবিষয় ছিল সাধ্য-সাধনতত্ত্ব। মধ্যলীলার অষ্টমপরিচ্ছেদে কবিরাজ এই সাধ্যসাধনতত্ত্বের এক অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। লোকসমাজে মোটামুটী ভাবে যত রকম সাধনপন্থা প্রচলিত আছে, এই আলোচনায় রামানন্দরায় সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি কতকগুলি সাধনের লক্ষ্য কেবল মায়ামুগ্ধজীবের দেহাভিনিবেশজনিত দৈহিক সুখবাসনার তৃপ্তি; কোনও কোনও সাধনের লক্ষ্য কেবল দৈহিক দুঃখনিবৃত্তি, আর কতকগুলির লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসেবা। এসমস্ত সাধনপন্থার তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা রায়রামানন্দ দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবের পরম-পুরুষার্থ লাভ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরদের সেবার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে

সেবা, তাহাই সাধ্যশিরোমণি। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-রাধাতত্ত্বাদিও বর্ণন করিয়াছেন এবং রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে, যাহাতে বিলাস-মাহাত্ম্যের চরমতম বিকাশ, সেই প্রেমবিলাস বিবর্ত্তের কথাও বলিয়াছেন এবং প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের পরিচায়ক "পহিলহি রাগ"—ইত্যাদি নিজকৃত একটী গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনপন্থার কথাও বলিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই হইল স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজগোস্বামিপ্রদত্ত সাধ্যসাধনতত্ত্বের বিবরণ।

কবিরাজগোস্বামিপ্রদত্ত উল্লিখিত বিবরণ হইতে রায়রামানন্দ-কথিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি কথা পাওয়া যায়, কবিকর্ণপূরের বিবরণে ততগুলি পাওয়া যায় না। কবিরাজগোস্বামীর এবং কর্ণপূরের বর্ণনার মর্ম্ম সর্ব্বাংশে ঠিক একরূপও নহে। কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেই এবিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। কবিরাজ এই বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন স্বধর্ম্ম নিয়া; কিন্তু কর্ণপূর আরম্ভ করিয়াছেন বৈরাগ্যের কথা নিয়া; "উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্নুধীরং সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি। তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ পপাঠ বৈরাগ্যরসাঢ্য-পদ্যম্ ॥ ১৩।৩৮॥" ইহার পরে তিনি বৈরাগ্যের উৎকর্ষপ্রতিপাদক একটী শ্লোক দিয়াছেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"বাহ্যমেতৎ—এহো বাহ্য।" ইহা শুনিয়া রামানন্দ "পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমেকান্তকান্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্ ॥ ১৩।৪১ ॥—ভক্তিপ্রতিপাদক স্বকৃত একটী শ্লোক বলিলেন।" এই শ্লোকটী হইতেছে—"নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। ১৩।৪২॥" ইত্যাদি শ্লোক, যাহা কবিরাজগোস্বামী প্রেমভক্তির সমর্থকরূপে তাঁহার গ্রন্থে রামানন্দরায়ের উক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রেমভক্তির পূর্ব্বেও কবিরাজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি এবং জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা রামানন্দরায়ের উক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকটীকেই প্রভু যে "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন,। এসমস্তের একটীরও উল্লেখ কর্ণপূরের গ্রন্থে নাই। যাহা হউক, কর্ণপূর লিখিয়াছেন—রামানন্দের মুখে "নানোপচারকৃতপূজনমিত্যাদি"—শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তথৈব বাহ্যং তদেতচ্চ পরং পঠ। ১৩।৪৩।—এহো বাহ্য, এহো বাহ্য আগে কহ আর।" নানোপচার-শ্লোকটী প্রেমভক্তির সমর্থক, তাহা শ্লোকস্থ "প্রেম্ণৈব"-শব্দ হইতেই জানা যায়; কর্ণপূরও তাহা বলিয়াছেন—"ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমি"ত্যাদি বাক্যে। প্রেমভক্তিপ্রতিপাদক এই শ্লোকটীকে প্রভু—একবার নহে, দুইবার—বাহ্য বাহ্য বলিলেন,—"তাহাও কেবল বাহ্য নয়, তথৈব বাহ্যম্—পূর্ব্বোল্লিখিত বৈরাগ্যের ন্যায়ই (তথৈব) বাহিরের কথা" বলিলেন, ইহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কবিরাজগোস্বামী বলেন, প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক উক্ত শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" কবিরাজগোস্বামীর উক্তিই যুক্তিসঙ্গত। কবিকর্ণপূর যে কেবল শুনা-কথার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিবরণ লিখিয়াছেন, নানোপচার-শ্লোক সম্বন্ধে প্রভুর মুখে "তথৈব বাহ্যং বাহ্যম্-উক্তি প্রকাশ করাতেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে।

যাহা হউক, কর্ণপূর লিখিয়াছেন, প্রভুর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়াই রায়রামানন্দ বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) পরম-প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক উভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক "পহিলহিরাগ" ইত্যাদি গীতটী প্রকাশ করিলেন "ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্ণোহতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদীৎ ॥ ১৩।৪৫ ॥" ইহা শুনিয়াই প্রেমচঞ্চলাত্মা মহাপ্রভু গাঢ়প্রেমভরে রায়রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রায় যাহা বলিলেন, তাহাই পরাৎপর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—একথাও প্রভু বলিলেন। "ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরঃ স প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ। প্রেমপ্রভাবপ্রচলান্তরাত্মা গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ ॥ ১৩।৪৭ ॥" কবিরাজ-গোস্বামী কিন্তু নানোপচার-শ্লোকসমর্থিত প্রেমভক্তির পরে এবং পহিলহিরাগ-গীতের পূর্ব্বে, রামানন্দরায়-কথিত আরও অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—দাস্যপ্রেমের কথা, সখ্যপ্রেমের কথা, বাৎসল্য-প্রেমের কথা, কান্তাপ্রেমের কথা, কান্তাপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্বের এবং অন্যাপেক্ষাহীনত্বের কথা, কৃষ্ণতত্ত্বের ও রাধাতত্ত্বের কথা, উভয়ের বিলাস-মাহাত্ম্যের কথা এবং বিলাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের ধীরললিতত্ত্বের কথা। নাগরীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার অপূর্ব্ব প্রেমবৈশিষ্ট্যের কথা না বলিয়া কেবল মাত্র নাগরেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ত্বের বর্ণনাদ্বারাই

বিলাসমাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রতিপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই, শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণনের পরে রায় যখন একটু মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন প্রবর্দ্ধিত উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রভু যখন আরও শুনিতে চাহিলেন, তখনই তিনি প্রেমবিলাসবিবর্তের উল্লেখ করিলেন এবং তাহার সমর্থনে উল্লিখিত "পহিলহিরাগ"-গীতটীর উল্লেখ করিলেন। এইরূপই কবিরাজের বর্ণনা। কবিরাজের এই বর্ণনায় সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনার মর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া উৎকর্ষের চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সাধ্যবস্তুর এই চরমপরাকাষ্ঠাই প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের উৎকর্ষ-বিকাশের এইরূপ স্বাভাবিকতায় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইতে হয়। কর্ণপুরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত—অতি সংক্ষিপ্ত। তাহাতে কথামাত্র তিনটী—"বৈরাগ্য—এহো বাহ্য।" "প্রেমভক্তি—এহো বাহ্য, এহো বাহ্য, বৈরাগ্যের মতই বাহ্য।" তারপরেই একেবারে হঠাৎ—"উভয়ের পরৈক্য—পহিলহিরাগ।" কর্ণপুরের বর্ণনাটা অনেকটা যেন এইরূপ। এক ভোক্তা এবং এক পরিবেশক। পরিবেশক প্রথমে আনিয়া দিলেন—উচ্ছা ভাজা; ভোক্তা বলিলেন,—ইহা তিক্ত, ভাল লাগে না। পরিবেশক তখন আনিয়া দিলেন—মোচাঘণ্ট; ভোক্তা মুখে দিয়া বলিলেন—(হয়তো উচ্ছা ভাজার তিক্ততা তখনও জিহ্বায় ছিল, তারই স্পর্শে মোচাঘণ্টও তিক্ত বলিয়া মনে হইল, তাই ভোক্তা বলিলেন), তোমার উচ্ছাভাজার মতনই, ভাল লাগে না। তখন যেন পরিবেশক একেবারে কতকগুলি পরমান্ন আনিয়া ভোক্তার পাতে ঢালিয়া দিলেন। দোষ পরিবেশকের নয়; তার ভাণ্ডারেই ঐ তিনটী বস্তু ছাড়া আর কিছু ছিল না। তদ্রূপ, কবিকর্ণপুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও তাঁহার দোষের পরিচায়ক নয়; তাঁহার আয়ত্তাধীনে আর কোনও উপকরণ ছিল না। অল্প যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বিশেষ সতর্কতা ও সততার সহিত পরিবেশন করিয়াছেন। তাই, উৎকর্ষবিকাশের কোন্ কোন্ স্তরের ভিতর দিয়া কি কি ভাবে অগ্রসর হইলে চরমতম স্তরে আসিয়া পৌছান যায় এবং চরমতম স্তরের মহিমাও উপলব্ধি করা যায়, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি যদি স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনাও অন্যরূপ হইত। কবিরাজ তাহা দেখিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনাও স্বাভাবিক এবং পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ঘটনা এবং এই জাতীয় ঘটনাসমূহে কবিরাজগোস্বামীর উক্তি যে কর্ণপুরের উক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

কবিকর্ণপুরের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল প্রথমতঃ মুরারিগুপ্তের কড়চা, যাহা সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরযোগ্য; আর দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার কয়েক বৎসর পরে অন্যের মুখে শুনা সেই ঘটনার বিবরণ—যাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে একমাত্র তখন, যখন ইহা অপর নির্ভরযোগ্য বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হইবে, অথবা অপর নির্ভরযোগ্য বিবরণের অবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কবিরাজ-গোস্বামীর উল্লিখিত আকরগ্রন্থের তালিকায় কর্ণপুরের উল্লেখ নাই কেন?—যে যে আকর হইতে কবিরাজগোস্বামী-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তিনি স্বীয়-গ্রন্থেই দিয়াছেন এবং আমরাও ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে কর্ণপুরের নাম নাই। তাহার হেতু বোধহয় এই যে, কর্ণপুরকে একতম মুখ্য উপজীব্য রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন কবিরাজের হয় নাই। কর্ণপুরের যাহা উপজীব্য ছিল, তাহাই (মুরারিগুপ্তের কড়চা) কবিরাজ পাইয়াছিলেন এবং প্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধে তাহাকেই একতম মুখ্য উপজীব্যরূপে কবিরাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর প্রভুর শেষলীলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তিকেই তিনি নিজের উপজীব্যরূপে পাইয়াছিলেন; সুতরাং কর্ণপুরের শুনাকথার বিবরণকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। তবে তাঁহার উপজীব্য-আকরগ্রন্থের কোনও উক্তির অনুকূল কোনও সুন্দর বর্ণনা যখনই তিনি কর্ণপুরের গ্রন্থে পাইয়াছেন, তখনই তাহা কর্ণপুরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন—সমজাতীয় উক্তি হিসাবে।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় নিঃসন্দেহভাবেই বুঝা গেল, কবিরাজগোস্বামী যে আকর হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপেই নির্ভরযোগ্য। এই নির্ভরযোগ্যতা বোধহয় কেবলমাত্র

ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেই। মহাপ্রভুর জন্ম ব্যতীত অপর কোনও ঘটনার সময় সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী ঐতিহাসিকের ন্যায় কোনও উক্তিই কোথাও করেন নাই; বোধহয় অন্য-কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থকারও করেন নাই। কোন্ ঘটনার পরে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধেও কবিরাজগোস্বামীর বিবরণ হইতে কোনও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সম্ভবতঃ ভাবের আবেশেই অনেক স্থলেই তিনি ঘটনার ক্রম ঠিক রাখিতে পারেন নাই (স্থল বিশেষে গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকায় আমরা তাহার উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিয়াছি)। আসল কথা হইতেছে এই যে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই; তজ্জন্য তিনি আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধও হন নাই। তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন -- গৌরের লীলামাধুর্য্য বর্ণন করিবার জন্য; তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লীলামাধুর্য্য-বর্ণনই ছিল তাঁহার প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। লীলামাধুর্য্য-বর্ণনের জন্য লীলার বা ঘটনার উল্লেখেরই প্রয়োজন, ঘটনার সময়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাই, কোনও লীলার মাধুর্য্য অভিব্যক্ত করার জন্য যে ঘটনা বা যে যে ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, সেই ঘটনা বা সে সে ঘটনার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের সময় সম্বন্ধীয় ক্রম রক্ষা করার কথা বোধহয় তাঁহার মনেও জাগে নাই। যাহা হউক, লীলা-মাধুর্য্য-বর্ণনকারীর পক্ষে ঘটনার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়; ঘটনার সত্যতাই তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনায় ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী

কাশীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শাঙ্কর-বেদান্তে মহাপণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসরস্বতীর উদ্ধার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বর্ণিত একটী প্রধান এবং প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কেহ কোনও প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। * মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম" নামে যে "অধরমুখার্জ্জি-বক্তৃতা,' দিয়াছেন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দস্বামী অদ্বৈতমত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের পরিপূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।''

তর্কভূষণ-মহাশয় এস্থলে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তি (অতঃপর আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত-মহাশয় বলিয়াই অভিহিত করিব) তাঁহার এক মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পণ্ডিত-মহাশয়—তাঁর সন্দেহের সমর্থক যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পরে সে সমস্তের আলোচনা করিব। এক্ষণে, কবিরাজ-গোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ভিত্তি কি এবং সেই ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক।

প্রথমে দেখা যাউক, কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে, অথবা যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছেন, এরূপ কাহারও নিকট হইতে মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলা-কাহিনী শুনিবার সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল কিনা।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন সনাতন-গোস্বামীও যে সেখানে ছিলেন এবং প্রভুর কাশীত্যাগের সময় পর্য্যন্তই ছিলেন, মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে তাহা জানা যায় (৪।১৩।১১-২১)। কবিকর্ণপুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (৯।৪৫।৪৮)। তাহা হইলে, মুরারিগুপ্ত ও কর্ণপুর এই দুইজনের গ্রন্থ হইতেই জানা গেল, শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

কাশীতে প্রভু তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা (আহার) করিতেন এবং মিশ্রপুত্র রঘুনাথ (পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী) প্রভুর সেবা করিতেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভু অবস্থান করিতেন—মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় এসকল কথা লিখিয়াছেন (৪।১।১৫-১৮)।

কবিকর্ণপুর তাঁহার মহাকাব্যে মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে একটী কথাও লিখেন নাই। তাঁহার নাটকে, প্রভু যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন, তাহা লিখিয়াছেন, (৯।৪৩); কিন্তু কোথায় ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা লিখেন নাই।

যাহা হউক, মুরারিগুপ্তের উক্তিই যথেষ্ট। ইহা হইতে জানা যায়—তপনমিশ্র, রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী এবং চন্দ্রশেখরও প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন।

উল্লিখিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন। তিনি আরও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা লিখিয়াছেন—পরমানন্দকীর্ত্তনীয়া এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। পরমানন্দ-কীর্ত্তনীয়া প্রভুর কাশীত্যাগের পরেও

* "গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব-বিচার" এর পরেও পৃথক ভাবে "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর" আলোচনার হেতু এই প্রবন্ধ-মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

কাশীতেই ছিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নীলাচল হইতেই প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও নীলাচলেই ছিলেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৪।১।১১) বলদেব-নামক প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার এক সঙ্গীর কথা লিখিয়াছেন; ইনি বোধ হয় বলভদ্র ভট্টাচার্য্যই।

এস্থলে যে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত অনুগত ভক্ত। যাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয় ছিলনা, প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এরূপ বহু লোক কাশীতে ছিলেন। মহারাষ্ট্রী-বিপ্র এই শ্রেণীর একজন; ইনি প্রভুর দর্শনের ফলে প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রভুর বারাণসী-লীলার এসমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সনাতন-গোস্বামী ও রঘুনাথভট্ট-গোস্বামী কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা কবিরাজ-গোস্বামীর ছয়জন প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরুর মধ্যে দুইজন। কবিরাজ-গোস্বামী বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ করিয়াছেন। ভট্টগোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরুও ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বারাণসী-লীলার কথা শুনিয়াছেন, এরূপ কাহারও সঙ্গের সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল কিনা, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিতকাল পরেই শ্রীরূপ-গোস্বামী কাশী হইয়া নীলাচলে আসিয়া দশমাস ছিলেন। কাশীতে তিনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। আর তিনি—"মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥ কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে। সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড়সুখে॥ মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া। সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥ চৈঃ চঃ ২।২৫।১৭০-২॥ শ্রীরূপগোস্বামী কাশীতে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে প্রভুর তত্রত্য লীলাকথা সমস্তই শুনিয়াছেন। নীলাচলে বলভদ্রভট্টাচার্য্যের মুখেও তিনি এসকল কথা শুনিয়া থাকিবেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী বঙ্গদেশ হইতে বৃন্দাবন-গমনের পথে কাশীতে অবস্থান করিয়া মধুসূদন-বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, ৫৪ পৃঃ)। এই সময়ে কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শ্রীজীব মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন। কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বেই শ্রীজীব বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, শ্রীপাদ-সনাতনের মুখেও ইনি প্রভুর এসব লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই রঘুনাথদাস-গোস্বামী নীলাচলে যাইয়া স্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে স্বরূপদামোদর অপ্রকট হয়েন এবং তাহার পরেই দাস-গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসেন; তাহাও কবিরাজ-গোস্বামীর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বে। নীলাচলে অবস্থানকালে বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের মুখে এবং বৃন্দাবনে আসার পরে সনাতন-গোস্বামীর এবং রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীর মুখেও দাস-গোস্বামী প্রভুর কাশী-লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন। প্রভুর প্রকটকালে সনাতন-গোস্বামী একবার এবং ভট্টগোস্বামী দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন, সেই সময়েও দাস-গোস্বামী ইঁহাদের নিকটে অনেক কথা শুনিয়া থাকিবেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী, ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামী—এই তিনজনই প্রত্যক্ষ-দর্শীদের মুখে প্রভুর বারাণসী-লীলার কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন গৌরগত-প্রাণ। গৌরের লীলাকথা শুনিবার বা বলিবার সুযোগ পাইলে ইহাদের কাহারও আহার-নিদ্রাদির অনুসন্ধানও থাকিত না। প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা সহকারে ইহারা যে সমস্ত তথ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। কবিরাজ-গোস্বামী বহুবৎসর পর্য্যন্ত এই তিনজনের অন্তরঙ্গ সঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহার শিক্ষাগুরুও ছিলেন। শেষসময়ে দাস-গোস্বামী ও

কবিরাজ-গোস্বামী এক সঙ্গেই থাকিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখা শেষ হওয়ার পরেও দাস-গোস্বামী প্রকট ছিলেন।

যাঁহারা উপন্যাস লেখেন, তাঁহারা কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করেন; ইহা দূষণীয় নয়। কাল্পনিক ঘটনাদিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দিষ্ট মূলনীতির পরিস্ফুরণ করেন। কিন্তু যাহারা চরিতকাহিনী লিখেন, কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা তাঁহাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ; এই শ্রেণীর লেখকদের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকে না। কবিরাজগোস্বামী উপন্যাস লেখেন নাই, তিনি চরিতকাহিনী এবং তাহার উপলক্ষ্যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদি বিবৃত করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি একাজে হাত দেন নাই। তাঁর প্রতি বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে, তিনি সত্যের অপলাপ করিবেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা থাকিলে, তাঁহারা তাঁহার উপরে গৌরচরিত বর্ণনের ভার অর্পণ করিতেন না। গৌরচরিতের সমস্ত ঘটনাই তাঁহারা সকলে জানিতেন; মনোজ্ঞ ভাষায় সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া লীলার মাধুর্য্য পরিস্ফুট করার জন্যই তাঁহারা কবিরাজগোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার উপাস্য শ্রীমদনগোপালের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই বৈষ্ণবদের আদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—"শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। ৩।২০।৯০।" গ্রন্থসমাপ্তির পরে শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীমদনগোপাল অসত্য কথা লেখার জন্য তাহাকে আদেশ করেন নাই; অসত্য বর্ণনা দ্বারা কলুষিত গ্রন্থও যে তিনি তাহার ইষ্টদেবের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। বৈষ্ণববৃন্দের বিদিত ঘটনাসমূহের মধ্যে একটা মিথ্যা কাল্পনিক ঘটনা অনুপ্রবিষ্ট করাইতে গেলে অবিলম্বেই তাঁহাকে বৈষ্ণববৃন্দের বিরাগভাজন হইতে হইবে—বিশেষতঃ তাঁহার একতম শিক্ষাগুরু এবং গ্রন্থলিখন-সময়েও তাঁহার নিত্যসঙ্গী রঘুনাথদাসগোস্বামীরও বিরাগভাজন হইতে হইবে—ইহাও কবিরাজগোস্বামী জানিতেন। ইহাদের আদেশে, ইহাদেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের বিরাগভাজন হওয়া, ইহাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুগ্রহের অমর্য্যাদা করা কবিরাজগোস্বামীর মত নিষ্কিঞ্চন সাধকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তিনি মিথ্যা কিছু লিখেন নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধারসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। তাঁহার লিখিত বর্ণনার সঙ্গে যদি অন্য কোনও চরিতকারের বর্ণনার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনাকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে; যেহেতু, এই লীলার প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরঙ্গ সঙ্গের সুযোগ এবং সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক বৈষ্ণবদের আলোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি যেরূপ পাইয়াছিলেন, অন্য কোনও চরিতকার সেরূপ পায়েন নাই।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনার সারমর্ম্ম ঐইরূপ:—

মহাপ্রভু দুইবার কাশীতে গিয়াছিলেন—একবার বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে, আর একবার বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার সময়ে। প্রত্যেক বারেই তিনি চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। মিশ্রপুত্র রঘুনাথ প্রভুর সেবা করিতেন; চন্দ্রশেখরের সঙ্গী পরমানন্দকীর্ত্তনীয়া প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। প্রথমবারে প্রভু অল্প কয়দিন মাত্র কাশীতে ছিলেন; কোনও সন্ন্যাসী তখন তাহার নিকটে আসেন নাই; তিনিও কোনও সন্ন্যাসীর নিকটে যান নাই; সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে বরং তিনি অন্যত্র নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিতেন না। তবে অন্যান্য লোক তাহার নিকটে আসিতেন এবং তাহার মধ্যে অদ্ভুত প্রেমবিকারাদি দর্শন করিয়া তাহার অনুগত হইয়া পড়িতেন। এসমস্ত লোকের মধ্যে এক মহারাষ্ট্রী বিপ্রও ছিলেন।

প্রভু কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে না মিশিলেও তাহার আগমনের কথা প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ জানিতেন; তাহারা প্রভুর অত্যন্ত নিন্দা করিতেন; নিন্দার কথা কোনও কোনও লোক আসিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রভুকেও জানাইতেন; কিন্তু প্রভু শুনিয়া কেবল হাসিতেন; আর কিছুই বলিতেন না।

দ্বিতীয়বারে প্রভু অন্যূন দুইমাস কাশীতে ছিলেন; শ্রীপাদ সনাতনও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত

হন। প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দেন। এবারেও তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশিতেন না; সন্ন্যাসীদের কৃত নিন্দার মাত্রাও কিছুমাত্রও কমে নাই, বরং দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি প্রভুর অনুগত ভক্তগণ সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার জন্য প্রভুকে অনেক মিনতি করিতেন; প্রভু ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়াই থাকিতেন, কিছু বলিতেন না।

প্রভুর অনুগত কাশীবাসী ভক্তদের দুঃখের কারণ ছিল দুইটী—সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দাশ্রবণ এবং কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণকথা-শ্রবণের সুযোগের অভাব।

প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেন; প্রভুর কথা উঠিলেই প্রকাশানন্দ বলিতেন:—

"সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নাচন। না করে বেদান্তপাঠ—করে সঙ্কীর্ত্তন॥ মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে। ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥ চৈঃ চঃ ১।৭।৩৯-৪০॥" তিনি কখনও বা বলিতেন:—"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক। কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥ চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লৈয়া। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ যেই তারে দেখে, সেই ঈশ্বর করি কহে। ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল। শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥ সন্ন্যাসী নাম মাত্র—মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥—চৈঃ চঃ ২।১৭।১১২-১৬॥"

প্রভুর এইরূপ নিন্দা ছিল ভক্তদের হৃদয়বিদারক দুঃখের কারণ; যেহেতু ইহা চিত্তবিক্ষোভজনক ইষ্ট-নিন্দন।

তাঁহাদের আর এক দুঃখের কারণ ছিল এই। প্রকাশানন্দ ছিলেন মায়াবাদী, তাঁহার মুখে এবং তাঁহার প্রভাবে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মুখেও এবং অপর অনেক লোকের মুখেও মায়া ও ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও কথা—ভগবানের কোনও নাম—শুনা যাইত না। ভগবানের লীলাগ্রন্থাদির আলোচনাও কোথাও হইত না, ষড়দর্শনাদির ব্যাখ্যা এবং আলোচনাই প্রায় সর্ব্বত্র হইত। চন্দ্রশেখর একদিন দুঃখ করিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন:—"আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসীস্থানে। মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥ ষড়দর্শনব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।—চৈঃ চঃ ২।১৭।৯১-৯২॥" ইহাও ছিল ভক্তদের এক দুঃখ, যেহেতু, তাঁহারা মনে করিতেন, কাশীতে তাহাদের ভাবানুরূপ ভজন-পুষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ছিলনা।

ভক্তগণ মনে করিলেন—প্রভু যদি প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীদের কৃপা করিতেন, তাহা হইলে, সেই সন্ন্যাসীরাও প্রভুর পদানত হইতেন, ভক্ত হইতেন, সর্ব্বত্র ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করিতেন, লীলাগ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন, প্রভুর নিন্দা হইতেও বিরত হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের অবসান হইত, সুখের উদয় হইত। তাই প্রভু যখন দ্বিতীয়বার কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর কৃপা আকর্ষণের জন্য একদিন চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র—দুঃখী হঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥ কতেক শুনির প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন॥ তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥ ১।৭।৪৭-৯॥" শুনিয়া প্রভু একটু হাসিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে এক মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসিয়া প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভুর দর্শনে তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে-সেখানে সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইত; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে। স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥ ২।২৫।৭॥" তাই তিনি মনে করিলেন, যদি কোনও প্রকারে প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের তিনি একত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রভুর দর্শনমাত্রেই ইহারা প্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিবেন, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ভক্ত হইবেন। তিনি আরও ভাবিলেন—বারাণসী বাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে। সর্ব্বকালে দুঃখ পাব, ইহা না করিলে॥ ২।২৫।৯॥" তিনি স্থির করিলেন—নিজ গৃহেই তিনি সন্ন্যাসীদিগকে এবং প্রভুকেও ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র করিবেন। এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে। তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥ ২।২৫।১০॥" আসিয়া তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া প্রভুর চরণে

পতিত হইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের আর্ত্তি শুনিয়া পূর্ব্বেই প্রভুর মন একটু নরম হইয়াছিল, সন্ন্যাসীদিগের মতি-গতি ফিরাইবার জন্য একটু ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রভু তাই বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ; সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে প্রভু বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন ; সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং পাদপ্রক্ষালনের স্থানেই বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীগণ দেখিলেন—প্রভুর "মহাতেজোময় বপু, কোটিসূর্য্যাভাস। ১।৭।৫৮।" দেখিয়া প্রভুর প্রতি সন্ন্যাসীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, আসন ছাড়িয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন, স্বয়ং প্রকাশানন্দই উঠিয়া গিয়া সমাদরে প্রভুর হাতে ধরিয়া আনিয়া খুব সম্মানের সহিত নিজেদের মধ্যে তাঁহাকে বসাইলেন (১।৭।৬০-৩)। ইহার পরে ইষ্টগোষ্ঠি আরম্ভ হইল। প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা, নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের কথা, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের কথা, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত বিকারের কথা—সমস্তই বলিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। পরে বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। প্রভু দেখাইলেন—মুখ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণাতে বেদান্তসূত্রের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি হয়। সূত্রের তাৎপর্য্যও সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। সন্ন্যাসীগণও স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে প্রভু বেদান্তের মুখ্য কয়েকটি সূত্রের মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থও করিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মন ফিরিয়া গেল, তাঁহারা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ। ১।৭।১৪২ ॥" পরে—"তবে সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া। ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া॥ চৈঃ চঃ ১।৭।১৪৪ ॥" এদিকে আবার সেই সভায় উপস্থিত—"চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন॥ ১।৭।১৪৬ ॥' ইহার পর হইতে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোক-সমাগম হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরের গৃহে—"মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে। ১।৭।১৪৯ ॥" আর—প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী। ১।৭।১৪৭ ॥" প্রভু যদি গঙ্গাস্নান করিতে যান, কিম্বা বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যান, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অগণিত লোক সে সকল স্থানে সমবেত হয়, হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত করে। "নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥ সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার। সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার॥ ২।২৫।১২ ॥"

এদিকে সন্ন্যাসীগণ নিজেদের মধ্যে প্রভু সম্বন্ধে, তাঁহার আচরণ, যুক্তি, বেদান্তব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন! যতই আলোচনা করেন, ততই তাঁহারা—স্বয়ং প্রকাশানন্দও—প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ প্রভুকে স্বয়ংভগবান বলিয়া অনুভব করিলেন!

একদিন সন্ন্যাসীগণ এইভাবে প্রভুসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিতে যাইতেছেন ; পথের দুইদিকে অসংখ্যলোক প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছে। মন্দিরাঙ্গনে আসিয়া প্রভু মাধবের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন—"শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন। চারিজন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি। উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥ ২।২৫।৫৪-৫৫ ॥" সশিষ্য প্রকাশানন্দ নিকটেই ছিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া শিষ্যগণকে লইয়া তিনিও মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন—"দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী। শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে হরি হরি॥ কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ। অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব॥ ২।২৫।৫৭-৫৮ ॥" কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সময়োচিত ব্যবহারের পরে—শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্তসূত্রের ব্যাস-কৃত ভাষ্য, এবং তাহা যে গায়ত্রীরও ভাষ্য, তাহা প্রভু সপ্রমাণ করিলেন। সন্ন্যাসীগণ সম্পূর্ণরূপে প্রভুর পদানত হইলেন। প্রেমভরে তাঁহারাও নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীদের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা আরম্ভ হইল। এইরূপে মহাপ্রভু সন্ন্যাসীগণকে উদ্ধার করিয়া তত্রত্য ভক্তদিগের দুঃখের মূলোৎপাটন এবং সুখের পথ প্রশস্ত করিলেন। প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, প্রভু নিজে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

সংক্ষেপে ইহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তির উপরে এবং কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শি-প্রমুখ সত্যানুসন্ধিৎসু ও বৈষ্ণবদের সভায় পুনঃ পুনঃ আলাপ আলোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষণে আমরা পুর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-মহাশয়ের উক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয়ের সন্দেহের হেতু এই যে, তাঁহার মতে মুরারিগুপ্তের বা কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। ইহাদের গ্রন্থ হইতে পণ্ডিত-মহাশয় মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলা সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার মন্তব্যসহ আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের নিবেদন জানাইতেছি।

(ক) মুরারিগুপ্তের গ্রন্থোক্তিসম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"মুরারিগুপ্তর কড়চায় ৪।১।১৮ ও ৪।১৩।২০ শ্লোকে "কাশীবাসিজনান্ কুর্ব্বন্ হরিভক্তিরতান্ কিল" ও "কাশীবাসিজনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তিপ্রদানতঃ" উক্তি আছে। শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের ন্যায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরুকে উদ্ধার করিয়া থাকিলে মুরারিগুপ্ত সে সম্বন্ধে নীরব থাকিবেন কেন?

নিবেদন। পণ্ডিত-মহাশয় এস্থলে দুইটী শ্লোকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে কি করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথমোদ্ধৃত (৪।১।১৮) শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কাশীবাসী লোকদিগকে হরিভক্তিরত করিয়া" (হরিসঙ্কীর্ত্তনামোদী মহাপ্রভু স্বীয় ভক্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে সর্ব্বদা উর্দ্ধে বাহুক্ষেপন করেন। ৪।১।১৯।) প্রভুর কীর্ত্তনের প্রভাবে এবং "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনিতে কাশীবাসী লোকগণ হরিভক্তিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন—একথাই মুরারিগুপ্ত পরবর্ত্তী ৪।১।১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন।

আর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার পথে প্রভু যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাই পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কাশীবাসী সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তি প্রদান পূর্ব্বক (৪।১৩।২০)।" এস্থলে মুরারিগুপ্ত বলিতেছেন—মহাপ্রভু কাশীবাসী সকলকেই (সর্ব্বান্) কৃষ্ণভক্তি দান করিয়াছিলেন। কয়েকজনকে বাদ দিয়া বাকী সকলকে তিনি কৃষ্ণভক্তি দিয়াছিলেন, একথা মুরারিগুপ্ত বলেন নাই; সুতরাং প্রকাশানন্দকেও যে তিনি কৃষ্ণভক্তি দিয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক অনুমান; প্রকাশানন্দ যে তখন কাশীতে ছিলেন না, একথাও তিনি বলেন নাই।

উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ দুইটীর মর্ম্মের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে (৪।১৩।২০) বলা হইয়াছে—প্রভু কাশীবাসী সকলকেই কৃষ্ণভক্তি দান করিলেন; প্রথম শ্লোকার্দ্ধে (৪।১।১৮) কিন্তু তাহা বলা হয় নাই—সঙ্কীর্ত্তনামোদি প্রভুর কীর্ত্তনে "হরিবোল" ধ্বনি যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা হরিভক্তি রত হইয়াছেন, ইহাই বলা হইয়াছে। প্রথমবারে প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বাহির হইয়া কাহারও সঙ্গে মিশেন নাই; যেখানে থাকিতেন, সেখানে যাঁহারা আসিতেন, কেবল তাঁহারাই তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেন, তাঁহারাই হরিভক্তি-রত হইতেন। সকল লোকের এই সৌভাগ্য হয় নাই। এই শ্লোকার্দ্ধের উক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও অনৈক্য নাই; কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রভৃতি কয়েকজন লোকই প্রথমবারে প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। প্রথমবারে প্রভু কাহারও সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন—একথা মুরারিগুপ্তও বলেন না, কবিরাজ-গোস্বামীও বলেন না।

পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে। তিনি শ্লোকটীর (৪।১৩।২০) প্রথমার্দ্ধ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করেন নাই। শেষার্দ্ধে কাশীবাসীদিগকে কৃষ্ণভক্তি দান করার হেতু উল্লিখিত হইয়াছে; সেই হেতুর প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন কিনা, তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে ঐ হেতু সিদ্ধ হইতে পারিত কিনা, তৎসম্বন্ধে একটা অনুমান করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই :—

"কাশীবাসিজনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তিপ্রদানতঃ। উদ্ধৃত্য কৃপয়া কৃষ্ণো ভক্তানাং সুখহেতবে॥ ৪।১৩।২০—ভক্তদিগের সুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাপূর্ব্বক কাশীবাসী সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তিপ্রদানপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া (* * * * শ্রীজগন্নাথদর্শনের অভিপ্রায়ে সত্বর চলিয়া গেলেন। ৪।১৩।২১)।

কবিরাজগোস্বামিবর্ণিত প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনীর আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি—প্রকাশানন্দ কর্ত্তৃক প্রভুর নিন্দা এবং কাশীতে প্রকাশানন্দের প্রভাবজনিত ভক্তিপুষ্টির প্রতিকূল আবহাওয়াই ছিল তত্রত্য ভক্তদের দুঃখের হেতু এবং এই দুঃখ দূরীকরণের এবং ভক্তদের সুখোৎপাদনের একমাত্র উপায়ই ছিল প্রকাশানন্দকে কৃষ্ণভক্ত করা। প্রভু তাহা করিয়াছেন, করিয়া ভক্তদের সুখোৎপাদন করিয়াছেন। প্রকাশানন্দকে বাদ দিয়া কাশীবাসী আর সকলকে কৃষ্ণভক্ত করিলেও ভক্তদের দুঃখের হেতু থাকিয়াই যাইত এবং তাঁহাদের সুখের সম্ভাবনাও থাকিত না। সুতরাং মুরারিগুপ্তের উল্লিখিত "সর্ব্বান্"-শব্দের মধ্যে প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণও অন্তর্ভুক্ত; নতুবা "ভক্তানাং সুখ-হেতবে"—কথারও কোনও সার্থকতা থাকে না। শ্লোকস্থ "উদ্ধৃত্য"-শব্দেরও একটা ব্যঞ্জনা আছে। প্রভুর নিন্দাজনিত পাপ হইতে উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীদেরই, অপরের নহে,; তাই "উদ্ধৃত্য – উদ্ধার করিয়া"-শব্দ হইতেও প্রকাশানন্দাদির উদ্ধারই ব্যঞ্জিত হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় যদি মুরারি-গুপ্তের উক্ত (৪।১৩।২০) শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যঞ্জনার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিমত অন্যরূপ হইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই—একথা মুরারিগুপ্ত বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কবিরাজগোস্বামীর বর্ণনার বিরোধ নাই।

মুরারিগুপ্ত প্রভুর বারাণসী-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দেন নাই; তিনি সূত্রমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন এজন্যই বোধ হয় তিনি প্রকাশানন্দের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী বিস্তৃতভাবেই বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণিতব্য বিষয়ের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহাতে তিনিও প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই:—"বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসী-মুখান্ কাশীনিবাসিনঃ। সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ॥—সন্ন্যাসিপ্রমুখ কাশীবাসী জনগণকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতনকে সুসংস্কৃত করিয়া প্রভু নীলাচলে গমন করিলেন।"

সূত্রে সাধারণভাবেই বিষয়ের উল্লেখ থাকে; বিশেষ কোনও ব্যক্তির উল্লেখ সাধারণতঃ থাকে না।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার সম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত যে একেবারেই "নীরব," একথা বলা চলে না; তাঁহার শ্লোকে এই উদ্ধারের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(খ) কবিকর্ণপুর সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন:—

(১) "কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—ব্রহ্মচারি-গৃহিভিক্ষু-বনস্থা যাজ্ঞিকা ব্রতপরাশ্চ তমীযুঃ মৎসরৈঃ কতিপয়ৈ র্যতিমুখ্যৈরের তত্র ন গতং ন স দৃষ্টঃ।—৯।৩২ নির্ণয়-সাগর সংস্করণ।

নাটকে কোথাও প্রকাশানন্দের উদ্ধারকাহিনী বা নাম নাই। বরং আছে যে কতিপয় প্রধান যতি মাৎসর্য্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে যায়েন নাই।"

নিবেদন। উদ্ধৃত শ্লোকটীর সঙ্গে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্লোকের একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই দুইটী শ্লোকের প্রথমটী হইতে জানা যায়, কাশীতে আসিয়া প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটীর মর্ম্ম হইতে জানা যায়, কাশীর এবং কাশীর বাহিরের অগণিত লোক অনুরাগভরে চন্দ্রশেখরের গৃহে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ এই।—তখন মনে হইয়াছিল, "অনুরাগ পূর্ব্বক আসিয়া ইঁহাকে দর্শন কর"—এইরূপ বলিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই যেন বিশ্বকে (বিশ্ববাসীকে) প্রভুর দর্শনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; নতুবা একই সময় সকল লোকের একই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে কেন?—তদানীন্ত * * * তমেত্য পশ্যেত্যনুরাগপূর্ব্বং বিশ্বেশ্বরো বিশ্বমিব ন্যযুঙ্ক্ত। কুতোঽন্যথা তাবতিতুল্যকালে তুল্যক্রিয়ঃ সর্ব্বজনো বভূব॥" ইহা বলিয়া, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক প্রভুকে দেখিবার

জন্য চন্দ্রশেখরের গৃহে গিয়াছিলেন, তাহাই পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু (অর্থাৎ সন্ন্যাসী), বনবাসী (বা বানপ্রস্থাবলম্বী), যাজ্ঞিক ও ব্রতপরায়ণ লোকগণ আসিয়াছিলেন ; (কেবল) কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ প্রধান যতি (সন্ন্যাসী) সেস্থানে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন নাই।

প্রধান সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজন মাৎসর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য সকল প্রধান সন্ন্যাসী এবং অপ্রধান সন্ন্যাসিগণও প্রভুর নিকট গিয়াছিলেন, শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই জানা যায়। কোনও প্রধান বা অপ্রধান সন্ন্যাসীই যায়েন নাই, একথা শ্লোকে বলা হয় নাই ; বরং সন্ন্যাসীদের যাওয়ার কথা (ভিক্ষু ও বনস্থ শব্দদ্বয়ে) স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, কবিকর্ণপুর এস্থলে কেবল যাওয়ার কথাই বলিয়াছেন, উদ্ধার বা অনুদ্ধার, কিম্বা উদ্ধারে অসামর্থ্য বা সামর্থ্যের কথাও কিছু বলেন নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণকে প্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে উদ্ধার করেন নাই, মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে করিয়াছিলেন এবং পরে বিন্দুমাধবের মন্দির-প্রাঙ্গণেই তাঁহারা সম্যক্‌রূপে প্রভুর পদানত হইয়াছিলেন।

(২) উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীচৈতন্য এই সকল সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমের মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। দশম অঙ্কে দেখিতে পাই—সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য বারাণসী যাইতেছেন। তিনি স্বগতোক্তি করিতেছেন—"যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতির্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি ১০।৫।" সার্ব্বভৌম সত্য সত্যই বারাণসী গিয়াছিলেন কিনা এবং গিয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে কবিকর্ণপুর কোন সংবাদ দেন নাই। পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থকারও এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য যদি তৎকালের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে আর সার্ব্বভৌমের বারাণসী-যাত্রার কথা কবিকর্ণপুর উল্লেখ করিতেন না।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেও কোনস্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই।"

নিবেদন। "এই সকল সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে পারিলেন না"-বাক্যে পণ্ডিত-মহাশয় যদি মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্য বারাণসীবাসী "সকল সন্ন্যাসীদের" অর্থাৎ কোনও সন্ন্যাসীকেই উদ্ধার করিতে পারেন নাই তাহা হইলে ঠিক কথা বলা হয় নাই। কারণ, কবিকর্ণপুর নিজেই বলিয়াছেন—মাৎসর্য্যপরায়ণ কতিপয় সন্ন্যাসীব্যতীত আর সকল সন্ন্যাসীই অনুরাগ ভরে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আর, যদি পণ্ডিত-মহাশয় মনে করিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র ঐ সকল মাৎসর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসী কয়জনকে প্রভু উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাহা হইলেও ব্রহ্মচারী, গৃহী, সন্ন্যাসী ও বনস্থ-আদি যাবতীয় বারাণসীবাসীদিগকে উদ্ধার করার পরে কেবলমাত্র কয়েকজন সন্ন্যাসী উদ্ধার পাইলেন না বলিয়াই বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, এজন্য "প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমের মনে ক্ষোভ রহিয়া" যাওয়ার কথা কবিকর্ণপুর কোথাও বলেন নাই। ইহা পণ্ডিত মহাশয়েরই কল্পিত কথা।

"সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য বারাণসী যাইতেছেন"—ইহাও কবিকর্ণপুর দশম অঙ্কে কেন, কোনও স্থানেই বলেন নাই ; ইহাও পণ্ডিত-মহাশয়ের কল্পিত কথা। সার্ব্বভৌমের কাশী-যাত্রার কথা কর্ণপুর লিখিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করার জন্যই গিয়াছিলেন,—একথা তিনি লিখেন নাই। সার্ব্বভৌম কি জন্য বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত-মহাশয়ের উদ্ধৃত তাঁহার স্বগতোক্তিতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—"বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি"—বারাণসী যাইয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করাইবার জন্য। বারাণসীতে কাহাকে তিনি শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করাইবেন? সমস্ত কাশীবাসীকে, না কেবল তত্রত্য সন্ন্যাসীদিগকে, না কি কেবল কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসীকে? আর কোন সময়েই বা সার্ব্বভৌম কাশী

যাইতেছিলেন? শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমনের পূর্ব্বে না পরে? যদি শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমনের পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম বারাণসীযাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত কাশীবাবাসী অথবা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর মত গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি যাইতেছিলেন মনে করা যায়। আর যদি প্রভুর বারাণসীত্যাগের পরে তিনি কাশীযাত্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে সকল মাৎসর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসী প্রভুর নিকটে আসেন নাই, তাঁহাদিগকেই প্রভুর মত গ্রহণ করাইতে সার্ব্বভৌম যাত্রা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুই কারণে ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌম স্বয়ংভগবান বলিয়া মনে করিতেন; তিনি যাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, সার্ব্বভৌম তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন, এরূপ আস্পর্দ্ধার ভাব প্রভুপদানত সার্ব্বভৌমের মনে আসার কথা নয় – সে আস্পর্দ্ধা আবার এত প্রবল যে, প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও সার্ব্বভৌম বারাণসী যাওয়ার জন্য রওনা হইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণপুর বলিয়াছেন—যাঁহারা প্রভুর নিকটে আসেন নাই, তাঁহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ এবং কতিপয় প্রধান সন্ন্যাসী; মাৎসর্য্য তাঁহাদের এতই প্রবল, যে তাঁহারা স্বশ্রেণীর আর একজন সন্ন্যাসীর—যিনি সমস্ত কাশীবাসীকে, অপর প্রধান এবং অপ্রধান সন্ন্যাসীদিগকেও ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছেন, এরূপ একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসীর—নিকটে যাওয়াও নিজেদের মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমী সার্ব্বভৌমের নিকটে আসিবেন, অথবা তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচারে সম্মত হইবেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া সার্ব্বভৌমের মত গ্রহণ করিবেন—এরূপ মনে করার মত অহঙ্কারও সার্ব্বভৌমের ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এসমস্ত কারণে মনে হয়, মহাপ্রভুর কাশী যাওয়ার পূর্ব্বেই প্রভুর মত গ্রহণ করাইবার জন্য সার্ব্বভৌম কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন এবং তখন এমন কোনও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহাতে প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও কাশী যাওয়ার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অনুমানই যে সত্য, আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সার্ব্বভৌম সত্যসত্যই কাশীতে গিয়াছিলেন কিনা, কর্ণপুর অবশ্য সে বিষয়ে কোনও সংবাদ দেন নাই; কিন্তু "পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকারও" যে "এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই"—ইহা ঠিক কথা নহে। বোধ হয় কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি পণ্ডিত-মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সংবাদ দিয়াছেন।—"বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত-আগমন। শিবানন্দসেন করে সভার পালন॥ শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান। প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান॥ পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥ ২।১।১২৯-৩১॥" সার্ব্বভৌম কোন্ সময়ে বারাণসীযাত্রা করিয়াছিলেন, এই কয় পয়ার হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়। এই কয় পয়ার হইতে জানা যায়—এক বৎসর গৌড়ীয়ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে চলিয়াছেন, পথে সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। কবিকর্ণপুরও একথা বলেন (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ১০।১৩। বহরমপুর সংস্করণ) এবং তিনি আরও বলেন, ঐ সময়ে সার্ব্বভৌম বারাণসীতে যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ শকাব্দায়?

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে প্রত্যেক বৎসরেই গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন এবং বর্ষার চারিমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যের পরে দেশে ফিরিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসের পরে ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে প্রভু নীলাচলে আসেন, ১৪৩২ শকের বৈশাখে দক্ষিণযাত্রা করিয়া দুইবৎসর পরে ১৪৩৪ শকের প্রারম্ভে ফিরিয়া আসেন। ১৪৩৪ শকেই গৌড়ীয় ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথম প্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসেন। ১৪৩৫ শকে তাঁহারা দ্বিতীয়বার আসেন এবং ১৪৩৬ শকে তৃতীয়বার আসেন। ১৪৩৬ শকাব্দার বিজয়াদশমীতেই মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে গৌড়ে যাত্রা করেন।

যাহা হউক, সূত্ররূপে মধ্যলীলার বর্ণিতব্য বিষয়সমূহের উল্লেখ-প্রসঙ্গেই প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পয়ারগুলি লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১২২-২৮ পয়ারে গৌড়ীয়ভক্তদের প্রথম (১৪৩৪ শকাব্দায়) নীলাচল-গমন ও চারিমাস অবস্থানাদির উল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত পয়ারসমূহে এবং পরবর্ত্তী কতিপয় পয়ারেও (১২৯-৩১) তাঁহাদের

"বর্ষান্তরের" আগমন ও অবস্থিতি এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। তাহার পরে ১৩৮ পয়ারে প্রভুর গৌড়-গমনের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—১৪৩৬ শকাব্দায় প্রভুর গৌড়গমনের পূর্ব্বে এবং ১৪৩৪ শকাব্দায় গৌড়ীয় ভক্তদের সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে আগমনের পরেই, ১৪৩৫ বা ১৪৩৬ শকাব্দার রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তদের সহিত সার্ব্বভৌমের পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ শকাব্দায়? ১৪৩৫ শকে, না ১৪৩৬ শকে?

মধ্যলীলার ১৬শ পরিচ্ছেদে ১১-৮০ পয়ারে গৌড়ীয় ভক্তদের দ্বিতীয়বারের (১৪৩৫ শকাব্দার) এবং ৮৫ পয়ারে তৃতীয়বারের (১৪৩৬ শকাব্দায়) নীলাচল গমন বর্ণিত হইয়াছে। ১৪৩৬ শকাব্দায় গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার অব্যবহিত পরেই দেশে চলিয়া যান (২।১৬।৮৫), চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই; এবং তাঁহাদের চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই সার্ব্বভৌমের সহিত নীলাচলে প্রভুর আলাপের কথা দৃষ্ট হয় ২।১৬।৮৬); ইহাতে বুঝা যায়, ১৪৩৬ শকে সার্ব্বভৌম বারাণসী যাত্রা করেন নাই। কিন্তু ২।১৬।১১-৮০ পয়ারে ১৪৩৫ শকের গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে অবস্থানাদির বর্ণনায় কোন স্থানেই সার্ব্বভৌমের উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায় না। তাহাতে মনে হয়, ১৪৩৫ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিতেছিলেন, তখনই তাঁহাদের সহিত সার্ব্বভৌমের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ১৪৩৫ শকাব্দাতেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন।

সময়-নির্ণয়ের আর একটী উপাদান কবিরাজ-গোস্বামী দিয়াছেন—সেই বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল। কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দশম অঙ্কে বলিয়াছেন—মহাপ্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে কোনও এক বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল এবং এই কুক্কুরই প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল (১০।৩)। এই প্রমাণেও জানা যায়, প্রভুর মথুরা-গমনের পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড় গিয়াছিলেন; গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া ১৪৩৭ শকের শরৎকালে মথুরা-যাত্রা করেন (২।১৭।২)। গৌড় হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়েই প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—"এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন (২।১৬।২৩৫)।" সুতরাং ১৪৩৭ শকাব্দার রথযাত্রা-উপলক্ষে কেহ নীলাচলে আসেন নাই। কাজেই মনে করিতে হইবে, ১৪৩৫ শকেই শিবানন্দের সঙ্গে একটী কুক্কুর গিয়াছিল এবং সেই বৎসরেই সার্ব্বভৌম বারাণসী গিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্রমে দুইটী প্রশ্নের আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন এই। মধ্যলীলার সূত্রমধ্যে দ্বিতীয় বারের (১৪৩৫ শকের) ভক্ত-সমাগমের প্রসঙ্গেই কবিরাজ-গোস্বামী কুক্কুরটীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে, বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-প্রসঙ্গেই কুক্কুরটী-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই কুক্কুরটী শিবানন্দের সঙ্গে আসিয়াছিল?

এক্ষণে দেখা যাউক,—অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে যে বারের ভক্ত-সমাগমের কথা বলা হইয়াছে, কুক্কুরটীও সেই বারেই শিবানন্দের সঙ্গে গিয়াছিল, এরূপ কোনও স্পষ্ট উল্লেখ সেস্থানে আছে কিনা; যদি না থাকে, তাহা হইলে কুক্কুরটী অন্য কোনও বারে শিবানন্দের সঙ্গে গিয়াছিল, ইহাও মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা মনে করিলে, এস্থলে কুক্কুরটীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করার সার্থকতা কি? কুক্কুরটী যে সেবারেই শিবানন্দের সঙ্গে চলিয়াছিল, এরূপ কোনও উল্লেখ অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদে নাই। ভক্তদের নীলাচলযাত্রা-উপলক্ষে বলা হইয়াছে, শিবানন্দ "সভারে পালন করে—দেন বাসাস্থান। ৩।১।১১।" ইহার অব্যবহিত পরেই কুক্কুরটীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তদের কথা দূরে, একটী কুক্কুরের সুখসুবিধার জন্যও শিবানন্দের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না শিবানন্দের পূর্ব্ব-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ উদারতার কথা বলা হইল। সুতরাং কুক্কুরটী পূর্ব্বে কোনও একবৎসরেই (১৪৩৫ শকের ভক্তসমাগমের সঙ্গেই) শিবানন্দসেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, এরূপ

মনে করিলে অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনার সঙ্গেও বিরোধ হয় না, অথচ মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদে, কবিরাজ-গোস্বামীর সূত্রোক্তির সহিত এবং কবিকর্ণপুরের নাটকের উক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে। তাই ইহাই সমীচীন সমাধান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই। কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকের নবম অঙ্কে শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ, এবং বৃন্দাবন-প্রয়াগ-কাশী-ভ্রমণ বর্ণনা করিয়া তাহার পরে দশম অঙ্কে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে গমন বর্ণন প্রসঙ্গেই সার্ব্বভৌমের বারাণসী যাত্রার কথা বলিয়াছেন। দশম অঙ্ক পড়িলে ইহাও মনে হয় যে, এই অঙ্কে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সার্ব্বভৌমের কাশীযাত্রাও যে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনা, এরূপ অনুমান করা যাইবে না কেন?

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, দশম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিক ক্রমের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির যে ঐতিহাসিক সত্যতা নাই, তাহা আমরা বলিতে চাইনা; কিন্তু কোন্ ঘটনার পরে বা সঙ্গে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঘটনাগুলির মধ্যে বাস্তবিক সময়ের ব্যবধান কিরূপ ছিল, কর্ণপুরের বর্ণনা হইতে তাহা নির্দ্ধারিত করা যায় না। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

একই নবম অঙ্কে এবং একই দৃশ্যেই প্রতাপরুদ্রের সভায় রায়রামানন্দ আসিয়া বলিলেন—প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলে রামানন্দ ভদ্রক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক বার্ত্তাবহ আসিয়া বলিল—ভদ্রক হইতে যাত্রা করার পরে পথে যবন রাজার সহিত সন্ধি হইলে প্রভু পাণিহাটিতে যান, তারপরে নানা ভক্তের বাড়ী ঘুরিয়া শান্তিপুর, শান্তিপুর হইতে কুলিয়ায় যাইয়া সাতদিন থাকিয়া রামকেলিতে গিয়াছেন। রামকেলি হইতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া তারপর মথুরা যাইবেন। এই বার্ত্তাবহের কথা শেষ হইতে না হইতেই শুনা গেল—প্রভু নীলাচলে আসিয়া লোকসংঘট্টের ভয়ে গুপ্তভাবে মথুরায় গিয়াছেন। তখনই আবার এক বার্ত্তাবহ আসিয়া জানাইল—বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রয়াগ হইয়া প্রভু কাশীতে আসিয়াছেন এবং বার্ত্তাবহের মুখে প্রভুর কাশী আগমনের বিবরণ শেষ না হইতেই স্বয়ং প্রভু আসিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। এই বর্ণনায় সময়ের প্রকৃত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

দশম অঙ্কে এবং এক দৃশ্যেই গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলগমনের উদ্যোগ, নীলাচল গমন, প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন, গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, হোরা পঞ্চমী—বর্ণিত হইয়াছে; এই বর্ণনায়, নীলাচল-যাত্রী ভক্তদের মধ্যে হরিদাসঠাকুরের এবং গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর নাম দৃষ্ট হয় (১০।১৩) এবং শিবানন্দের তিনপুত্রের কথাও তাহাতে আছে; তিনপুত্রের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ দাস (ইনিই পরে কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) যে সেই বারই সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহাও এই দশম অঙ্ক হইতে জানা যায় (১০।১৮)। পরমানন্দদাসের জন্মই হইয়াছে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে; সুতরাং দশম অঙ্কে বর্ণিত ভক্ত-সমাগমকে পরমানন্দ-দাসের নামই প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপ দিয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী ও হরিদাসঠাকুর প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, গৌড়ীয় ভক্তগণের সর্ব্বপ্রথম (১৪৩৪ শকে) নীলাচলে গমনের সময়েই নীলাচলে গিয়াছিলেন (২।১১।৭৩-৭৫) এবং তাঁহারা অন্য ভক্তদের সঙ্গে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন নাই, নীলাচলেই অবস্থান করিতে থাকেন। প্রভু যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তখন হরিদাসঠাকুর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন (২।১৬।১২৭), আবার তাঁহার সঙ্গেই নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় অপ্রকট সময় পর্য্যন্ত সে স্থানে ছিলেন; কিন্তু গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী আর নীলাচল ত্যাগ করিয়া কোথাও যান

নাই (১)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় ; কবিকর্ণপুর এস্থলে হরিদাসঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী এবং শিবানন্দের তিনপুত্রকে একসঙ্গে নীলাচলে পাঠাইয়া অন্ততঃ পাঁচছয় বৎসর ব্যবধানের দুইটী ঘটনাকে একই সময়ে সংঘটিত ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হরিদাস ও গদাধর নীলাচলে গমনের পাঁচ ছয় বৎসর পরেই পরমানন্দদাসকে সর্ব্বপ্রথমে সেস্থানে আনা হয়। বস্তুতঃ কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকের দশম অঙ্কে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বৎসরের ঘটনা বর্ণন করেন নাই। বিভিন্ন বৎসরের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিকে তিনি এস্থলে একই সঙ্গে সমাবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের নাটকীয় ভাব ও নাটকীয় প্রভাব উৎপাদন ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং দশম অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ঘটনার রূপ দৃষ্ট হইলেও তৎসম্পর্কে উল্লিখিত সার্ব্বভৌমের বারাণসীযাত্রাও পরবর্ত্তী ঘটনা, তাহা মনে করার সঙ্গত হেতু নাই।

পণ্ডিত মহাশয় কবিকর্ণপুরের নাটক হইতে সার্ব্বভৌমের যে স্ব-গতোক্তি হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বারাণসীযাত্রার প্রমাণ দিয়াছেন, সেই স্বগতোক্তির অপরাংশের আলোচনা করিলেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌমের বারাণসীযাত্রা—প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। প্রভুর অনুমতি না পাইয়াও তিনি বারাণসী যাইতেছেন, কি হইবে কে জানে—এরূপ বলিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

"যদ্যপি ভগবত ইচ্ছাধীনৈব করুণা তথাপি করুণাপরতন্ত্রত্বং তস্যেতি কদাচিৎ করুণাপি স্বতন্ত্রা ভবতীতি করুণায়া এব সাহায্যেন যদ্ভবতি তদেব ভবিষ্যতীতি।—যদিও ভগবানের করুণা তাঁহারই ইচ্ছাধীন, তথাপি কখনও কখনও করুণা স্বতন্ত্রা বা বলবতী হইয়া ইচ্ছাকে অধীন করিয়া ফেলে। তাই তাঁহার করুণার সাহায্যে যাহা হয়, তাহাই হইবে।"

সার্ব্বভৌমের এই স্বগতোক্তি হইতে বুঝা যায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কাশীবাসী-দিগকে প্রভুর মত গ্রহণ করাইতে যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহার পুর্ব্বেই যদি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে স্বীয় চেষ্টাসত্ত্বেও কাশীবাসীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীচৈতন্য ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, তাহাহইলে—প্রভু নিজে চেষ্টা করিয়া যে কাজ করিতে পারেন নাই, সে কাজ করিবার জন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি যে সেই অসমর্থ-প্রভুর কৃপার উপরই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তখন পর্য্যন্ত কাশীবাসীদিগকে উদ্ধার করার জন্য প্রভুর সামর্থ্য পরীক্ষিত হয় নাই, এবং ইহাও বুঝা যায় যে—সার্ব্বভৌম মনে করিয়াছিলেন, কাশীবাসীদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিবার জন্য প্রভুর নিজের যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই ; প্রভুর কৃপার সহায়তায় সার্ব্বভৌমই তাহা করিতে সমর্থ হইবেন। সার্ব্বভৌমের কাশীযাত্রা প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন এবং কর্ণপূরের বর্ণনার ধ্বনিও তাহার অনুকূল।

কিন্তু তখন কি এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের কাশী যাওয়ার জন্য এতই আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, মহাপ্রভুর অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি বারাণসীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন ?

মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ইঁহাদের কাহারও গ্রন্থ হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর

---

(১) এ সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিই যে নির্ভরযোগ্য তাহার হেতু এই :—শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বিভিন্ন সময়ে নীলাচলে যাইয়া কয়েকমাস ধরিয়া অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই হরিদাসঠাকুরের সঙ্গে থাকিতেন; গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর সঙ্গও এই কয় মাস তাঁহারা করিয়াছেন। রঘুনাথ-দাসগোস্বামী তো কয়েক বৎসর পর্য্যন্তই হরিদাস ঠাকুর এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন এবং শ্রীরঘুনাথের নিকট সমস্ত বিবরণ জানিবার সুযোগ কবিরাজ গোস্বামীর হইয়াছিল। কবিকর্ণপুরের এ জাতীয় সুযোগ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না; মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময়েও তিনি বোধহয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পরে তো নীলাচলের চাঁদের হাটই ভাঙ্গিয়া যায়।

পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপুরেরই সমসাময়িক গ্রন্থকার জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কয়েকটী উক্তি হইতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের উত্তরখণ্ডে মহাপ্রভুর কাশীলীলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী। বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ড সন্ন্যাসী॥ ১৪৯ পৃঃ।" পণ্ডিত-মহাশয়ও এই পয়ারটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন নাই। এই পয়ার হইতেও বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, মহাপ্রভুর বারাণসী-লীলাসম্বন্ধে উক্ত বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে বিজয়খণ্ডে ও তীর্থখণ্ডে জয়ানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণের কথা এবং তাহারও পূর্ব্বে প্রকাশখণ্ডে নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—নীলাচলে শ্রীচৈতন্য আছেন একচিত্তে। বারাণসী হৈতে পত্র আইল আচম্বিতে॥ বড় বড় সন্ন্যাসী সকল পত্র লেখি। নীলাচলে চৈতন্য সভেই মনে দুখি॥ সন্ন্যাসীর যোগ্যস্থল নীলাচল নহে। সে সব সুখদ স্থল সন্ন্যাসীর যোগ্য নহে॥ সম্ভোগ লক্ষণ মাল্যচন্দন যে পরে। পাষাণ শরীর হয় অবশ্য বিগারে॥ এই পত্র শুনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র। তা সভারে বিড়ম্বিব করিয়া প্রবন্ধ॥ আপনি চৈতন্য শ্লোক লিখিলেন পত্রে। সে পত্র পাঠাঞা দিল বারাণসী ক্ষেত্রে॥ সকল সন্ন্যাসী মেলি পত্র পড়িল। শ্লোক পড়ি সভাকার ধিক্কার জন্মিল॥ সিংহের সমান বল নাহি কার গাএ। আরে তাহে শূকর হস্তীর মাংস খাএ॥ তমু সিংহ শরীরেতে না হয় বিগার। বৎসরে শৃঙ্গার করে সবে এক বার। পাথরের কণা ধান্য পারাবত খাএ। তাহে কাম অনুক্ষণ স্ত্রীসঙ্গে যাএ॥ ইহার বিচার লেখি পাঠাবে আমারে। তবে নীলাচল ছাড়ি রহিব অন্তরে। এই পত্র শুনি যত প্রাচীন সন্ন্যাসী। নীলাচল গেলা সভে ছাড়ি বারাণসী॥ চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব। আনন্দে প্রকাশখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥—১৩৫ পৃঃ।" ইহার পরে তীর্থখণ্ডে প্রভুর মথুরাদি তীর্থ-ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পয়ারসমূহের মধ্যে এক পয়ারে বলা হইয়াছে, কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পত্র পাইয়া প্রভু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—"তা সভারে বিড়ম্বির করিয়া প্রবন্ধ।" তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বারাণসীতে যাইয়া তিনি যে বাস্তবিকই বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ডী সন্ন্যাসী॥—জয়ানন্দের গ্রন্থের ১৪৯ পৃঃ হইতে পয়ার উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, মথুরা যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এক সময় নীলাচলে বসিয়া আছেন, এমন সময় কাশীবাসী "বড় বড় সন্ন্যাসী"দিগের লিখিত এক পত্র নীলাচলে পাওয়া গেল। নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদায়, তাঁহার প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিতেন; কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ বোধ হয় ইহাকে বিলাসিতাময় আচরণ মনে করিয়া প্রভুকে পত্র লিখিলেন যে—"তুমি নীলাচলে কেন আছ? নীলাচলত্যাগী সন্ন্যাসীদের বাসের যোগ্যস্থান নহে; সেখানে তুমি যাহা আহার কর, যে সকল মাল্যচন্দন ধারণ কর, তাহাতে মানুষের কথা তো দূরে, পাষাণ-মূর্ত্তিরও বিকার জন্মে।" প্রভু পত্র পড়িয়া হাসিলেন এবং পত্রের উত্তরও দিলেন। উত্তরে জানাইলেন—"সিংহ অনেক উত্তেজক জিনিস আহার করে, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য অত্যন্ত কম। অথচ পারাবত পাথরের কণা খায়, কিন্তু তার ইন্দ্রিচাঞ্চল্য অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ কি জানাইবে। যদি তোমাদের উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে আমি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইব।" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—প্রভুর এই পত্র পড়িয়াই কাশীর প্রাচীন সন্ন্যাসীরা কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে গেলেন। একথা যে ঠিক নহে, তাহা জয়ানন্দের অন্য উক্তি হইতেই বুঝা যায়, পরে উত্তর-খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন, উক্তরূপে চিঠিতে কথা-কাটাকাটির পরে বারাণসীতে যাইয়া প্রভু "বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ডী সন্ন্যাসী।" সন্ন্যাসীরা সকলে নীলাচলে আসিয়া থাকিলে তাহার আর কাশী যাওয়ার প্রয়োজনই থাকে না এবং গিয়া থাকিলে তিনি সেখানে "বিড়ম্বিলেন" কাহাকে?

জয়ানন্দ হইতে আরও বুঝা যায়—সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য যে নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, কাশীবাসী শাঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ তাহা জানিতেন এবং সম্ভবতঃ ইহাও তাহারা জানিয়াছিলেন যে, শাঙ্কর-বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও শ্রীচৈতন্যের পদানত হইয়াছেন। এই সার্ব্বভৌম ছিলেন পূর্ব্বভারতে

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এক মহাস্তম্ভ, তাঁহার ভক্তিমার্গ অবলম্বনে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইল মনে করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যদেবই এই ক্ষতির কারণ মনে করিয়া কাশীবাসী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ যে শ্রীচৈতন্যের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। তাঁহারা পত্রযোগে তাহাদের এই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর গ্লানিও প্রচার করিতে লাগিলেন। পত্রে তাহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহরে সার মর্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়া থাকিলেও তাহার আচরণ সন্ন্যাসীর উপযুক্ত নহে। কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পত্রে প্রভু সম্বন্ধে এ সকল গ্লানিজনক উক্তি দেখিয়াই গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন—এসকল সন্ন্যাসী প্রভুর মহিমা জানেন না, তাহার মতের যুক্তিযুক্ততাও জানেন না, জানিলে তাহারাও প্রভুর পদানত হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি মনে করিলেন—তিনি নিজে যদি তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া বলেন, তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করেন, তাহা হইলে প্রভুর কৃপায় নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিতে পারিবেন। বারাণসী যাওয়ার জন্য তিনি প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না, প্রভু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলেন এ কঠিন কাজ সার্ব্বভৌমের দ্বারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু প্রভুর কৃপাশক্তির উপর সার্বভৌমের নির্ভরতা এত বেশী ছিল যে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন প্রভুর অনুমতি না পাইলেও তিনি বারাণসী যাইবেন এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, প্রভুর কৃপাতেই তিনি সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর মতে আনয়ন করিতে পারিবেন। তাই তিনি বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন এবং বারাণসীতে গিয়া যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, সার্ব্বভৌমের অভীষ্ট-কার্য্য পরে প্রভু নিজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং পণ্ডিত-মহাশয় যে বলিয়াছেন মহাপ্রভুর অসমাপ্তকার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য সার্বভৌম কাশীতে গিয়াছিলেন, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই। তিনি মনে করিয়াছেন মহাপ্রভুই সার্বভৌমের আগে কাশীতে গিয়াছিলেন, তাহার এই অনুমানও ভিত্তিহীন।

পণ্ডিত-মহশেয় লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপুর তাহার মহাকাব্যেও কোন স্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মহাকাব্যে কর্ণপুর তো প্রভুর কাশী-গমনের উল্লেখও করেন নাই, তাহাতেই কি মনে করিতে হইবে –প্রভু কাশীতে যায়েন নাই? প্রভুর পশ্চিমগমন সম্বন্ধে তিনি মাত্র দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন তাহার একটীতে লিখিয়াছেন, প্রভু নীলাচলে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন এবং অপর শ্লোকটিতে লিখিয়াছেন, সেই স্থানে (কালিন্দীতীরে) কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় নীলাচলে আসিলেন (২০।৩৫।৩৭)। প্রভুর পশ্চিমগমনই যিনি বর্ণনা করিলেন না, তিনি প্রকাশানন্দের নাম কিরূপে উল্লেখ করিবেন?

(গ) বৃন্দাবনদাসসম্বন্ধে পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত পড়িয়াও মনে হয় না যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

নিবেদন। বৃন্দাবনদাসঠাকুরও মহাপ্রভুর পশ্চিমভ্রমণ বর্ণন করেন নাই, সেজন্য যেমন প্রভু কখনও পশ্চিমে যান নাই বলা সঙ্গত হইবে না, তিনি প্রকাশানন্দ-উদ্ধার বর্ণনা করেন নাই বলিয়াও তেমনি প্রকাশানন্দকে প্রভু উদ্ধার করেন নাই বলাও অসমীচীন হইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, তাহা সকলেই জানেন।

কাহারও গ্রন্থে কোনও একটি ঘটনার অনুল্লেখই সেই ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।

(ঘ) লোচনদাসসম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন: লোচনদাস প্রকাশানন্দের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের কাশীগমন সম্বন্ধে মাত্র লিখিয়াছেন ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী। অনেক বৈসয়ে তথা পরমসন্ন্যাসী॥ পৃ. ৯৫, শেষ খণ্ড।

নিবেদন পূর্ববৎই। অনুল্লেখদ্বারাই কোনও ঘটনা অপ্রমাণ হয় না। শ্রীচৈতন্য কাশীতে গিয়াও প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই, এমন কথা মুরারিগুপ্ত, কর্ণপুর বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাস কেহই বলেন নাই অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়া কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন প্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছেন।

(ঙ) পণ্ডিত-মহাশয় লিখিয়াছেন :—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার) "সপ্তম পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চতত্ত্বনিরূপণ করিয়া মহাপ্রভু কর্তৃক প্রেমদান বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি সহসা তত্ত্ব হইতে লীলায় আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য না রাখিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন। আবার অষ্টমপরিচ্ছেদে তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।"

"আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্রমভঙ্গ করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী কেন প্রকাশানন্দের কাহিনী লিখিলেন বুঝা কঠিন! যদি এরূপ ব্যাপার না-ই ঘটিয়া থাকে, অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্য এরূপ ঘটনার সংযোজনা করা প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামী যিনি লিখিতে লিখিতে পরলোকগমণের আশঙ্কা করিতেছিলেন—আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া এরূপ লীলা লিখিয়াছেন অনুমান করিতে হয়।"

নিবেদন। প্রথমতঃ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা যে খুব খারাপ হইয়াছিল—এত খারাপ হইয়াছিল যে, অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টায় "শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্য" মিথ্যাকাহিনীর সৃষ্টিও—কেবল কবিরাজ-গোস্বামীকর্তৃক নয়, পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ কর্তৃকই—আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই; আমরাও জানি না। বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা যে তখন এরূপই শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পণ্ডিত-মহাশয়ও বিশ্বাস করেন নাই; করিলে "যদি" শব্দের আশ্রয় নিতেন না। অথচ এই "যদির" উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বৃদ্ধ-কবিরাজ-গোস্বামীর নামে এবং সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নামেও প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায় একজন সম্মানিত ব্যক্তির গ্লানিজনক একটি মিথ্যা উপাখ্যান সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, মিথ্যার উপর কোনও সম্প্রদায়ের গৌরব যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এই বিবেচনাটুকু বৃদ্ধ-কবিরাজ-গোস্বামীর এবং রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রমুখ তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-গণের ছিল। ইঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য অভিযোগ যিনি আনিতে পারেন, তিনি বাস্তবিকই কৃপার্হ!

দ্বিতীয়তঃ—"শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বনির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া" কবিরাজগোস্বামী "এরূপ (প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী) লীলা" লিখেন নাই। তিনি ক্রমভঙ্গ করেন নাই। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণন করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ষষ্ঠপরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস (বস্তুতঃ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ)—এই পাঁচজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাঁহাদের মুখ্য কার্য্যের কথাই তিনি বলিয়াছেন। নির্ব্বিচারে প্রেমদানই শ্রীচৈতন্যের মুখ্য কার্য্য; নিজে তিনি তাহা করিয়াছেন এবং অপর চারি তত্ত্বদ্বারাও করাইয়াছেন। ইহা দেখাইতে যাইয়া কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ—সকলকে, এমন কি ম্লেচ্ছকে পর্য্যন্ত, তাঁহারা প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছেন। মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী ও পড়ুয়াগণ প্রথমে সহজে ধরা দেন নাই। ইঁহাদের উদ্ধারের জন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন; নিন্দুক-পড়ুয়া-আদি তখন প্রভুর পদানত হইলেন; তখন কেবল বাকী রহিলেন কাশীর মায়াবাদীগণ—"সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ।১।৭।১৩৭।" ইঁহাদের জন্যই প্রভুর মুখ্যতঃ কাশীতে গমন। এই কাশীগমন-প্রসঙ্গেই কাশীতে প্রভু যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চতত্ত্বাখ্যানের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়—প্রেমবিতরণেরই অঙ্গীভূত: এই বর্ণনা না দিলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; সুতরাং এই বর্ণনার অবতারণায় ক্রমভঙ্গদোষও নাই, অপ্রাসঙ্গিকতাও নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সমস্ত বিবরণও এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হয় নাই; মধ্যলীলার যথাস্থানে (১৭শ ও ২৫শ পরিচ্ছেদে) ক্রমপূর্বক ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সুতরাং "শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য না রাখিয়াই" যে কবিরাজগোস্বামী আগ্রহাতিশয্য-বশতঃ, যেস্থানে লেখা উচিত নয়, সেস্থানেই "কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার কাহিনী লিখিয়াছেন," তাহা নয়। আর

"শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই" যে তিনি "এরূপ লীলা লিখিয়াছেন", তাহাও নয়। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বনিরূপণ করা হইয়াছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে; আর সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রেমবিতরণ-প্রসঙ্গে কাশীবাসী-সন্ন্যাসীদিগকে প্রেমবিতরণের কথা লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—পণ্ডিত-মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন—আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান লিখিবার সময় বৃদ্ধ-কবিরাজগোস্বামী "পরলোকগমনের" আশঙ্কা করিতেছিলেন; তাই প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের মিথ্যা কাহিনীটী যথাস্থানে বর্ণন করার অবসর পাছে না পান, তাহার পূর্ব্বেই পাছে তাহাকে "পরলোকগমন" করিতে হয়, সেজন্যই ক্রমভঙ্গ করিয়াও, অপ্রাসঙ্গিকভাবেও, এইস্থানে এই কল্পিত উপাখ্যানটি লিখিয়া গিয়াছেন। যাহারা সারাজীবন দুষ্কর্ম্ম করে, মৃত্যুসময়ে তাহাদেরও কাহারও কাহারও তজ্জন্য অনুতাপ জন্মে। আর যাহারা সারাজীবন সদ্ভাবে অতিবাহিত করিয়া যায়, মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তাহাদের মনে দুষ্কর্ম্মের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক নয়। কবিরাজগোস্বামী যৌবনে সংসারত্যাগ করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যদের সঙ্গে ও আনুগত্যে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করিয়া অকপট ও ঐকান্তিকভাবে ভজন-সাধন করিয়াছেন। "পরলোকগমনের" অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে একজন ভারতবিখ্যাত সন্ন্যাসীর পরাজয়-সূচক একটা জঘন্য মিথ্যা কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবাদেশে ও শ্রীমদন গোপালের কৃপায় লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে কলঙ্কিত করিবার আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুমানের ও উক্তির কোনও ভিত্তিই নাই। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী একটা ঐতিহাসিক সত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(চরিতাংশ)

জন্মলীলা। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যাসময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্মলীলা প্রকটিত করেন। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল; গ্রহণোপলক্ষে নবদ্বীপ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে মুখরিত হইতেছিল; গঙ্গার ঘাটে শত শত লোক হরিনাম করিতে করিতে গ্রহণ-স্নান করিতেছিলেন। ঠিক এমন সময়ে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপের মায়াপুরে সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শ্রীশচীদেবী?

জগন্নাথ-মিশ্রের জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট-জেলার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণে। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং পরে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে শচীদেবীর আট কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, আট কন্যাই দেহত্যাগ করেন। পরে বিশ্বরূপের এবং তাঁহার পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু একটী নিম্ববৃক্ষ তলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিশুকালে তাঁহাকে নিমাই বলা হইত; কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলেন—"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই॥ ১।১৩।১১৬॥"

অতি অল্প বয়সেই বিশ্বরূপ পরম বিদ্বান্ এবং ধর্মপ্রবণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় ষোল বৎসর, তখন জগন্নাথমিশ্র তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এমন সময় বিশ্বরূপ হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শোকে দুঃখে পিতামাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; প্রাণের নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহারা কোনও রূপে জীবন রক্ষা করিলেন।

বিদ্যারম্ভ ও অধ্যয়ন-ত্যাগ। যথাসময়ে নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ হইল; গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। লেখা-পড়ায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ উন্নতি ও প্রতিভা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। কিছুদিন পরেই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন, তখন নিমাইয়ের জন্য মিশ্রবরের উৎকণ্ঠা হইল। লোকে যতই নিমাইয়ের অসাধারণ প্রতিভা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং অধ্যয়ন-পটুতাদির প্রশংসা করিত, মিশ্রবরের উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একদিন তিনি শচীদেবীকে বলিলেন—

"এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর॥ এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র। জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র॥ সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর। অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥ এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান্ ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়াণ॥ * * * * পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিল তোমারে। মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।" নিমাইয়ের পড়া বন্ধ হইল। নিমাই মনে বড় দুঃখিত হইলেন; তথাপি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

ঔদ্ধত্য। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত উদ্ধত ছিলেন, সর্ব্বদাই দুরন্তপনা করিতেন; বিদ্যারসে মগ্ন হইয়া মধ্যে একটু শান্ত হইয়াছিলেন; এখন আবার পূর্ব্ব স্বভাব জাগিয়া উঠিল। অল্প বয়স, লেখা পড়ার কাজ নাই; দুরন্তপনা না করিয়া করিবেন বা কি? রাত্রিতে সমবয়স্কদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কখনও প্রতিবেশীদের কলাগাছ ভাঙ্গিতেন কখনও বা বাহির হইতে তাঁহাদের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন; কোনও সময়ে বা আস্তাকুড়ে যাইয়া বর্জ্য হাড়ির উপরে বসিয়া থাকিতেন এবং সমস্ত গায়ে হাড়ির কালি মাখিতেন। মাতা শাসন করিলে বলিতেন—"...তোরা মোরে না দিস পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥"

উপনয়ন ও পুনঃ অধ্যয়নারম্ভ। নিমাইকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিমিত্ত সকলেই মিশ্রকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরে তিনি নিমাইকে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে আবার ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। নিমাই আবার খুব উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগ। কিছুকাল পরে জগন্নাথমিশ্র দেহত্যাগ করিলেন। মাতা-পুত্র দুইজনেই শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। মাতা প্রাণ দিয়া পিতৃহীন নিমাইয়ের লালন পালন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দুরন্তপনা দেখিলে জগন্নাথ মিশ্র শাসন করিতেন ; এখন শাসন করিবার আর কেহ নাই ; তাই মায়ের অত্যধিক আদরে নিমাই আবার বিষম উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। চাহিবামাত্রই কোনও জিনিস না পাইলে আর রক্ষা ছিল না; ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ড ভণ্ড করিতেন। যাহা হউক, অধ্যয়নে তাঁহার শৈথিল্য ছিল না ; অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।

প্রথম বিবাহ। অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাই-পণ্ডিতের বিবাহ হইল।

অধ্যাপন। অধ্যয়ন শেষ করিয়াই নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপন আরম্ভ করিলেন ; নানাদিগ্ দেশ হইতে শত শত ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে ভর্ত্তি হইতে লাগিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের গৌরবে নবদ্বীপ ধন্য হইয়া গেল। নবদ্বীপ তখন বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল; সেস্থানে খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাস ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে বিদ্যাযুদ্ধে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে অন্য স্থান হইতেও অনেক খ্যাতনামা দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিতেন। নিমাই- পণ্ডিতের নিকটে তাঁহাদের সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত।

পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ ও তপনমিশ্র। তৎকালের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা-বিতরণের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণও করিতেন। আমাদের নিমাই-পণ্ডিতও একবার পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। তখন অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। অনেককে অনেক স্থানে পড়াইয়াছিলেন। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচারও তিনি পূর্ব্ববঙ্গেই আরম্ভ করেন। "এই মত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১।১৬।১৭ ॥" পদ্মাতীরে তপন মিশ্র নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। স্বপ্নযোগে এক ব্রাহ্মণের আদেশ পাইয়া তিনি নিমাই-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। নিমাই-পণ্ডিত তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন এবং বারাণসীতে যাইয়া তারক-ব্রহ্ম হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিলেন।

নাম-বিতরণের আরম্ভ। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই প্রভুর জন্ম। সকল শিশুই শিশুকালে কান্নাকাটি করে, প্রভুও করিতেন ; কিন্তু অন্য শিশুর কান্নাকাটি যে ভাবে থামিত, তাঁহার কান্না সেভাবে থামিত না। তাঁহার নিকটে "হরি হরি" বলিলেই তাঁহার কান্না থামিত, অন্য কিছুতেই না। তাই রমণীগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—গৌরহরি। নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাব। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আগমনের পূর্ব্বে নবদ্বীপে তিনি কেবল বিদ্যারসেই মত্ত ছিলেন, নাম-প্রচারমূলক কোনও কথাই কোনও দিন বলেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে "যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১।১৬।৬ ॥" তাঁহার প্রকটলীলার প্রধান-কার্য্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গেই আরব্ধ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ। যাহা হউক, যখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে, তখন সর্পদংশনের ব্যপদেশে তাঁহার সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবী অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরিয়া গিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কিছুকাল পরে রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

বৈষ্ণবদের উপদেশ। নবদ্বীপে তখনও কয়েকজন ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা এবং অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য সকলের চিত্তকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীবাস-পণ্ডিত ও মুরারিগুপ্ত প্রমুখ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন ; কিন্তু তিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন না—ইহাই তাঁহাদের বিশেষ দুঃখের হেতু ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত পণ্ডিতকে উপদেশও দিতেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন না।

গয়াযাত্রা ও দীক্ষা। পিতৃ-শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে নিমাই-পণ্ডিত গয়ায় গেলেন। সেই স্থানেই তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্যভাব প্রকটিত হইল ; কৃষ্ণপ্রেমে

তিনি যেন উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন ; বৃন্দাবনে গেলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন মিলিবে মনে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করিলেন—দেশে আর ফিরিবেন না। শ্রীবৃন্দাবনের দিকে রওয়ানাও হইয়াছিলেন, এক দৈববাণী শুনিয়া নিরস্ত হইলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যে নিমাই-পণ্ডিত গয়ায় গিয়াছিলেন, সেই নিমাই পণ্ডিত যেন আর আসিলেন না ; যিনি আসিলেন, তিনি যেন অন্য একজন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল—পাণ্ডিত্য-গৌরবে উদ্ধত সেই নিমাই-পণ্ডিত আর নাই ; তৎস্থলে কৃষ্ণবিরহ-কাতর, কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, দৈন্যের প্রকট-বিগ্রহ-সদৃশ এক পরম ভাগবত যেন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

পরিবর্ত্তন। প্রভু এখন আর বিদ্যারসাস্বাদনের নিমিত্ত পণ্ডিতের সভায় যান না, অধ্যাপনের নিমিত্ত চতুষ্পাঠীতে যান না—গেলেও পুঁথি খুলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"ই বলেন, আর ব্যাকরণের সূত্র-পাঁজি ব্যাখ্যার ছলেও কৃষ্ণ-কথাই বলেন। তাঁহার ইষ্ট-গোষ্ঠি এখন কেবল বৈষ্ণবদের সঙ্গে—তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা, তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণগুণ-স্মরণে ক্রন্দন, কখনও বা কৃষ্ণ-বিরহে ভূলুণ্ঠন।

অধ্যাপনা শেষ ও কীর্ত্তনারম্ভ। অধ্যাপনা শেষ হইল। ছাত্রগণ পুঁথিতে ডোর দিলেন। তাঁহারাও তাঁহাদের অধ্যাপকের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। সর্ব্বত্র কীর্ত্তন হইতে লাগিল—বিশেষরূপে শ্রীবাসের অঙ্গনে।

কীর্ত্তনে বিঘ্ন। কীর্ত্তনাদি ভালবাসেন না, এমন লোকই তখন নবদ্বীপে বেশী ছিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গগুণে এবং কীর্ত্তন-প্রভাবে অনেকেরই মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তথাপি অনেকে তখনও বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি যেন তাঁহাদের কর্ণপটহে উত্তপ্ত লৌহশলাকাবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা গিয়া মুসলমান-কাজির নিকটে নালিশ করিলেন। কাজি আদেশ দিলেন—কেহ কীর্ত্তন করিতে পারিবে না ; কোনও কোনও স্থলে খোল-করতালাদিও কাজি নষ্ট করিয়া দিলেন। সঙ্কীর্ত্তনরস-লোলুপ বৈষ্ণবগণ প্রমাদ গণিলেন ; ভীত হইয়া সকলে নিমাই-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন।

মহাসঙ্কীর্ত্তন ও কাজি-দমন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর আদি আসিয়া পূর্ব্বেই মিলিত হইয়াছিলেন। সকলকে লইয়া পণ্ডিত এক মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে সমস্ত নগর দীপাবলী, পুষ্পমালা ও আম্রপল্লবে সুসজ্জিত হইল ; প্রতি গৃহদ্বারে রম্ভাতরু ও পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইল। সন্ধ্যাসময়ে মশাল-হস্তে সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত হইল, শতশত খোল, সহস্র সহস্র করতাল, সহস্র সহস্র শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদে, আর সহস্র কণ্ঠের সমুচ্চ হরি হরি ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি ভুবন-মোহন-বেশে সজ্জিত হইলেন ; সে সজ্জার বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমাদের নাই ; শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা॥ জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার। চন্দন-ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥ চাঁচর চিকুর শোভে মালতির মালা। মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥ ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে। বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥ আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥ দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ। পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব॥ সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন। শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥ গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন। তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র অতিক্ষীণ। চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান। পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥" প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। তিনি সম্প্রদায় গঠন করিলেন :—"আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস॥ পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥" কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত নগর

ভ্রমণ করিলেন; শেষে কাজির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের মহা রোল শুনিয়া কাজি পূর্ব্ব হইতেই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের আহ্বানে সন্ত্রস্ত-হৃদয়ে তিনি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তা হইল; যবন-কাজি প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিলেন, আর যাহাতে কীর্ত্তনে বিঘ্ন না জন্মে, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

এখন হইতে নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল; বৈষ্ণব-বৃন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

জগাই-মাধাই উদ্ধার। নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ বংশে জগাই-মাধাইর জন্ম; কিন্তু তাঁহারা মদ্যপ, দুর্দ্দান্ত এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন; এমন গর্হিত কর্ম্ম বোধ হয় কিছু ছিল না, যাহা তাঁহাদের অসাধ্য ছিল। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে পথে সাধুসজ্জনের যাতায়াত বিপদসঙ্কুল ছিল। প্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীহরিদাস যখন নগরে নাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন জগাই-মাধাই তাঁহদিগের পশ্চাতেও ধাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন মদ্যপ মাধাই একটা মুটুকী তুলিয়া নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করিলেন; মাথা কাটিয়া দর দর রক্ত পড়িতে লাগিল; মাধাই আবার মারিতে উদ্যত হইলে জগাই বাধা দিলেন এবং মাধাইকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু অক্রোধ-পরমানন্দ পরমদয়াল নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যায় প্রভুর ক্রোধ ভাসিয়া গেল; দুই ভাইকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তদবধি জগাই-মাধাই পরম-ভাগবত হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ। চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃদ্ধা জননী, কিশোরী ভার্য্যা এবং তদ্‌গত-প্রাণ ভক্ত-বৃন্দকে কাঁদাইয়া কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে লইয়া আসিলেন। সেস্থানে নদীয়াবাসী সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বলা শচীমাতাও আসিলেন। কিন্তু পরম-দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যাওয়া হইল না। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীদর্শন নিষিদ্ধ। সহধর্ম্মিনী হইয়া তিনি কিরূপে প্রভুর দর্শনে যাইবেন? তিনি গেলেন না; প্রভুর সন্ন্যাসের কথা ভাবিয়া কেহ তাঁহাকে যাওয়ার জন্য বলেনও নাই। বস্তুতঃ প্রভুর সন্ন্যাসের পরে প্রভুর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাক্ষাতের কথা কোনও চরিতকারই বলেন নাই। হা প্রিয়াজি! হা করুণাময়ি! জগদ্বাসীর উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি কত দুঃখ, কত কষ্ট না সহ্য করিয়াছ—তোমার হৃদয়ের ধন কোটিমন্মথ-মদন—শ্রীশ্রীগৌর—সুন্দরকে মায়াহত দীনদুঃখীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত—আপনি কাঁদিয়া জগতের জীবকে কাঁদাইবার নিমিত্ত—ত্রিতাপদগ্ধ আচণ্ডাল সাধারণকে স্বীয় কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত—তুমি জগতের দ্বারে ছাড়িয়া দিয়াছ; ভক্তি স্বরূপিণি জগত্তারিণি! জগৎকে ভক্তি সম্পত্তি বিলাইবার নিমিত্ত তুমি নিজে চিরদুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছ! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কৃপা।

শান্তিপুরে। শচীমাতা শান্তিপুরে গেলেন। মুণ্ডিত-মস্তক প্রাণের নিমাইকে কোলে বসাইয়া তাঁহার চাঁদবদন নিরীক্ষণ করিলেন, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দুঃখিনী জননী; একে একে আটটী কন্যা হারাইয়াছেন; সুপণ্ডিত, সুন্দর-দর্শন কিশোর পুত্র বিশ্বরূপও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিরকালের তরে চলিয়া গেলেন; তার পরে স্বামিহারা হইলেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল, অন্ধের নয়নসদৃশ নিমাই তাঁহার একমাত্র ভরসার স্থল ছিল। সেই নিমাইও আজ বিশ্বরূপের ন্যায়ই চলিয়া যাইতেছেন। ঘরে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া; কি বলিয়া তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিবেন? অভাগিনী জন্মের মত একবার দর্শন করিতেও পারিল না। নিমাইর বদন পানে চাহিয়া চাহিয়া মা এসব ভাবিতেছেন; আর অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন।

নীলাচল যাত্রা। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি কয়েক দিন শান্তিপুরে থাকিয়া মাতার আদেশ গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নীলাচলে তিনি চব্বিশ বৎসর ছিলেন।

ইতস্ততঃ গমনাগমন। এই চব্বিশ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নাম প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে যাওয়ার উপলক্ষে আর একবার বাঙ্গালায়

আসিয়াছিলেন ; সেবারও শান্তিপুরে শচীমাতাকে দর্শন দিয়াছিলেন ; রামকেলিতে শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নাই। সঙ্গে লোক সঙ্ঘট্ট দেখিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

পরে ঝারিখণ্ডের বনপথে কাশী ও প্রয়াগ হইয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-যাত্রায় প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস-নামক এক ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, কবি কর্ণপুর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্" নামক সংস্কৃত-গ্রন্থেও একথা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রায় বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহে প্রভু ভিক্ষা করিতেন।

শ্রীরূপের শিক্ষা। প্রভু মথুরায় গেলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ সঙ্গে থাকিয়া প্রভুকে সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইলেন। আরিট-গ্রামে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন প্রয়াগে আসিলেন, তখন শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী সে স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু দশ দিন সে স্থানে থাকিয়া শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার। পুনরায় কাশীতে আসিলেন। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী নামক এক অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসী তখন কাশীতে ছিলেন ; তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ভারত-বিখ্যাত ছিল। প্রভু হরিনাম করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিন্দা করিতেন। প্রভু এবার কৃপা করিয়া প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিলেন ; সশিষ্য প্রকাশানন্দ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ; কাশীনগরী সঙ্কীর্ত্তন-রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সনাতন-শিক্ষা। কাশীতে শ্রীপাদ সনাতন আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। দুই মাস থাকিয়া প্রভু তাঁহাকে সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন।

কাশী হইতে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুকে পাইয়া নীলাচলবাসী ভক্তগণের প্রাণহীন দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে নানা স্থানে যাতায়াতে প্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার পরে প্রভু আর দূর দেশে কোথাও যায়েন নাই, মাঝে মাঝে কেবল অল্প সময়ের জন্য আলালনাথ যাইতেন।

নীলাচলে বিরহ-লীলা। শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচলেই স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলতা থাকিত—প্রভুর দেহের উপর দিয়া নানাবিধ ভাবের প্রবল বন্যা যেন বহিয়া যাইত ; তাহার ফলে কখনও বা তাঁহার হস্ত-পদাদি দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহার দেহ তখন কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিত ; আবার কখনও বা হস্তপদের অস্থি-গ্রন্থি-আদির প্রত্যেকটী প্রায় বিতস্তি-পরিমাণ শিথিল হইয়া যাইত, দেহ অতি দীর্ঘাকার হইয়া যাইত। কখনও তিনি শ্রীরাধার ভাবে বিরহিণী রমণীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্য রোদন করিতেন, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কখনও বিরহ-আর্ত্তিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ-সঙ্ঘর্ষণ করিতেন, আবার কখনও বা যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন ; কোনও কোনও বার ভক্ত-গৃহিণীরাও যাইতেন ; তাঁহারা দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন—নিকটে যাইতেন না, কারণ, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ-অবধি স্ত্রীলোক দর্শন করিতেন না। গৌড়ের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস নীলাচলে থাকিতেন ; কেহ ঘরে রান্না করিয়া, কেহবা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তাঁহাদের সঙ্গেই প্রভু একটু আন্মনা থাকিতেন ; চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে তাঁহারা চলিয়া গেলে প্রভু আবার কৃষ্ণ-বিরহ সমুদ্রে নিপতিত হইতেন।

প্রতাপরুদ্র ও রায়-রামানন্দ। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রায়-রামানন্দ ছিলেন বিদ্যানগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ-প্রতিনিধি। তিনি পরম-পণ্ডিত এবং পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে প্রভু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার মুখে

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রস-তত্ত্বাদি প্রকাশিত করেন। প্রভুর গুণ-মুগ্ধ হইয়া রায়-রামানন্দ রাজা প্রতাপ-রুদ্রের অনুমতি লইয়া প্রভুর চরণ-সন্নিধানে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরও চারি ভাই এবং তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়ও প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন।

সার্ব্বভৌম। কাশীতে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর ন্যায় বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ছিলেন নীলাচলে খুব খ্যাতনামা বৈদান্তিক পণ্ডিত; অনেক সন্ন্যাসীকেও তিনি বেদান্ত পড়াইতেন। প্রভু যখন প্রথমে নীলাচলে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাঁহাকেও সাতদিন বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন; পরে প্রভুর মুখে বেদান্তের ব্যাখা এবং শঙ্কর-ভাষ্যের ত্রুটী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন; সার্ব্বভৌম প্রভুর অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

নীলাচলে প্রভুর আরও অনেক পার্ষদ ছিলেন। প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন।

লীলাবসান। ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার লীলা-সম্বরণ এক রহস্যময় ব্যাপার। কেহ বলেন—তিনি শ্রীগোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন; আবার কেহ বলেন, তিনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাসঠাকুরই প্রভুর অন্তর্ধানলীলার বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রভু শ্রীজগন্নাথের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। যে ভাবেই হউক, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। বহু দিন পরে দুঃস্থ ভারতের বুকে প্রেমভক্তির যে একটা স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃপুঞ্জ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভক্তবৃন্দ নয়নের মণি হারা হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় নিরানন্দ পৃথিবীর বুকে অতি কষ্টে কিছুকাল নিজেদের গুরু-দেহভার বহন করিয়া অবশেষে তাঁহাদের প্রাণার্ব্বুদ-প্রিয়তমের সান্নিধ্যে চলিয়া গেলেন।

প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন বাঙ্গালায় ধর্ম্মভাবের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। পণ্ডিতেরা কেবল বিদ্যাচর্চ্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভগবদ্-ভজন, তাহা যেন তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা অষ্টপ্রহর বিষয়-কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিতেন—বিষয়ের উন্নতি-সাধনকেই তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। "কেহো পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥"

অদ্বৈতের সঙ্কল্প। যাঁহারা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেন, মঙ্গলচণ্ডীর গীত এবং বিষহরির পূজাই ছিল তাঁহাদের প্রধান অনুষ্ঠেয়। এইরূপই ছিল দেশের সাধারণ অবস্থা। যাঁহারা ঐকান্তিক-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। সাধারণ লোক তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ তো করিতই না, বরং তাঁহাদিগকে উপহাস করিত। দেশের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মনে করিলেন—জগতের যেরূপ-অবস্থা, তাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই কিছু করিতে পারিবে না। "আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥"—তাহা হইলেই জীবের উদ্ধার হইতে পারে। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন:—"শুদ্ধ ভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥"

তিনি তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর-হরিদাসও নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন; কয়েক বৎসর পরে মহাপ্রভুর প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের আরাধনা ফলবতী হইয়াছে, মরুভূমিতে সুর-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; আর জীবের ভয় নাই।

আবির্ভাবের ফল। বাস্তবিকই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। অপ্রাকৃত গোলোকধাম হইতে যেন একটা স্নিগ্ধ মধুর ভাবধারা বাঙ্গালার মরুতুল্য শুষ্ক প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইল, শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইল, মৃণ্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী আনন্দঘন-মূর্ত্তিতে—স্নিগ্ধহাস্যবিমণ্ডিত-মৃদুমধুর-কলভাষণে—চতুর্দ্দিকে যেন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করিল।

উপাস্যের আকর্ষকত্ব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বাঙ্গালার ধর্ম্মরাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। ভগবানের যে রূপটী তিনি জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্যই তাহার সংবাদ বিশেষভাবে দেন নাই। এই রূপে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্য্যের প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ; তাঁহার হাতে পাপীর হৃৎকম্পোৎপাদনকারী তীক্ষ্ণকণ্টকময় জলন্ত লৌহদণ্ড নাই—আছে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মোহনবংশী; শতযোজন দূর হইতে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রকম্পিত করযুগলকে বক্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয়, দৌড়াইয়া গিয়া কোটি-মন্মথ-মনোমথন-স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল সেই সর্ব্বাত্মবিস্মাপন অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় রূপটিকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতে। এই রূপটী যে মহাপ্রভুর একটী নূতন পরিকল্পনা, তাহা নয়। শ্রুতি পরতত্ত্ববস্তুর যে পরিচয় দিয়াছেন, প্রভু তাহারই সমুজ্জ্বল চিত্রটী জগতের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—পরতত্ত্ববস্তু আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার এই আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, তাহা এমন জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ইতঃপূর্ব্বে কেহ জানান নাই। ভগবত্তার সার কি, তাহাও এমন সুন্দরভাবে কেহ জানান নাই। বরং সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, ঐশ্বর্য্যই বুঝি ভগবত্তার সার; তাই লোক ভগবানের নামেই যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রভুই সর্ব্বপ্রথমে জলদ-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন— মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার।" ইহাই শ্রুতির আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস স্বরূপত্বের চরম তাৎপর্য্য। তিনি আরও জানাইলেন—পরতত্ত্বে এই মাধুর্য্যের বিকাশ এতই সর্ব্বাতিশায়ী যে, তাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন! পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" এই আনন্দঘনবিগ্রহ, রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ, অখিল-রসামৃতবারিধি পরতত্ত্ববস্তু হইতেছেন— "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ ২।৮।১১০।", তিনি আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।"

সাধনের আনন্দ-দায়কত্ব। আর তিনি যে সাধন-পন্থা দেখাইয়া গেলেন, তাহাও অপূর্ব্ব। তাহাতে জাতি-কুলের বিচার নাই, ধনি-দরিদ্রের বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খের বিচার নাই, দেশ কালের বিচার নাই—যে কেহ যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে যে কোন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কার্য্যেও দেখাইয়া গিয়াছেন—কত কোল, ভীল, সাঁওতাল—কত অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, কত কুক্কুর-ভোজী হীনাচার, এমন কি কত যবনকেও যে কৃপা করিয়া তিনি বৈষ্ণব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রদর্শিত সাধন-পন্থায় কোনওরূপ দুঃখ নাই, কষ্ট নাই—আছে এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সাধনেই আনন্দ—সিদ্ধাবস্থার কথা তো দূরে। তিনি দেশের মধ্যে এক প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন—তাহার প্রবল প্রবাহে সাধনবিষয়ে সমস্ত সামাজিক বা লৌকিক বাধাবিঘ্ন—অনধিকারাদি দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্যের উপর প্রভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যেও এক নূতন যুগের উদ্ভব হইল। তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সাহিত্যভাণ্ডার গড়িয়া উঠিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। এই সাহিত্য দুই শ্রেণীর—বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত। বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের লালিত্য এবং নিত্য নূতন রসধারা বোধ হয় চিরকালই রসজ্ঞ-ভাবুকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রথম চরিত-কথাই বোধ হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। তারপরেই শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল চরিতকথা নহে; ইহা একখানা দার্শনিক গ্রন্থও—তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামীগণ সংস্কৃত-ভাষাতেও বহু তত্ত্বগ্রন্থ এবং লীলাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এজাতীয় গ্রন্থ বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। কিরূপ সাধনপন্থা অবলম্বন করিলে কি ভাবে সেই রসস্বরূপকে পাওয়া যাইতে পারে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে রসস্বরূপের অনন্ত-রসবৈচিত্রী কিভাবে সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি হইতেছে ভগবৎ-প্রেমসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রেমের

বিভিন্ন স্তর, তাহাদের বিকাশের ধারা, তাহাদের প্রভাব-আদি এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের সমন্বয় এবং পরস্পর সম্বন্ধের কথা এক অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর বৃহদ্‌ভাগবতামৃত একটী অতি সুন্দর সিদ্ধান্তগ্রন্থ। শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ; তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ—এই ছয়টী সন্দর্ভই ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার গোপালচম্পূ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধীয় বহু তত্ত্বপূর্ণ একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—শ্রীজীব গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।" এই তিন গোস্বামী আরও বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নাটক—কোনও বিষয়ের গ্রন্থের অভাবই তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। জীবনের একটী মূহুর্ত্তও যেন ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত ব্যয়িত না হয়, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগকে এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যাপন করাইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যালঙ্কারাদিতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত তাঁহারা ব্যাকরণের মধ্যেও তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামীর হরিনামামৃত-ব্যাকরণের সূত্রসমূহও হরিনামাত্মক, উদাহরণগুলিও হরিলীলা-বিষয়ক। কবিরাজ-গোস্বামীর গোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত এবং কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—ভক্তিমার্গের সাধকের ভজন-পুষ্টির অনুকূল অতি চমৎকার লীলাগ্রন্থ। এই তিনজনও আরও বহুগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বলদেব-বিদ্যাভূষণের ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়রত্নাবলী এবং গোবিন্দ ভাষ্য—তিনটী দার্শনিক গ্রন্থ। গোবিন্দ-ভাষ্য হইতেছে বেদান্তসূত্রের শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রায়শঃ মতানুকূল- ভাষ্য। ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালীর কৃত কোনও বেদান্ত-ভাষ্য ছিল না। বলদেববিদ্যাভূষণ এই অভাব দূর করিয়া বাঙ্গালাকে গৌরবের এক অতি উচ্চ আসনে সমাসীন করাইয়াছেন।

ভাবের গাম্ভীর্য্য, রসের পরিপাট্য, আস্বাদনের চমৎকারিত্ব এবং ভজনের পোষকত্ব রক্ষার অনুকূলভাবে যাহাতে বৈষ্ণব-পদাবলী সুনিপুণ ভাবে কীর্ত্তিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীলনরোত্তমদাস-ঠাকুরাদি বৈষ্ণব-মহাজনগণ অভিনব সুর-তালাদিরও আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালার সাহিত্যে, বাঙ্গালার দর্শনে, বাঙ্গালার ভাবধারায়, বাঙ্গালার কৃষ্টিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালার কৃষ্টি বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাবে পরিপুষ্ট কৃষ্টিকেই বুঝায়—একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রভাব কেবল যে বাঙ্গালার কৃষ্টিকেই এক অপূর্ব্বরসে পরিসিঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নহে, সমগ্র ভারতের কৃষ্টিতেও তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে।

সমাজ-সংস্কার। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া তিনি কিছু করিয়া যান নাই। প্রকাশ্যে তিনি কিছু করেন নাই সত্য; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারের বীজও তিনিই বপন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশ্য আন্দোলনের বিঘ্ন অনেকই ছিল। তখন বাঙ্গালার সমাজবন্ধন খুব দৃঢ় ছিল। মুসলমানের করোয়ার জল গায়ে লাগিলেই ব্রাহ্মণের জাতি যাইত; এইদিকে স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ আবার তৎকালীন সমাজবন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। সাধন-রাজ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে নূতন সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ তাহারই বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে তখন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজেরই বিশেষ প্রতিপত্তি—সমাজের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্তা তখন তাঁহারাই। ধর্ম্ম-সংস্কারে—মুখ্যতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলেই মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, হিন্দুগণ ধর্ম্মের উপরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য দিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ সামাজিক আচার পদ্ধতির রক্ষা হইলেই তাঁহারা সাধারণতঃ ধর্ম্মরক্ষা হইল বলিয়া মনে করেন। তাই যখন নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রচালিত সামাজিক নিয়মের প্রধান প্রধান গুলিতে বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, তখন তাঁহাদের মনঃপূত না হইলেও তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে মৌখিক দু'চারিটী কথা ব্যতীত কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু বিঘ্ন উৎপাদন

করেন নাই। তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-সংস্কার—তাঁহার পার্ষদবৃন্দেরও তাহাই ছিল একমাত্র অভিপ্রায়; তাই তিনিও ধর্ম্ম-সংস্কারের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রবল বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কাও যে তাঁহার উপর কোনও ক্রিয়া করে নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন—সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে প্রাধান্য দিতে গেলে অভীষ্ট ধর্ম্ম সংস্কারেই সম্ভবতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ইহাও হয়তো তিনি মনে করিয়া থাকিবেন—ধর্ম্মই মানবের একমাত্র কাম্যবস্তু; প্রকৃত ধর্ম্মের দিকে যদি লোকের মন ধাবিত হয়, তাহা হইলে—সমাজ-ধর্ম্মাদি অনাত্ম-ধর্ম্মের সহিত ভজনমূলক আত্মধর্ম্মের যে বিশেষ কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই এবং সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত সমাজধর্ম্মের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনও যে অসঙ্গত নয়—তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবে।

ভারতীয় ঋষিগণ এবং তাঁহাদের অনুগত সমাজ-সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থাদাতারাও মানুষের জীবনে আত্মধর্ম্মকেই সকলের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন। লোকধর্ম-সমাজধর্ম্মাদিকে তাঁহারা আত্মধর্মের অনুগতরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই, ভ্রূণের গর্ভসঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত লৌকিক অনুষ্ঠানকেই তাঁহারা আত্মধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—বিষ্ণুকে বাদ দিয়া হিন্দুর কোনও অনুষ্ঠান নাই। দৈনন্দিন ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা। ইহাই হিন্দুসমাজের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ছিল; আজকাল নানাকারণে হিন্দু এই বৈশিষ্ট্যকে হারাইতে বসিয়াছে; তাহার ফল কি হইতেছে বা হইবে, ভগবান্ জানেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—সমাজের মধ্যে আত্মধর্ম্মের ভাবটা যদি সমুজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তোলা যায়, প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কার আর খুব দুরূহ ব্যাপার হইবে না, তাহা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িবে। তিনি যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবল স্রোতোবেগমুখে অনেক অবাঞ্ছনীয় সামাজিক ব্যাপার বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই, পদকর্ত্তা গাহিতে পারিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"

সাধারণভাবে প্রকাশ্যে তিনি কিছু না বলিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত আচরণ হইতে সমাজ-সংস্কারবিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা আমরা পাইতে পারি। সন্ন্যাসের পরে দেখা গিয়াছে, তিনি কোনও স্থানে উপস্থিত হইলে আহারের সময়ে—যদি হরিদাসঠাকুর সেস্থানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে—একই ঘরে আহারের জন্য তাহাকেও তিনি আহ্বান করিতেন। অবশ্য দৈন্যবশতঃ, বিশেষতঃ প্রভুর অবশেষের জন্য লোভ বশতঃ, হরিদাসঠাকুর সেই আহ্বান অঙ্গীকার করিতেন না; কিন্তু করিলে প্রভু যে ভোজন-স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেন, ইহা মনে করিলে তাহার অকপটতারই অমর্য্যাদা করা হইবে। হরিদাসঠাকুর ছিলেন যবনবংশ-সম্ভূত। প্রভু যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের পাচিত এবং ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনৌড়িয়া অনাচরণীয়। আবার ভজনের অনুকূল দীক্ষাদিসম্বন্ধেও তিনি রায়-রামানন্দকে বলিয়াছেন—"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" তাঁহার অনুগত ভক্তগণ যে তাহার এই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর ছিলেন কায়স্থ, শ্রীলশ্যামানন্দঠাকুর সদ্গোপ, শ্রীলনরহরিসরকার ঠাকুর ছিলেন বৈদ্য। তাহাদের প্রত্যেকেরই বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন এবং এসমস্ত ব্রাহ্মণশিষ্যদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান এবং তাহারা তাহাদের আদিগুরুর পরিবারভুক্ত বলিয়াই এখনও পরিচিত। তিনি হরিদাসঠাকুরের দ্বারা নাম প্রচার করাইয়াছেন, কায়স্থ রামানন্দ-রায় দ্বারা অধ্যাত্ম-শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন; এসমস্তও গুরুরই কাজ। ভজনসম্বন্ধেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদিবিচার।" এবং কার্য্যতঃও তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার প্রভাবে বহু মুসলমানও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রভুর এ সমস্ত আচরণ হইতে সর্ব্ববিষয়ে অস্পৃশ্যতা এবং অনাচরণীয়তা বর্জ্জন সম্বন্ধে তাহার মনোভাব জানা যায়। বাস্তবিক, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-বিষয়ক আন্দোলনের বীজও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুই রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

সাম্য। তিনি কেবল অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের বীজই বপন করিয়া যান নাই; সাম্যনীতিও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সাম্যের কথা প্রচারিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা প্রভুর সাম্য ছিল অনেক বেশী ব্যাপক।

মানুষে-মানুষে যে ভেদ, তাহা দূর করার কথাই আমরা এখন শুনি। কিন্তু পরমোদার শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবমাত্রের মধ্যেই ভেদজ্ঞান দূর করার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-ব্যাপারে তাঁহার আচরণে মানুষে-মানুষে ভেদ দূর করার কথা জানা গিয়াছে। আবার তিনি জীবত্বের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া—সেই ভূমিকায় দাঁড়াইয়া জীবমাত্রের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন- চারিবর্ণের বা চারি আশ্রমের কেহ নই আমি (ধ্বনিতে—স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যেও কেহ নই আমি), আমি সেই অখিল-রসামৃতসিন্ধু গোপীভর্ত্তার দাসানুদাস (ইহাই জীবের স্বরূপ, সুতরাং জীবত্বের ভূমিকা)। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ ॥" বস্তুতঃ, নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি ভগবানের চরণকমলের দাস আমিও এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অপর সকল জীবও—এই জ্ঞান যাঁহার চিত্তকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে, একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সকলের প্রতি সত্যিকারের সমদৃষ্টি সম্ভব এবং একমাত্র তাঁহার পক্ষেই পরমপ্রীতিভরে সেই সমদৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব; কারণ, এই সমদৃষ্টির পশ্চাতে ভিত্তিরূপে থাকিবে পরমানন্দ-পরিপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য ভগবান্ এবং তাঁহার চরণকমলের মধু-আস্বাদনজনিত পরম-আনন্দ, আর থাকিবে—সকলেই সেই অমৃতের সমুদ্রে সাঁতার দিতেছে, সকলেই সেই চরণকমলের মধুর লোভে সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য সেই সর্ব্বজনসেব্যের অহৈতুকী সেবা, সকলেই তাঁহার চরণের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে এক নিত্য অচ্ছেদ্য মধুর প্রীতির বন্ধনে—আবদ্ধ—এইরূপ একটা অনুভূতি। এই অনুভূতিই সাম্যের ভাবকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত-সাম্যভাবের ইঙ্গিতই প্রভু দিয়া গিয়াছেন। ইহার তুলনায় যত্নকৃত বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিজাত সাম্যভাব অনেক নিম্নস্তরের বস্তু। প্রকৃত সাম্যভাবের বীজও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গই রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

সেবা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার ॥ ১।৯।৩৯॥" পরোপকারেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। বাক্যদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, অর্থদ্বারা, এমন কি যাহাতে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই কার্য্য দ্বারা বা জীবন দ্বারাও পরোপকার করিবে। "এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ শ্রী, ভা, ১০।২২।৩৫ ॥" দুঃখ দূর করাই উপকার। সমস্ত দুঃখের মূল সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করার সহায়তাই হইল সর্বাপেক্ষা বড় উপকার। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাতো করিবেই; কিন্তু নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা-আদিরূপ ইহকালের ব্যাপারেও কায়মনোবাক্যে প্রাণীদিগের উপকার করা লোকের কর্ত্তব্য, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রভু সেইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৩।১২।৪৫ ॥" উপকার-চেষ্টার পশ্চাতে যেন কোনও স্বার্থানুসন্ধান না থাকে, কোনও উপকার-প্রার্থী যেন বিমুখ হইয়া না যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বৃক্ষের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন "সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ১।৯।৪১ ॥ অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ। শ্রী, ভা, ১০।১২।৩৩। বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ৩।২০।১৮-১৯ ॥"

প্রভু নিজেও কাঙ্গালদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া দরিদ্রসেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। "প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে। দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি। 'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি ॥ 'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ২।১৪।৪২-৪৪ ॥"

পরোপকারের ব্যাপারে উপকারকের মনে যদি অহঙ্কারের ভাব আসে "আমি অনুগ্রাহক", যাদের উপকার করিতেছি, তারা আমার অনুগ্রাহ্য"—এইরূপ একটা ভাব যদি চিত্তে জাগে, তাহা হইলে উপকারের বা সেবার তাৎপর্য্যই নষ্ট হইয়া যায় এবং উপকারী ও উপকৃত উভয়ের চিত্তেই মালিন্যের সঞ্চার হয়। উপকারী নিজের মনে

পোষণ করিবেন—নিজের সম্বন্ধে সেবক-ভাব এবং অপরের সম্বন্ধে সেব্য-ভাব। তাহা হইলেই সেবা সার্থক হইবে। এই ভাবটি যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০ মনুষ্যপশুপক্ষিকীট-পতঙ্গাদি স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে ভগবান বিরাজিত; সুতরাং প্রত্যেক জীবই, বা প্রত্যেক জীবের দেহই, হইল ভগবানের শ্রীমন্দির-তুল্য; ভক্তের নিকটে ভগবন্মন্দির যেমন শ্রদ্ধা ও পূজার বস্তু, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবকেই তেমনি শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র মনে করিবে এবং চিত্তে এই ভাব পোষণ করিয়াই সেবার বা পরোপকারের কাজে লিপ্ত হইবে। তাহা হইলে নিজের সম্বন্ধে অনুগ্রাহকত্বের এবং সেব্যের সম্বন্ধে অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব আসিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিবে না, সেবাকেও অসার্থক করিতে পারিবে না। "ইঁহার সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম"—এইরূপ ভাবই সেবাকে তখন মহনীয়তা দান করিবে। মহাপ্রভু এই জাতীয় সেবার আদর্শের কথাই বলিয়াছেন।

অহিংসা। ভারতবর্ষে অহিংসা একটা নূতন কথা নয়। আর্য্য-ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই অহিংসার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন, কাহারও হিংসা করাতো দূরে, "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥ ২।২২।৬৬॥" দেহের কথা তো দূরে, বাক্যদ্বারাও কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবে না; কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবার কথা কখনও মনেও চিন্তা করিবে না। প্রভুর এই উপদেশ চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ইহা ভজনাঙ্গ—অবশ্য প্রতিপাল্য—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া যাহাকে সম্মান করার কথা, তাহার প্রতি হিংসাচরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। "যে তোমার হিংসা করিবে, তোমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকেও তুমি হিংসা করিবে না, তাহার অনিষ্ট-চিন্তাও তুমি করিবে না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারই করিবে"—এইরূপই প্রভুর উপদেশ। এবিষয়ে বৃক্ষধর্ম্মী হওয়াই সঙ্গত। "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে, করে আনের রক্ষণ॥ ৩।২০।১৯॥" যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়া দেয়, ফল-ফুল দেয়; নিজের অঙ্গরূপ ডালটীও দেয়। তাহার হিংসা করে না।

সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে প্রভুর বিশেষ উপদেশ। "তরোরিব সহিষ্ণুণা"—গাছের মত সহিষ্ণু হইবে। বৃক্ষ-ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র অবিচলিত ভাবে সহ্য করে; জীবকৃত কত উৎপীড়নও সহ্য করে; ডাল কাটে, পাতা ছিঁড়ে, ফল নেয়,—কাহাকেও কিছু বলে না। মানুষকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে। "অপরের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্ব্ব্যবহার—আমারই উপার্জ্জিত, আমারই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, সুতরাং আমারই প্রাপ্য; ইঁহারা উপলক্ষ্যমাত্র, ইঁহাদের যোগে আমার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; ইঁহাদের দোষ কিছুই নাই; বরং আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলি ভোগ করিবার সুযোগ দিয়া ইঁহারা আমার উপকারই করিতেছে, আমার কর্ম্মফলের দুর্ব্বহ বোঝা কিছু কমাইয়া দিতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া অম্লানবদনে সমস্ত সহ্য করিবে। "ঐহিকং তু সদা ভাব্যং পূর্ব্বাচরিতকর্ম্মণা॥ পদ্মপু, পা, ৫১।২৬॥ ভুঞ্জান এব আত্মকৃতবিপাকম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৮॥"

স্বাবলম্বিতা। অপরের গলগ্রহ না হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়াই প্রভুর অভিপ্রেত ছিল। প্রভুর উপদেশে সুবুদ্ধিরায়-নামক নবদ্বীপের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার যখন ভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রভু বলিতেন, যে পরের অপেক্ষা রাখে, তার ইহকাল-পরকাল-দুইই নষ্ট হয়, কৃষ্ণও তাকে উপেক্ষা করেন। "নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥ ৩।৩।২২॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ৩।৬।২২২॥"

প্রীতি ও মৈত্রী। প্রীতিই ছিল মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষার প্রাণবস্তু। ভগবৎ-প্রীতি হইল তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাণ এবং সেই প্রীতির প্রতিফলনই হইল জাগতিক প্রীতি। প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করিয়া অভিব্যক্ত করে, সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে, বহুক্ষেত্রে প্রভু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। জগাই-মাধাই

ছিল নবদ্বীপে দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী, মদ্যপ। তাহাদের ভয়ে কেহ রাস্তায় বাহির হইতে সাহস করিত না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ গেলেন তাহাদিগকে হরিনাম শুনাইতে; তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিল। নিতাই তাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাদের প্রতি আরও প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ফলে তাহারা তাঁহার পদানত হইল, গৌরের পরম ভক্ত হইয়া ধন্য হইল। রাজনৈতিক ব্যাপারেও প্রীতির প্রভাব যে গুরুতর সমস্যারও সমাধান করিতে পারে, প্রভুর লীলায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতেছেন; সঙ্গে রাজা-প্রতাপরুদ্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও কয়েকজন আসিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত। এই সীমার পরেই এক যবন-রাজার রাজত্ব; তখন প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌড়ে আসিতে হইলে তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। যুদ্ধের জন্য তাহা নিরাপদ ছিল না। তাই প্রতাপরুদ্রের অমাত্যবর্গ বলিলেন, যবনরাজের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে, নচেৎ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। সন্ধি হইল—চিরকালের জন্য যুদ্ধবিরতি এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সন্ধি রাজায় রাজায় নয় কোনও দলিলপত্রে নয়; এই সন্ধি হইয়াছিল—গৌরের এবং যবনরাজের, হৃদয়ের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে। মধ্যস্থও হইয়াছিল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেম, অপর কেহও নহে, অপর কিছুও নহে। গৌরসুন্দরের সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী প্রীতিই যবনরাজের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার পদানত করিয়া দিয়াছিল। তখন তিনি নিজেই রক্ষক হইয়া গৌরসুন্দরকে একটা বিপদসঙ্কুল নদী পার করিয়া দিলেন এবং এই সেবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তদবধি তাঁহার পূর্ব্বশত্রু রাজা-প্রতাপরুদ্রও তাঁহার পরম বান্ধবে পরিণত হইলেন। প্রীতির এমনি প্রভাব—তাহা প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন।

বিচার ও আলোচনা। গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নদীয়ানগরে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন মহাসঙ্কীর্ত্তন লইয়া তিনি নবদ্বীপের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কাজীসাহেবের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেস্থানে তাঁহার সহিত গোবধ-সম্বন্ধে প্রভুর বিচারমূলক আলোচনা হইয়াছিল।

সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের সঙ্গে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে বেদান্তের শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে প্রভুর বিচার হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তিতে শ্রুতির অর্থ করিয়া বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়; লক্ষণায় তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, লক্ষণাতে অর্থ করিতে গেলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের লক্ষণার্থ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যতঃ (১) ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খণ্ডন করিয়া সবিশেষত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণত্ব ও স্বয়ংভগবত্তা, (২) জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব খণ্ডন করিয়া জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মশক্তিকত্ব, এবং নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব, (৩) ভগবদ্‌বিগ্রহের মায়িক-সাত্ত্বিক-বিকারত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দঘনত্ব, (৪) সৃষ্টি-ব্যাপারে বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন পূর্ব্বক পরিণামবাদ এবং (৫) তত্ত্বমসিবাক্যের মহাবাক্যত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, (৬) শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, (৭) শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের সম্বন্ধতত্ত্ব, (৮) ভক্তিই (অভিধেয়-তত্ত্ব, (৯) প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব, (১০) সেব্য সেবকত্বই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের চরমতম কাম্য, সাযুজ্যমুক্তি নহে।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দের সঙ্গে তিনি সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় রায় ছিলেন বক্তা এবং প্রভু ছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা। শ্রীরাধার প্রেমই যে সাধ্য-শিরোমণি এবং এবং রাগানুগামার্গের ভজনেই যে এই প্রেমের আনুগত্যময়ী সেবা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই এই আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীল বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে প্রভু চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস অবস্থান করেন বেঙ্কটভট্ট ছিলেন শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। তাঁহার ভক্তি-

নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভু ভট্টকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন ; ভট্টেরও প্রভুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ছিল। উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ভজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায়শঃই ইষ্টগোষ্ঠী হইত। এক সময়ে এই ইষ্টগোষ্ঠি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ স্বরূপে অভিন্ন হইলেও সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং লীলারস-বৈচিত্রীতে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। তাই নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার লোভে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য লক্ষ্মী-দেহে তিনি তাঁহার অভীষ্টসেবা পান নাই ; কিন্তু প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৩৯-৪১॥" ইহা শ্রুতির সেই "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।"—উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে বৌদ্ধাচার্য্যদের সহিতও প্রভুর তত্ত্ব-বিচার হইয়াছিল। প্রভু বৌদ্ধাচার্য্যদের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অনুগত তত্ত্ববাদীদের সহিতও সাধ্য-সাধনসম্বন্ধে প্রভুর আলোচনা হইয়াছিল। তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিয়াছিলেন—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ২।৯।২৩৮-৩৯॥" ইহা হইতে জানা যায়, মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের মতে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিই সাধ্য এবং বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণে কর্মার্পণই তাহার সাধন। ইহার উত্তরে প্রভু বলিলেন—"শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥' শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। সেই পরম-পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা॥ কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥ পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥ এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন। সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন॥ ২।৯।২৪০-৪৫॥" প্রভু বলিলেন—কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ, চতুর্ব্বিধা মুক্তি নয় ; আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই তাহার সাধন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ নয়। শুনিয়া তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিলেন—"তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়। সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥ তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ। সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥ ২।৯।২৪৭-৪৮॥"

এস্থলে দেখা গেল, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের সাধন-বিষয়েও মিল নাই, সাধ্য-বিষয়েও মিল নাই। বেদান্তমত-বিষয়েও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল নাই। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ছিলেন ভেদবাদী, আর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইলেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী।

রামানুজাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ; তাঁহাদের কাম্যও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের কাম্যও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি—সালোক্যাদি মুক্তি। এই দুই সম্প্রদায়ের কাম্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও ইঁহারা দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ; যেহেতু ইঁহাদের বৈদান্তিক মত ভিন্ন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আর মধ্বাচার্য্য ভেদবাদী। ইহাতে বুঝা যায়, বৈদান্তিক মতের পার্থক্যই সম্প্রদায়-পার্থক্যের হেতু। চারিটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে—শ্রী (রামানুজ), ব্রহ্ম (মধ্বাচার্য্য), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) এবং চতুঃসন (নিম্বাদিত্য)। ইঁহাদের বৈদান্তিক মত ভিন্ন ভিন্ন। তাই ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বৈদান্তিক মত এই চারি সম্প্রদায়ের মত হইতে পৃথক; সুতরাং বৈদান্তিক মতের পার্থক্যই সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার হেতু হইলে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও একটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হওয়ারই কথা। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—গৌড়ীয়-সম্প্রদায় একটী পৃথক সম্প্রদায় হইলে উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও অনুমোদিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইবেন কিনা। তাহাতে কোনও বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, উক্ত চারিটী সম্প্রদায় পরস্পর পৃথক হইলেও তাঁহাদের একটা সাধারণ ভূমিকা আছে—সেব্য-সেবকভাব এবং এই সেব্য-সেবক ভাবই ইঁহাদের অনুমোদিত

হওয়ার হেতু। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরও সেব্য-সেবক ভাব বর্ত্তমান। সুতরাং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও অনুমোদিত না হওয়ার কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু ইহার কোনও বিচারসহ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কেহও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কোনও স্থলে বলেন নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটাই যেমন একটি পৃথক সম্প্রদায়, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও তদ্রূপ একটি পৃথক সম্প্রদায়। অনেকে মনে করেন, পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটি সম্প্রদায়ই হইতেছে অনুমোদিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় তদতিরিক্ত কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাই। কিন্তু ইহারও কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লেখকের "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন," প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন।

যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক পাঠান পীরের সঙ্গেও কোরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার হইয়াছিল। প্রভু বলিয়াছিলেন—কোরাণের প্রতিপাদ্য হইলেন সবিশেষ ব্রহ্ম, অভিধেয় হইল ভক্তি এবং প্রয়োজন হইল ভগচ্চরণে প্রীতি। প্রভুর কৃপায় সপার্ষদ পাঠান পীর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার অভাব। প্রভুর উপদেশের এবং আচরণের আদর্শে একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিলনা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমার্গ-সম্প্রদায়ের সাধ্য এবং সাধন ভক্তিবিরোধী হইলেও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে প্রভু "সিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থান ॥ ২।৭।২২৭॥" (গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িকতা একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইবে)।

বৈষ্ণব লেখকগণ মুখ্যভাবে প্রভুর শিক্ষা এবং আচরণেরই বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক দিক্‌টায় তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার চরিতের ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইলে সম্ভবতঃ অনেক নূতন বিষয় জানা যাইবে এবং লৌকিক সমাজের কোন্ কোন্ দিকে তাঁহার প্রভাব কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহাও জানা যাইবে। এসকল বিষয়ে কেহ যদি অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার একটা লুপ্ত সম্পদও হয়তো আবিষ্কৃত হইতে পারে।

তাঁহার লীলায় এবং উপদেশে প্রভু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে আমরা তাহার দিগ্‌দর্শন দিতে চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তের মূল যিনি, অথবা যাঁহাতে তৎসমস্ত অবস্থিত, বেদাদি শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-শব্দটী তাঁহার স্বরূপবাচক ; ইহার অর্থ—বৃহত্তম বস্তু ; সেই বস্তুটী কিসে এবং কিরূপে বৃহৎ, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

ব্রহ্মশব্দের অর্থ, ব্রহ্ম সশক্তিক। বৃংহ-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন ; বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। (বৃংহতি) যিনি বড় হয়েন এবং (বৃংহয়তি) যিনি বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে, যিনি ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য, তিনি নিজে বড় এবং বড় করেনও। যিনি বড় করিতে পারেন, নিশ্চয়ই বড় করার শক্তি তাঁহার আছে। সুতরাং "বৃংহয়তি"-অর্থে—ব্রহ্মের যে অন্ততঃ একটা শক্তি—বড় করার শক্তি—আছে, তাহাই বুঝা যায়। শ্রুতি বলেন, একটা নয়, তাঁহার অনেক শক্তি আছে এবং এ সমস্তই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ; অর্থাৎ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বের ন্যায় ব্রহ্মের শক্তিও তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্য। এসমস্ত শক্তি তাঁহার স্বরূপগত, নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥" বাস্তবিক তাঁহার বিবিধ—অনন্তবিধ শক্তিই থাকার কথা ; কারণ তিনি "বৃংহতি"বড় ; কাহা অপেক্ষা, কিসে এবং কতটুকু বড়, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও না থাকায় বুঝিতে হইবে, তিনি অন্য সকল অপেক্ষা, সকল বিষয়ে সমধিকরূপেই বড়। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। "ন তৎ সমশ্চা ভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥" সুতরাং তিনি স্বরূপে বড়, শক্তিতে বড় এবং শক্তির কার্য্যেও বড়। স্বরূপে বড় হওয়াতে তিনি সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু ; শক্তিতে বড় হওয়াতে শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বড়। তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও তাঁহাতে অনন্ত। শক্তি অর্থ কার্য্যক্ষমতা ; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কার্য্যদ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যই ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়ার কথা স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিতেছে—"জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও আছে। তিনি যখন সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বড়, তখন তাঁহার প্রত্যেক শক্তির কার্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। শ্রুতি বলিয়াছেন" অনন্তং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মের এই আনন্ত্য সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যে, শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে।

শব্দার্থ প্রকাশ করিবার জন্য **মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি*** প্রয়োগের সর্ব্বোত্তম স্থল কিছু যদি থাকে, তবে তাহা পরতত্ত্ব-বাচক শব্দ ; কারণ, পরতত্ত্বই একমাত্র পরমস্বতন্ত্র—সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্নের অতীত—বস্তু। তাই, পরতত্ত্ববাচক "ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে করাই সঙ্গত ; এই বৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি" এতদুভয়ই গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুভয় অর্থের চরমসীমা পর্য্যন্তই গ্রহণ করিতে হইবে ; তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব—আনন্ত্য পর্য্যন্ত ব্যাপক এবং এই আনন্ত্য কেবল স্বরূপে নয়, পরন্তু শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং প্রকাশবৈচিত্রীতেও।

---

* সংস্কৃতশাস্ত্রে মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিনামে শব্দার্থ প্রকাশের একটা রীতি আছে ; শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থের অবাধ বিকাশই ইহার তাৎপর্য্য। প্রগ্রহ-শব্দের অর্থ ঘোড়ার লাগাম—যাহা অশ্বের গতিকে সংযত করে, গতিপথে বাধা জন্মায়। এই লাগাম যদি খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অশ্ব হয় মুক্তপ্রগ্রহ—তাহার শক্তি-সামর্থ্যের শেষসীমা পর্য্যন্ত অশ্ব তখন স্বীয় অভীষ্ট পথে গমন করিতে পারে। কোনও শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থও যদি স্বীয় বিকাশের পথে কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন না পায়, তাহা হইলে তাহা বিকাশের শেষসীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে ; তখনই তাহা হয় অত্যন্ত ব্যাপক। যে বৃত্তিতে অর্থ করিলে শব্দার্থ এরূপ অবাধ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে, তাহাকে বলে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া যদি "বৃংহতি এবং "বৃংহয়তি"—এই দুইটী অংশের কোনও একটীকে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের অপূর্ণত্বজ্ঞাপক, ব্রহ্মত্বের হানিজ্ঞাপক। উভয় অংশের অর্থ গ্রহণে এবং উভয় অর্থের সর্ব্বোত্তম ব্যাপকতাতেই ব্রহ্মের পরতত্ত্বত্ব সূচিত হইতে পারে; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ১।১২।৫৭॥" শ্রুতিও ইহার সমর্থন করেন। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥—তাঁহার সমানও দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও দেখা যায় না।" এই উক্তিদ্বারা "বৃংহতি"-অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্ব্বোদ্ধৃত "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ', —বাক্য হইতে "বৃংহয়তি" অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। যাঁহারা পরতত্ত্ব ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলেন, তাঁহারা কেবল "বৃংহতি"-অংশকেই গ্রহণ করেন, "বৃংহয়তি"-অংশকে উপেক্ষা করেন; তাহাতে, ব্রহ্মের বা পরতত্ত্বের পূর্ণতার হানি হয়; এইরূপে তাঁহারা যে তত্ত্বের সন্ধান পান, তাহাও একটী তত্ত্ব বটে, কিন্তু তাহা পরমতত্ত্ব নহে—উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণের এবং শ্রুতির উক্তিই তাহার প্রমাণ।

এস্থলে ব্রহ্ম-শব্দের যে অর্থ করা হইল, তাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ মুখ্যাবৃত্তির অর্থ (১।৭।১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য) এবং এই অর্থ যে শ্রুতিবাক্যদ্বারা সমর্থিত, তাহাও দেখান হইয়াছে। শ্রুতি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা বলিয়াছেন এবং শক্তি স্বীকার করিয়াই উক্ত মুখ্যাবৃত্তির অর্থ পাওয়া গিয়াছে। শক্তি স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং সবিশেষত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতে এইরূপ মুখ্যার্থের স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২।২।৭॥"—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের মহিমার কথাও বলা হইয়াছে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক। ৩।২।৩॥ কঠ। ২।২৩॥" এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের বরণ করার শক্তির—সুতরাং তাঁহার সশক্তিকত্বের এবং সবিশেষত্বের—কথা দৃষ্ট হয়। বেদান্তের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থে উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ॥ ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য॥"—এইভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মুখ্যার্থে ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিসমন্বিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের মত ও তাহার খণ্ডন। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শেষকালে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে উল্লিখিত স্বকৃত মুখ্যার্থকেও উড়াইয়া দিয়াছেন (১।৭।১০৪ পয়ারের টীকায় লক্ষণা ও গৌণী বৃত্তির তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে তিনি স্থাপন করিয়াছেন—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক এবং নির্ব্বিশেষ। জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপনই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। শ্রুতিতে ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক—এই উভয় রকমের উক্তিই দৃষ্ট হয়, এমন কি একই শ্রুতিতেও এই উভয় রকমের উক্তি দৃষ্ট হয় (১।৭।১১৩ পয়ারের টীকায় আদিলীলার ৫৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়েই যথার্থ মীমাংসা সম্ভব। শঙ্করাচার্য্য ভেদবাচক-শ্রুতিগুলির পারমার্থিক মূল্য অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক মূল্য স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—অভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিই তত্ত্ব-নির্ণায়ক; অপরগুলি নয়। কিন্তু তাঁহার এই মতের সমর্থনে তিনি কোনও স্পষ্ট-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই; স্থলবিশেষে তিনি যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মুখ্যাবৃত্তির অর্থ তাঁহার মতের সমর্থক নহে, তাঁহার স্বকল্পিত লক্ষণাবৃত্তির অর্থই হয়তো তাঁহার সমর্থক। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই যে—তাঁহার নিজস্ব যুক্তি ব্যতীত কোনও শ্রুতি-প্রমাণ তাঁহার এইরূপ মতের পোষক নহে।

তত্ত্বমসি-বাক্যের লক্ষণাবৃত্তির অর্থে কিরূপে জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই তাঁহার ব্যাখ্যা প্রণালীর একটু আভাস পাওয়া যাইবে। উক্ত বাক্যে—তৎ ত্বম্ অসি—এই বাক্যে, তৎ-শব্দে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ চিদ্রূপ ব্রহ্মকে এবং ত্বম্-শব্দে অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ চিদ্রূপ জীবকে বুঝায়। ব্রহ্ম এবং জীব—উভয়ই চিদ্রূপ। চিদংশে উভয়ে এক হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিশেষণগুলি—ব্রহ্মের বিশেষণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান

এবং জীবের বিশেষণ অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান, এই বিশেষণগুলি যতক্ষণ—থাকিবে,ততক্ষণ উভয়ের সর্ব্ববিষয়ে একত্ব স্থাপন করা চলে না। তাই শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়ের বিশেষণগুলিকেই বাদ দিয়াছেন। ব্রহ্মের বিশেষণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌কে বাদ দিলে থাকে কেবল চিদ্‌রূপ ব্রহ্ম, আর জীবের বিশেষণ অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্‌কে বাদ দিলে থাকে কেবল চিদ্‌রূপ জীব। এক্ষণে উভয়েই যখন চিদ্রূপ, তখন উভয়ের একত্বে বিঘ্ন জন্মাইবার কিছু থাকে না। এইরূপে তিনি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ভাবের অর্থকে বলে অহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা (১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে স্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে, সেস্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করার বিধি শাস্ত্রানুমোদিত নহে। মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলেই লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাহন্যধী র্ভবেৎ সা লক্ষণা। অলঙ্কারকৌস্তুভ। ২।১২।" ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ যে শ্রুতিসম্মত এবং তাহা যে শ্রীপাদ শঙ্করও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে। তথাপি, মুখ্যার্থ হইতে "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌" এই বিশেষণদ্বয়ের পরিত্যাগপূর্ব্বক, তত্ত্বমসি-বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লক্ষণাবৃত্তিতে তিনি যে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে "বিশেষণহীন" চিদ্‌বস্তু মাত্র অর্থ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা হইল শক্তির ক্রিয়া। এই দুই বিশেষণ পরিত্যাগ করায় ব্রহ্মের শক্তিহীনতাই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। ইহাও শ্রুতিবিরোধী, যেহেতু, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী অবিচ্ছেদ্যা শক্তির অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তি হইতেছে এই। তিনি বলেন, উপাসনার সুবিধার জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের বা আকারাদির কথা বলা হইয়াছে। "আকারবদ্‌ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনা-বিধিপ্রধানানি। ৩।২।১৪। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।" এবিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—"ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে।—উপাসনায় ধ্যানের জন্য যে বিগ্রহ স্বীকার্য্য, তাহা অলীক কল্পনা নহে। যেহেতু—"তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ।—শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বিগ্রহ প্রমেয় তত্ত্ব, অলীক বস্তু, নহে। ৩।২।১৬। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" (এই উক্তির সমর্থক একাধিক শ্রুতিবাক্য গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে)। সুতরাং সবিশেষত্বসূচক শ্রুতিবাক্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে। (বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-১৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২॥"-সূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, ব্রহ্ম—সর্ব্ববৃহত্তম-তত্ত্ব, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। ২।২৪।৫৩॥" কিন্তু এই ব্রহ্ম কি বস্তু? ব্রহ্মের উপাদান কি? শ্রুতি বলেন—আনন্দং ব্রহ্ম। আরও বলেন—ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। বহু শ্রুতিবাক্যে কেবল "আনন্দ"-শব্দ দ্বারাই পরতত্ত্ব-ব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, আনন্দই ব্রহ্মের উপাদান "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥"—আনন্দশব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয়। সৎ ও চিৎ আনন্দের বিশেষণ-স্থানীয়। সৎ-শব্দ সত্তা বা অস্তিত্ববোধক; যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান, তাহা সৎ—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, তিনকালেই তাহার অস্তিত্ব, তাহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান, বর্ত্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এই আনন্দ নিত্য—জগতের প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য নহে। আর চিৎ-শব্দে চেতন—অজড়—বুঝায়। যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান, তাহা কেবল যে নিত্য তাহা নহে; তাহা চেতনও—প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় জড়, অচেতন নহে। চেতন বলিয়া এই আনন্দ নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে এবং অপরকেও অনুভব করাইতে পারে; তাই এই আনন্দ স্বপ্রকাশ। আবার যাহা চেতন, তাহার যেমন অনুভব করিবার এবং করাইবার শক্তি আছে, তেমনি জানিবার এবং জানাইবার শক্তিও আছে; তাই এই আনন্দ বা ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপও।

"সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।" আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য, চেতন—স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র এই ব্রহ্মই ছিলেন। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ॥" তাই কেবল "সৎ" বলিতেও এই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার এই ব্রহ্মই একমাত্র চেতনবস্তু—চিদ্‌বস্তু; অন্যত্র যাহা কিছু চেতনা দেখা যায়, তাহা কেবল এই নিত্য চিদ্‌বস্তু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই। তাই কেবল "চিৎ" বলিতেও এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই বুঝায়। সুতরাং যাহা সৎ, তাহাই চিৎ এবং আনন্দ; যাহা চিৎ, তাহাই সৎ এবং আনন্দ এবং যাহা আনন্দ, তাহাই সৎ এবং চিৎ।

ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রী। শক্তিবিকাশ-বৈচিত্রীর নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মের বিকারহীনত্ব :— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের শক্তির যেমন অনন্ত বৈচিত্রী, প্রত্যেক শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রীও অনন্ত। কিন্তু শক্তির বিকাশ-বৈচিত্রী কি? বিকাশের বিভিন্ন স্তরই বিকাশ-বৈচিত্রী। একজন লোক বিশ সের বোঝা টানিয়া নিতে পারে; সুতরাং সে যে পাঁচ সের, সাত সের, দশ সের ইত্যাদিও টানিয়া নিতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশ সের নেওয়ার সময় তাহার যে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, পাঁচ সের নেওয়ার সময় নিশ্চয়ই সে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় না—পাঁচ সের নিতে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করা দরকার, ততটুকুই প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা নিশ্চয়ই বিশ সের টানিয়া নেওয়ার উপযোগী শক্তির একটা অংশ এবং তাহার পূর্ণশক্তিবিকাশের পথে একটা স্তর। ব্রহ্মের প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও অসীম। এই অসীমত্ব পর্য্যন্ত বিকাশের পথে প্রত্যেক শক্তিকেই বিভিন্ন-স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; এই বিভিন্ন স্তরই সেই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ-বৈচিত্রী। পরতত্ত্বে তাঁহার প্রত্যেক শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ—অসীমত্ব পর্য্যন্ত বিকাশ এবং এই বিকাশ নিত্য; নচেৎ ব্রহ্মের পরমত্ব বা পূর্ণত্ব এবং নিত্যত্ব থাকে না। প্রত্যেক শক্তির পূর্ণতম বিকাশ যদি নিত্য হয়, বিকাশের বিভিন্ন স্তর বা বিভিন্ন-বৈচিত্রীও নিত্য হইবে; নতুবা পূর্ণতম বিকাশের নিত্যত্ব থাকেনা। বিশেষতঃ, নিত্যত্ব ব্রহ্মের একটা স্বরূপগত ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক শক্তির বিকাশ এবং বিকাশের প্রত্যেক বৈচিত্রী ও কার্য্য—সমস্তই নিত্য হইবে। স্বরূপের ধর্ম্ম—স্বরূপের প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই বিদ্যমান থাকিবে। ব্রহ্মের শক্তি, শক্তিকার্য্য এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রী নিত্য বলিয়া শক্তির বিকাশাদিতে ব্রহ্ম কোনওরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হন না। যাহা ছিলনা, তাহা যখন কোনও বস্তুতে আসে, তখনই সেই বস্তু বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। একাধিক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ-বৈচিত্রীর সম্মিলনেও আবার অশেষবিধ বৈচিত্রীর উদ্ভব হয়; তাহারাও নিত্য।

শক্তির কার্য্য-বৈচিত্রী নিত্য। শক্তির বিকাশ সূচিত হয় তাঁহার কার্য্যে। ব্রহ্মে শক্তিবিকাশের যখন অনন্ত-বৈচিত্রী, তখন তাঁহার শক্তিকার্য্যের বৈচিত্রীও অনন্ত এবং প্রত্যেক কার্য্য-বৈচিত্রীও নিত্য; সুতরাং শক্তিকার্য্য-দ্বারাও ব্রহ্মের বিকারহীনত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। শক্তির ক্রিয়ায় নির্ব্বিশেষ বস্তু সবিশেষত্ব লাভ করে। কুম্ভকারের শক্তিতে নির্ব্বিশেষ মৃত্তিকা সবিশেষ ঘটাদিতে পরিণত হয়। ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়াশীলতাও এরূপ বিশেষত্ব উৎপাদন করে। ব্রহ্মের কতকগুলি শক্তি তাঁহার স্বরূপের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; এই শক্তিগুলিকে স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি বলে, অন্তরঙ্গা-শক্তিও বলে। (পরবর্ত্তী শক্তিতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের স্বরূপও বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকে, ব্রহ্ম আকার পরিগ্রহও করিয়া থাকেন। তাই ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তির কথা শ্রুতিতে দেখা যায়।

ব্রহ্ম রসস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় তিনি যে সমস্ত বিশেষত্বাদি ধারণ করেন, তৎসমস্তই আনন্দ-বৈচিত্রী। আনন্দ স্বতঃই আস্বাদ্য বলিয়া এই সমস্ত আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বৈচিত্রীও স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে সাধিত হইতেছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন বলিয়া, নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারেন বলিয়া অশেষবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বৈচিত্রীও তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। এসমস্ত কারণেই শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ। তৈত্তি ২।৭॥" রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ

এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য—যেমন মধু—তাহা রস। আর যে আস্বাদন করে—যেমন ভ্রমর—সেও রস। সুতরাং রস-অর্থে আস্বাদ্য এবং আস্বাদক (রসিক) দুইই হয়। ইহা হইল রস-শব্দের সাধারণ অর্থ; এই অর্থানুসারে গুড়ও রস; কারণ তাহার একটা স্বাদ আছে; আর পিপীলিকাও রসিক; কারণ, পিপীলিকা গুড় আস্বাদন করে। কিন্তু রসশাস্ত্রে একটা উৎকর্ষজ্ঞাপক বিশেষ অর্থেই রসশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—সাধারণ অর্থে নহে। রস-শাস্ত্রানুসারে চমৎকারিত্বই হইল রসের প্রাণ; যাহাতে চমৎকারিত্ব নাই, রস-শাস্ত্র তাহাকে "রস" বলেন না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তভ। ৫।৭॥" অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব কোনও বস্তুর দর্শনে, শ্রবণে, অনুভবে মনে যে একটা বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাহাই চমৎকৃতি। এতাদৃশী চমৎকৃতিই হইল রসের প্রাণ, রসের সার। কিন্তু কেবল এই চমৎকৃতি থাকিলেও আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলা হয় না, আরও একটা বস্তু চাই; তাহা হইতেছে এই আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অপূর্ব্বতা। আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে আস্বাদনে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের ব্যাপারই তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যবিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই যেন আস্বাদনের চমৎকারিত্বেই কেন্দ্রীভূত হইয়া অপর বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য হইয়া পড়ে। আস্বাদ্যবস্তু যখন এজাতীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। "বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ।" সুতরাং যে বস্তুর আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই চমৎকারিত্ব—নিত্য-নব-নবায়মানত্ব অনুভূত হয়, যাহার আস্বাদনে প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এরূপ অপূর্ব্ব মাধুর্য্য পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করা হয় নাই, সুতরাং যাহার আস্বাদনে কখনও বিতৃষ্ণা তো জন্মেই না, বরং প্রতিমুহূর্ত্তে আস্বাদন-পিপাসা কেবল বর্দ্ধিতই হয়, এবং যাহার আস্বাদন-চমৎকারিত্বের আতিশয্যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের অন্য সমস্ত ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহাই হইল আস্বাদ্য রস। আর উক্তরূপ (আস্বাদ্য) রস আস্বাদন করিয়া যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নবায়মান মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন—সুতরাং যাঁহার আস্বাদন-স্পৃহা স্তিমিত না হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনিই আস্বাদক-রস বা রসিক।

ব্রহ্ম রসস্বরূপে আস্বাদ্য ও আস্বাদক। প্রাকৃত কাব্যামৃতরসে বা অপর প্রাকৃতবস্তুজাত রসে রসত্বের পূর্ণ বিকাশ নাই; কারণ, তাহাতে অনর্গল চমৎকৃতিবিকাশ নাই, নিত্য-নব-নবায়মানত্ব নাই; মুহুর্মুহু বর্দ্ধনশীলা রসাস্বাদন-পিপাসাও নাই—এ সমস্তের নিত্যত্ব নাই। এসমস্ত নিত্যত্বের লক্ষণ অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম অপ্রাকৃত-বস্তু, নিত্যবস্তু; রসত্বের পূর্ণ এবং নিত্যবিকাশ ব্রহ্মেই সম্ভব। ব্রহ্ম রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসরূপে আস্বাদক—রসিকও। এই রসত্ব ব্রহ্মের একটা স্বরূপগত গুণ বা ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহার সকল বৈচিত্রীতেই এই রসত্ব বিদ্যমান—সকল বৈচিত্রীই আস্বাদ্য এবং সকল বৈচিত্রীই আস্বাদক বা রসিক। অবশ্য শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে আস্বাদ্যত্বের এবং আস্বাদকত্বেরও তারতম্য আছে।

আর একটু আলোচনায় বিষয়টী বোধ হয় আরও পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, এবং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি আছে। সুতরাং স্বাভাবিকী-শক্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে বৈশিষ্ট্য দান করে। যেমন সরবৎ বা মিষ্টজল। জল হইল বিশেষ্য, মিষ্টত্বই হইল তাহার গুণ বা বিশেষণ। মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে। এই মিষ্টত্বই সরবতের বৈশিষ্ট্য। বিশেষণ-মিষ্টত্ব তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাহাকে সুস্বাদু সরবৎ করিয়াছে। তদ্রূপ, আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন—চিদানন্দ; তার স্বাভাবিকী স্বরূপভূতা শক্তিও চেতনাময়ী—চিচ্ছক্তি। তাই এই শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে, নিজেও বৈশিষ্ট্যধারণ করিতে পারে। কিরূপে—তাহা বিবেচনা করা যাউক।

রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তির দুই রূপে অভিব্যক্তি (দুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি)। একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদ্য করে এবং আর একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদক করে। আর, উভয়রূপেই আনন্দের

এবং নিজেরও অনন্ত বৈচিত্রীসম্পাদনও করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, আস্বাদ্যত্ব-জনয়িত্রী অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক। মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী। গুড়ের মিষ্টত্ব, চিনির মিষ্টত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বিবিধ ফলমূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এসকল মিষ্টদ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু একরকম মিষ্ট নয়; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক এক রূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্র্য। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি। ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এসমস্ত বিবিধ উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং এসমস্ত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিভিন্ন পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানযোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ, একই স্বরূপতঃ-আস্বাদ্য আনন্দ তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র-রস-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব।

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বাদ্য-রসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাহাকে আস্বাদক (রসিক)-করিয়া থাকে এবং অনন্ত-রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য অনন্ত বাসনা-বৈচিত্রী জন্মাইয়া সেই আনন্দের মধ্যে অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সমস্ত অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদক-রসতত্ত্ব।

আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব এবং আস্বাদক-রসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ-রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রস-তত্ত্ব ব্রহ্মে বিরাজিত; যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপশক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তিবিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্যরূপে অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তত্ত্বটী বোধগম্য করার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি", "বৈচিত্রীর উদ্ভব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ অভিব্যক্ত, অনন্ত-বৈচিত্র্য ইত্যাদি রূপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত।

সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দ রূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যা, রসও তা। রসও যা, ব্রহ্মও তা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটী নাম—জন্মদাতা বলিয়া তিনি জনক এবং পালনকর্ত্তা বলিয়া তিনি পিতা; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একও অভিন্ন—তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর দুইটী নাম; সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম বলিয়া সেই তত্ত্ববস্তুর নাম ব্রহ্ম এবং পরম-আস্বাদ্য ও পরম-আস্বাদক বলিয়া তাঁহার নাম রস; বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

শক্তির বিকাশে ব্রহ্মের ভগবত্তা, শিবত্ব ও সৌন্দর্য্য। ব্রহ্মের যে সমস্ত বৈচিত্রীতে শক্তির বিকাশ আছে, সে সমস্ত বৈচিত্রীতে ঐশ্বর্য্য (স্বেতর-নিখিল স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুকীভাবে পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছা), তেজঃ (কাল-মায়া-প্রভৃতিরও অভিভবকারী প্রভাব), সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য, ভক্তবশ্যতা প্রভৃতি গুণেরও অভিব্যক্তি আছে। সুতরাং এই সমস্ত বৈচিত্রীকে ভগবান্ বলা যাইতে পারে। যাঁহাদের মধ্যে শক্তি বা গুণের বিকাশ যত বেশী, তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। ব্রহ্মের এরূপ অশেষ-কল্যাণ-গুণের আকরত্ব ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনুভব করিয়াই ঋষিগণ তাঁহাকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়াছেন। তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নিত্য।

ব্রহ্ম ভাবনিধি। শক্তির বিকাশে ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ-বৈচিত্রী, তাঁহার অনন্ত রস-বৈচিত্রী, অনন্ত ভগবত্তা-বৈচিত্রী, অনন্ত-কল্যাণগুণবৈচিত্রী, অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বৈচিত্রী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যবৈচিত্রী—এই সমস্তই তাঁহার অনন্ত ভাববৈচিত্রীর পরিচায়ক; তিনি অনন্ত-ভাবনিধি।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত রসবৈচিত্রীর ও ভাববৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, কোনও কোনও নিপুণ ব্যক্তি অঙ্গভঙ্গী-আদিদ্বারা কোনও কোনও ভাবকে অনেকটা অভিব্যক্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের অঙ্গাদি বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া এবং কোনও কোনও উপাদান ভাবপ্রকাশোপযোগী ভঙ্গী গ্রহণে অসমর্থ বা অনহুকূল বলিয়া ভাবকে তাহারা সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত করিতে পারেনা, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভাবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেনা। ব্রহ্মের উপাদান কিন্তু একটী মাত্র—আনন্দ,—নিত্য, চেতন আনন্দ এবং তাহা ভাব-প্রকাশেরও সম্যক অনুকূল; কারণ, আনন্দ-স্বরূপের নিজস্ব-শক্তি, তাঁহার স্বরূপশক্তিই স্বীয় বিকাশ-বৈচিত্রীদ্বারা ব্রহ্মের ভাববৈচিত্রী উৎপাদন করে; সুতরাং স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অনায়াসেই বিভিন্ন ভাববৈচিত্রীর—স্বরূপ-শক্তির প্রকাশবৈচিত্রীর, রস-বৈচিত্রীর, ভগবত্তা-বৈচিত্রীর, অনন্ত-কল্যাণগুণবৈচিত্রীর, ঐশ্বর্য্য-বৈচিত্রীর, মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর—মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন। এই সমস্ত মূর্ত্তরূপ-বৈচিত্রীই ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ-বৈচিত্রী। শাস্ত্রে যে শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-সদাশিবাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মের অনন্ত মূর্ত্তরূপ-বৈচিত্রীই সে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ।

অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম। ব্রহ্মের শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার অনন্ত স্বরূপের অভিব্যক্তি। সুতরাং এই সমস্ত স্বরূপের মধ্যে এমন এক স্বরূপ আছেন, যাঁহাতে শক্তি সমূহের ন্যূনতম অভিব্যক্তি এবং আবার এমন এক স্বরূপও আছেন, যাঁহাতে সমস্ত শক্তির এবং সমস্ত শক্তিবৈচিত্রী-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি। প্রথমোক্ত স্বরূপকে সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলা হয়; ইনি স্বরূপেও (ব্যাপকতায়, সচ্চিদানন্দত্বে) ব্রহ্ম বটেন—বৃহদ্‌বস্তু বটেন; কিন্তু শক্তিতে ব্রহ্ম (বৃহৎ) নহেন; স্বরূপে পূর্ণ, কিন্তু শক্তিতে বা শক্তির বিকাশে পূর্ণ নহেন। এই স্বরূপ নির্ব্বিশেষ, নিরাকার। কারণ, এই স্বরূপে শক্তি থাকিলেও শক্তির বিকাশ নাই; শক্তির বিকাশ ব্যতীত রূপ-গুণাদির বিশেষত্ব অসম্ভব। কিন্তু এই স্বরূপকে একেবারে নিঃশক্তিক বলা যায় না; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে স্বরূপগত শক্তি আছে, এই শক্তি ব্রহ্মের সকলস্বরূপেই বিদ্যমান থাকিবে। "চিৎ-স্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥ ১।৫।২৯॥" "চিচ্ছক্তি আছয়ে নাহি চিচ্ছক্তি বিলাস॥" এই স্বরূপেরও অস্তিত্ব আছে; সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষা করার শক্তি তাঁহার আছেই; এই স্বরূপও আনন্দময়; সুতরাং আনন্দময়ত্ব অনুভব করাইবার শক্তিও তাঁহার আছে। কিন্তু সত্তামাত্র রক্ষা করার এবং স্বরূপানন্দ-মাত্র অনুভব করাইবার বা করিবার নিমিত্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তদতিরিক্ত শক্তির বিকাশ তাঁহাতে নাই; তাই তাঁহাকে নিঃশক্তিক না বলিয়া অব্যক্ত-শক্তিক বলাই সঙ্গত। পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্বের বিকাশ নাই বলিয়াই সাধারণতঃ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্"-এই গীতাবাক্যে এই অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ। আর যে স্বরূপে শক্তি-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, তাঁহাতেই ব্রহ্মের, ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ। বস্তুতঃ ব্রহ্মত্বের পর্য্যাবসানই তাঁহাতে। তাঁহাতে শক্তির, শক্তি-কার্য্যের, কল্যাণগুণগণের, সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, ভগবত্তার, ঐশ্বর্য্যের—পূর্ণতম বিকাশ। এই স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলে—ইনি পূর্ণতমস্বরূপ; তাঁহাতে রসত্বের—আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকত্বের—পূর্ণতম বিকাশ। এই পূর্ণতম স্বরূপকে, পরব্রহ্মকেই শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়। "কৃষির্ভূবাচক-শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম গোপাল। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজার মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "ওঁ যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উ, তা, ৯৪॥ এই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপাল-তাপিনী শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম॥—শ্রীকৃষ্ণ পরম-দেবতা।" ঐ শ্রুতি আরও বলেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥—যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্যবেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।"

পরমাত্মা ও অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ। ঈশ্বর ও ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ও স্বয়ংভগবান্ এবং পরতত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের

ন্যায় সবিশেষ, সাকার। এই সবিশেষ-স্বরূপসমূহের মধ্যে যাঁহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ, তিনিই যোগীদের ধ্যেয় পরমাত্মা—ইনি সাকার, কিন্তু লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির বিকাশ ইঁহাতে নাই। অন্যান্য সকল সবিশেষ-সাকার-স্বরূপেই লীলাবিলাসোপযোগিনী শক্তির বিকাশ আছে। রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, সঙ্কর্ষণাদিতে পরমাত্মা অপেক্ষা অধিক এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কম শক্তির বিকাশ। ইঁহাদের সকলের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তার বিকাশ আছে; সুতরাং ইঁহাদের সকলেই ঈশ্বর ও ভগবান্; অবশ্য শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তার তারতম্য আছে। কিন্তু পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণে শক্তি-আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের ও ভগবত্তারও পূর্ণতম অভিব্যক্তি—তিনি পরম ঈশ্বর এবং স্বয়ংভগবান্। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা, ১৷৩৷২৮।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫৷১॥—তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, অথচ সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ।" শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরমমহত্ত্ব॥ ১৷২৷৫॥" শ্রীকৃষ্ণেরই অপর একটী নাম "গোবিন্দ"। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দাপর নাম। ২৷২০৷১৩৩॥ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোহস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ংভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এবিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, ঊর্দ্ধও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হন; ভগবত্তায় বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬৷৭॥"-বাক্যও সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের কথাই বলিয়াছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যূনতম-শক্তিবিকাশময়" এক বৈচিত্র্য বলিয়াই গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্॥—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। মুণ্ডকোপনিষদও ঈশ্বর-পুরুষকে ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মের হেতুভূত) বলিয়াছেন। "যদা পশ্যঃ-পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। ৩৷১৷৩॥"

পরব্রহ্ম একরূপেই বহুরূপ। যাহা হউক, পরব্রহ্মের এসমস্ত বৈচিত্রী বা স্বরূপ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক স্বরূপেই এসকল অনন্ত বৈচিত্রী ধারণ করেন। তাই তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিধাতি। গোঃ তাঃ শ্রুতি পুঃ ২০॥" একরূপে যেমন তিনি বহুরূপ বা বহুমূর্ত্তি, তেমনি আবার বহুমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তি। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা ১০৷৪০৷৭॥" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম অনন্ত ভাবের নিধি—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ভাবেরই মূর্ত্তরূপ। বিভিন্নভাব যেমন ভাবনিধি শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বরূপে বা বিগ্রহেই বিরাজমান, ভাবের মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপ সমূহও তাঁহার বিগ্রহেই বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বাহিরে কেহ নাই, থাকিতেও পারে না, কারণ তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপক। একখানা ময়ূরকণ্ঠি শাড়ীতে নানাবর্ণের সমবায়, ময়ূরের কণ্ঠে যেমন নীল-পীতাদি নানাবর্ণ থাকে তদ্রূপ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই শাড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যায়; আবার কোনও স্থান বিশেষ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ময়ূরের কণ্ঠের সমগ্র বর্ণপুঞ্জই দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ—ময়ূরকণ্ঠের বর্ণপুঞ্জেরই অন্তর্গত, একই ময়ূরকণ্ঠি-শাড়ীখানাতেই অবস্থিত—তাহার বাহিরে নয়। তদ্রূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বৈচিত্রী—বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ—তাঁহার নিজ স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে সমগ্র ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী স্থানীয়, অথবা ময়ূর কণ্ঠের সমগ্র বর্ণপুঞ্জস্থানীয়; আর বিভিন্ন ভগবৎ স্বরূপ শাড়ীর বা ময়ূরকণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণস্থানীয়। "যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিঞ্ছাবয়ব বিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাৎ দত্তচক্ষুর্যোজনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষস্থানীয়ং নিজ প্রধানভাসান্তর্ভাবিততত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং তত্তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ম্॥—ভগবৎসন্দর্ভঃ।"

সাধন-ভেদে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভূতিভেদ। "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ২।২০।১৪৩॥" "ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার॥ ১।২।৪৯॥" ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ,) আত্মা (পরমাত্মা) ও ভগবান্—এই তিন এক শ্রীকৃষ্ণেরই তিনটী বৈচিত্রী বা স্বরূপ; একই তত্ত্ব হইয়াও তিনি জ্ঞানমার্গের উপাসকের নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গের উপাসকের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের উপাসকের নিকটে ভগবানরূপে প্রতিভাত হয়েন। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভা ১।২।১১।" একই বৈদূর্য্যমণি যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে কাহারও নিকটে নীল, কাহারও নিকটে পীত, কাহারও নিকটে অন্য বর্ণের বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ ধ্যানভেদে—উপাসনাভেদে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হন। "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভি র্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥" একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪১॥"—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একই বিগ্রহে—একই মূর্ত্তিতে—বিবিধ আকার ধারণ করেন, বিবিধ ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে প্রতিভাত হয়েন। "একই বিগ্রহ তাঁর—অনন্ত স্বরূপ॥ ২।২০।১৩৭॥" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বীয় পার্থ-সারথীর দেহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। আর এই কলিযুগে শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের বিগ্রহেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভক্তগণ রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-বলরাম, বলরাম, নৃসিংহ, বরাহ, শিব, দুর্গা রুক্মিণী, লক্ষ্মী, রাধা, কৃষ্ণ-আদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ আছে মনে করিলে তত্ত্বের—সত্যের—অপলাপ হয়; ইহা অপরাধজনক। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। ২।৯।১৪০॥"

সমস্ত স্বরূপই সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বিদ্যমান থাকে; ক্ষুদ্র জলকণার মধ্যেও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব গুণ আছে। ব্রহ্ম স্বরূপে সৎ চিৎ আনন্দময়—নিত্য, শাশ্বত এবং পূর্ণ—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; সুতরাং শক্তিবিকাশের তারতম্য থাকিলেও পরব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের প্রত্যেকেই নিত্য, শাশ্বত, পূর্ণ—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। ল, ভা, কৃ ৮৬॥ পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে ময়ূরকণ্ঠি-শাড়ীর মূল-ময়ূরকণ্ঠি বর্ণের ন্যায় নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রত্যেকটীই যেমন সমগ্র শাড়ীটীকে ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের প্রত্যেকেই পরব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত,বিভু কৃষ্ণতনুসম।

অংশ ও অংশী। ন্যূনশক্তি হইল পূর্ণশক্তির অংশ। বলা হইয়াছে, উল্লিখিত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের মধ্যে পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণ-তম বিকাশ; সুতরাং উক্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশ। এজন্য, স্বরূপে তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশবশতঃ, তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়, আর শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অংশী বলা হয়। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাং পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ॥ তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত। ৪৫।৪৬॥-স্বয়ংরূপ বা পরব্রহ্ম যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু অংশরূপ তাহা পারেন না—ইহাই পার্থক্য।"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহার অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলা হয়। স্বাংশ-স্বরূপগণ সকলেই বিভু, সকলের মধ্যেই স্বরূপশক্তি আছে।

সগুণ ও নির্গুণ। প্রকৃতির সত্ত্ব-রজস্তম হইতে উদ্ভূত গুণসমূহকে প্রাকৃত গুণ বলে। সংসারাসক্ত জীব মায়িক গুণসমূহকে অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়া একমাত্র তাদৃশ জীবেই প্রাকৃত গুণ থাকিতে পারে। স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি কেবলমাত্র ভগবানেই থাকে বলিয়া স্বরূপশক্তির বিলাসভূত অপ্রাকৃত গুণ সকল কেবলমাত্র ভগবানেই থাকিতে পারে। ভগবানের সঙ্গে মায়ার বা প্রকৃতির স্পর্শ নাই বলিয়া তাঁহাতে মায়িক প্রাকৃত গুণ থাকিতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলিয়াছেন। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিত্ত্বয্যেকা

সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১।১২।৬৯॥" ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ—স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ হইতে জাতগুণ।

কোনও কোনও শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, কোনও কোনও শ্রুতি তাঁহাতে সগুণ বলিয়াছেন। সকল শ্রুতিবাক্যের সমান মর্য্যাদা দিয়া এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন। মায়িক গুণের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে তিনি নির্গুণ অর্থাৎ তাঁহাকে মায়িক গুণ নাই। আর চিন্ময় অপ্রাকৃত গুণের দিক হইতে দৃষ্টি করিলে তিনি সগুণ; তাঁহাতে অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাঁহার এজাতীয় সগুণত্ব স্বীকার করিতেছেন; তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, তিনি সুন্দর। শিবত্ব ও সুন্দরত্ব তাঁহার গুণ—অপ্রাকৃত গুণ। শ্রুতি ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ (মুণ্ডক) ১।৯" বলিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ববিত্বাও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ। আবার তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপে স্বরূপশক্তির বিকাশ নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোনও (অপ্রাকৃত) গুণের বিকাশ নাই; সুতরাং এই স্বরূপ অপ্রাকৃত-গুণ-হিসাবেও নির্গুণ এবং অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় প্রাকৃত-গুণ-হিসাবে নির্গুণ তো আছেনই।

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব যে প্রাকৃত-গুণের অভাবই বুঝায়, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত-কল্যাণগুণের আকর, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপূজা-মন্ত্র-প্রসঙ্গে গোপালতাপনীশ্রুতি বলিতেছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ উঃ তাঃ ৯৭॥" এই শ্রুতিতে "কর্ম্মাধ্যক্ষ," "সাক্ষী" "চেতাঃ"—ইত্যাদি শব্দও ব্রহ্মের সবিশেষত্ববাচক বা গুণবাচক; তথাপি তাঁহাকে "নির্গুণ" বলা হইয়াছে। এ-স্থলে নির্গুণ-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নির্গুণশ্চেতি অত্র গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ—গুণশব্দে এস্থলে সত্ত্বাদি মায়িক গুণকে বুঝায়।" তাৎপর্য্য হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণে বা ব্রহ্মে মায়িক গুণ নাই বলিয়াই তাঁহাকে "নির্গুণ বলা হয়; অন্য যে গুণ তাঁহাতে আছে, সে সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ। ইহাতেই বুঝা যায়, নির্গুণ বলিতে অপ্রাকৃত গুণহীনতা বুঝায় না।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ১।৩।৫৩॥" অদ্বয় অর্থ দ্বিতীয়হীন, যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব, যাঁহা ব্যতীত অপর কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। তাই অদ্বয় বলিতে ভেদশূন্য-তত্ত্বকে বুঝায়। ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্ব। সজাতীয় বলিতে সমান-জাতীয় বা এক জাতীয় বস্তুকে বুঝায়। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, নারিকেলগাছ, শালগাছ ইত্যাদি একই বৃক্ষজাতীয় বস্তু, তাই তাহারা সজাতীয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে—আমগাছ এক শ্রেণীর গাছ, নারিকেল গাছ আর এক শ্রেণীর গাছ, ইত্যাদি ভেদ আছে। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ সজাতীয় ভেদ নাই। যদি বলা হয়—রাম-নৃসিংহ-নারায়ণাদিও তো শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় চিদ্‌বস্তু, সুতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় এবং তাঁহারা পৃথক্ স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহাদের ভেদও আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও সজাতীয় ভেদ আছে। উত্তরে বলা যায়—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাম-নৃসিংহাদি স্বয়ংসিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব নহে, স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন বিগ্রহেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে নানা রূপ ধারণ করেন। "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১॥—এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে অভিহিত হন।" সুতরাং ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নহেন আর তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, রাম-নৃসিংহাদি পৃথক্ ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা হইলেও তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া, তাঁহাদের সত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই সত্তার অপেক্ষা রাখে বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদ নহেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-ভেদশূন্য।

আর, বিজাতীয় বলিতে ভিন্ন জাতীয় বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ-জাতীয়; আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইল জড়-জাতীয়। তাই, আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা শ্রীকৃষ্ণের সত্তারই অপেক্ষা রাখে, বিশেষতঃ ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি মায়ার

পরিণতি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদ নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদশূন্য।

অণুচৈতন্যজীবও শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই জীবশক্তি বলিয়া স্বয়ংসিদ্ধ নহে; তাই জীবও শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংসিদ্ধ ভিন্ন বস্তু নহে।

স্বগত-ভেদ হইল মুখ্যতঃ দেহ-দেহী ভেদ। জীবের দেহ হইল জড়, দেহী বা জীবাত্মা হইল চিৎ; তাই জীবে দেহ ও দেহী দুই ভিন্ন জাতীয় বস্তু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে (এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপেও) এরূপ কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁহাতে দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, একই। যেমন চিনির পুতুল—সর্ব্বত্রই চিনি; এই চিনি যদি চেতনবস্তু হইত, তাহা হইলে পৃথক্ কোনও আত্মার অধিষ্ঠানব্যতীতও চিনির পুতুল চলাফিরা করিতে পারিত, কথা বলিতে পারিত। ভগবানও তদ্রূপ কেবল আনন্দ, চেতন আনন্দ। যেমন লবণপিণ্ডের সর্ব্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই আনন্দ, তাঁহাতে আনন্দ ব্যতীত অপর কিছুই নাই। "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব। বৃহদারণ্যক। ৪।৫।১৩॥" তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। বেদান্তের "অরূপবৎ এব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥"-সূত্রে একথাই বলা হইয়াছে (১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সুতরাং দেহী শ্রীকৃষ্ণ একবস্তু, তাঁহার দেহ আর এক বস্তু—তত্ত্বতঃ তাহা নয়। তবে যে সাধারণতঃ "শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ"—ইত্যাদি বলা হয়, তাহা কেবল ভাষার ভঙ্গীমাত্র, উপচারবশতঃই এরূপ বলা হয়। "সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ। ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনঃ॥ ল, ভা, কৃ, ৩৪১॥—শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবস্তু বলিয়া উপচারবশতঃই তাঁহার সম্বন্ধে দেহ-দেহিভেদ বলা হয়; এই ভেদ তাত্ত্বিক নহে।" তাই কূর্ম্মপুরাণ বলেন "দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥—ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই।"

শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী-ভেদ না থাকার একটী অদ্ভূত প্রভাব এই যে, তাঁহার বিগ্রহের যে কোনও অংশই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তিধারণ করে। জীবের দেহ ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ আদি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। এই পঞ্চভূতও আবার সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে অবস্থিত নয়। চক্ষুতে-তেজের পরিমাণ বেশী, তাই চক্ষু দেখিতে পায়। কর্ণে শব্দের পরিমাণ বেশী, তাই কর্ণ শুনিতে পায়। চক্ষু কিন্তু শুনিতে পায় না, কর্ণও দেখিতে পায় না। উপাদানের পরিমাণ-পার্থক্য বশতঃই এইরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণে (বা যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপে) আনন্দব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিয়া বিগ্রহের সর্বত্রই একই বস্তু একই পরিমাণে অবস্থিত। এই আনন্দ আবার চেতন, জ্ঞানস্বরূপ। তাই বিগ্রহের যে কোনও অংশই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৩২।"

যদি কেহ বলেন—ভগবানে দেহ-দেহী-ভেদ না থাকিতে পারে; কিন্তু হস্ত-পদাদি-ভেদ, নাসা-নেত্রাদি ভেদ তো আছে। সে সমস্ত কি স্বগত-ভেদ নহে? এসমস্ত স্বগত-ভেদ নহে; এ সমস্ত ভেদও ঔপচারিক; বিগ্রহের সকল অংশই যখন সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিধারণ করে, তখন বাস্তবিক ভেদ কিছু নাই।

ভগবানের বিভিন্ন গুণাদিও তাঁহার স্বগত-ভেদ নহে। তিনি সশক্তিক আনন্দ; তাঁহার শক্তিকে আনন্দ হইতে পৃথক্ করা যায় না। তাঁহার গুণাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্রী বিশেষ বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং গুণাদিও স্বগতভেদের পরিচায়ক নহে।

এইরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য বলিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

সর্ব্ব-কারণ-কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।১॥" গীতাও একথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ মত্তঃ পরতরং

নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৬-৭ ॥ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥ ৭।১০॥"—শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের বীজ বা কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পরতর) আর কিছু নাই। মাণ্ডুক্য শ্রুতিও বলেন "এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষঃ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত-তত্ত্ব। "কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ১।২।৭৮ ॥" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একথা বলিয়াছেন। "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ॥ ৯।৪ ॥" শ্রুতিও তাহাই বলেন। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ গোপালতাপনী, উ, তা, ৯৭ ॥"-এই শ্রুতির "সর্ব্ব-ভূতাধিবাসঃ"-শব্দই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাপক। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার বিশ্বরূপে অর্জ্জুনকে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন (গীতা একাদশ অধ্যায়)।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরবপু। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্ ॥ ৪।১১।২ ॥" এই প্রমাণ হইতে পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি অর্থাৎ দ্বিভুজ, দ্বিপদ, একমস্তক, দ্বিচক্ষুঃ, দ্বিকর্ণ। গোপাল-তাপনী শ্রুতিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ পূ, তাপনী। ২১ ॥—তিনি কমলনয়ন, নবজলধরবর্ণ, পীতবসন, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালী এবং ঈশ্বর।"

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলা আছে। লীলা অর্থ ক্রীড়া বা খেলা। কোনও কার্য্যসিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া কেহ খেলায় প্রবৃত্ত হয় না। ছোট শিশুরা আনন্দের উচ্ছ্বাসে খেলায় প্রবৃত্ত হয়, উদ্দেশ্যও আনন্দভোগ। আনন্দ-স্বরূপ—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও আনন্দের প্রেরণায় লীলা করিয়া থাকেন, উদ্দেশ্যও আনন্দাস্বাদন, রসাস্বাদন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-স্পৃহাই লীলার প্রবর্ত্তক।

শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত-রসবৈচিত্রী বর্ত্তমান। অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন রস-রূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাঁহার স্বয়ংরূপেও অনুষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার স্ব-স্বরূপেরও লীলা আছে, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরও লীলা আছে।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥ পূ, তা, ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ পরম দেবতা।" দিব্ ধাতু হইতে দেবতা বা দৈবত শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। দেবতা-শব্দের অর্থ লীলাকারী বা লীলাপরায়ণ। পরম-দেবতা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ লীলাপরায়ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। গোপালতাপিনী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও তাহাই বলেন। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ॥ ৬।৭ ॥"—এস্থলে পরম-ব্রহ্মকে "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্"—লীলাকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাকারী বলা হইল। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই লীলাপরায়ণ; তাঁহাদের সকলের মধ্যে যিনি "ঈশ্বর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর", সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বাতিশায়ী লীলাপরায়ণ—লীলা-পুরুষোত্তম। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যেরূপ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের স্ফুরণ হয়, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের লীলায় তদ্রূপ হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ। ২।২১।৮৩॥"

লীলা বা খেলা একাকী হয় না। খেলার সঙ্গী চাই; ভগবানের খেলার সঙ্গীদের বলে পরিকর। খেলার স্থানও দরকার; ভগবানের লীলার স্থানকে বলে ধাম।

ধাম। ব্রহ্মের ধামের কথা শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন—"ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে

ম্বেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ২।২।৭॥"—ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মধামে), ব্যোমে (পরব্যোমে) বিরাজ করেন। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নীতি॥ শ্রুতি॥—সেই ভগবান্ কোথায় থাকেন? নিজের মহিমায়।" নিজের মহিমা বলিতে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মহিমাকে বুঝায়। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই তাঁহার ধাম। গীতাতেও ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যেস্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয়না, তাহাই আমার পরম ধাম।"

গোপালতাপনী-শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি॥ পূ, তা, ৩৫॥" বৃন্দাবন গো-গোপাদির স্থান। ঋগ্‌বেদের "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ১৫৪।৬॥"—এই বাক্যে শোভন শৃঙ্গযুক্ত-গো-সমূহসমন্বিত উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পরম-পদের (পরম-ধামের) কথা জানা যায়।

পরিকর। পুরাণাদিতে ভগবৎ-পরিকরাদি সম্বন্ধে অনেক উক্তিই আছে। গোপালতাপনী শ্রুতিতে রুক্মিণী, ব্রজস্ত্রী, প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ রুক্মিণী। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ॥ উ, তা, ৫৭॥" ঋক্-পরিশিষ্টে শ্রীরাধার নামও পাওয়া যায়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা॥ বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি॥"

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষকত্ব। শ্রীকৃষ্ণ "মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি ভাণ্ডার॥ ২।২১।৩৪॥" তাঁহার রূপগুণাদির মাধুর্য্য এতই অধিক যে, "যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী, করে আকর্ষণ। ২।২১।৮৪॥" কেবল ত্রিভুবন নহে, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং লক্ষ্মীগণের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে; "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তাঁ-সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে দেববাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি এক অনির্ব্বচনীয়-আকর্ষণ-শক্তি আছে যে তাহাতে—অন্যের কথা তো দূরে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আস্বাদন-লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন। "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বলে। কৃষ্ণ-আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল॥ ১।৪।১২৮॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১১৪॥" অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই অধিক এবং এমনি চমৎকারপ্রদ যে, তাহা কেবল অনুভববেদ্য, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই মাধুর্য্যের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উপযুক্ত শব্দের অভাবে তাঁহারা কেবল "মধুর মধুর" বলিয়াই আকুলি-বিকুলি দ্বারা নিজেদের অতৃপ্তি এবং অক্ষমতারই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি-মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত।" আর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর, তাতে যেই মুখ-সুধাকর। মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভার॥ মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে, ব্যাপে সভ ত্রিভুবনে, দশদিকে বহে যার পুর। ২।২১।১১৬-১৭॥" (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের বিশেষ বিবরণ ২।২১।৯২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রত্যেকেরই পূর্ণতম-বিকাশ থাকিলেও, মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য; তাঁহার ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যেরই অনুগত, ঐশ্বর্য্যের প্রতি অণু-পরমাণু যেন মাধুর্য্যরস-নিষিক্ত; তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও মধুর—অন্যস্থলের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভীতিপ্রদ, সঙ্কোচোৎপাদক বা গৌরব-বুদ্ধিজনক নহে। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর মাধুর্য্যের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রাধান্যের সংবাদ বোধ হয় পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে জনসমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ পরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন; তাই ভগবত্তার কথা শুনিলেই স্বভাবতঃ লোকের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাবই স্ফুরিত হয়—লোক সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যকেই ভগবত্তার সার বলিয়া মনে করে; কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য-সন্ত্রস্ত-জীবের কর্ণে

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু মৃদু-মধুর হাস্যনিষিক্ত জলদ-গম্ভীর স্বরে একটী অভয়-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন— ঐশ্বর্য্য ভগবত্তার সার নহে—"মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। চৈঃ চঃ মঃ ২১।৯২।"

নরবপুর বিভুত্ব। বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সাকার, দ্বিভুজ নরবপু। বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্ম বলিয়া সাকার-রূপেও তিনি বিভু—সর্ব্বগ, অনন্ত—ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান পরিমিত দেহেই যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক, বিভু—মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন; বিভু না হইলে—যাঁহাকে দেখিতে ছোট একটী শিশুর ন্যায় মনে হয়, তাঁহার ছোট একখানি মুখের ছোট একটী গহ্বরে যশোদামাতা কিরূপে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত-কোটি ভগবদ্ধাম, ব্রজমণ্ডল, এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত দেখিলেন? তিনি যে বিভু এবং তিনি যে আশ্রয়-তত্ত্ব—তাহাই তিনি এই এক লীলায় দেখাইলেন। দ্বারকায় অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মা এক সঙ্গে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন; আর প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত; অথচ তিনি তখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারকাতেই প্রকটলীলা করিতেছেন। (২।১।৪০-৪৭॥) বস্তুতঃ বিভু বলিয়া তিনি পরিদৃশ্যমান পরিমিত-বিগ্রহদ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা আছেনও। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ, তা, ২১॥"—ইত্যাদি বাক্যে যে গোপালতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ নরাকৃতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই শ্রুতিতেই আবার তাঁহাকে "সর্ব্বব্যাপী" বলা হইয়াছে। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ উ, তা, ৯৭॥" ইহাতেই বুঝা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতেই তিনি যেমন "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্," তেমনি নরবপুতেও বিভু।

বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়; যে সময়ে তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক, ঠিক সেই সময়েই তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র; "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ (শ্বেতাশ্বতর। ৩।২০॥, কঠ ১।২।২০।)।" তিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু; অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। 'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥ লঘুভাগবতামৃত-ধৃতকূর্ম্মপুরাণ-বচন। কৃ। ৯৭।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। আদি ৪র্থ।" শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যের প্রভাবেই এইরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্ভব।

করুণা। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তাঁহাতে করুণা ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণ নাই। ব্যক্ত-শক্তিক ভগবৎস্বরূপ-সমূহে আছে; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে করুণা ও ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণের পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণে কারুণ্য এতই অভিব্যক্ত যে, মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত; বাস্তবিক তাঁহাতে "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।৩।৫।"—হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাতে ভক্তবাৎসল্য এতই অভিব্যক্ত যে পরম-স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও তিনি নিজেকে ভক্ত-পরাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"অহং ভক্ত-পরাধীনঃ। শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩।" বাস্তবিক সংসার-তাপক্লিষ্ট জীবের পক্ষে ভগবৎ-করুণাই বিশেষ ভরসার কথা। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ-সূত্র; যে স্থলে তাহার অভাব, সে স্থলে জীবের আর উদ্ধারের আশা কোথায়? ত্রিতাপ-দগ্ধ জীব স্বীয় উদ্ধারের নিমিত্ত কাতর-প্রাণে ভগবচ্চরণে স্বীয়-দীন-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারে; কিন্তু ভগবান যদি করুণ না হয়েন, তাহা হইলে জীবের কাতর ক্রন্দনে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই বা হইবে কেন? কিন্তু শ্রীভগবান্ করুণ, পরম-করুণ; কাতর প্রাণে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকার কথা তো দূরে, অন্য ব্যপদেশেও যদি তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, নামাভাস-উচ্চারণকারীকেও তিনি সংসার-বন্ধন-হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। তাহার সাক্ষী অজামিল। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণ-নামক স্বীয় পুত্রকে তিনি ডাকিয়াছিলেন; পরম-করুণ স্বয়ং নারায়ণ ঐ ডাককে উপলক্ষ্য করিয়াই যমদূতের কঠোর হস্ত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করার নিমিত্ত স্বীয় দূতগণকে পাঠাইয়া দিলেন।

শক্তিতত্ত্ব

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—চিচ্ছক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ-স্বরূপ; তাঁহার এই চিৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় শক্তিকে চিৎ-শক্তি (চিচ্ছক্তি) বলে; এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই এই শক্তি ক্রিয়াশীলা; এই শক্তির সাহায্যেই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ-লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন; এজন্য এই শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে। এই শক্তি স্বরূপেও চিদ্‌বস্তু, স্বপ্রকাশ বস্তু। অনন্ত কোটি জীব শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ। জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তিও বলে, কারণ, ইহা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কোনটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে; তদুভয় হইতে পৃথক্ একটা শক্তি—সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রেরও অন্তর্ভুক্ত নহে, উচ্চ-তীরেরও অন্তর্ভুক্ত নহে, উভয় হইতে পৃথক্ একটা স্থান, তদ্রূপ। "তত্তটস্থঞ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ। ষট্ সন্দর্ভঃ॥" এই জীবশক্তি কিন্তু স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তি এতদুভয়ের নিয়ন্ত্রণেই প্রবেশ করিতে পারে। জীব যখন স্বীয়-স্বরূপের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া যায়, তখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কবলে পতিত হয়; আর যখন স্বীয় স্বরূপের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তাহাকে অঙ্গীকার করে। যে শক্তির কার্য্যক্ষেত্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তাহাকে মায়াশক্তি বলে। এই শক্তি কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কার্য্যস্থলেও যাইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ হইতে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির কার্য্যস্থল হইতে সর্ব্বদা বাহিরে থাকে বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে॥

গুণমায়া ও জীবমায়া। মায়াশক্তির দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বলে গুণমায়া; ঈশ্বরের শক্তিতে এই গুণমায়া জগতের গৌণ-উপাদান রূপে পরিণত হয়। জীবমায়াও ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাকে মুগ্ধ করে; জীবমায়া এইরূপে ঈশ্বরের শক্তিতে, সৃষ্টিকার্য্যে জগতের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরের সহায়তা করিয়া গৌণ-নিমিত্ত-কারণ-রূপে পরিণত হয়। এই মায়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কখনও সংসার-সুখ ভোগ করায়, আবার কখনও বা দুঃখ দিয়া জর্জ্জরিত করে।

সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবানের স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটী বস্তু আছে। তদনুসারে তাঁহার চিচ্ছক্তিরও তিনটী বৃত্তি আছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। তাঁহার সৎ-অংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী, চিৎ-অংশের শক্তিকে বলে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী। সন্ধিনী—সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজের সত্তাকে রক্ষা করেন এবং অপরের সত্তাকেও রক্ষা করেন। সম্বিৎ—জ্ঞান (চিৎ)-সম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজেও জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন। আর হ্লাদিনী—আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা ভগবান্ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং অপরকেও আনন্দদান করিতে পারেন। ইহাদের প্রত্যেক শক্তিরই আবার অনন্ত বিলাস-বৈচিত্রী আছে। (১।২।৮৪ পয়ারের টীকায় স্বরূপশক্তিসম্বন্ধে, ১।২।৮৬ পয়ারের টীকায় জীবশক্তিসম্বন্ধে এবং ১।২।৮৫ পয়ারের টীকায় ও ১।১।২৪ শ্লোকটীকায় মায়াশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

সৎ, চিৎ এবং আনন্দকে যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তদ্রূপ, সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীকেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিচ্ছক্তির যে বিলাসে ইহাদের একটী বর্ত্তমান থাকিবে, সেই বিলাসে অপর দুইটীও বিদ্যমান থাকিবেই, তবে হয়তো পরিমাণের কিছু তারতম্য থাকিতে পারে।

শুদ্ধসত্ত্ব। মূর্ত্তি। চিচ্ছক্তি স্বপ্রকাশ, চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ—তাহা নিজকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তি বিশেষের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার

স্বরূপে বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি-বিশেষ-রূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে শুদ্ধ-সত্ত্ব বলে (ভগবৎ সন্দর্ভ। ১১৮)। মায়ার সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলে। বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি। যখন সংবিৎ-শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বলে আত্মবিদ্যা ; আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক ; ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। গুহ্যবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক ; ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—এই তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমান ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে বলে মূর্ত্তি ; এই শক্তিত্রয়-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব (বা মূর্ত্তি) দ্বারা পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও পরিকরাদির বিগ্রহ প্রকাশিত হয়। (১।৪।৫৫ পয়ারের টীকায় এবং ১।৪।১০ শ্লোকটীকায় শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

মূর্ত্তা ও অমূর্ত্তা শক্তি। এই শক্তি-সমূহের আবার দুই রূপে স্থিতি—প্রথমতঃ কেবল মাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত ; দ্বিতীয়তঃ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে চিচ্ছক্তি ভগবদ্-বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহাই ভগবৎ-পরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন। ভগবৎ-সন্দর্ভ। ১১৮। শ্রীরাধিকাদি হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

যোগমায়া। চিচ্ছক্তির আর এক মূর্ত্ত বিগ্রহের নাম যোগমায়া। ইনি লীলার সহায়কারিণী। লীলায় রস-পুষ্টির নিমিত্ত কোনও কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া তাঁহাদের স্বরূপের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করার প্রয়োজন হয় ; যোগমায়াই এইরূপ মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের সুযোগ করিয়া দেন। এই যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

জীবমায়া ও যোগমায়ার পার্থক্য। জীবমায়া ও যোগমায়ার পার্থক্য এই যে, স্বরূপ-লক্ষণে জীবমায়া হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি, আর যোগমায়া হইতেছেন তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। তটস্থ-লক্ষণে জীবমায়ার কার্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, যোগমায়ার কার্য্য চিন্ময় ভগবদ্ধামে। জীবমায়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের মুগ্ধত্ব জন্মায়—জীব-স্বরূপ-বিরোধী—হেয়, নশ্বর, পরিণাম-দুঃখময় এবং কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাবর্দ্ধনকারি প্রাকৃতসুখভোগের নিমিত্ত ; আর যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের এবং-পরিকরগণের এবং কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ত ভক্তগণের মুগ্ধত্ব জন্মায়—লীলারসের পুষ্টিসাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের নিমিত্ত এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস ভক্তগণকে ভোগ করাইবার নিমিত্ত।

ধামতত্ত্ব ও পরিকর-তত্ত্ব

ধাম ও পরিকর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম এবং রসিক-শেখর ; লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি লীলা বা ক্রীড়া করেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া করিতে হইলে লীলার সহায়ক পরিকরের প্রয়োজন এবং লীলার স্থানেরও প্রয়োজন। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত শুদ্ধ-সত্ত্ব লীলার ধাম ও পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই এইরূপ ধাম ও পরিকর আছেন, সমস্ত ধামই নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়। ১।৩।২২ এবং ১।৪।৫৬-৫৭ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণলোক ও পরব্যোম। সিদ্ধলোক। ধাম সবিশেষ ; সিদ্ধলোক নির্ব্বিশেষ। কারণসমুদ্র।—সম্বিদংশ-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তিই ধামরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ধামের নাম কৃষ্ণলোক ; ইহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। দ্বারকা-মথুরা হইতে গোকুলেরই বৈশিষ্ট্য। গোকুলই স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব-ধাম। গোকুলের অপর নাম ব্রজ ; ইহাকে গোলোক, বৃন্দাবন এবং শ্বেতদ্বীপও বলে। (১।৫।১৩-১৪ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমষ্টির সাধারণ নাম পরব্যোম ; বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের বিভিন্ন ধাম এই পরব্যোমেরই অন্তর্ভুক্ত। পরব্যোম, শ্রীকৃষ্ণ-লোকের নিম্নদেশে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণলোক ও পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপের ধামসমূহ সবিশেষ ; প্রত্যেক ধামেই জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি লীলার সমস্ত উপকরণ আছে ; কিন্তু প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৃক্ষ-লতাদির ন্যায় এ সমস্ত প্রাকৃত বস্তু নহে ; তাহারা চিন্ময় নিত্যবস্তু, চিচ্ছক্তির বিলাস। (১।৫।৪৫। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরব্যোমে সবিশেষ ধাম-সমূহের বহির্দ্দেশে সিদ্ধলোক-নামে একটি নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে ; ইহাই অব্যক্তশক্তিক-ব্রহ্মের ধাম ; এইস্থানে চিচ্ছক্তি আছে, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস নাই ; কোনও লীলা নাই, লীলার উপকরণাদিও নাই। ইহাও পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত। (১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সিদ্ধলোকের বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার অপর নাম বিরজা। এই কারণ সমুদ্রের বাহিরে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির বিলাসস্থল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। (১।৫।৪৩ পয়ার টীকা এবং ১।৫।৬ শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)। সমস্ত ভগবদ্ধামই নিত্য, চিন্ময়, "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কৃষ্ণতনুসম।" অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, তদ্রূপ তাঁহাদের ধামও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধাম শ্রীগোলকেরই প্রকাশবিশেষ। ১।৫।১১ ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রজরস ও ব্রজপরিকর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা, গোপ অভিমান, গোপবেশ। ব্রজে তিনি চারিভাবের লীলারস আস্বাদন করিতেছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (শুদ্ধ-সত্ত্ব) প্রত্যেক ভাবের অনুকূল লীলা-পরিকর-রূপেই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। দাস্য-রসের পরিকরদিগের নাম রক্তক, পত্রক ইত্যাদি। ইহারা শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধিবশতঃ দাসোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন। সখ্যভাবের পরিকরদিগের নাম সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি। দাস্যভাবের পরিকরগণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের মমতাবুদ্ধি অধিক ; ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখার ন্যায় সমান-সমান ভাবে ব্যবহার করেন, একসঙ্গে খেলা করেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন, কখনও বা কৃষ্ণেরই কাঁধে চড়েন, নিজেদের মুখের উচ্ছিষ্ট ফলও কৃষ্ণকে খাইতে দেন। দাস্যে গৌরব-বুদ্ধিজাত সঙ্কোচ আছে, সখ্যে তাহা নাই, ইহা মমতাবুদ্ধির আধিক্যের ফল। বাৎসল্যে সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি অধিক ; শ্রীমন্নন্দমহারাজ, শ্রীমতী যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের পরিকর ; ইহারা সম্বিদংশপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তির চরম-পরিণতি। শ্রীমতী যশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান, শ্রীমন্নন্দমহারাজ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মজ ; শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার পিতামাতা ; কিন্তু ইহা অনাদিসিদ্ধ অভিমান-মাত্র। যাহা হউক, পিতৃ-মাতৃ-অভিমানে নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য এবং নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের

লালক বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ব্যবহারও এইরূপ অভিমানের অনুকূলই। মধুরে বাৎসল্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধির আধিক্য। শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণ মধুর-ভাবের পরিকর; ইঁহারা হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীরূপ মূর্ত্তবিগ্রহ। ইঁহাদের অভিমান—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী; শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান; এইরূপ অভিমানের অনুকূলভাবে ইঁহারা নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

মমতাবুদ্ধির আধিক্যে কৃষ্ণবশ্যতার আধিক্য। যেখানে মমতাবুদ্ধির যত আধিক্য, সেখানেই ঘনিষ্ঠতা তত বেশী, সেখানেই প্রীতিও তত বেশী আস্বাদ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে গৌরব করে, আপনা অপেক্ষা বড় মনে করে, তাহার প্রেমে আমি বশীভূত হইনা; কারণ, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু যে আমাকে তাহা অপেক্ষা ছোট মনে করে, অন্ততঃ তাহার সমান মনে করে, আমি সর্ব্বতোভাবেই তাহার প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকি।" তাই দাস্যরস অপেক্ষা সখ্যরস অধিক আস্বাদ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর রস অধিক আস্বাদ্য। সমস্ত রস অপেক্ষা মধুর-রসেই আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই (মধুর) প্রেমা হইতে।"

লোক-সমাজে দেখা যায়, পুত্র যতই বড় হউক না কেন, পিতার নামেই পরিচিত হয়; পুত্রের গৃহও পিতার নামেই পরিচিত হয়। নরলীল শ্রীকৃষ্ণেরও সেই অবস্থা; তাই নন্দ-নন্দন, যশোদা-তনয় প্রভৃতি নামেও তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। আবার নন্দমহারাজকেও ব্রজেশ্বর, ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি নামে এবং যশোদামাতাকে ব্রজেশ্বরী, নন্দগেহিনী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই নামগুলি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অপরিসীম-মাধুর্য্যব্যঞ্জক।

ব্রজপ্রেম। ব্রজপরিকরগণের সকলেই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রেম শুদ্ধমাধুর্য্যময়, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানও তাঁহাদের প্রেমের উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরায়ও দাস্যাদি উক্ত চারিটি ভাব আছে; তবে সে স্থানের ভাব ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত, পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্য দ্বারা সঙ্কোচিত। দ্বারকায় রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ কান্তাভাবের পরিকর; দেবকী-বসুদেব বাৎসল্য ভাবের পরিকর।

পরব্যোমের অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম শ্রীনারায়ণ; ইনি চতুর্ভুজ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের প্রেয়সী। পরব্যোমে বাৎসল্যরস নাই, নর-লীলাতেই বাৎসল্যরসের স্থান; পরব্যোমের লীলা দেব-লীলা, নরলীলা নহে। তাই পরব্যোমে লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতা-মাতা নাই।

ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ধাম, লীলা ও পরিকরাদি তত্তৎস্বরূপের অনুরূপ। সুতরাং স্বরূপশক্তির বিলাস-বৈচিত্রীর তারতম্যানুসারে অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের ধাম-পরিকর-লীলাদি হইতে নারায়ণের ধাম-পরিকর-লীলাদি শ্রেষ্ঠ। পরব্যোম হইতে দ্বারকা-মথুরার মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং দ্বারকা-মথুরা হইতে ব্রজের বা গোকুলের মাহাত্ম্য-পরিকর-লীলাদির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যে আবার দাস হইতে সখাদের, সখা হইতে নন্দ-যশোদাদির এবং নন্দ-যশোদাদি হইতে শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণপ্রেয়সীদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। প্রেয়সীবর্গের মধ্যে অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীরাধিকার রূপ-গুণ-মাধুর্য্য ও রস-পরিবেশন-পারিপাট্য সর্ব্বাতিশায়ী।

ভগবৎ-স্বরূপ

ব্রজের ও দ্বারকার ভাববৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে স্বয়ংরূপে বিরাজিত ; তাঁহার পরিকরাদির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর এক স্বরূপে তিনি দ্বারকা-মথুরায়ও লীলা করিতেছেন ; ব্রজের ভাব-বেশাদি হইতে দ্বারকা-মথুরার ভাব-বেশাদির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ব্রজে তাঁহার গোপবেশ, গোপভাব এবং তদনুরূপ লীলা। দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়-ভাব, ক্ষত্রিয়-বেশ এবং তদনুরূপ লীলা। দ্বারকা-মথুরায়ও তিনি সাধারণতঃ দ্বিভুজ, সময় সময় চতুর্ভুজ হয়েন ; দ্বারকা-মথুরায় তিনি দেবকী-বসুদেবের তনয়-রূপেই পরিচিত ; তাই এস্থলে তাঁর একটী নাম বাসুদেব। দেবকীদেবীর অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতা ; বসুদেবের অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা ; কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত—ব্রজের বাৎসল্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধবাৎসল্য নহে। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের কান্তাপ্রেমও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রিত।

বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের আর এক স্বরূপ আছেন—তাঁহার নাম শ্রীবলরাম ; শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও নরবপু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নবজলধর-শ্যাম নহেন ; তিনি রজত-ধবল। তাঁহার কোনও স্বতন্ত্র ধাম নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত। তিনি ব্রজেও আছেন, দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন। ব্রজে তাঁহার গোপবেশ, গোপভাব ; আর দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়-বেশ, ক্ষত্রিয়-ভাব। তিনিও বসুদেব-নন্দন বলিয়া অভিহিত, বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীদেবী তাঁহার মাতা বলিয়া খ্যাত। দ্বারকায় শ্রীবলরামকে সঙ্কর্ষণও বলা হয়।

দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি স্বরূপকে দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ বলে। দ্বারকায় বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ।

পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহ। পরব্যোমে নারায়ণ-নামে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ আছেন, তিনিও নবজলধর-শ্যাম, কিন্তু চতুর্ভুজ। তিনি সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি, সালোক্যাদি-মুক্তিদাতা। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে পরব্যোমাধিপতির চারিটি ব্যূহ আছেন ; ইঁহারা দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহেরই স্বরূপ-বিশেষ এবং দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূনশক্তিবিশিষ্ট। ইঁহারা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র চারিটী বিগ্রহ—নারায়ণেরই পরিকরভুক্ত। পরব্যোমে লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের কান্তা। এস্থলে **নারায়ণ নরলীল নহেন ; তিনি দেবলীল** ; তাই এই ধামে পিতা-মাতা নাই, বাৎসল্যভাবও নাই। পরব্যোমের লীলা ঐশ্বর্য্য-প্রধান। পরিকরাদি সমস্তই ষড়ৈশ্বর্য্যময়।

পরব্যোম-স্বরূপ। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপের পৃথক্ পৃথক ধামও এই পরব্যোমেরই অন্তর্গত ; শ্রীরাম-নৃসিংহাদিরও পরিকরাদি আছেন। পরব্যোমস্থ ভগবদ্ধামসমূহের বহির্ভাগে যে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধ-লোকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম-স্বরূপের ধাম। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা এই ধামই লাভ করেন। সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চারি রকমের মুক্তির যে কোনও রকম মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, পরব্যোমের সবিশেষ অংশেই তাঁহাদের স্থান হয়।

পুরুষত্রয়। সিদ্ধ-লোকের বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ একস্বরূপে কারণার্ণবে অবস্থান করেন ; ইঁহাকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ বলা হয়। ইনি সহস্রশীর্ষা ; মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব ইঁহাতেই আশ্রয় লাভ করে। ইনিই সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ। ইনিই সমষ্টি জীবের বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী। সৃষ্টির পরে ইনিই আবার একরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্বেদজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন ; এই স্বরূপের নাম গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষ। ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, সহস্রশীর্ষা এবং যুগাবতার মন্বন্তরাবতারাদির মূল।

ইনিই আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু ওশিব—এই তিনরূপে আত্মপ্রকট করেন ; ব্রহ্মা রূপে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করেন ; তৎপর বিষ্ণুরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবের অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন ; এক স্বরূপে ইনি পয়োব্ধিতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া ইঁহাকে পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণ বা তৃতীয় পুরুষ বলে। ইনি চতুর্ভুজ, ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী। ইনি জগতের পালনকর্ত্তা ; আর শিব জগতের সংহার কর্ত্তা।

প্রথম পুরুষই সময়ে সময়ে মৎস্য কূর্ম্মাদি লীলাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন (১।৫।৬৭)। মৎস্য কূর্ম্মাদি লীলাবতারের এবং যুগাবতারাদির ধাম পরব্যোমে ; পরব্যোম হইতে ইঁহারা লীলাহ্মরোধে জগতে অবতীর্ণ হয়েন। (বিশেষ বিবরণ আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রসাস্বাদন

আত্মারামতা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম, স্বরাট্—সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ, কোনও ব্যাপারেই অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কাহারও সহায়তা গ্রহণ করার তাঁহার প্রয়োজন হয়না। তাঁহার শক্তি তাঁহারই সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য সংযুক্ত বলিয়া তাঁহারই স্বরূপভূতা, সুতরাং তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; তাই যথাযথভাবে তাঁহার এই স্বকীয়া শক্তির সহায়তা গ্রহণে তাঁহার আত্মারামতার, আপ্তকামতার, স্বাতন্ত্র্যের বা স্বরাটত্বের হানি হইতে পারে না। স্বরাট্-শব্দেই তাঁহার স্বশক্ত্যেকসহায়তা বুঝায়। অপরের শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিলে অবশ্য তাঁহার অন্যনিরপেক্ষত্ব ক্ষুণ্ণ হইত; কিন্তু তাহা তিনি করেন না, করিবার তাঁহার প্রয়োজনও হয়না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপশক্তি তাঁহার স্বরূপেই নিত্য অবস্থিত, জীবশক্তি বা মায়াশক্তি স্বরূপে অবস্থিত নহে। স্বরূপশক্তির প্রভাবেই তাঁহার রসত্ব—রসরূপে আস্বাদ্যত্ব এবং রসিকরূপে আস্বাদকত্ব (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার এই রসত্ব তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া ইহাতে তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তিরই স্থান নাই। তাঁহার ধাম, পরিকর, লীলা প্রভৃতি তাঁহার রসত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। রসিক-রূপে তিনি রস আস্বাদন করেনও স্বরূপশক্তিরই সহায়তায় এবং যাহা আস্বাদন করেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তিরই বিলাস; যেহেতু, তিনি আত্মারাম, স্বশক্ত্যেকসহায়।

স্বরূপানন্দ ও শক্ত্যানন্দ। কিন্তু তিনি কি আস্বাদন করেন? তিনি যখন রসিক, রসই তিনি আস্বাদন করিবেন। রস আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা দুই রকমের—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং মানসানন্দ। স্বরূপেও তিনি রস—আস্বাদ্যরস; স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় স্বীয় স্বরূপের আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পান, তাহার নাম **স্বরূপানন্দ**। হ্লাদিনীই (অর্থাৎ হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বই) আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এই হ্লাদিনী নিজেও আনন্দরূপা, পরম আস্বাদ্যা। এই হ্লাদিনী যেখানে যত বেশী বৈচিত্রী ধারণ করে, সেখানে তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও তত বেশী। কিন্তু এই হ্লাদিনী যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে, এইরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করেনা। শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত ভক্তহৃদয়ের বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত মিলিত হইলেই ইহা ঐরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিতে পারে। কিন্তু হ্লাদিনী স্বরূপ-শক্তি বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই অবস্থিত; ভক্ত-হৃদয়স্থিত উৎকণ্ঠার সহিত হ্লাদিনীর মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? সম্ভাবনা হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীকে ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। বাস্তবিক রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিয়া থাকেন। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত পরম-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই হ্লাদিনী-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম-আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিতং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। প্রীতিসন্দর্ভঃ।৬৫॥" ভগবানের স্বরূপে হলাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ের বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ; মুখগহ্বরস্থ বায়ু নানা ভঙ্গীতে মুখ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে; এসমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে। কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় শব্দের উদ্ভব হয়, যদ্দ্বারা শ্রোতা এবং বংশীবাদক নিজেও, মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী

যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদন-চমৎকারিতাময়। ভগবানের স্বরূপে অপেক্ষা, সেবা-বাসনা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাদিবশতঃ, ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনীর বৈচিত্রী-বিকাশের সুযোগ এবং অবকাশ বেশী। ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনী সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং এসকল বৈচিত্রীর আস্বাদনেই ভগবানের সমধিক কৌতূহল। ভক্তহৃদয়স্থ সেবাবাসনার সাহচর্য্যে ভগবৎ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী প্রীতিরূপে পরিণত হয়, এবং প্রীতিরূপে পরিণত হ্লাদিনীই অশেষ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনন্ত ভাগবতী প্রীতিবৈচিত্রীরূপে অভিব্যক্ত হয়। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ক্রীড়ার বা লীলার ব্যপদেশে ভক্তহৃদয়ের এই প্রীতিরস-বৈচিত্রী অভিব্যক্ত হইয়া ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। এই আস্বাদনে ভগবান যে আনন্দ পান, তাহাই তাঁহার **স্বরূপশক্ত্যানন্দ**—যেহেতু, এই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী হইতে জাত।

ঐশ্বর্য্যানন্দ। এই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দকে কোন্ অবস্থায় ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং কোন্ অবস্থায় মানসানন্দ বলা হয়, তাহা এখন বিবেচ্য। ভক্তদিগের ভাব অনুসারেই শক্ত্যানন্দ এই দুইটী রূপ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের পরিকর-ভক্তদের দুইটী শ্রেণী আছে ; এক শ্রেণীতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রধান ; আর এক শ্রেণীতে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন। যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য, কৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়াও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। মিষ্ট-অম্বলের চিনি অম্লকে একটু মাধুর্য্য দান করিয়া যেমন তাহার আস্বাদনের একটু চমৎকারিতা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু স্বয়ং প্রাধান্য লাভ করেনা, প্রাধান্য থাকে অম্লেরই, তদ্রূপ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তহৃদয়ের প্রীতিও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে কিছু মাধুর্য্যদান করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মায় বটে কিন্তু নিজে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, প্রাধান্য থাকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই। তথাপি, প্রীতির প্রভাবে ঐশ্বয্যজ্ঞান মাধুর্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া লীলাব্যবদেশে অভিব্যক্তি লাভ করতঃ ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয় ; এই আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পান, তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দ। এই আনন্দও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই আনন্দও শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

মানসানন্দ। আর যেস্থলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত, কিন্তু ভগবান্ আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ি-প্রাধান্য থাকে এবং এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত করিয়া, মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া, পরম-আস্বাদ্য করিয়া তোলে এবং নিজের (মাধুর্য্যের) অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে,—সেস্থলে পরিকর-ভক্তদের চিত্তেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যে-র জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফুরিত হইতে পারেনা, স্ফুরিত হওয়ার অবকাশও পায়না। তাই শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়া অবাধরূপে অনন্ত-বৈচিত্রী ধারণ করিতে সমর্থ হয় ; যেহেতু, বৈচিত্রীবিকাশের ব্যাপারে সেস্থলে প্রীতিকে কোনও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রীতির বিকাশকে যেমন প্রতিহত করে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতি কোনও কিছু-দ্বারাই তদ্রূপ প্রতিহত হয়না ; তাই ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত বৈচিত্রী এবং অনন্ত আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত এই আস্বাদন-চমৎকারিতার আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পান, তাহারই নাম মানসানন্দ। স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

সকল রকমের আনন্দ মনেই অনুভূত হয় ; সুতরাং সকল রকমের আনন্দকেই সাধারণভাবে মানসানন্দ বলা যায়। কিন্তু যে আনন্দের অনুভবে আনন্দাস্বাদনজনিত মনঃপ্রসাদের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই মানসানন্দেরও চরম-পর্য্যবসান। এজন্যই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের হৃদয়স্থিত শুদ্ধ-প্রীতিরসের আস্বাদনজনিত আনন্দকেই বিশেষরূপে মানসানন্দ বলা হয়। যেহেতু, স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদনে আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য এবং তদপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদনে আনন্দের আধিক্য।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান, কারণ, পরব্যোম ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম,

সেখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য নাই। তাই, **পরব্যোমেই ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন।** আর গোলোক, বা ব্রজ, বা বৃন্দাবনের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন; কারণ, ব্রজে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও তাহার প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য মাধুর্য্যের। ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে কবলিত। তাই **ব্রজেই মানসানন্দের আস্বাদন।** আর রূপস্বপানন্দের অস্বাদন সর্ব্বত্রই।

ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত রসবৈচিত্রী বিরাজিত। তিনি অখিল-রসামৃত-বারিধি। তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ। এক এক ভগবৎ-স্বরূপ এক এক রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। প্রত্যেক স্বরূপই রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক। প্রত্যেক স্বরূপই স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন। প্রত্যেক স্বরূপেরই পরিকর আছেন। যে স্বরূপে রসের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্ত, সেই স্বরূপের পরিকরগণের মধ্যেও সেই রসবৈচিত্রীর অনুরূপ ভগবৎ-প্রীতি অভিব্যক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে লীলায় সেই প্রীতিরস আস্বাদন করিয়াই সেই ভগবৎ-স্বরূপ শক্ত্যানন্দ অনুভব করেন এবং তিনি স্বীয় স্বরূপানন্দও আস্বাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে স্বীয় স্বরূপানন্দের এবং শক্ত্যানন্দের অনন্ত বৈচিত্রীই যেন পৃথক্ পৃথক্ রূপে আস্বাদন করিতেছেন। আবার স্বয়ংরূপে সম্মিলিত আনন্দ-বৈচিত্রীরও (স্বরূপানন্দের এবং শক্ত্যানন্দেরও) আস্বাদন করিতেছেন। আবার, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপরূপেও তিনি স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাদি যথাসম্ভবরূপে আস্বাদন করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং তাঁহার উপলক্ষণে পরব্যোমস্থিত অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপও যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা"—ইত্যাদি (শ্রী, ভা, ১০।৮৯।৫৮) শ্লোকই তাহার প্রমাণ (২।৮।৩৩-শ্লোক-ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। আর, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী এবং তদুপলক্ষণে পরব্যোমস্থিত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লক্ষ্মীগণও যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত, "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা-চরত্তপঃ"—ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।১৬।৩৬ শ্লোকই তাহার প্রমাণ (২।৮।৩৪ শ্লোক-ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা "লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ২।৮।১১৩॥ কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আরও অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ "আপন মাধুর্য্যে হয়ে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ ২।৮।১১৪॥" কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব নহে। "কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥ ১।৭।৮৯॥" সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহাদের অংশী। অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপ অবতার বা ভগবৎ-স্বরূপগণের ভক্তভাবই স্বাভাবিক। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ১।৬।৯১॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ। * * *। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান॥ ১।৬।৯১-৯২॥ ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ। 'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥ তাঁর অবতার এক শ্রীযুত লক্ষ্মণ! শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ॥ সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥ ১।৬।৭৫।৭৮॥ পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ। কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার। নিরন্তর দেখি সভার ভক্তির আচার॥ ১।৬।৮২।৮৩॥ নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণগুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর॥ ১।৬।৬৭।৬৮॥ আনের আছুক কাজ আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন। ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ: ১।৬।৯৩।৯৫॥ এইরূপে দেখা যায়, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত এবং এই মাধুর্য্যাস্বাদ-লালসার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মধ্যে ভক্তভাব বিরাজিত। এই ভক্তভাবও তাঁহাদের স্বাভাবিক—স্বরূপগত; প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপতঃ

রস-আস্বাদক বলিয়া তাঁহাদের এই মাধুর্য্যাস্বাদন-লালসা। যে স্বরূপে রসিকত্বের যে বৈচিত্রীর বিকাশ, তাঁহার ভক্তভাবও তদনুরূপ এবং তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনও তদনুরূপই হইয়া থাকে।

রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকটন। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা যায়—স্বীয় অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিকশেখর আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাঁহার রসবৈচিত্রীর আস্বাদন-লালসার পরিতৃপ্তি। এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে তিনি আনুষঙ্গিকভাবেই নানাভাবের সাধককে কৃতার্থ করেন। কিরূপে? তাহাই বলা হইতেছে।

তিনি অখিল-রসামৃত-বারিধি হইলেও ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সকল রসবৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার চিত্ত যেই বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর আস্বাদন-লাভের উপযোগী সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবৎ-কৃপায় সাধনে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহেই সেই বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপে দর্শন দিয়া এবং সেই বৈচিত্রীর আস্বাদন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। একথাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৮।১৪১॥ মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ নারদপঞ্চরাত্রবচনম্॥"

পরিকররূপেও শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন। যাহা হউক, পরিকররূপেও শ্রীকৃষ্ণ রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করিতেছেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণই নিজেদের চিত্তে বিকশিত ভগবৎ-প্রেমদ্বারা সেবা করিয়া সেই ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন রস আস্বাদন করাইতেছেন, তেমন আবার নিজেরাও সেই ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতেছেন। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥" আবার, পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিকশিত প্রীতির অনুরূপভাবে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও আস্বাদন করিতেছেন। এইরূপ দেখা গেল, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্তরসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন। এসমস্ত নিত্য পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই—আবির্ভাববিশেষ (১।৪।৫৬-৫৭ পয়ার, ১।৪।১০ শ্লোকের এবং ১।৪।৬১ পয়ার ও ১।৪।১২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের এবং স্বয়ংরূপের পরিকররূপে স্বীয় অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন, ইহাই বলা যায়।

রসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ জীবশক্তির অপেক্ষা রাখেন না। উল্লিখিত আলোচনায় কেবলমাত্র স্বরূপশক্তির মূর্ত্তরূপ নিত্যপরিকরদের কথাই বলা হইল; যেহেতু, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অপেক্ষা রাখেন। নিত্যপরিকরদের মধ্যে নিত্যমুক্ত জীবও আছেন। "নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ ২।২২।৯॥" ইহারা স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, কিন্তু তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি নহেন—জীবশক্তি। তাই, লীলারস আস্বাদনের জন্য স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের অপেক্ষা রাখেন না, ইহাদের উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। লীলায় সেবা দিয়া এবং লীলায় ইহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে কৃতার্থ করেন; কিন্তু ইহাদের সেবা না পাইলে যে তাঁহার লীলারস আস্বাদনের চেষ্টাই ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে তাঁহার আত্মারামতাই ক্ষুন্ন হইত।

ব্রজে সুবল-মধুমঙ্গলাদি, নন্দ-যশোদাদি, কি রাধাললিতাদি পরিকরগণের রাগাত্মিকা ভক্তি; রাগাত্মিকা ভক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী; এই ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই (১।২২।৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যে সকল পরিকরের রাগাত্মিকাভক্তি, তাঁহাদের মধ্যে মুক্ত জীবও থাকিতে পারেন না; তাই রাগাত্মিকা ভক্তি-রস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে জীবশক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয় না।

জীব-স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যময়ী-সেবাতেই দাসের অধিকার বলিয়া রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগাভক্তিতেই জীবের অধিকার। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নিত্যপরিকরের মধ্যে রাগানুগাভক্তি প্রকটিত,

তাঁহাদের মধ্যেও স্বরূপশক্তির বিলাসভূত পরিকর আছেন—যেমন শ্রীরূপমঞ্জরী আদি। রাগানুগাভক্তির সেবাতে ইঁহারাই মুখ্য পরিকর ; রস-আস্বাদন ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদেরই অপেক্ষা রাখেন ; রাগানুগাভক্তিতেও তাঁহার পক্ষে জীবশক্তির—মুক্ত জীবের—অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন ; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না; তাঁহাদের সেবা না পাইলে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নির্ব্বাহিত হয় না, তাহা নয়। অবশ্য লীলার সেবাতে পরিকরভুক্ত মুক্তজীবগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মনে যে একটু হেয়তার ভাব থাকে, কিম্বা তাঁহাদের মনেও যে নিজেদের সম্বন্ধে হেয়তার ভাব থাকে, তাহা নয়। মন প্রাণ ঢালা সেবা তাঁহারও করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও খুব আগ্রহের সহিতই তাঁহাদের সেবাপ্রাপ্তিজনিত সুখ আস্বাদন করেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন

স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর ॥ ১।৭।৫
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥ ২।৮।১০৮

বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, আত্মারাম, নিত্য, অনাদি। সুতরাং তিনি অজ—জন্মরহিত। তথাপি তাঁহাকে নন্দাত্মজ, নন্দনন্দন, ব্রজেন্দ্রনন্দন, যশোদা-তনয় ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় কেন? তিনি যদি কাহারও সন্তানই হইবেন, তাঁহার জনক-জননীই যদি থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি অজ, অনাদি, নিত্য কিরূপে হইলেন? পরব্রহ্ম বা স্বয়ংভগবানই বা কিরূপে হইতে পারেন? প্রকটলীলায় দেখাও যায়—নন্দযশোদা হইতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। এসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য পিতামাতার প্রয়োজন। তিনি রসস্বরূপ—রসিকশেখর। তিনি অশেষ রসবৈচিত্রী আস্বাদন করেন। ইহাদের মধ্যে একটী রস হইতেছে বাৎসল্যরস। সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ-মমতা, তাহারই নাম বাৎসল্য; এই বাৎসল্যই অবস্থাবিশেষে পরমাস্বাদ্য রসে পরিণত হয়। পিতামাতাই হইলেন বাৎসল্যের আধার; তাই পিতামাতা না থাকিলে কাহারও পক্ষেই বাৎসল্যরস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না —শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও না। তাই, বাৎসল্যরস আস্বাদন করার নিমিত্ত অজ-শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পিতামাতার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কোনও সত্যিকারের পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারেনা; যেহেতু তিনি অজ, নিত্য। তথাপি তিনি বাৎসল্যরস আস্বাদন করেন—পরিকরের সহযোগিতায়।

অভিমানবশতঃই পরিকরভুক্ত নন্দ-যশোদার পিতৃমাতৃত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মবশতঃ নয়। তাঁহার অসংখ্য পরিকর; তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীনন্দ, আর একজনের নাম শ্রীযশোদা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের একটা সম্বন্ধের অভিমান আছে—শ্রীনন্দ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান, আত্মজ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের জনক; আর শ্রীযশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী। এইরূপই তাঁহাদের দৃঢ়া প্রতীতি; এইরূপ দৃঢ়া প্রতীতিকেই এস্থলে অভিমান বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান; তিনি মনে করেন—নন্দ-যশোদা তাঁহার জনক-জননী, তিনি তাঁহাদের সন্তান। উভয় পক্ষের এইরূপ দৃঢ়া প্রতীতি না থাকিলে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব বা যশোদা-তনয়ত্ব এবং নন্দ-যশোদার কৃষ্ণ-জনক-জননীত্ব হইল কেবল অভিমানজাত সম্বন্ধ, বাস্তব জন্মমূলক সম্বন্ধ নহে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ধামের নাম গোলোক বা ব্রজ; শ্রীনন্দ-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলিয়া তিনিই ব্রজের অধিপতি বা ব্রজেশ্বর বা ব্রজেন্দ্র; আর শ্রীযশোদা হইলেন ব্রজেশ্বরী। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন বা ব্রজেশ্বরীসুতও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ—জ্ঞানস্বরূপ হইলেও লীলারস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্বকে প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার চিত্তে নন্দনন্দনের অভিমান জাগাইয়াছে। বস্তুতঃ লীলাশক্তি নন্দ-যশোদার প্রেমের এমনই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, যে তাহার প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ অভিমান জন্মিয়াছে।

পরব্যোম ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম; পরব্যোমে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, রাম ব্যতীত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অনুভূতি আছে—তাঁহারা ভগবান্, সুতরাং অজ; তাঁহাদের পরিকরগণের মধ্যে প্রেমের এমন উৎকর্ষ নাই, যাহার প্রভাবে তাঁহাদের ভগবত্তার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইতে পারে। তাই কাহারও উপর সন্তানত্বের অভিমান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারেনা, বাৎসল্যরসের আস্বাদনও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। **পরব্যোমে বাৎসল্যরস নাই।**

দ্বারকা-মথুরার বাৎসল্য। দ্বারকা-মথুরার ভাব ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য। অবশ্য মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য। পরব্যোমেও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য মিশ্রিত আছে; কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্য্যেরই প্রাধান্য। দ্বারকা-মথুরায় মাধুর্য্যের প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য যে মাধুর্য্য-মণ্ডিত, তাহা নয়; দ্বারকা-মথুরার ঐশ্বর্য্য কোনও কোনও সময়ে প্রাধান্য লাভ করে; মাধুর্য্য তখন প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মাধুর্য্যের প্রাধান্য বলিয়া দ্বারকা-মথুরায় বাৎসল্য থাকা সম্ভব। এই দুই ধামেও শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা (অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ-অভিমানযুক্ত পরিকর) আছেন—বসুদেব ও দেবকী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—ভগবান্, এই অনুভূতি সময় সময় তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হয়; তখন তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, আস্বাদ্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

ব্রজের শুদ্ধমাধুর্য্য। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যের প্রাধান্য। ব্রজে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইলেও মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়িত্ব, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই; ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত; তাই কেবল মাধুর্য্য-পুষ্টির, লীলারস-পুষ্টির জন্যই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—তাহাও আবার মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া; তাই লীলাকারীদের কেহই ঐশ্বর্য্যকে চিনিতে পারেন না, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবেই যে লীলারস পুষ্টিলাভ করিতেছে—এই অনুভূতিও তাঁহাদের কাহারও নাই। ইহা ব্রজপরিকরদের প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষেরই ফল। এই উৎকর্ষের ফলেই নন্দ-যশোদার অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। বসুদেব-দেবকীর অভিমানের ন্যায়, নন্দ-যশোদার এই অভিমান কখনও ক্ষুণ্ণ হয়না; ইহা নিত্য একভাবে বিরাজিত; তাঁহাদের প্রেমাতিশয্যের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তদনুরূপ—নন্দ-যশোদার তনয়ত্বের অভিমান সতত অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই, ব্রজের বাৎসল্য কখনও সঙ্কুচিত হয় না; বরং প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মাধুর্য্য বিকাশ করিয়া অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন চমৎকারিতা ধারণ করে। এইরূপ নির্ম্মল বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও অপরিসীম আনন্দ (মানসানন্দ) লাভ করিয়া থাকেন। দ্বারকা মথুরার বাৎসল্য সময় সময় ঐশ্বর্য্যদ্বারা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া সেখানকার বাৎসল্যরস অপেক্ষা ব্রজের বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ অনেক বেশী।

কেবল বাৎসল্য কেন, দ্বারকা-মথুরার দাস্য, সখ্য, মধুররসও সময় সময় ঐশ্বর্য্যদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া আস্বাদ্যত্ব হারাইয়া ফেলে (১৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ব্রজে এরূপ সঙ্কোচনের সম্ভাবনা নাই; যেহেতু ব্রজে ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই, ব্রজে সমস্ত রসের আস্বাদন-চমৎকারিতার উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী।

ব্রজেই ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ। ব্রজরসের আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষের হেতু এই যে ব্রজে আনন্দ-স্বরূপ—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপত্বের—রস-স্বরূপত্বের—তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। মাধুর্য্যের এই পূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে, তাঁহার পরিকরবর্গের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহাদের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে, অধিকন্তু উভয়ের স্বরূপজ্ঞান-সম্বন্ধেও উভয়ের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়াছে। রস-আস্বাদনের জন্য এইরূপ মুগ্ধত্ব অত্যাবশ্যকরূপে অপরিহার্য্য। রস আস্বাদনের জন্য অন্ততঃ তিনটী জিনিসের বিশেষ দরকার—রস-আস্বাদনের জন্য ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠাময়ী বলবতী লালসা, রসের পাত্র ভক্তব্যতীত অন্যত্র এই পরমলোভনীয় রসের সুদুর্ল্লভতার জ্ঞান এবং রসের পাত্র ভক্তের নিকটে রস-আস্বাদক শ্রীকৃষ্ণের অকপট বশ্যতা। এই তিনটী বস্তুর একটীর অভাব হইলেও বিশুদ্ধরসের নিরবচ্ছিন্ন আস্বাদন সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যদি তাঁহার চিত্তে প্রকট থাকে (যেমন পরব্যোমে), তাহা হইলে উক্ত তিনটী বিষয়ের একটীরও অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকেনা; যিনি ঈশ্বর—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থ—তাহার অভাব কিসের? তিনি আবার কাহার বশীভূত হইবেন? তার প্রয়োজনই বা কি? আর শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান যদি পরিকরদের মধ্যেও জলন্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে (যেমন পরব্যোমে), তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষেও মনঃপ্রাণ-ঢালা সেবা-বাসনা জাগ্রত হইতে পারে না, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে সেই বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাহাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়,

শিথিল হইয়া যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে লোভনীয় হয় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত ॥" কিন্তু ব্রজে মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষময় বিকাশ ঐশ্বর্য্যকে কবলিত—সর্ব্বতোভাবে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত—করিয়া নিজের অনুগত করিয়া রাখিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের এবং তাহার পরিকরবর্গের চিত্ত হইতেও তাঁহার ভগবত্তার জ্ঞানকে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে রস-আস্বাদনের যোগ্যতা এবং পরিকরবর্গের চিত্তকে রস-পরিবেশনের যোগ্যতা দান করিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া তাঁহার চিত্তে নন্দ-নন্দনত্বের দৃঢ় অভিমান জাগাইয়াছে। আবার, মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া ব্রজরসেরও আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাতিশায়িনী—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রসের পরম-লোভনীয়তা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামেও নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসত্বের—রসরূপে আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকরূপে আস্বাদকত্বের—চরমতম বিকাশও ব্রজেই। আর ব্রজে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ—ঐশ্বর্য্যবশীকরণ-সমর্থ বিকাশ বলিয়া ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেই, সুতরাং ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ—তিনিই পরব্রহ্ম।

ব্রজেন্দ্রনন্দনেই মাধুর্য্যের পূর্ণতমবিকাশ—তিনিই পরব্রহ্ম। আবার মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ-বশতঃই যখন ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব, এবং মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশবশতঃই যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বের অভিমান, তখন ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শব্দদ্বারাই তাঁর পরব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম-বিকাশত্ব—সূচিত হইতেছে। তাই "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" পরব্রহ্ম হইয়াও নন্দ-যশোদার বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া তিনি বালগোপালরূপে নন্দমহারাজের অলিন্দে হামাগুড়ি দিয়াছিলেন। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—"অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তম বিকাশ বলিয়া তাহার ব্রজলীলাও সর্ব্বোত্তম এবং মানুষের ন্যায় ব্রজে তাঁহার পিতামাতা (অবশ্য অভিমানমূলক) আছে বলিয়া তাঁহার তত্রত্য লীলাও নরলীলা। সুতরাং তাঁহার এই নরলীলার মাধুর্য্যই সর্ব্বোত্তম। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" তাঁহার প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাই নরলীলা।

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য। এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা করার নিমিত্ত দ্বাপরে তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার এই জন্মও বাস্তব জন্ম নয়, নরলীলাসিদ্ধির জন্য জন্মের অনুকরণ মাত্র। নরলীলা করিতে হইলে নৃসিংহদেবের মত হঠাৎ আবির্ভূত হইলে চলে না; মানুষের মতই পিতামাতার যোগে আসিতেছেন বলিয়া সাধারণের জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। তজ্জন্য জন্মের অভিনয়। প্রকটেও তিনি তাঁহার অপ্রকটের নিত্য পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করেন। "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥ যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ পদ্ম, পু, পা, ৫২।৩-৪ ॥ চৈ, চ, ১।৪।২৪ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।" তাঁহাদের সঙ্গে করিয়াই (অর্থাৎ যথাযথভাবে তাঁহাদিগকে প্রকটিত করান; নিজেও) প্রকটিত হন। (১।৩।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার পূর্ব্বেই নন্দ-যশোদার আবির্ভাব হয়, লৌকিক রীতিতে তাঁহাদের বিবাহ সংঘটিত হয়; তার পরে যথাসময়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব। আবির্ভাবের প্রকার এইরূপ। প্রথমে তেজোরূপে বা তদ্রূপ অন্য কোনওরূপে শ্রীনন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করেন; সেস্থান হইতে যশোদার হৃদয়ে। তারপর লৌকিক দৃষ্টিতে যশোদার দেহে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়; যথাসময়ে তাঁহার দেহ হইতে সদ্যোজাত নরশিশুর আকারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ইহাই জন্মলীলার অনুকরণ। পিতামাতার শুক্রশোণিতে তাঁর জন্ম নয়। প্রকটলীলাতেও তাহার দেহ রক্তমাংসাদিদ্বারা গঠিত নয়। "ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা। যোগী চৈবেশ্বরশ্চাত্মঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ পদ্ম, পু, পা, ৪৬।৪২।" প্রকট-লীলাতেও তিনি সচ্চিদানন্দতনু, আনন্দঘনবিগ্রহ। অপ্রকটে তিনি নিত্য কিশোর। প্রকটে বাল্য-পৌগণ্ড আসে

কৈশোরের ধর্ম্মরূপে ; পৌগণ্ডের পরে কিন্তু কৈশোরেই নিত্যস্থিতি। (১।৪।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রকটে মথুরার কংস-কারাগারেও ঐভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অনুকরণ। তবে সেখানে নরশিশুরূপে তিনি আবির্ভূত হন নাই ; আবির্ভূত হইয়াছেন ঐশ্বর্য্যাত্মক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ; যেহেতু, মথুরায় মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যের ভাব এবং ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য আছে। অবশ্য এই চতুর্ভুজরূপ তাঁহার পিতা-মাতা (অভিমানী) বসুদেব-দেবকী ব্যতীত অপর কেহ দেখে নাই। তাঁহাদের প্রার্থনাতেই তিনি চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া পরে দ্বিভুজরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। বসুদেব-দেবকীও তাঁহার অপ্রকট দ্বারকালীলার নিত্যপরিকরস্থানীয় পিতামাতা (অভিমান বশতঃ)। তাঁহারাও স্বরূপশক্তিরই বিলাসবিশেষ (১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। সৃষ্টিলীলা অনাদি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌-ভাগবতোক্তি (১।১।১) তাহার প্রমাণ। সৃষ্টিলীলার আদি নাই ; অনাদিকাল হইতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে —ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আবার মহাপ্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয় ; আবার সৃষ্টি হয়—এইরূপ।

লীলাবশতঃ সৃষ্টি। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তসূত্র। ২।১।৩৩ ;" কেবল লীলাবশেই সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের প্রবৃত্তি হইয়াছে, কোনরূপ ফলাভিসন্ধান বা প্রয়োজনের বশে নহে। তিনি আপ্তকাম, তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ ; তাঁহার কোনও অভাব বা প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। সুখোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন সুখের উদ্রেক বশতঃই নৃত্যাদি করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বরূপানন্দ-স্বভাব-বশতঃই ভগবান্ অন্যান্য লীলার ন্যায় সৃষ্টিলীলাও করিয়া থাকেন। "সৃষ্ট্যাদিকং হরেনৈর্ব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্। গোবিন্দভাষ্য। ২।১।৩৩॥"

লীলায় করুণা। যাহা হউক, ভগবান্ লীলারস-রসিক বলিয়া লীলাই তাঁহার স্বভাব; আবার তিনি পরম-করুণ বলিয়া জীবাদির প্রতি করুণা-প্রকাশও তাঁহার স্বভাব ; এই কারুণ্যবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব" হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক আনন্দ-রসাবেশে তিনি যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত লীলা হইতেই আনুষঙ্গিক ভাবে তাঁহার করুণাও প্রকাশিত হইয়া থাকে—করুণা-প্রকাশ-বিষয়ে তাঁহার অনুসন্ধান না থাকিলেও ইহা হইয়া থাকে ; কারণ, করুণা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ ; লীলাও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ; তাই—যেখানেই প্রজ্জলিত অগ্নি, সেখানেই যেমন আলোক থাকিবে, তদ্রূপ—যেখানে স্বরূপ-শক্তির বিকাশ, যেখানেই করুণা থাকিবে ; তাই ভগবানের যে কোনও লীলাতেই আনুষঙ্গিক ভাবে করুণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সৃষ্টিলীলাতে কাহার প্রতি কিরূপে করুণা প্রদর্শিত হইল ? করুণা প্রদর্শিত হইয়াছে—বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি।

পঞ্চনিত্যবস্তু। সৃষ্টিলীলায় জীবের প্রতি করুণা। কাল, কর্ম্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর—এই পাঁচটী বস্তু নিত্য—অনাদি। ইহা স্বীকার না করিলে সকল বিষয়েই অনবস্থা-দোষ জন্মিবে। ব্যাসদেব ধ্যান-নেত্রে এই পাঁচটী অনাদি-তত্ত্বের দর্শনও পাইয়াছিলেন। এই পাঁচটী নিত্যবস্তুর মধ্যে কাল, কর্ম্ম ও মায়া এই তিনটী জড়—অচেতন ; আর ঈশ্বর চিদ্‌বস্তু, বিভু-চিৎ ; জীব অণুচিৎ, চিৎকণ। যাহা হউক, এই অনাদি কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ কতকগুলি জীব শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভগবৎ-সেবা-সুখের নিমিত্ত লালায়িত না হইয়া মায়িক জগতের সুখভোগের নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে লালসান্বিত হইল। তাহাদের এই অদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখ-লাভও অসম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ ভোগব্যতীত অদৃষ্টের নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, আবার ভোগায়তন-দেহ ব্যতীত অদৃষ্টের ভোগও সম্ভব নহে। অদৃষ্টজনিত মায়িক-সুখ-দুঃখ-ভোগের নিমিত্ত মায়িক বা প্রাকৃত ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন ; প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি ব্যতীত মায়িক-ভোগায়তন-দেহ-প্রাপ্তিও ঐ সমস্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান্ লীলাবশতঃ যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন, তখনই ঐ সমস্ত জীব মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার সুযোগ পায় এবং মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ-যন্ত্রণাদিতে উত্যক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার বিষময়ত্ব অনুভব পূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভের এবং শ্রীকৃষ্ণ সেবা-লাভের উপযোগী সাধন-ভজনেরও সুযোগ পাইয়া জীব ধন্য হইতে পারে। সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে এই সমস্ত সুযোগই জীবের প্রতি ভগবানের করুণার পরিচায়ক। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—ভগবানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, বহির্ম্মুখ জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে একটা

বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যটী হইতেছে জীবের অদৃষ্ট-ভোগ। ইহা অবশ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য নহে—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কারুণ্যের বিকাশে আপনা-আপনিই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমরা—বহির্ম্মুখ জীব আমরা—তাই মনে করি, আমাদের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই পরম-করুণ ভগবান্ বৈচিত্রীময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। "এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ শ্রীভা, ১১৩৩॥—নবযোগেন্দ্রের একতম অন্তরীক্ষ নিমি-মহারাজকে বলিলেন—হে মহাভুজ, সর্ব্বভূতাত্মা আদ্যপুরুষ এসমস্ত মহাভূতদ্বারা, স্বীয় অংশভূত জীবের বিষয়ভোগের জন্য এবং মুক্তির জন্য, দেবতির্য্যগাদি ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ॥ ১০৮৭।২॥—প্রভু পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়-ভোগের নিমিত্ত, ভববন্ধহেতু কর্ম্মাদিকরণের নিমিত্ত এবং ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত। এস্থলে বলা হইল, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টির কারণ; (পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটী নিত্য বস্তুর অন্যতম যে মায়া, তাহারই অপর নাম প্রকৃতি); জগতের উপাদান-কারণও প্রকৃতি, নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তাও প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সমবায়ই প্রকৃতি বা মায়া। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা অনন্ত রকমের জিনিস দেখিতে পাই, তাহাদের পরিদৃশ্যমান উপাদানও অনন্ত রকমের; কিন্তু একই প্রকৃতি কিরূপে এই অনন্ত রকমের বস্তুর অনন্ত রকম উপাদানে পরিণত হইল? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা; প্রকৃতি অচেতন জড়বস্তু হইলেও ইহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহা আপনা-আপনিই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদান-রূপে পরিণত হইতে পারে এবং বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আকারাদিতেও পরিণত হইতে পারে; সুতরাং বিভিন্ন আকারাদি দেওয়ার নিমিত্ত অপর কোনও কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণের প্রয়োজন হয় না; স্বতঃপরিণাম-শীলা বলিয়া প্রকৃতি যেমন উপাদান-কারণ হইতে পারে, তেমনি নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে।

জগতের কারণ ঈশ্বর। শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতগণ উপনিষদের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে—জড় প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণও হইতে পারে না, নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ আদি ৫ম পঃ।" ঈশ্বরই জগতের কারণ, ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রকৃতি কারণরূপে পরিণত হয়—প্রকৃতি জড় বলিয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইতে পারে না।

সাংখ্যমতের নিরসন। সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রকৃতির জগৎ-কারণত্বের যোগ্যতা দেখাইয়াছেন—তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়া। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা না হইলে জগতের কারণ হইতে পারিত না। সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—প্রকৃতি জড় বা অচেতন বলিয়া স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না; এবং স্বতঃ পরিণামশীলা না হইলে প্রকৃতি জগতের কারণও হইতে পারে না। কিন্তু জড় বলিয়া প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না কেন? প্রকৃতি যদি স্বতঃ-পরিণামশীলা হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে তাহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্ম্ম; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না; সুতরাং প্রকৃতির স্বতঃপরিণামশীলতাও কোনও সময়েই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিবে না—সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়; তখন এই সাম্যাবস্থাও বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না—প্রকৃতির পরিণামশীলতা বশতঃ সাম্যাবস্থাও অন্য অবস্থায় অবিলম্বেই পরিণত হইবে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্বপর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়াই প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়—পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম্ম নয়—প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা নয়: সুতরাং একই প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের পরিদৃশ্যমান অসংখ্য বস্তুর

পরিদৃশ্যমান অসংখ্য উপাদানে পরিণত হইতে পারে না—কাজেই জগতের উপাদান-কারণও হইতে পারে না। আবার স্বতঃ-পরিণাম-শীলতার অভাববশতঃ প্রকৃতি আপনা-আপনি পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন আকারেও পরিণত হইতে পারে না—সুতরাং জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। অধিকন্তু, আমরা দেখিতে পাই—জগৎ অনন্ত বৈচিত্রীতে পরিপূর্ণ; বৈচিত্রী বিচার-বুদ্ধিরই ফল: অচেতন বস্তুর বিচার-বুদ্ধি থাকিতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতি বৈচিত্রীময় জগতের কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। ঈশ্বরই জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণও ঈশ্বর, উপাদান-কারণও ঈশ্বর। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের ধর্ম্ম বা তাহাদের কোনও একটীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতির সাহচর্য্য আছে সত্য; কিন্তু তাহা গৌণ—তাই প্রকৃতিকে জগতের গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গৌণ-উপাদান-কারণ-রূপে প্রকৃতির যে অংশ পরিণত হইয়াছে, তাহাকে বলে গুণমায়া—ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। আর যে অংশ গৌণ-নিমিত্ত-কারণ-রূপে পরিণত হইয়াছে; তাহাকে বলে জীবমায়া—ইহা একটি শক্তি-বিশেষ; কিন্তু শক্তি হইলেও জড় শক্তি;—চৈতন্যময়ী কোনও শক্তিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলে ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য উপাদান-কারণ। গুণমায়া গৌণ-উপাদান-কারণ। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণাম-শীলা নয় বলিয়া জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা গুণমায়ার নাই। ঈশ্বরের শক্তি তাহাকে এই যোগ্যতা দান করে—অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেমন দাহক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে; তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়াও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। অগ্নির শক্তিব্যতীত লৌহ দাহ করিতে পারে না, পরন্তু লৌহের সাহচর্য্য ব্যতীতও অগ্নি দাহ করিতে পারে বলিয়া অগ্নিকেই যেমন দাহ-কার্য্যের মুখ্য কারণ বলা হয়; তদ্রূপ—ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত গুণমায়া জগতের উপাদান হইতে পারে না, পরন্তু গুণমায়ার সাহচর্য্য ব্যতীতও ঈশ্বরের শক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান একমাত্র ঈশ্বরের শক্তি—চিচ্ছক্তি) বলিয়া ঈশ্বরের শক্তি বা ঈশ্বরই হইলেন জগতের মূল-উপাদান-কারণ। আর অগ্নির শক্তিতে লৌহও দাহ করিতে পারে বলিয়া লৌহকে যেমন দাহ-কার্য্যের গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে গুণমায়াও জগতের উপাদানত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাকে জগতের গৌণ-উপাদান-কারণ বলা হয়।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য নিমিত্ত-কারণ। জীবমায়া গৌণ নিমিত্ত-কারণ। আর জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণের স্বরূপের জ্ঞান এবং স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহদের আসক্তি জন্মাইয়া দেয়; তাহাতে প্রাকৃত সুখভোগের লালসায় ভোগায়তন দেহ অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাহারা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে প্রলুব্ধ হয় এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে; ইহাতেই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবনিচয়ের সৃষ্টির আনুকূল্য সাধিত হয়। এইরূপে জীবমায়া দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার আনুকূল্য সাধিত হয় বলিয়া জীবমায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ; আর মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইলেন—ঈশ্বর বা ঈশ্বরের শক্তি।

মায়া ও জীব। বহির্ম্মুখ জীব তাহার অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ অনাদিকাল হইতেই **কৃষ্ণের** দিকে পেছন ফিরিয়া আছে। তাই, কৃষ্ণই যে সুখস্বরূপ, সুখের একমাত্র উৎস, তাহা সে জানেনা। সে মুখ ফিরাইয়া আছে, মায়িক জগতের সুখসম্ভারের দিকে; তাই মনে করিয়াছে—মায়িক জগতেই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে। এই ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ সে মায়িক জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৭।৩৮॥ স তু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজয়া অবিদ্যয়া অজাং মায়াং অনুশয়ীত আলিঙ্গেত উপাধিলিপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।" মায়াও তখন যেন ঈর্ষ্যার সহিতই (সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সুখভোগের জন্য তোমার লোভ হইয়াছে! আচ্ছা, এস, মায়িক সুখের

মজা কেমন, একবার চাখিয়া দেখ—এইরূপ ভাবের সহিতই) তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার বুদ্ধিকে মুগ্ধ করিয়া, তাহার স্বরূপের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিল। "পরঃ স্বশ্চেত্যাসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ইত্যাদি শ্রী, ভা, ৭।৫।১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদিরীত্যা অনাদিত এব ভগবদ্বিমুখানাং জীবানামত অতএব নূনং সের্ষ্যয়া যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপবিস্মরণপূর্ব্বকদেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষেণ মোহিতবুদ্ধীনামসত্যামিত্যাদি।" এসমস্ত দ্বারা বুঝা গেল—অনাদিবহির্ম্মুখ জীব যখন মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখনই মায়া স্বীয় জীবমায়াংশে তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়াছে—যেন অনন্যচিত্তে কিছুকাল মায়িক সুখ ভোগ করিয়া সেই সুখের স্বরূপ—সেই সুখের অকিঞ্চিৎকরতা, অনিত্যতা, দুঃখসঙ্কুলতা উপলব্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ অনুভব ব্যতীত বিষয়ের-মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা জানা যায় না। "নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্। নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ॥ শ্রী, ভা, ৬।৫।৪১॥" মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিলেই নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিবার এবং তাহার পরে ভগবদুন্মুখতা জন্মিবারও সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের বিষয়-ভোগ-লালসার তীব্রতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে বিষয় ভোগ করাইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে অশেষ যন্ত্রণাও দেয়—যেন দুঃখসঙ্কুল সংসার-সুখের প্রতি ভ্রান্ত জীবের বিতৃষ্ণা জন্মে, যেন নিত্যসুখের উৎস শ্রীভগবানে তাহার উন্মুখতা জন্মে।

পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। প্রসঙ্গক্রমে পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যাউক। উপনিষৎ বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ছা, ৩।১৪॥—যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম।" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম সশক্তিক মূল-তত্ত্ব এবং সজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য আশ্রয়-তত্ত্ব; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু কোথাও থাকা সম্ভব নহে, সমস্তই স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; বিশেষতঃ, ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রকৃতিই যখন জগতের কারণ এবং প্রকৃতিও যখন ব্রহ্মেরই (বহিরঙ্গা) শক্তি, তখন অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট। মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মই স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকেই পরিণামবাদ বলা হয়। আর যাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ সেই সমস্ত আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম যখন নিঃশক্তিক, তখন তাঁহাদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব নহে; বস্তুতঃ এই জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই; যে স্থানে কোনও বস্তুই নাই, ঐন্দ্রজালিক যেমন সে স্থানেও দর্শকগণকে বিচিত্র বস্তু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া আমাদিগকে এই জগৎ-প্রপঞ্চ দেখাইতেছে; ইহা মায়াবিজৃম্ভিত। ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে দর্শকগণ যাহা কিছু দেখে, তাহা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, তদ্রূপ মায়ার প্ররোচনায় জগৎ বলিয়া আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র; জীবের পরিদৃশ্যমান দেহাদিও ভ্রান্তিমাত্র। ইহাকেই বিবর্ত্তবাদ বলে (বিবর্ত্ত অর্থ ভ্রান্তি)। মায়ার প্রভাব অন্তর্হিত হইলেই অনুভব হইবে যে,—সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই, জীব তখন বুঝিতে পারিবে—সেও ব্রহ্ম। তাঁহারা আরও বলেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার; সুতরাং ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন না, হইলে তিনি বিকারী হইয়া পড়েন। ইহার উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—পরিদৃশ্যমান জগৎ ভ্রান্তিমাত্র নহে, ইহার অস্তিত্ব আছে, তবে ইহা নশ্বর; আর ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলেই বিবর্ত্তবাদের কথা তুলিতে হয়; কিন্তু বিবর্ত্তবাদে অনেক সমস্যারই সমাধান হয় না; বিশেষতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে গেলে যে মায়ার অবতারণা করিতে হয়, শক্তি স্বীকার না করিলে সেই মায়ারও কোনও সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায় না। জগতেও নানাবিধ শক্তির ক্রিয়া অনবরত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলে এই সমস্ত শক্তিরও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এস্থলে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার স্থানাভাব। প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করা যাউক। (১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

কাল ও কর্ম্মের সহায়তা। পাঁচটী অনাদি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর, জীব ও মায়া বা প্রকৃতি যে সৃষ্টিকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহাই এপর্য্যন্ত বলা হইল। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি তাঁহারই শক্তিতে তাঁহার সহায়তা করে, আর জীব সৃষ্ট বস্তুর ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট ভোগায়তন-দেহাদি অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টি-ব্যাপারকে সফল করিতে চেষ্টা করে। অন্য দুইটী অনাদি তত্ত্বও—কাল এবং কর্ম বা অদৃষ্টও—সৃষ্টি-ব্যাপারে উপেক্ষণীয় নহে; তাহারাও সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে। কাল এবং কর্ম্ম বা অদৃষ্ট জড়—অচেতন; সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহারও সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত আর একটী বস্তু আছে—সৃষ্টি-ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে যাহার জ্ঞান একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এই বস্তুটী হইতেছে—প্রকৃতির স্বভাব।

প্রকৃতির স্বভাব। অম্লযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু ক্ষীর বা সন্দেশে পরিণত হয় না; ইহা দুগ্ধের স্বভাব। অল্প পরে আমরা দেখিতে পাইব—প্রকৃতি পরিণতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বে, তার পরে অহঙ্কার-তত্ত্বে, তার পরে তন্মাত্রা-ইত্যাদিতে পরিণত হয়; কিন্তু প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বে পরিণত না হইয়া অহঙ্কার-তত্ত্বে বা তন্মাত্রাদিতে পরিণত হয় না—ইহা প্রকৃতির স্বভাব।

কালের সহায়তা। আবার অম্লযোগে দধিতে পরিণত হওয়া দুগ্ধের স্বভাব হইলেও অম্লযোগ করা মাত্রই ইহা দধিতে পরিণত হয় না। -কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও দধিতে পরিণতির নিমিত্ত দুগ্ধের সহায়তা করে। তদ্রূপ ঈশ্বর-শক্তিতে প্রকৃতির বিকার-প্রাপ্তি-যোগ্যতা জন্মিলেও সময় বা কালের আনুকূল্য অপরিহার্য্য—সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে, অহঙ্কার-তত্ত্ব তন্মাত্রাদিতে পরিণত হইতে কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও প্রকৃতির পরিণতির বা সৃষ্টিকার্য্যের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

অদৃষ্টের সহায়তা। তারপর অদৃষ্টের কথা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লৌকিক-দৃষ্টিতে সৃষ্টি ব্যাপারের উদ্দেশ্য—জীবের অদৃষ্ট ভোগ; সুতরাং সৃষ্টি-নিমিত্ত প্রকৃতির পরিণাম এবং সৃষ্টবস্তু—সমস্তই অদৃষ্ট ভোগের অনুকূল হইবে। ঈশ্বরশক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্ম বা অদৃষ্টই প্রকৃতির পরিণামকে, অথবা সৃষ্টবস্তুকে এই আনুকূল্য দান করে—অথবা ঈশ্বর শক্তিই জীবাদৃষ্টের অনুকূল ভাবে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতিকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইবার পক্ষে অনুরূপতা যোগাইয়া জীবাদৃষ্ট ঈশ্বর শক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রকৃতি (এবং প্রকৃতির স্বভাব), কাল, কর্ম্ম এবং জীবকে লইয়া ঈশ্বর কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতিতে শক্তির সঞ্চার ও প্রকৃতির পরিণতি। মহত্তত্ত্ব। সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (ঈশ্বর) দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন; এই শক্তি সঞ্চারের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়। এই বিক্ষোভিত প্রকৃতিতে পুরুষ তখন জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মফল সহ যে সমস্ত জীব মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, পুরুষ সে সমস্ত জীবকে তাহাদের কর্ম্মফল সহ বিক্ষোভিতা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুরুষ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়া কাল ও কর্ম্ম এবং প্রকৃতির স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথ পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে লাগিল। এইরূপে জীবাদৃষ্টের অনুকূল প্রথম যে পরিণাম প্রকৃতি লাভ করে, তাহাকে বলে মহত্তত্ত্ব (শ্রীভা ২।৫।২১-২২)। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব; সুতরাং মহত্তত্ত্বেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ থাকিবেই; তিনটী গুণ থাকিলেও কাল-কর্ম্ম স্বভাবাদির প্রভাবে মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব ও রজোগুণেরই প্রাধান্য; সত্ত্বের ধর্ম্ম জ্ঞান শক্তি এবং রজঃ এর গুণ ক্রিয়াশক্তি; সুতরাং মহত্তত্ত্ব ক্রিয়া জ্ঞান শক্তিময় একটা উপাদানবিশেষ। (শ্রী, ভা, ২।৫।২৩)।

অহঙ্কার। কাল কর্ম্মাদির প্রভাবে মহত্তত্ত্ব হইতে আবার এক তত্ত্বের উদ্ভব হইল—ইহার নাম অহঙ্কার; অহঙ্কার-তত্ত্বে তমোগুণেরই প্রাধান্য —সত্ত্ব ও রজোগুণের অল্পতা। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া তিন-রূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার এবং তামস অহঙ্কার।

তামসাহঙ্কারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, রাজস-অহঙ্কারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি এবং সাত্ত্বিকাহঙ্কারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি (শ্রীভা-২।৫।২৩-২৪)।

বস্তুতঃ কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহার এক অংশে সত্ত্বগুণের, এক অংশে রজো গুণের এবং এক অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে। যে অংশে সত্ত্ব-গুণের এবং যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য জন্মে, সেই দুই অংশকে মহত্তত্ত্ব বলে; যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য, সেই অংশকে সূত্রতত্ত্বও বলে; সূত্রতত্ত্ব মহত্তত্ত্বেরই প্রকার-ভেদ। আর যে অংশে তমোগুণের প্রাধান্য, তাহাকে বলে অহঙ্কার-তত্ত্ব। অহঙ্কার-তত্ত্বে তমোগুণই বেশী, সত্ত্ব ও রজোগুণ অল্প। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনরূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার। তামসিক অহঙ্কারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, অর্থাৎ ইহাতে মহাভূতাদি দ্রব্য-উৎপাদনের সামর্থ্য আছে; রাজস-অহঙ্কারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ক্রিয়া-সাধন-ইন্দ্রিয়াদি উৎপাদনের শক্তি আছে; আর সাত্ত্বিক অহঙ্কারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবিষয়ক সামর্থ্য আছে।

তামসাহংকারের বিকার। তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয়; আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব বলিয়া বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দও থাকে; সুতরাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—এই দুইটী গুণই আছে। এই বায়ু হইতেই প্রাণ (দেহ ধারণ-সামর্থ্য), ওজঃ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা), সহঃ (মনের পটুতা) এবং বল (শরীরের পটুতা) জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হয়; তেজের স্বাভাবিক গুণ রূপ। বায়ুহইতে ইহার উদ্ভব হওয়ায় ইহাতে শব্দ এবং স্পর্শ গুণও আছে; এইরূপে তেজের গুণ তিনটী—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এই তেজ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়; জলের গুণ রস। তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপও আছে; এইরূপে জলের চারিটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্ষিতি (মাটী) উৎপন্ন হয়; ক্ষিতির গুণ গন্ধ। জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ক্ষিতিতে জলের গুণ-চতুষ্টয়ও আছে; এইরূপে ক্ষিতির গুণ হইল পাঁচটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। (শ্রীভাঃ ২।৫।২৫-২৯।)

পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। এইরূপে দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন তামসাহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচটী তন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্রার স্থূলরূপ বা আশ্রয়—যথাক্রমে আকাশ, বায়ু তেজ, জল এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটী মহাভূত—সাকল্যে দশটী বস্তুর উৎপত্তি হয়। এস্থলে যে আকাশাদি-পঞ্চ-মহাভূতের কথা বলা হইল, ইহারা পরিদৃশ্যমান আকাশাদি নহে—পরন্তু পরিদৃশ্যমান আকাশাদির সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র।

সাত্ত্বিকাহঙ্কারের বিকার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সাত্ত্বিকাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন (অর্থাৎ মনের উপাদান) এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের (ঈশ্বরাধীন শক্তি-বিশেষের) উৎপত্তি হয়। এই সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশটী দেবতার উদ্ভব হয়। এই সমস্ত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বরাধীন শক্তি-বিশেষ—তত্তৎ-ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী-শক্তিদাতা; প্রাকৃত দেহের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজস্ব কোনও শক্তি নাই; মৃতদেহের শক্তি-হীন ইন্দ্রিয়াদিই তাহার-প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শক্তিতেই চক্ষু-কর্ণাদি স্ব-স্ব-কার্য্য নির্ব্বাহে শক্তিমান হয়। এই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বর-শক্তি হইলেও ভোগায়তন-প্রাকৃত দেহকে কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রাকৃত-সাত্ত্বিকাহঙ্কার-যোগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। (শ্রীভা-২।৫।৩০)।

রাজসাহঙ্কারের বিকার, দশ ইন্দ্রিয়। রাজসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক-এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ তাহাদের সূক্ষ্ম উপাদানের) উৎপত্তি হয় (শ্রীভা-২।৫।৩১)।

বিকার সমূহের মিলনের অসামর্থ্য। শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটী বস্তুই ভোগের বিষয় ; তাহাদের আশ্রয়রূপে তাহাদের স্থূলরূপ-আকাশাদিও ভোগ্যবস্তু ; তাহাদের পরস্পর মিলনেই উপভোগ্য রসের বৈচিত্রী জন্মিতে পারে। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্টের প্রেরণায় কালবশে প্রকৃতি শব্দ-স্পর্শাদিতে এবং তাহাদের আশ্রয়রূপ আকাশাদিতে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করিতেছিল ; কারণ, জীবাদৃষ্টানুরূপ বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনের অনুকূলভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের তখনও ছিল না। আর যে দশ-ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অধিপতিরূপ একাদশ ইন্দ্রিয় মনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যখন স্ব-স্ব-অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখনই তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি উপভোগের করণ-রূপে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তি লাভের পূর্ব্বে, অদৃষ্টানুরূপ কোনও ভোগায়তন-দেহে তাহাদের সমাবেশ এবং স্থূলরূপে অভিব্যক্তি—অদৃষ্ট-ভোগের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু ভোগায়তন-দেহের উপাদানরূপ আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতের পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য না থাকায় এবং উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদিরও পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য বা স্থূলরূপে অভিব্যক্তি-সামর্থ্য না থাকায়, সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল (শ্রীভা ২।৫।৩২)।

সম্মিলন নিমিত্ত সংহননশক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, কেবলমাত্র একটী শক্তি যখন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োজিত হয়, তখন কেবল একদিকেই তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে ; শক্ত্যন্তরের ক্রিয়া ব্যতীত তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রথমে প্রকৃতিতে যে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা কেবল এক দিকেই - প্রকৃতির পরিণতির দিকেই—ক্রিয়া করিতে লাগিল ; তাহার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু ঐ পরিণতি-দায়িনী শক্তি, প্রকৃতির বিকার-সমূহের সম্মিলন-দানে সমর্থা নহে, তাই পঞ্চভূতাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের সম্মিলনের জন্য অন্য একটী সংহনন-শক্তির (সম্মিলনদায়িনী শক্তির) প্রয়োজন। এই সংহনন-শক্তি যখন ক্রিয়া করিবে, পরিণতি-দায়িনী শক্তির ক্রিয়াও তখন সম্মিলনের পক্ষে অপরিহার্য্য ; কারণ, সম্মিলনও পরিণতিরই বৈচিত্রী-বিশেষ। উভয় শক্তিরই যুগপৎ ক্রিয়া দরকার।

সংহনন শক্তির প্রয়োগ। ভৌতিক হৈম অণ্ড। বহু অণ্ডের সৃষ্টি। বস্তুতঃ কারণার্ণবশায়ী আকাশাদি সমস্ত বস্তুতেই সংহনন-শক্তি সঞ্চার করিলেন (শ্রীভা ৩।২৬।৫০)। তখন উভয় শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কালকর্ম্মাদির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের সম্মিলনে একটী ভৌতিক অণ্ডের সৃষ্টি হইল (শ্রীভা ৩।২০।১৪)। অণ্ড একটি গোলাকার বস্তু। ঘূর্ণন ব্যতীত কোনও তরল বা কোমল বস্তু গোলাকারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না ; আবার কেন্দ্রাভিমুখিনী-শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর ঘূর্ণনও সম্ভব নয়। সংহননশক্তির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইয়া যখন অণ্ডাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ সংহনন-শক্তিটি যে কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি—অণ্ডের কেন্দ্র হইতেই যে ইহা ক্রিয়া করিতেছে—তাহাও অনুমিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ঐ অণ্ডটি "হৈম" অণ্ড ; হৈম অর্থ হেমবর্ণ—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়। ইহাও জানা যায়, ঐ অণ্ডটী নাকি বহুকাল যাবৎ সাগর-জলে শয়ান ছিল (শ্রীভা ৩।২০।১৫)। এই সাগর অধুনা পরিদৃশ্যমান সাগর নহে—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, তখনও পরিদৃশ্যমান স্থূল জলের সৃষ্টি হয় নাই। বোধ হয় নীহারিকাবৎ কোনও সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থকেই এস্থলে সাগর-জল বলা হইয়া থাকিবে—ইহা তখন সমগ্র অণ্ডকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল ; তেজঃপ্রভাবেই বোধ হয় ইহা তখন জ্যোতির্ম্ময় (হৈম)-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভূতাদির সম্মিলনজনিত যে বস্তুটী সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় অণ্ডাকারত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রথমতঃ নীহারিকা অথবা নীহারিকারই স্থূলরূপ কোনও বাষ্পীয় বা তরল পদার্থময়ই ছিল ; নচেৎ গোলাকারত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নহে। কালক্রমে সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় ঘূর্ণন বশতঃ অণ্ডের বহির্ভাগ ক্রমশঃ তরল ও পরে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে—অংশবিশেষ মূল অণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও যাইতে থাকে ; এইরূপে আবার অসংখ্য অণ্ডের সৃষ্টি হইতে থাকে। মূল অণ্ডের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশেও পরিণতি-দায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তির ক্রিয়া থাকাতে বিচ্ছিন্ন অণ্ড সমূহেও ঐ দুইটী শক্তির ক্রিয়া রহিয়া গেল—তাই তাহারাও অণ্ডাকারত্বই প্রাপ্ত হইল। এ সকল

অণ্ডের প্রত্যেকটীতেই পুরুষের শক্তি কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে লাগিল। এই কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির যে অধিষ্ঠাতা, তিনিও কারণার্ণবশায়ীরই একটি স্বরূপ—প্রত্যেক অণ্ডের কেন্দ্রে তাঁহার অধিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্পষ্ট কথাতেই বলিয়াছেন:—"অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ। ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ॥ ১।৫।৫৯। সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥ ১।৫।৭৮॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন, সেই পুরুষ এক এক রূপে অণ্ড সমূহের—"ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। ১।৫।৭৯॥' তখন তিনি—"নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ১।৫।৮০॥ জলে ভরি অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজবাস। ১।৫।৮২॥" এজন্য পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ বলে।

উল্লিখিত পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যায়, অণ্ড-সমূহের অভ্যন্তর-ভাগ জলবৎ তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল; ইহা স্বাভাবিক; অভ্যন্তর-ভাগে তাপাধিক্য বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ এখনও অত্যধিক তাপময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ॥

গর্ভোদকশায়ী। যাহা হউক, কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির প্রবর্ত্তকরূপে গর্ভোদকশায়ী প্রত্যেক অণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিলেন; তখনও জীবের ভোগায়তন দেহাদির অর্থাৎ জীবের সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—গর্ভোদকশায়ী পুরুষ সহস্রাধিকবর্ষ যাবৎ ঐরূপে অবস্থান করার পরে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হয় (শ্রীভা ৩।২০।১৫)। ইহাতেই বুঝা যায়, তাপ বিকীরণাদি দ্বারা অণ্ডের বহির্ভাগ জীব-বাসের উপযোগী হইতে সুদীর্ঘকালের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল—পুরুষ ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট উপাদানাদির সাহায্যে জীবাদৃষ্টের অনুকূল ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্যবস্তু-আদির সৃষ্টি করিলেন—সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় মহাভূতাদিই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কালকর্ম্মের প্রভাবে তত্তদ্‌রূপে পরিণত হইল; তখন জীবমায়ার প্রভাবে জীব স্বস্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে রূপ-রসাদি উপভোগ করিতে লাগিল। গর্ভোদকশায়ী জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে থাকিয়া তাহার কর্ম্মফল দান করিতে লাগিলেন।

শ্রীবলরাম

ক্রিয়াশক্তি। শ্রীবলরাম স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ। বলরামে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়—লীলাশক্তির সাহায্যে কেবল অন্তরঙ্গ লীলারস আস্বাদনেই নিমগ্ন। ক্রিয়াশক্তিমূলক অন্যান্য লীলা কার্য্য বলরামস্বরূপেই তিনি নির্ব্বাহ করেন।

মূল ভক্তিতত্ত্ব। ভগবানের চিচ্ছক্তির পরিণতি-বিশেষই ভক্তি—যাহা সেবার প্রাণ। সুতরাং ভক্তি বা সেবার মূলই হইল চিচ্ছক্তি; চিচ্ছক্তিই মূল-ভক্তিতত্ত্ব। এই চিচ্ছক্তিই ধামপরিকরাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণে অন্তরঙ্গ সেবা করিতেছেন—আবার বলরামের দ্বারাও এই চিচ্ছক্তিই শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা করিতেছেন। চিচ্ছক্তিই যখন মূল ভক্তিতত্ত্ব এবং চিচ্ছক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত—তখন সেব্যতত্ত্ব ও সেবকতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভূত, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের এই সেবক-তত্ত্বের আবির্ভাবই শ্রীবলরাম, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। ১।৬।৭৫

বলরামের শ্রীকৃষ্ণ সেবা। যাহা হউক, শ্রীবলরাম নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপে ব্রজে ও দ্বারকা-মথুরায় (সঙ্কর্ষণরূপে) থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন। পরব্যোম চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ স্বরূপের সাক্ষাৎসেবা করিতেছেন। আবার এই সঙ্কর্ষণের অংশাংশ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরাব্ধিশায়ী রূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিতেছেন। এইরূপে সৃষ্টি কার্য্যের মূলও হইলেন শ্রীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীবলরাম। আবার শেষরূপে তিনি স্বীয় মস্তকে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষারূপ সেবা করিতেছেন; অনন্তরূপেও বিবিধ সেবা করিতেছেন। আবার আসন, বসন, ভূষণ, মাল্য, চন্দন, পাদুকা, ছত্র, চামর আদি শ্রকৃষ্ণের সেবার যত কিছু উপকরণ আছে, তৎসমস্তও শ্রীবলদেব। আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্ধামাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলার আনুকূল্য করিতেছেন। এইরূপে কেবল লীলা পরিকররূপে নয়—লীলার উপকরণ এবং লীলার ধামাদিরূপেও—শ্রীবলরাম সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন; আর সঙ্কর্ষণাদিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্যক্ত তাঁহার আজ্ঞার পালনরূপ সেবাও করিতেছেন।

———

প্রেমতত্ত্ব

হলাদিনী-সম্বিৎ-প্রধান শুদ্ধ-সত্ত্বের বৃত্তি। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম প্রেম। ইহা প্রাকৃত মনের একটী প্রাকৃত বৃত্তিবিশেষ নহে। ইহা হলাদিনী-সম্বিদংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ; সুতরাং প্রেম স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু; তাই প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত মনে ইহার আবির্ভাব অসম্ভব। ভগবৎকৃপায় সাধনপ্রভাবে জীবের চিত্ত হইতে যখন ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-আদি সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া যায়, তখনই তাঁহার চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে—তৎপূর্ব্বে নহে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের চিত্তে অনাদিকাল হইতেই প্রেম বিরাজিত।

চিত্তে যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা জন্মে; এই মমতা-বুদ্ধির ফলে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বা-জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান বিলুপ্ত হইয়া যায়; ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণকে আর ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না—পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করেন; লৌকিক জগতে সখা, পুত্র, প্রাণ-পতি প্রভৃতির সহিত লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিকর-ভক্তদের তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত—শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই তাঁহাদের আর অনুসন্ধান থাকে না। ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও এই প্রেমবন্ধন ছিন্ন হয় না। এই প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, ততই শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার চেষ্টায়ও অন্যাপেক্ষা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে; প্রেমের গাঢ়তম অবস্থায় বেদ-ধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথাদি এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধের অপেক্ষা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, ভক্ত তখন নিজাঙ্গদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন।

প্রেমের পরিণতি। প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে হইতে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যাপ্রাপ্ত হয়; এইগুলি প্রেম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর; মহাভাবই ঊর্দ্ধতম স্তর।

স্নেহ। প্রেম যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। প্রেমেও উপলব্ধি আছে সত্য; কিন্তু তৈলাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতার আধিক্যের ন্যায় প্রেম অপেক্ষা স্নেহে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ও চিত্তদ্রবতার আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির লালসা পরিতৃপ্ত হয় না।

মান। এই স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও স্বীয় ভাব গোপনের নিমিত্ত কুটিলতা ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। মানে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য আছে বলিয়াই কুটিলতা সম্ভব হয়—ইহা স্বার্থমূলক ঘৃণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতিরই একটা বৈচিত্রী; ইহাতে প্রিয় ব্যক্তির (শ্রীকৃষ্ণের) তুষ্টিরই পুষ্টি সম্পাদিত হয়।

প্রণয়। মমতাবুদ্ধির আরও আধিক্যবশতঃ মান আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যাহাতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করায়, তখন তাহাকে প্রণয় বলে।

রাগ। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত সুখকেও পরম দুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন তাহাকে রাগ বলে।

অনুরাগ। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও (শ্রীকৃষ্ণকেও) প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় উন্নীত প্রেমকে বলে অনুরাগ।

ভাব। এই অনুরাগের চরম-পরিণতিকে বলে ভাব। যে দুঃখের নিকট প্রাণবিসর্জ্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরমসুখ মনে হয়।

ভাব ও মহাভাব। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী ভাব ও মহাভাব একার্থবোধক রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু কবিরাজগোস্বামী ভাব ও মহাভাবে একটা পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন—ভাবের পরবর্ত্তী উর্দ্ধতর স্তরকে তিনি মহাভাব বলিয়াছেন; কিন্তু ভাব ও মহাভাবের মধ্যবর্ত্তী সীমা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই; কিংবা ভাব হইতে মহাভাবের পার্থক্য কি. তাহাও বলেন নাই।

মাদন। যাহা হউক, প্রেমবিকাশের এ সমস্ত বিভিন্ন স্তরের আবার অনেক বৈচিত্রী আছে। মহাভাবের আবার দুইটী স্তর আছে—মোদন ও মাদন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত রকম আনন্দ-বৈচিত্রী জন্মিতে পারে, মাদনে তৎসমস্তেরই যুগপৎ অনুভব হয়—ইহাই মাদনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত এই মাদনাখ্য-মহাভাব অপর কাহারও মধ্যেই অভিব্যক্ত নহে, এমন কি লীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও মাদনের অভিব্যক্তি নাই।

জীবের যথাবস্থিত দেহে—সাধন মার্গে তিনি যতই উন্নত হউন না কেন—প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইতে পারে; স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব যথাবস্থিত দেহে সম্ভব নহে; প্রাপ্তপ্রেম সাধক-জীবের দেহ-ভঙ্গের পরে যখন ভগবল্লীলাস্থলে তাঁহার জন্ম হইবে, তখন তাঁহার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে স্নেহ মান প্রণয়াদির স্ফুরণ হইতে পারে।

জীবে প্রেমের আবির্ভাব। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥২।২২।৫৭॥" কৃষ্ণপ্রেম অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিদ্যমান; সাধনাদিদ্বারা ইহা গঠিত হয় না, আবির্ভূত হয় মাত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে প্রেমের উদয় হয়। উদ্ধৃত পয়ারে "উদয়" শব্দ প্রয়োগের একটা সার্থকতা আছে। সৌরমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের স্থান অবিচলিত হইলেও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া পৃথিবীর কোনও একস্থান হইতে সূর্য্যকে সর্ব্বদা এক জায়গায় দেখা যায় না। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যেস্থলে সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য পূর্ব্বে সে স্থলে ছিলনা; পৃথিবীর ঘূর্ণনবশতঃ যখন সেস্থানে আসিয়া পড়ে, তখনই সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায়, সূর্য্য অন্যস্থান হইতে উদয়-স্থলে আসে। তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমও হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষরূপে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (হ্লাদিনী স্বরূপ শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপেই নিত্যবিরাজিত)। পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাহাকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন (প্রীতিসন্দর্ভঃ।৬৫॥); জীবের মলিন চিত্তে তাহা গৃহীত হয় না। চিত্ত যখন শুদ্ধ হয়, তখন তাহা সেই চিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেম নামে খ্যাত হয়। সূর্য্য যেমন অন্যস্থান হইতে উদয় স্থলে আসে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সাধকের শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে আসিয়া আবির্ভূত হয়। জীবের মধ্যে হ্লাদিনী (স্বরূপ শক্তির কোনও বৃত্তিই স্বরূপতঃ) নাই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষ সাধকের শুদ্ধচিত্তে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে।

শ্রীরাধা-তত্ত্ব

স্বরূপ। হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতি বা ঘনীভূত অবস্থাস্বরূপ। হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম; আর প্রেমের পরম সার হইল মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী। তিনি মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তি, প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই তাঁহার কার্য্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবের পরিকর, কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। "কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে। গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ১।৪।৭০-৭১॥ * * * কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকানাম পুরাণে ব্যাখানে ॥ ১।৪।৭৫॥"

সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। শ্রীরাধিকা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি; তিনি সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী,—সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের, সমস্ত কান্তির মূল আধার। "......কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥ ১।৪।৭৮-৭৯ ॥"

পূর্ণশক্তি। শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত। অভেদরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ; কেবল লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে দুই স্বরূপে বিরাজিত। হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে পৃথক স্বরূপে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুইবস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।। রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ১।৪।৮৩—৮৫।। ১,৪,৮৪ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূল কান্তাশক্তি। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও, লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তি। শ্রীরাধার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে মাদনাখ্য-মহাভাবের অভিব্যক্তি নাই। উভয়ে এক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখণ্ড রস-স্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড-রস-বল্লভা, শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্, শ্রীরাধাও তেমনি স্বয়ং-শক্তিরূপা, মূল কান্তাশক্তি: তিনি দ্বারকার মহিষীগণের, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণের অংশিনী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে ভগবৎ স্বরূপের যে সম্বন্ধ, তাঁহার কান্তারও শ্রীরাধার সহিত সে সম্বন্ধ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাঁহার কান্তাও শ্রীরাধার বিলাস।

শ্রীরাধা যে মূল কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি এইরূপ। "রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ ॥ তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূতা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ সরস্বতী ভারতীচ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥—যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিতা (উপেন্দ্রাদির কান্তাশক্তি), তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী। না, প, রা, ২।৩।৫৫।।)। পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতীদেবী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী

হন। স্বয়ংরূপে পরাদেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিতা। ২।৩।৬০-৬৫ ॥" অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী-শ্রুতি হইতেও জানা যায়, লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশ-লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদধৃত বচন।"

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ ভগবানের অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। "শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৪৩॥" বেদান্তও একথা বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥ ৩।৩।৪০॥"—শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলষিত লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, বিষ্ণুর শ্রী-(প্রেয়সী) তাহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা) ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা॥ ১।৮।১৫॥" পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥—শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী। ১।৯।১৪॥" আরও বলিয়াছেন—"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥—দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমন রূপে তাঁহার সহায়কারিণী হন। ১।১৪০॥ রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী॥—রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী॥ ১।৯।১৪২॥"

শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি, তাই তিনি মূল-ভগবৎস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণই যখন দ্বারকা-বিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে বিহার করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হন। পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবেই তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীশিব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা "শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ * * *॥ চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে॥ প, পু, প, ৪৬।৩৬-৮॥" শ্রীশিব আরও বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা।—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প, পু, পা, ৪৬।৩৮॥"

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অংশিনীও শ্রীরাধা। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—জগতের সৃষ্টিসময়ে শ্রীরাধাই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষ্ণু হইতে জগতের সৃষ্টি, তিনিও শ্রীরাধা হইতে উদ্ভূত। "সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥ ২।৬।২৫॥" মহাবিষ্ণু হইতে জগতের উদ্ভব, আবার শ্রীরাধা হইতে মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতাও বলা যায়। "শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা॥ না, প, রা, ২।৬।৭॥" বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যে শ্রীরাধারই অংশ, পদ্মপুরাণ হইতেও তাহা জানা যায়। "বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ। অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূত্যৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ॥ গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদ্বারাও প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী, পালনকর্ত্রী) বলা হয়॥ ৫০।৫১২॥" মায়া শ্রীরাধার কিরূপ বহিরঙ্গ অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্পকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম (সাপের খোলস) সর্পের যেরূপ অংশ (বহিরঙ্গ অংশ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইরূপ বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি। "স যদজয়াত্ব-জামনুশয়ীত গুণাংশ্চ পুষন্"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৭।৩৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থাতদ্বিভূতিরেব যদুক্তা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে অস্যা আবরিকা-শক্তির্মহামায়েখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ। ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যাত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যাত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ।—শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—সর্পের কঞ্চুকাখ্য-শুষ্কত্বকের ন্যায় বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও তোমার স্বরূপভূতযোগমায়ার (স্বরূপশক্তির) বিভূতি। তুমি নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্য বলিয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিতেছ না।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা যায়—"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্বিদ্যাত্মিকা পরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥ কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥ ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে॥ মায়া-বিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥—বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম-আনন্দসন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী (তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক বালক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের) যে সকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশস্বরূপ॥ ৪০।৫৩-৫৬॥" শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী, সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—অংশিনী, শ্রীনারদের উল্লিখিত বাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিঃ দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভি-ব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।—যে স্বরূপশক্তির গুণাদিসম্পদ্রূপা অনন্ত শক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দুইরূপে বিরাজিত—তাঁহার মধ্যে অনভিব্যক্ত-নিজ মূর্ত্তিতে (অর্থাৎ কেবল শক্তিরূপে), আর বাহিরে লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া। এই স্বরূপশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হন। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥"

শ্রীরাধা পূর্ণাশক্তি। "স্মরতি চ॥" —এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তরত্নগ্রন্থের ২।২২ অনুচ্ছেদে, অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ॥" টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যা ইতি আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্য।—আদিশব্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়।" উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। "তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বথাধিকা।" সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু।"—ইত্যাদি ঋক্পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-গতজীবনা; কৃষ্ণ ভিন্ন তিনি আর কিছুরই অনুসন্ধান রাখেন না; তাঁহার বদনে কৃষ্ণকথা, নয়নে কৃষ্ণরূপ, নাসায় কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ, শ্রবণে কৃষ্ণবংশীধ্বনি যেন সর্ব্বদাই স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার—"কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥ ২।৮।১৪০॥" শ্রীরাধা ··· "কৃষ্ণকে করায় শ্যাম-রসমধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর। অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥ ২।৮। ১৪১-৪২॥" শ্রীরাধা ··· 'কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ ১।৪।৭৩॥" আবার ··· "জগত-মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী॥ ১।৪।৮২॥"

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তির, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের আধার। তিনি পূর্ণতম-তত্ত্ব, তথাপি শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে যেন ক্রীড়নকের মত নৃত্য করাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন।—"পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য—নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৬-৮॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও প্রেমের বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষ॥ সৌপর্ণশ্রুতি॥" যে ভক্তে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সেই ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও বেশী। শ্রীরাধায় প্রেমের সর্ব্বাধিক বিকাশ, সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও সর্ব্বাধিক।

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥১।৮।৭০-৭১॥" বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন, তদনুরূপভাবে গোপীদের সেবা করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি নিজমুখে তাঁহাদের নিকটে নিজের চিরঋণিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥" ইহাতে গোপীদিগের প্রেমের মাহাত্ম্য এবং সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম-মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য্য-বিকাশক; তাই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা যখন পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বিকশিত হয় যে, তাহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত।৮।৩২॥"

গোপীতত্ত্ব

গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। গোপী-শব্দের অর্থ। বহু কান্তা ব্যতীত কান্তা-রস-বৈচিত্রীর উল্লাস হয় না বলিয়া হ্লাদিনীশক্তি অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা। "আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ১।৪।৬৮-৬৯॥" শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ, আর ব্রজদেবীগণ তাঁহার শাখাপত্রতুল্য। "রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শ্রীকৃষ্ণের যেমন গোপ-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণেরও গোপী-অভিমান। গুপ্-ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুপ্ ধাতু রক্ষণে; যে সমস্ত রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী; ইহাই গোপী-শব্দের অর্থ। গোপী বলিতে সাধারণতঃ মহাভাববতী কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই বুঝায়।

গোপী-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত গোপীগণ অন্য কিছুই কামনা করেন না, নিজেদের সুখের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধান নাই; তাঁহারা যে স্বীয় দেহের মার্জ্জন-ভূষণ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত; তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের সুখের সাধন; তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন; তাই তাঁহাদের সাজ-সজ্জা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেই চাহেন, স্বসুখার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা বলেন "কৃষ্ণসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর। ৩।২০।৫১॥" তথাপি যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার হেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান॥ ৩।২০।৫০॥"

মহাভাববতী গোপীদিগের অভিমান—তাঁহারা শ্রীরাধার সখী, সমপ্রাণা সখী; তাঁহাদের নিকটে শ্রীরাধারও গোপনীয় কিছুই নাই, শ্রীরাধার নিকটেও তাঁহাদের গোপনীয় কিছু নাই। এই সখীদের দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। "সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ ২।৮।১৬৪।" সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়॥ নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥ ২।৮।১৬৭-৮॥"

কামক্রীড়া নহে। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাবময়ী লীলা, ইহা কামক্রীড়া নহে, ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ; ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগঃ ঈর্য্যতে॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।', আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"যূনোর্নায়ক-নায়িকায়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়োর্দশনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্যায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্ররীত্যা আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ। * * * প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।"

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আস্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত-কামক্রীড়ার ন্যায় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতি প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতা ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতিপ্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয়-প্রীতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্ব্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্ত্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তাৎপর্য্য পশুবৎ-কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদি আস্বাদ্য; প্রীতিহীন চুম্বনাদি ধিক্কারজনক।

পুত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা চুম্বনাদি দ্বারা স্নেহাদি প্রকাশ করে না—তখন সম্বন্ধের অপেক্ষা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্রূপ প্রীতিপ্রকাশে বাধা দান করে। সুতরাং বাৎসল্য-প্রীতিরও নির্ব্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরস্পরের প্রতি আসক্তিযুক্ত নায়ক-নায়িকার প্রীতিপ্রকাশে সম্বন্ধের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রতি আসক্তি কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদিও কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রীতিপ্রকাশের দ্বার হয় না—উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত হয়, নিজের সুখের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্ব্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে যে চুম্বনালিঙ্গনাদি, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারস্বরূপ, ইহা উদ্দেশ্যে পর্য্যবসিত হয় না, চুম্বনালিঙ্গনের জন্যই তাঁহাদের চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ সুখের নিমিত্তও নহে। ভূগর্ভস্থ বাষ্পরাশির চাপ উত্তাপাধিক্যাদি বশতঃ যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধর্ম্মবশতঃই বাষ্পরাশি ভূগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে চেষ্টা করে; তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনও স্থলে ভূপৃষ্ঠ-বিদারণ, কোনও স্থলে পর্ব্বতাদির উদ্ভব, আবার কোনও স্থলে বা হ্রদাদির সৃষ্টি হয়। এস্থলে ভূমিকম্প-ভূগর্ভ-বিদারণাদি যেমন বর্দ্ধিত-চাপ, বাষ্পরাশির উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাহার বহির্গমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র—তদ্রূপ, চুম্বনালিঙ্গনাদিও শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরী-দিগের পরস্পরের প্রতি প্রীত্যাধিক্যের অভিব্যক্তি চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্র, চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না—তাঁহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরস্পরের প্রীতিসম্পাদন; যে উপায়েই হউক, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিমুহূর্ত্তে সম্বর্দ্ধনশীলা প্রীতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন খাদ্য বস্তুর গুণাদি বিচার করে না, যাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে—তদ্রূপ এই প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীলা প্রীতি, যেন হৃদয়মধ্যে স্থানাভাববশতঃই—প্রতিমুহূর্ত্তেই বর্দ্ধনশীলা গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায় সম্বন্ধে তাহার কোনও বিচার নাই—যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পর্ব্বতগাত্রে সঞ্চিত বারিরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিবেই—তদ্রূপ, ইঁহাদের প্রীতিরাশিও যে কোনও দ্বারে যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই; এই প্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে—অভিব্যক্তির দ্বার দিয়া নয়—অভিব্যক্তি-প্রয়াসের উদ্দামতা দ্বারা।

কাম ও প্রেম। কাম হইতেছে প্রাকৃত মনের বৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; সুতরাং ইহার অভিব্যক্তিতে অনেক অপেক্ষা আছে,—যে উপায়ে অভিব্যক্ত হইলে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে, সে উপায় কাম কখনও অবলম্বন করে না। কিন্তু প্রেম হইতেছে হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি, ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে; পরন্তু অপরের—বিষয়ের—প্রীতি-উৎপাদন। আর, অগ্নি যেমন নিজের দাহিকা-শক্তিতে সকল বস্তুকেই উত্তপ্ত করিয়া লইতে পারে, তদ্রূপ এই হ্লাদিনী-সার প্রেমও স্বীয় আনন্দাত্মিকা শক্তিতে যে কোনও উপায়কেই সুখ-সাধন করিয়া লইতে পারে. তাই ইহার আত্মপ্রকাশে উপায়ের অপেক্ষা নাই। তাই মহাভাববতী গোপ-সুন্দরীদিগের কৃত তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন—তত প্রীতি তিনি বেদস্তুতিতেও লাভ করেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন:—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩॥"

নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে ব্রজগোপীদিগের প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকে কান্তারতি বা মধুরা-রতি বলে। মধুরা-রতি তিন রকমের; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে সমর্থা-রতি।

সাধারণী। যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলে। নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শন-সম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥—উঃ নীঃ স্থা, ৩০।

কৃষ্ণসুখের ইচ্ছাকেই রতি বলে। আত্মসুখহেতু-সম্ভোগেচ্ছাই যদি সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইহাকে 'রতি' বলা হইল কেন? উত্তর—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। কুব্জা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইলেন এবং স্বসুখতাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তখনই তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। তারপর তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদিত হইল:—যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি-পথে উদিত হইয়াই আমাকে এত সুখী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচিত সপর্য্যদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিব। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইহার মূল নিজের সুখই, যদিও নয়নপথে উদিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে এই কৃষ্ণ সুখের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, কৃষ্ণসুখের বাসনা তো জন্মিয়াছে? কৃষ্ণসুখের জন্য এই একটু বাসনাবশতঃই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনা-মূলক-সম্ভোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (কৃষ্ণসুখেচ্ছা বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। কারণের ধর্ম্ম কার্য্যেও কিছু বর্ত্তমান থাকে; এই রতির কারণই হইল আত্মসুখ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুব্জাকে সুখ দিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যখন আবার হৃদয়ে বলবতী হয় তখনই আবার সম্ভোগজনিত-আত্মসুখ-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ কৃষ্ণসুখেচ্ছার সঙ্গেই আত্মসুখেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্বসুখ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুখ-বাসনাকে (রতিকে) ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণসুখবাসনারূপা রতি উৎপন্ন হয় না; প্রথমতঃ নিজের সুখানুভব, তারপরে নিজের সুখহেতু কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা; সুতরাং সাক্ষাদ্দর্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

শ্লোকে যে "প্রায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে সাধারণতঃ সাক্ষাদ্দর্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও রূপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়;

স্বসুখ-বাসনা-মূলক সম্ভোগেচ্ছাই যখন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সম্ভোগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেই এই রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সম্ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। "অসান্দ্রত্বাদ্রতেরস্যাঃ সম্ভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে। এতস্যা হ্রাসতো হ্রাসস্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি॥" সাধারণী-রতি প্রেমপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আত্মা প্রেমান্তিমান্-ইতি। উঃ নীঃ স্থায়িভাবে ১৬৪ শ্লোক।

সমঞ্জসা। যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই সান্দ্রা (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। "পত্নী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ উঃ নীঃ স্থা, ৩৩। এই শ্লোকের "গুণাদিশ্রবণাদিজ"-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; রূপগুণাদি-শ্রবণের পূর্ব্বে যেন রুক্মিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ-রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বকান্তা, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যা স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতি আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রকট-লীলায় প্রথমে প্রচ্ছন্ন হইয়াই ছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ রতি উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। "গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধন-সিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু নিত্যসিদ্ধাসু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা। তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্গুণরূপশ্রুতির্মনাগিতি। আনন্দচন্দ্রিকা।"

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে—পত্নীত্বাভিমানাত্মা। কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের পত্নীত্বের

অভিলাষ এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির ন্যায় তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ; কুব্জাদির সম্ভোগতৃষ্ণা তদ্রূপ নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশাবস্থায় সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে না ; কেবল কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণাই থাকে ; পরে বয়সের ধর্ম্মবশতঃ সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণা উদিত হয় ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না ; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সম্ভোগতৃষ্ণা সামান্য। "রুক্মিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিত-শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণাদিনোদ্বুদ্ধাগ্নিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি স্তথা কামোদ্গমসম বয়ঃসন্ধি-স্বাভাব্যাৎ সম্ভোগতৃষ্ণা-জন্যা চ রতির্যুগপদেবাভূৎ। তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥" ইহার পরে তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের জন্য, দ্বিতীয়তঃ স্ব-সুখের জন্য। কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণ-রতির সহিতেই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতি হইতে স্বতন্ত্র। শ্লোকোক্ত "ক্বচিৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-সুখার্থ-সম্ভোগ-তৃষ্ণা সর্ব্বদা উদিত হয় না, ক্বচিৎ অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদিত হয় মাত্র। "ক্বচিদিতিপদেন ইয়ং সম্ভোগ-তৃষ্ণোত্থা রতির্ন সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ।"

সমঞ্জসা-রতি হইতে সম্ভোগেচ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্ব-সুখার্থ সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে উত্থিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত বা বশীভূত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈ র্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৩৫॥"

সমঞ্জসা রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৬৩।"

সমর্থারতি। কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখ বাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতির একটী অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ উৎপত্তির বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হইতে জাত ; ইহা আত্মসুখবাসনা হইতে জাত, অথবা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজের সুখ হইলে, তারপর তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত ; সুতরাং ইহা নির্হেতুকী নহে। সমঞ্জসা রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা রতিতে উন্মেষের জন্য (কুব্জার রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের, বা (মহিষী আদির রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণের কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধর্ম্ম-বশতঃ ইহা আপনা আপনিই উন্মেষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্যাদিদর্শন, বা গুণাদিশ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। 'স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ২৬॥" দ্বিতীয়তঃ—সাধারণী-রতিতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছাই বলবতী ; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে ; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই তাঁহাদের বলবতী, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সেই বাসনা-পরিপূর্ত্তির একটা উপায় মাত্র ; সমর্থা-রতিতে সম্ভোগেচ্ছার প্রাধান্য নাই ; ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা গৌণী, তাহাও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-সম্ভোগের ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল চরণদ্বয় তাঁহাদের কঠিনস্তন-যুগলে স্পর্শ করাইতে তাঁহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইতেন না (যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহমিত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।২৯।১৯॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য লালসান্বিতা হইলেও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহাদের কৃষ্ণ-

সেবার বাসনা ধর্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই ; তাই তাঁহারা (যজ্ঞাদি-সম্পাদন পূর্ব্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্নীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-সুখের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে,লোকধর্ম-বেদধর্ম-বিধিধর্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; সর্ব্ববিধ ধর্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুরিত্যাদি।" কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিলনা – তাই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। এই রতি গোপীদিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থারতি বলে। চতুর্থতঃ – সাধারণী-রতি সর্ব্বদাই স্ব-সুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রূপ বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না ; কঠিন প্রস্তরে যেমন সূচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থারতিতেও কৃষ্ণসুখবাসনব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সমর্থারতিকেই গাঢ়তমা বলে।

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "রতি র্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে ॥" এই ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থা-রতিই প্রধানা বা মুখ্যা মধুরারতি ; ইহাই কেবলা মধুরা রতি ; কারণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং সমর্থারতিমতী ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীদিগের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, একমাত্র শ্রীরাধাতেই সমর্থা-রতির চরম-পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব দৃষ্ট হয়।

রমণ। হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রীতিবিধানের নামই রমণ। রমণ শব্দের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

আত্মারামতা। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহাদের সাহচর্য্যে ক্রীড়ারস-আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেক-সহায়তার হানি হয় না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা গোপী। ব্রজগোপীগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা ; তাঁহারা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি। আর যাঁহারা সাধন-প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধা। ইঁহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব। নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন।

সখী ও মঞ্জরী। সেব্যার প্রকার-ভেদে আবার গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সখী ও মঞ্জরী। যাঁহারা স্বীয় অঙ্গাদানাদি দ্বারা শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয়া সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তাহাদিগকে সখী বলা যায়। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখী ; ইঁহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তি। আর যাঁহারা সাধারণতঃ তদ্রূপ করেন না, নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিতে যাঁহারা কখনও প্রস্তুত নহেন, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই যাঁহারা নিজেদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে মঞ্জরী বলা হয়। ইঁহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী এবং অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ-সেবায় সখী অপেক্ষাও মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী। মঞ্জরীগণ সখীগণ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী ; ইঁহারা স্বরূপশক্তি। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী ; মঞ্জরীদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ জীবও আছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ ব্রজে সখী হইতে পারেন না। সখীগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধা-স্বরূপশক্তি। সখীদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী ; মঞ্জরীদের সেবা আনুগত্যময়ী। সাধারণতঃ সখী ও মঞ্জরী এই উভয়কেই সখী বলা হয় ; কারণ, উভয় দ্বারাই লীলাবিস্তার সাধিত হয় এবং লীলাবিস্তারই সখিত্বের বিশেষ লক্ষণ।

শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীরাধাই ব্রজের মধুরা-রতির মূল উৎস; শ্রীরাধার সাহচর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর রস আস্বাদন করেন, সখী-মঞ্জরীগণ তাহার পরিপুষ্টি এবং বৈচিত্রী বিধান করেন মাত্র; কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত সখী-মঞ্জরীর সমবেত চেষ্টায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ বসন্তরাস লীলায় পাওয়া গিয়াছে। শতকোটি গোপী রাসমণ্ডলে নৃত্যাদি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-লীলাশক্তির প্রভাবে এক এক মূর্ত্তিতে এক এক গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া রাসরস আস্বাদন করিতেছেন; অকস্মাৎ কোনও কারণে শ্রীরাধা যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখনই রাসস্থলী যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল, রসের উৎস বন্ধ হইয়া গেল; বস্তুতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে দেহের যেরূপ অবস্থা হয়, শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসমণ্ডলেরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। শতকোটি গোপীর মধ্যে সকলেই আছেন; নাই কেবল একা শ্রীরাধা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিলেন--ডুবিয়াছিলেন রসের সমুদ্রে; অকস্মাৎ কে যেন তাঁহাকে দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া দিল; তীব্রবিরহজ্বালায় ব্যথিত হইয়া তিনিও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে ছুটিয়া গেলেন। ইহা হইতেই শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। ২।৮।৭৭-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে। পরবর্ত্তী প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরম-স্বরূপ

যে স্থলে স্বরূপেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং সমস্ত শক্তির ও পূর্ণতম বিকাশ, সে স্থলেই পরম-স্বরূপত্বের অভিব্যক্তি। তত্ত্ব-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ হইলেও লীলানুরোধে তাঁহার স্বরূপ শক্তি যখন অনাদিকাল হইতেই স্বতন্ত্র বিগ্রহ ধারণ করিয়াও বিরাজিত এবং মূর্ত্তিমতী স্বরূপ-শক্তির বিগ্রহ শ্রীরাধাতেই যখন স্বরূপ-শক্তির শ্রেষ্ঠতমা-বৃত্তি-হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া তিনি যখন স্বরূপ-শক্তির অন্যান্য বৃত্তিসমূহেরও অধিষ্ঠাত্রী—তখন শ্রীরাধাতে স্বরূপ-শক্তির পূর্ণতম-অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাই শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি। আর এই শক্তিরই শক্তিমান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণতম শক্তিমান্। পূর্ণতমা শক্তির সহিত পূর্ণতম শক্তিমানের মিলনেই পরম-স্বরূপত্বের অভিব্যক্তি। তাই যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।

রসস্বরূপত্বের বিকাশে পরম-স্বরূপত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও যখন যেরূপ শক্তির সাহচর্য্যে লীলা করেন, তখন তদনুরূপ ভাবেই তাঁহার ভগবত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। যখন তিনি সখাদের সঙ্গে থাকেন, কি যশোদামাতার কোলে থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য দেখিয়া মদন মূর্চ্ছিত হয় না; মহাভাববতী গোপীদিগের সঙ্গে যখন থাকেন, তখনও তাঁহার মাধুর্য্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় না; কিন্তু সেই তিনিই যখন মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার নিকট থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিকাশের অসমোর্দ্ধতায় মদন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। অখণ্ড-রস-বল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীর সাহচর্য্যে চিদানন্দঘনবিগ্রহ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডরস-স্বরূপত্বেরই পূর্ণতম বিকাশ—রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসিকেন্দ্র-শিরোমণিত্বেরই পূর্ণতম-অভিব্যক্তি। তাই রসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে স্বরূপে কেবল রস-স্বরূপত্বেরই পূর্ণতম বিকাশ, তাহাকে পরম-স্বরূপ বলা সঙ্গত কি না? তাঁহাতে অন্য বিষয়ের পূর্ণতম বিকাশ আছে কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরূপে পরম-স্বরূপ হইবেন?

ক্রিয়াশক্তির পর্য্যবসান রসস্বরূপত্বে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরামে। ক্রিয়া শক্তির অভিব্যক্তি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবলরাম চিচ্ছক্তির সহায়তায় অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন ভগবদ্ধাম এবং প্রত্যেক ধামে প্রয়োজনীয় লীলার উপকরণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ধামাদি ও লীলোপকরণাদি হইল ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তরই ফল; কিন্তু এই ধামাদি-প্রকাশের তাৎপর্য্য—কেবল লীলার আনুকূল্য করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লীলা আবার পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বেরই নিজস্ব বস্তু; সুতরাং ভগবদ্ধামাদিতে ক্রিয়াশক্তির যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও পরব্রহ্মের রস-স্বরপত্বের বিকাশেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ সৃষ্টিকার্য্যে। লীলাবশতঃই এই সৃষ্টি—তাহা "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে; সুতরাং সৃষ্টি-ব্যাপারে ক্রিয়া-শক্তির যে অভিব্যক্তি, তাহারও পর্য্যবসান লীলাতে—যদ্দ্বারা রস-স্বরূপত্বেরই বিকাশ সূচিত হয়। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে বহির্ম্মুখ জীব আসিয়াছে—অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্ত, অদৃষ্ট-ভোগে কর্ম্মফলের নিবৃত্তি ঘটিলে—অথবা তৎপূর্ব্বেও—জীব এই সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডেই সাধন-ভজনের সুযোগ পাইতে পারে; সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎ-কৃপায় জীব ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে—এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেই। যখন জীব ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিবে, তখন লীলার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাই তাহার ভাগ্যে ঘটিবে। সুতরাং জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায়—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে পরব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির যে অভিব্যক্তি, তাহারও পর্য্যবসান—বহির্ম্মুখ জীবকে ভগবৎ-পার্ষদত্ব-দানে, সুতরাং—লীলায় বা পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের অনুরূপ কার্য্যে।

এইরূপে দেখা গেল, ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরামে হইলেও, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের অনুকূল।

ঐশ্বর্য্যশক্তির পর্য্যবসানও রসস্বরূপত্বে। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশেই রসস্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু, তাহা বলিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ নাই, তাহা নহে। ব্রজে মাধুর্য্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। তবে ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত, সম্যক্‌রূপে পরিমণ্ডিত। তাই এই ঐশ্বর্য্যও পরম আস্বাদ্য। ব্রজের ঐশ্বর্য্যে ভীতি নাই, ত্রাস নাই, সঙ্কোচ নাই। ব্রজে আনন্দ-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া এবং আনন্দস্বরূপত্বেই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য—পরমস্বাতন্ত্র্য। ঐশ্বর্য্যের এখানে প্রাধান্য নাই; এখানে ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অনুগত। অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনরূপ সেবাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের কার্য্য। মাধুর্য্যের বা রসের পুষ্টির জন্যই ব্রজে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিয়া এবং মাধুর্য্যেরই অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের অন্তরালেই তাহার বিকাশ; তাই বৈকুণ্ঠের ন্যায় ব্রজে ঐশ্বর্য্যের অনাবৃত বিকাশ নাই এবং এজন্যই ঐশ্বর্য্যকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া ব্রজে কেহ চিনিতে পারে না। চিনিতে পারিলে রসের পুষ্টি সাধিত হইত না, মাধুর্য্যের বিকাশই বরং প্রতিহত হইত। ঐশ্বর্য্যও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল—তাঁহার আস্বাদনীয় লীলারসের মাধুর্য্যের পরিপুষ্টিসাধন, যাহাতে তাঁহার রসস্বরূপত্ব পূর্ণসার্থকতা লাভ করিতে পারে। ঐশ্বর্য্য তাহাই করে বলিয়া ব্রজে ঐশ্বর্য্য-শক্তির পর্য্যবসানও রসস্বরূপত্বে।

রসস্বরূপত্বেই পরব্রহ্মের পর্য্যবসান। অন্য যে কোনও বিষয়ের আলোচনাদ্বারাও দেখা যাইবে—সমস্তেরই পর্য্যবসান পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বেই। রসস্বরূপত্বই তাঁহার পরম-স্বরূপ; সুতরাং রসস্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশেই তাঁহার পরমস্বরূপত্বের বিকাশ। তাই যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরমস্বরূপ।

জীবতত্ত্ব

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা গুল্মাদি যত রকমের প্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহটী থাকে চেতন; কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহা হইয়া যায় অচেতন—তখন দেহের সমস্তই থাকে, থাকেনা কেবল চেতনা। তাহা হইতে বুঝা যায়—দেহের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহার অভাবে সমস্ত দেহটাই চেতন এবং অনুভূতি-সম্পন্ন হইয়া থাকিত, মৃত্যুর সময়ে সেই বস্তুটা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতেই দেহটা অচেতন এবং অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। একটী অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি একটা প্রদীপ আনা যায়, ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, ঘরটা আলোকিত হইয়া পড়ে; প্রদীপটী অন্যত্র লইয়া গেলে ঘরটা আবার অন্ধকার হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়—প্রদীপটী আলোকময়, ইহা অপরকেও অলোকিত করিতে পারে। তদ্রূপ, যে বস্তুটী দেহে থাকিলে দেহটী চেতনাময় হয় এবং যাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহা নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই চেতন বস্তুকেই বলে জীব। যাহা নিজেও জীবিত এবং অপরকেও জীবিত করিতে পারে, তাহাই জীব। মনুষ্যাদি স্থাবর-জঙ্গমের দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত (জীবযুক্ত) থাকে। তাহাদের দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার। দেহ কিন্তু জীব নয়; দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের চেতনা আছে। তথাপি, সাধারণতঃ জীববিশিষ্ট দেহকেও জীব বলা হয়। মানুষ একটী জীব, সিংহ একটী জীব, বৃক্ষ একটী জীব—এইরূপই সাধারণতঃ বলা হয়। পার্থক্য-সূচনার জন্য প্রকৃত-চেতনাময় জীবকে জীবস্বরূপ বা জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মা হইল স্বরূপতঃই জীব; আর জীবাত্মাবিশিষ্ট দেহকে—মনুষ্যাদিকে—জীব বলা হয় কেবল উপচারবশতঃ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নাম বা রূপ জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা যখন মানুষের দেহে থাকে, তখন দেহসম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়; যখন পশুদেহে থাকে, তখন পশু বলিয়া কথিত হয়। একই জীবাত্মা কখনও মানুষ, কখনও পশু কখনও তরু, গুল্ম, লতা ইত্যাদিও হইতে পারে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গুল্মাদির দেহকে সকলেই দেখে; কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব আছে—যেমন রোগের জীবাণু আদি—যাহাদিগকে খোলা চক্ষুতে দেখা যায় না, মাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদি দ্বারাই দেখা যায়। তথাপি যন্ত্রাদির সাহায্যে হইলেও তাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের যোগ্য। জীবাত্মাকে কিন্তু দেখা যায় না; যন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা অদৃশ্য। জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায়—কেবল তাহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা। যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেই দেখা যায়, তাহদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে; তাহা বুঝা যায় তাহাদের জীবন-মৃত্যুদ্বারা।

মানুষের দেহের, পশুর দেহের, বা বৃক্ষাদির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি বা উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্মার উপাদান বা বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যাহাকে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাহা কখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মাদিই বা কিরূপ, তাহা কেবল শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায়। জীবাত্মার (অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের) স্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

জীব ভগবানের শক্তি। জীব হইল স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি। গীতা ও বিষ্ণুপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। ৬।৭।৬১॥—বিষ্ণুশক্তি (স্বরূপশক্তি) পরা-শক্তি নামে অভিহিতা; অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি (জীবশক্তি); অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞায় (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলিয়া) অভিহিতা।"

গীতা বলেন—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে মহাবাহো, ইহা (পূর্ব্বশ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জড় বলিয়া) নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা হইতে ভিন্না জীবশক্তিরূপা আমার একটী উৎকৃষ্টা (চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীবশক্তির অংশরূপ জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগের জন্য বহিরঙ্গা-শক্তিভূত এই) জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১।৭।১১২ ॥"

চিদ্রূপা শক্তি। দেখা গেল, জীব হইল ভগবানের জীবশক্তি। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা"-ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও যে একটী পৃথক শক্তি, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনে তু তিসৃণামেব পৃথক্‌শক্তিত্বনির্দ্দেশাৎ"-ইত্যাদি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ২৫ ॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাম্" ইত্যাদি গীতোক্ত (৭।৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীব-শক্তিকে উৎকৃষ্ট বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি হইল জড়, কিন্তু জীবশক্তি হইল চৈতন্যময়ী। "ইয়ং প্রকৃতির্ব্বহিরঙ্গা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং জীবভূতাং পরমুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ ॥" উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের অর্থও এইরূপ এবং শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যের অর্থের মর্ম্মও এইরূপই। ইহা হইতে জানা গেল—জীবশক্তি চৈতন্যময়ী, চিদ্রূপা। পরমাত্মসন্দর্ভও তাহাই বলেন। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জড়ো ন বিকারী। ১৯ ॥" "দৈবাৎক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরং পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ শ্রীভা, ৩।২৬।১৯ ॥" —এই শ্লোকের টীকায় বীর্য্যং-শব্দের অর্থে শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্", শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্" এবং শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্তিম্।" ইহা হইতে জানা যাইতেছে—জীবশক্তি চৈতন্যস্বরূপ, চিদ্রূপা শক্তি; সময় সময় ইহাকে চিচ্ছক্তিও বলা হয়। কিন্তু এই চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নয়।

তটস্থাশক্তি। এই জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। "ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গামায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গ-চিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্—শ্রীভা, ১০।৮৭।২০ শ্লোক-টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্-শব্দের অর্থে চক্রবর্ত্তিপাদ।" এইরূপে, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়ত্বরূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া, অর্থাৎ এই জীবশক্তি—স্বরূপশক্তিও নহে, মায়াশক্তিও নহে, পৃথক্ একটী শক্তি বলিয়া, ইহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। "অথ তটস্থত্বঞ্চ * * * উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব। পরমাত্ম-সন্দর্ভ-। ৩৭ ॥" এই চিদ্রূপা জীবশক্তিকে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রও তটস্থাশক্তি বলিয়াছেন। "যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বয়ং-বেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভ (২৬) ধৃতবচনম্।"

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, জীবশক্তি চিদ্রূপা শক্তি হইলেও ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তি-রূপা চিচ্ছক্তি নহে। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চিদংশের শক্তির নামই স্বরূপশক্তি-রূপা চিচ্ছক্তি। চিদ্রূপা জীবশক্তি হইল জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, স্বরূপশক্তি-বিশিষ্টকৃষ্ণের অংশ নহে। (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। জীবশক্তি জড় নহে, পরন্তু চৈতন্যময়ী—ইহা বুঝাইবার জন্যই ইহাকে চিদ্রূপা বলা হয়। ভগবৎস্বরূপে এই শক্তির স্থিতি নাই বলিয়া ইহা স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে।

জীব ভগবানের অংশ। জীব ভগবানের অংশ; গীতায় অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭ ॥"

বেদান্তমতেও জীব ব্রহ্মেরই অংশ। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে ২।৩।৪৩ ॥"—এইসূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। অংশঃ (পরমেশ্বরের অংশ জীব; অংশু—কিরণ—যেমন

সূর্য্যের অংশ এবং সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে। কেন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইল?) নানাব্যপাদেশাৎ (ঈশ্বরের সহিত জীবের নানারূপ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া; যেমন সুবালশ্রুতি বলেন—দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণ ইতি—এক নারায়ণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্ গতি। স্মৃতিশাস্ত্রও বলেন—গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ ইত্যাদি—ঈশ্বরই জীবের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ এবং সুহৃদ্। এইরূপে দেখা যায়, স্মৃতি-শ্রুতিতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। তাহাতেই জীব যে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত; ব্রহ্ম আধার, জীব আধেয়; ব্রহ্ম প্রভু, জীব দাস—ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ স্মৃতি-শ্রুতিতে পাওয়া যায়)। অন্যথা চ অপি (অন্যরূপও উল্লেখ আছে। পুর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ সূচিত হইয়াছে। অন্যরূপ—অর্থাৎ অভেদের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কোথায় অভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়?? দাসকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে (কেহ কেহ—আথর্ব্বণিকেরা—বলেন, ব্রহ্মই দাস-কিতবাদিরূপ জীব। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি।—কৈবর্ত্ত, ভৃত্য, কপটী—এসকল জীব ব্রহ্মই—ইহাই তাঁহাদের উক্তি। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপে অভিন্ন হইলে এইরূপ ব্যপদেশ সম্ভব নয়। যেহেতু, কেহ কখনও নিজের ব্যাপ্য হইতে পারেনা, সৃজ্যও হইতে পারে না। আবার চৈতন্যঘন ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপতঃ দাসাদিভাবও সম্ভব নয়)। (গোবিন্দভাষ্য)। ভাষ্যকার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন ভেদের উল্লেখও দেখা যায়, অভেদের উল্লেখও দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে—জীব ব্রহ্মের অংশ। যেহেতু, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও—তাঁহার ভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ। —শ্রুতির উক্তি অনুসারে জীব ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের আশাংশিভাবই প্রতীত হয়।

পরবর্ত্তী "মন্ত্রবর্ণাৎ চ॥২।৩।৪৪"-সূত্রেও বলা -হইয়াছে, বেদের মন্ত্রাংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। পুরুষসূক্তে আছে—"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি—সর্ব্বভূত ব্রহ্মের একটি অংশ। এস্থলে সর্ব্বভূত-শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে জীবই প্রধান। (শঙ্করভাষ্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ (গোবিন্দভাষ্য) বলেন, উক্ত মন্ত্রে "ভূতানি" শব্দে জীবাত্মা যে বহুসংখ্যক, তাহাই সূচিত হইতেছে।

পরবর্ত্তী "অপি চ স্মর্য্যতে॥ ২।৩।৪৫॥"—সূত্রে বলা হইয়াছে, স্মৃতি হইতেও জানা যায়, জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহার প্রমাণরূপে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণ "মমৈবাংশো জীবলোকে"—ইত্যাদি গীতাশ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তবে জীবের (মায়াবদ্ধজীবের) দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইবে—যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্তপদাদি আহত হইলে সেই ব্যক্তির কষ্ট হয়, তদ্রূপ। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন।

"প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ॥২।৩।৪৬॥"—"ন এবং পরঃ"—জীব যেমন দুঃখী হয়, পর বা ব্রহ্ম সেরূপ হন না। "প্রকাশাদিবৎ"—সূর্য্যের ন্যায়। সূর্য্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যের আলোও বাঁকাইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেই বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। (মায়াবদ্ধ) জীব দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া দেহের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করিয়া দুঃখী হয়। (শঙ্করভাষ্য)।

পরবর্ত্তী "স্মরতি চ ॥২।৩।৪৭॥"—সূত্রেও বলা হইয়াছে, স্মৃতিতেও ব্রহ্মের নির্লিপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। "ন লিপ্যতে কর্ম্মফলৈঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।—পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, "মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায়" ব্রহ্মও তদ্রূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। শ্রুতিও তাহা বলেন—"তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি।—ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একজন (জীব) পক্ব কর্ম্মফল ভক্ষণ করে; অপর জন (ব্রহ্ম) ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করেন। (শঙ্করভাষ্য)।

এসকল বেদান্তসূত্রে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপন্ন হইল।

কিরূপ অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, জীব (জীবাত্মা) ব্রহ্মের কিরূপ অংশ?

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যে এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"—ইত্যাদি ২।৩।৪৩-সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ—জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের কোনও অংশ হইতে পারে না; যেহেতু, ব্রহ্ম মায়ার বিষয়ীভূত নয়, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শই করিতে পারে না, ছেদ করিবে কিরূপে? তারপর বলিয়াছেন—"ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ—টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের কোনও এক বিচ্ছিন্ন অংশই জীব, একথাও বলা চলেনা (পাষাণকে খণ্ড করিবার যন্ত্রকে টঙ্ক বলে); যেহেতু, শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য; বিশেষতঃ, ব্রহ্মকে এই ভাবে ছেদ করা যায় মনে করিলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব-দোষও স্বীকার করিতে হয়; শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কিন্তু বিকারহীন।" শেষকালে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্—ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই তত্ত্ব।" শক্তি হইলে কিরূপে অংশ হইতে পারে, তাহাও ভাষ্যকার বিচার করিয়াছেন। "একবস্তেকদেশত্বমংশত্বমিতি অপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতি।—কোনও বস্তুর একদেশই হইল সেই বস্তুর অংশ; ব্রহ্মের শক্তি জীবও ব্রহ্মের একদেশ; যেহেতু ব্রহ্ম হইল শক্তিমান্ একবস্তু—ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।"

উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই অনুগত। শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্বহিরন্তরসংবরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্। ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ১০।৮৭।২০॥"-এই শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তত্র শক্তিরূপত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি—শক্তিরূপেই জীব ব্রহ্মের অংশ। ৩১॥"

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জীব কি ব্রহ্মের কেবল শক্তিরূপেই অংশ? অর্থাৎ জীবে কি ব্রহ্মের কেবল শক্তিমাত্রই আছে, না শক্তিমান্‌সহ শক্তি আছে? পূর্ব্বোদ্ধৃত গোবিন্দ-ভাষ্যে দৃষ্ট হয়, "ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু—ব্রহ্ম হইলেন শক্তিমান্ একটী মাত্র বস্তু।" একটী মাত্র বস্তু বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥" ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি, মৃগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায়, অবিচ্ছেদ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়—শক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই (অথবা শক্তিমানের সহিত সংযুক্ত শক্তিই) হইল জীব।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন জাগে—কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ জীব? ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সকল শক্তির যোগ একরকম নহে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্না হইলেও, তাহার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ স্বরূপ-শক্তির মত নহে। স্বরূপ-শক্তি থাকে ব্রহ্মেরই স্বরূপের মধ্যে। মায়াশক্তির সহিত ব্রহ্মের কিন্তু স্পর্শ নাই; তথাপি, ব্রহ্ম মায়াশক্তির নিয়ন্তা, মায়াশক্তি ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মের উপরেই মায়াশক্তির সত্তা নির্ভর করে, ব্রহ্মের ব্যতিরেকে মায়ারও ব্যতিরেক হয় বলিয়া (ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ। শ্রীভা, ২।৯।৩২।) মায়াশক্তিও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংযুক্তা। অন্যান্য শক্তিসম্বন্ধেও এইরূপ।

যাহা হউক, মায়াশক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মই কি জীব? তাহা নয়। যেহেতু, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা। ৭।৫॥"-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্না এবং উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে; উৎকৃষ্টা বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি জড়, কিন্তু জীবশক্তি চেতনাময়ী। জীব (বা জীবশক্তি) যদি-মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই অংশ হইত, তাহা হইলে, ইহাকে মায়াশক্তি অপেক্ষা ভিন্না বা উৎকৃষ্টা বলা হইত না।

তবে কি স্বরূপশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের অংশই জীব? শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৪৩-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবিষয়ে বিচার করিয়াছেন। জীব যদি স্বরূপশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই অংশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ও জীবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ থাকে না। অথচ জীব সৃজ্য, ব্রহ্ম স্রষ্টা; জীব নিয়ম্য, ব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা; জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম তাহার ব্যাপক—ইত্যাদি সম্বন্ধ শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিজে কেহ নিজের স্রষ্টা বা সৃজ্য, কিম্বা ব্যাপক বা ব্যাপ্য হইতে পারে না। "ন হি স্বয়ং সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। গোবিন্দভাষ্য।" সুতরাং জীব স্বরূপ-শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের (বা স্বরূপশক্তিযুক্তকৃষ্ণের) অংশ হইতে পারে না। ইহাও শ্রীপাদজীব-গোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। তাহাই দেখান হইতেছে।

দেখা গিয়াছে—জীব (বা জীবাত্মা) হইল শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ। আরও দেখা গিয়াছে—জীব মায়াশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নয়, স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশও নয়। বাকী রহিল এক জীবশক্তি। তাহা হইলে জীব (বা জীবাত্মা) কি জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশ? পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষমীষবহিরন্তরসংবরণম্" ইত্যাদি (১০।৮৭।২৪)-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (৩১) বলিয়াছেন—"অংশকৃতমংশমিত্যর্থঃ অখিলশক্তিধৃতঃ সর্ব্বশক্তিধরস্যেতি বিশেষণং জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ ন তু শুদ্ধস্যেতি।" এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রুতিগণ বলিতেছেন (উক্ত শ্লোকটী শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতির অন্তর্ভুক্ত)—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব; শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নহে। এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ-বলে শ্রীজীবগোস্বামী সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশই জীব বা জীবাত্মা।

কিন্তু জীব শুদ্ধ-কৃষ্ণের অংশ নয়—একথার তাৎপর্য্য কি? শুদ্ধ-কৃষ্ণ কাহাকে বলে? উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবমন্তর্য্যামিত্বাংশেঽপি ভগবতঃ শুদ্ধত্ববর্ণনেন তৎপরাণাং শ্রুতীনাং বচনং শ্রুত্বা" ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা গেল—অন্তর্য্যামিত্বাংশেই ভগবানের (বা ব্রহ্মের) শুদ্ধত্ব। স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্ম বা কৃষ্ণই অন্তর্য্যামী। সুতরাং স্বরূপশক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণই শুদ্ধ-কৃষ্ণ—ইহা পাওয়া গেল। এবং ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে। সুতরাং জীবে স্বরূপশক্তিও থাকিতে পারে না। জীবে যে স্বরূপশক্তি নাই, বিষ্ণুপুরাণও তাহা বলিয়াছেন। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বি, পু, ১।১২।৬৯॥" শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১।৪।৭ শ্লোকের টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, স্বরূপশক্তিই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে; জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় ভগবান্ কিরূপে জীবশক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারেন? পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥"-এই ১১।২২।৬-শ্লোকের প্রমাণে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রৈতি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৪॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়—শক্তিমান্ পরমাত্মাতে (ভগবানে) জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ জীবশক্তিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্-পরমাত্মার স্বরূপেই তো স্বরূপশক্তি নিত্য বর্ত্তমান। সেই ভগবানে যখন জীবশক্তি অনুপ্রবেশ করিল, তখন এই জীবশক্তিবিশিষ্ট ভগবানেও তো স্বরূপশক্তি থাকিবে—যেহেতু, স্বরূপশক্তি হইল ভগবানের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিরাজিত। তাহা হইলে জীবেই বা স্বরূপশক্তি থাকিবে না কেন ? মিশ্রীর সরবত সর্ব্বদাই মিষ্ট ; তাহাতে যদি লেবুর রস মিশ্রিত হয়, সরবতের মিষ্টত্ব তো লোপ পাইয়া যায় না।

ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায়—ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। প্রাকৃত জগতেও এইরূপ দেখা যায়। কোনও বিচারপতি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোমলচিত্ত এবং খুব দয়ালু হইতে পারেন ; কিন্তু যখন তিনি বিচারাসনে বসেন, তখন আইনানুগত ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাকে আশ্রয় করে ; তখন তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন। তখন তাঁহার চিত্তের কোমলতা এবং দয়ালুতা যেন নিদ্রিত থাকে, ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। এস্থলে বলা যায়—ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ শক্তি থাকিলে ন্যায়পরায়ণতার ভিতর দিয়া তাঁহার কোমলচিত্ততা এবং দয়ালুতা উঁকি-ঝুঁকিও মারিবে না। ভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীবশক্তি যখন তাঁহাতে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বরূপশক্তি কিঞ্চিন্মাত্রই বিকশিত হয় না, একমাত্র জীবশক্তিই তাঁহাতে প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। স্বরূপশক্তি ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও যে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না, তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই তাহার প্রমাণ। স্বরূপশক্তির বিকাশহীন ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট জীবশক্তি অনাদিকাল হইতেই নিত্য-বিরাজিত ; এই তত্ত্বকেই শ্রীজীবগোস্বামী জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা।

সুতরাং জীব বা জীবাত্মা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ নয়; জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।

বিভিন্নাংশ। ভগবানের অংশ দুই রকমের—স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। "তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ। বিভিন্নাংশাস্তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্তু গুণলীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৫ ॥" লীলাবতার-গুণাবতারাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইল ভগবানের স্বাংশ ; আর জীব হইল বিভিন্নাংশ। "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ; স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার। অনন্ত বৈকুণ্ঠব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার : স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ২।২২।৫-৭ ॥"

এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণম্" ইত্যাদি ১০।৮৭।২০-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মণ্ডলস্থানীয়স্য ভগবত স্বল্পশক্তিব্যক্তিময়াবির্ভাববিশেষত্বাং স্বাংশত্বং শ্রীমৎস্যদেবাদীনাং রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ বিভিন্নাংশত্বং জীবানামিতি তত্ত্ববাদিনঃ। অত্র তদুদাহৃতং মহাবারাহ-বচনঞ্চ। স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথাস্থিতিঃ ॥ তদেব নাণুমাত্রোপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥" তাৎপর্য্য—"একদেশস্থিতস্যাগ্নে- জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১।২২।৫৩ ॥"—এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোক অনুসারে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলতুল্য এবং পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে—সুতরাং জীবকেও—তাঁহার রশ্মিতুল্য মনে করা যায়। রশ্মি থাকে সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে—যদিও তাহা সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ হইলেও ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে থাকেনা, বাহিরে থাকে। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপগণের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নাই ; তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহের অন্তর্ভূক্ত। শক্তিতেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন ; তাই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী. আর অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাঁহারা হইলেন সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই অল্পশক্তিব্যক্তিময় আবির্ভাববিশেষ এবং তাঁহারা মণ্ডলের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও

পার্থক্য নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ; এজন্য এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি আছে। আর, রশ্মিস্থানীয় জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীব অল্পশক্তি, সামান্য-সামর্থ্যযুক্ত। স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশকে বলে স্বাংশ—চতুর্ব্যূহ, পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, পুরুষত্রয়, লীলাবতার, গুণাবতারাদি। আর জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশকে বলে বিভিন্নাংশ, বিভিন্নাংশে স্বরূপশক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ পরিকর-গণও স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহারা স্বাংশের অন্তর্ভুক্ত।

সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বদাই সূর্য্যের বাহিরেই থাকে, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বদা কৃষ্ণস্বরূপের বাহিরেই থাকে। সূর্য্যরশ্মি যেমন কখনও সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভূত হইয়া যায় না, জীবও তদ্রূপ কখনও কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর্ভূত হইয়া যায় না—মুক্তাবস্থাতেও না। এজন্যই বোধ হয় জীবকে বিভিন্নাংশ—বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ বলা হইয়াছে।

জীবের পরিমাণ বা আয়তন। জীব বা জীবাত্মা পরিমাণে কি বিভু (সর্ব্বব্যাপক), না মধ্যমাকার, না কি অতিক্ষুদ্র বা অণুপরিমাণ?

জীবাত্মা যদি বিভু বা সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে তাহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত সম্ভব হয় না; কোনও আধারে আবদ্ধ হওয়া বা সেই আধার হইতে বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব হয় না। কিন্তু কৌষিতকী শ্রুতি বলেন—জীবাত্মা (জগতিস্থ স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণীর) দেহ হইতে বাহির হইয়া গমন করে। "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি।—জীবাত্মা যখন শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলের সহিতই বাহির হইয়া যায়। ৩।৩॥" জীবাত্মা যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, তাহাও কৌষিতকী শ্রুতি হইতে জানা যায়। "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।—যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে, চন্দ্রলোকেই গমন করে। ১।২।" আগমন করার কথাও বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে। ৪।৪।৬॥—কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেইলোক (পরলোক) হইতে আবার এই পৃথিবীতে আসে।" এসকল কথাই "উৎক্রান্তিগত্যা-গতীনাম্।"—এই ২।৩।১৯-বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইদানীন্তু কিম্পরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যমপরিমাণ আহোস্বিন্মহৎপরিমাণ ইতি।—জীবের (জীবাত্মার) পরিমাণ কি অণু? না কি মধ্যম? না কি মহৎ—বিভু? তাহারই বিচার করা হইতেছে।" তারপরে তিনি বলিয়াছেন—"উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রবণানি জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি। জীবের উৎক্রমণ, গমন এবং আগমনের কথা শুনা যায় বলিয়া জীব (বিভু হইতে পারে না,) পরিচ্ছিন্নই হইবে।" শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণও তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে উক্তরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবাত্মা যে বিভু নহে, তাহাই শ্রুতি-বেদান্ত হইতে জানা গেল। জীবাত্মা অপরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছিন্ন।

যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মধ্যমাকারও হইতে পারে, অণুপরিমাণও হইতে পারে। তবে কি জীব মধ্যমাকার? মধ্যমাকার বলিতে দেহের যেই আকার, জীবাত্মারও সেই আকার বুঝায়। জৈনদের মতে জীবাত্মা মধ্যমাকার। বেদান্তের "এবং চ আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্।"—এই ২।২।৩৪-সূত্রে এই জৈনমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সূত্রের মর্ম্ম শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এইরূপ। একই জীবাত্মা কর্ম্মফল অনুসারে কখনও মনুষ্যদেহ, কখনও কীটদেহ, কখনও বা হস্তিদেহকে আশ্রয় করে। যে জীব কীটের ক্ষুদ্র দেহমাত্র ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই আবার হস্তীর বৃহৎ দেহকে কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে? ভিন্ন দেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও একদেহেরও বিভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। শৈশব, কৌমার, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য—জীবনের এসমস্ত বিভিন্ন অবস্থায় দেহের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যদি মধ্যমাকার বা দেহপরিমিত আকারবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে একই জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হইবে? যদি বল—দেহের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে জীবাত্মার পরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহারই উত্তর পাওয়া যায়, বেদান্তের পরবর্ত্তী সূত্রে—"ন চ পর্য্যায়াদ্ অপি অবিরোধঃ

বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫ ॥-সূত্রে।” এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই। যদি বলা যায়, জীবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত বিরোধের নিরসন হয় না। “বিকারাদিভ্যঃ”—কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্মা বিকারী—সুতরাং অনিত্য। সুতরাং দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আত্মারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এই মত শ্রদ্ধেয় নহে। আরও যুক্তি আছে। তাহা পরবর্ত্তী বেদান্তসূত্রে—“অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ॥২।২।-৩৬ ॥”-সূত্রে দেখান হইয়াছে। উভয়নিত্যত্বাৎ—আত্মা এবং তাহার পরিমাণ এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া, অন্ত্যাবস্থিতেঃ—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার, অবিশেষঃ,—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষত্ব) কিছুই নাই। আত্মা যেমন নিত্য, তাহার পরিমাণও নিত্য—সকল সময়েই একই আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ কখনও বড় বা কখনও ছোট হইতে পারে না। মোক্ষপ্রাপ্তির পরে যে আকার থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দেহে অবস্থানকালেও সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীবাত্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না ; যেহেতু, মধ্যমাকার হইলেই দেহ-অনুসারে জীবাত্মাকে কখনও বড় কখনও ছোট হইতে হয়।

এইরূপে দেখা গেল, জীব বিভুও নয়। মধ্যমাকারও নয়। তবে কি জীবাত্মা অণুপরিমাণ?

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১।৭।১১১ ॥” ঈশ্বর বহুবিস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব ক্ষুদ্র একটী স্ফুলিঙ্গের তুল্য ক্ষুদ্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১১।১৬।১১ ॥—সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব।” জীবাত্মা এত ক্ষুদ্র যে, তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তুর আর কল্পনা করা যায় না। “সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তো জীবঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩ ॥”

শ্রুতিও বলেন, জীবাত্মা অণুপরিমিত। “এষঃ অণুঃ আত্মা। মুণ্ডক। ৩।১।৯ ॥” কাঠকোপনিষৎ বলেন—আত্মা “অণুপ্রমাণাৎ ॥ ১।২।৮ ॥-আত্মা অণুপ্রমাণ।” শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ বলেন—“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ, ॥ ৫।৯ ॥—কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায় এবং তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার একশত ভাগ করা যায়, তাহার সমান হইবে জীব ॥” অর্থাৎ কেশাগ্রের দশহাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য ক্ষুদ্র হইল জীব।

ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রও জীবাত্মার অণুত্বের কথাই বলেন। ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

“উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।১৯ ॥”-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের যখন উৎক্রান্তি আছে, গতাগতি আছে, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। জীব যে মধ্যমাকারও হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কাজেই জীবের পরিমাণ হইবে অণু।

“স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ॥ ২।৩।২০ ॥-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব সূত্রের “গতি ও অগতি”—এই শেষ শব্দ দুইটীর (উত্তরয়োঃ) গৌণ অর্থ ধরিলে কোনও স্বার্থকতা থাকে না। “স্বাত্মনা”—জীবাত্মা নিজে সত্য সত্যই গমনাগমন করেন, ইহাই “যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি ॥ কৌষিতকী ॥ ১।২ ॥ তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥ বৃ, আ, ৪।৪।৬ ॥”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহাতেই পূর্ব্বসূত্রোক্ত “গতি ও অগতি”-শব্দদ্বয়ের সার্থকতা জীবাত্মা যখন গতাগতি করে এবং ইহা যখন মধ্যমাকারও নহে, তখন ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত যে—জীবাত্মা অণু।

ইহার পরে সূত্রকার নিজেই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন পূর্ব্বপক্ষটী হইতেছে এই আত্মা অণু নহে, বৃহৎ ; যেহেতু, আত্মা যে বৃহৎ—বিভু, এরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। এই পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনের জন্য ব্যাসদেব নিম্নলিখিত সূত্র করিয়াছেন।

“ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ ॥ ২।৩।২১ ॥”—ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারেনা যেহেতু) অতৎশ্রুতেঃ (অনণুত্ব-শ্রুতেঃ—আত্মা অনণু, বৃহৎ, বিভু, এরূপ শ্রুতি বাক্য আছে), ইতি চেৎ (এরূপ যদি কেহ বলেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। এই উক্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) ন (না—আত্মা বিভু

নহে। যেহেতু) ইতরাধিকারাৎ (শ্রুতিতে যে আত্মাকে বৃহৎ বা বিভু বলা হইয়াছে, সেই আত্মা জীবাত্মা নহে ; অন্য আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম)। এই সূত্রার্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই বিভু, জীবাত্মা কিন্তু অণু।

"স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ ॥ ২।৩।২২ ॥"—এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যে অণু, তাহা "স্বশব্দ" এবং "উন্মান" দ্বারাই বুঝা যায়। "স্ব-শব্দ"—শ্রুতির উক্তি। শ্রুতি বলেন, জীবাত্মা অণু। "এষঃ অণুঃ আত্মা ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।১।৯ ॥" "উন্মান"—বেদোক্ত পরিমাণ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫।৯ ॥"—এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার একটা পরিণাম দেওয়া হইয়াছে ; ইহা হইতেও জানা যায়, জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম—অণু।

ইহার পরে সূত্রকার আরও একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, নিম্ন সূত্রে।

"অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥ ২।৩।২৩ ॥"—এই সূত্রে বলা হইল—যদি কোনও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, জীবাত্মা যদি অণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেহে কিরূপে শীত-গ্রীষ্ম-যন্ত্রণাদির অনুভূতি জন্মিতে পারে ? তদুত্তরে বলা হইল—"অবিরোধঃ"—ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। আত্মা অণুপরিমাণ হইলেও সমগ্রদেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে। কিরূপে ? "চন্দনবৎ"—একবিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে সংলগ্ন হইলে সমগ্র দেহেই যেমন তৃপ্তির অনুভব হয়, তদ্রূপ আত্মা অণুপরিমিত হইলেও সমগ্রদেহে অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে পারে।

এই উক্তির পরেও পূর্ব্বপক্ষ আর এক আপত্তি তুলিতেছেন। ব্যাসদেব তাহাও খণ্ডন করিয়াছেন—পরবর্ত্তী-সূত্রে।

"অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২।৩।২৪ ॥"—যদি কেহ আপত্তি করেন যে, "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ"—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাতে তাহার স্নিগ্ধতাজনিত তৃপ্তির অনুভব সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা তো সেরূপ দেহের এক স্থানে থাকে না। "ইতি চেৎ—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে বলা যায়, "ন"—না, এইরূপ আপত্তির কোনও স্থান নাই। কেন ? "অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি"—আত্মাও (দেহের একস্থানে) হৃদয়ে বাস করে, ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। "হৃদি হি এষ আত্মা।" প্রশ্নোপনিষৎ ॥ ৩। "স বা এষ আত্মা হৃদি। ছান্দোগ্য। ৮।৩।৩ ॥"

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, চন্দনের সূক্ষ্ম অংশগুলি সমগ্রদেহে ব্যাপ্ত হইয়া তৃপ্তি জন্মাইতে পারে ; কিন্তু আত্মার তো কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই যে তাহা সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতি বিস্তার করিবে। সুতরাং আত্মা সূক্ষ্ম হইলে সর্ব্বদেহে কিরূপে অনুভূতি জন্মিতে পারে ? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,

"গুণাৎ আলোকবৎ ॥ ২।৩।২৫ ॥—"গুণাৎ—আত্মার গুণ চৈতন্য সকলদেহে ব্যাপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখের অনুভূতি জন্মায়। "আলোকবৎ"—আলোকের ন্যায়। প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও যেমন আলোক বিস্তার করিয়া সমগ্র ঘরখানিকে আলোকিত করে, তদ্রূপ।

এই উত্তরেও পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। দুগ্ধের গুণ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; যেখানে দুগ্ধ নাই, সেখানে শ্বেতবর্ণ দেখা যায় না। আত্মার গুণ চৈতন্য। যেখানে আত্মা আছে, সেখানেই চৈতন্য থাকিতে পারে ; যেখানে আত্মা নাই, সেখানে তো চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা যদি সমগ্রদেহকে ব্যাপিয়া না থাকে, আত্মা যদি অণুপরিমিত হয়, তাহা হইলে সমগ্রদেহে সুখ-দুঃখের অনুভূতি কিরূপে জন্মিতে পারে ? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন ;

"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২।৩।২৬ ॥" "ব্যতিরেকঃ"—ব্যতিক্রম আছে ; যেখানে গুণী থাকে না, সেখানেও স্থলবিশেষে গুণ থাকিতে পারে। "গন্ধবৎ"—যেমন গন্ধ। যেস্থানে ফুল নাই, সেস্থানেও ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং দেহের যেস্থানে আত্মা নাই, সেস্থানেও আত্মার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে।

অন্য এক সূত্রেও ব্যাসদেব উল্লিখিত উক্তির সমর্থন করিতেছেন।

"তথাচ দর্শয়তি ॥ ২।৩।২৭ ॥" অণুপরিমিত আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও যে সমগ্রদেহে চৈতন্য বিস্তার করিতে পারে, শ্রুতিতেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—"আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ ॥ ৮।৮।১ ॥—লোম এবং নখাগ্রপর্য্যন্ত।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা এবং তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে আত্মা একস্থানে থাকিলেও তাহার গুণ জ্ঞান সমগ্রদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞান ও আত্মা যে পৃথক্, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,

"পৃথক্ উপদেশাৎ ॥ ২।৩।২৮ ॥"-হ্যাঁ, আত্মা এবং জ্ঞান যে পৃথক্, শ্রুতিতে তাহার উপদেশ বা উল্লেখ আছে। কৌষিতকী শ্রুতি বলেন—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ॥ ৩।৬॥—জীবাত্মা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বারা শরীরে সম্যক্‌রূপে আরোহণ করে।" এস্থলে আত্মা হইল আরোহণের কর্ত্তা এবং জ্ঞান হইল করণ; সুতরাং তাহারা দুই পৃথক্ বস্তু।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের আনুগত্যেই উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রগুলির তাৎপর্য্য-প্রকাশ করা হইল। জীবাত্মা হয় বিভু, না হয় মধ্যমাকৃতি, আর না হয় অণুপরিমিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তসূত্রের প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে—আত্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না। "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।১৯ ॥" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ইহাও দেখান হইয়াছে যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার উৎক্রমণ ও যাতায়াতের কথা দেখা যায় বলিয়া আত্মা যে বিভু—সর্ব্বব্যাপক—হইতে পারেনা, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ইহা হইতেই সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন—আত্মা যখন বিভুও নয়. মধ্যমাকারও নয়, তখন নিশ্চয়ই অণুপরিমিত হইবে। তারপর, আত্মার অণুপরিমিতত্বের বিপক্ষে যতরকম আপত্তি থাকিতে পারে, ২।৩।২০ হইতে ২।৩।২৮ পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে সূত্রকার নিজেই তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রগুলিতে যত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই জীবাত্মার বিভুত্বের অনুকূল। সূত্রকার ব্যাসদেব একে একে সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শঙ্করমতের বিচার ও খণ্ডন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও উল্লিখিত সূত্রসমূহের ভাষ্যে বিভুত্ব খণ্ডন পুর্ব্বক অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যেই শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রটী এই :—

"তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥" শ্রীপাদ রামানুজের মতে এই সূত্রটী জীবাত্মার পরিমাণ-বিষয়ক নয়। গোবিন্দভাষ্যেও এই সূত্রটী জীব-পরিমাণ-বিষয়ক বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। রামানুজের ভাষ্য দেখিলে মনে হয়, পুর্ব্বসূত্রের সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ—এইভাবে। পুর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান—দুই পৃথক্ বস্তু। এই সূত্রে বলা হইল, তাহারা পৃথক্ হইলেও স্থল-বিশেষে জীবকেও জ্ঞান বা বিজ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হয়—জীবের শ্রেষ্ঠ গুণ জ্ঞান বলিয়া, গুণী ও গুণের অভেদ মনন করিয়া। "তদ্‌গুণসারত্বাৎ" —এই স্থলে তদ্-শব্দের অর্থ জীব। তাহার গুণের সার হইতেছে জ্ঞান। এই জ্ঞান জীবের গুণসার বা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া (জীবও তাহার গুণ পৃথক্ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ থাকিলেও) "তু"—কিন্তু "তদ্ব্যপদেশঃ"—জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান রূপেও অভিহিত করা হয়। যেমন "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে—জীব যজ্ঞ করে।" অনুকূল উদাহরণও আছে। "প্রাজ্ঞবৎ—প্রাজ্ঞের (বা পরমাত্মার) ন্যায়। পরমাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে আনন্দ; তাই যেমন পরমাত্মাকে সময় সময় আনন্দ বলা হয় (আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। তৈত্তি। ৩।৬ ॥), তদ্রূপ জীবাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ জ্ঞান হওয়াতে জীবাত্মাকেও স্থলবিশেষে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। ইহাই উক্ত সূত্রের রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

কিন্তু এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, পুর্ব্বোল্লিখিত সূত্রসমূহে জীবাত্মার অণুত্বস্থাপনার্থ যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত হইল পুর্ব্বপক্ষের উক্তি। বস্তুতঃ আত্মা অণু নহে, বিভু। "তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।"

এস্থলে শ্রীপাদশঙ্করের যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলি ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই :—

(১) নৈতদস্ত্যণুরাত্মেতি, উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ।—উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়া আত্মা (জীবাত্মা) অণু হইতে পারে না।

মন্তব্য।—জীবাত্মা অনাদি, নিত্য ; সুতরাং তাহার উৎপত্তি বা জন্ম থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় মনে করিতেছেন, উৎপত্তিই অণুত্বের একটী বিশেষ প্রমাণ। কিন্তু ইহা সঙ্গত নয়। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে ; মায়াবদ্ধ জীবদেহের উৎপত্তি আছে ; তাহারা কিন্তু অণুপরিমিত নহে। আর উৎপত্তি না থাকাই—অর্থাৎ নিত্যত্বই—যদি অণুত্ববিরোধী এবং বিভুত্বপ্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে মায়াও বিভু হয় ; যেহেতু বহিরঙ্গা মায়া নিত্যবস্তু ; কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার অবস্থান নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্মের ন্যায় বিভু বলা যায় না। সুতরাং শ্রীপাদশঙ্করের এই যুক্তি বিচারসহ নহে।

(২) পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশ শ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদব্রহ্ম জীবস্তহি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বম্ আম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।—পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শাস্ত্রে দেখা যায় বলিয়া পরব্রহ্মই জীব। সুতরাং ব্রহ্মের যে আকার, জীবেরও সেই আকারই হইবে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম বিভু ; সুতরাং জীবও বিভু।

মন্তব্য।—কেবল যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়, তাহা নহে। জীবেরও প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়। প্রাকৃত দেহে প্রবেশ এবং মৃত্যুকালে সেই দেহ হইতে জীবের বহির্গমন প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত স্থূল শরীরের সহিত জীবের তাদাত্ম্যের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। স বায়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মানো বিজহাতি॥ বৃহ, আ, ৪।৩।৮॥"—সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের এই যুক্তিও বিচারবহ নহে।

(৩) জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শঙ্করাচার্য্য একটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—ইত্যেবঞ্জাতীয়কা জীববিষয়কা বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।"—এই সেই মহান্ অজ আত্মা, যিনি বিজ্ঞানময় এবং প্রাণসমূহে অবস্থিত ইত্যাদি।—এই জাতীয় জীববিষক বিভুত্ব-প্রতিপাদক বাক্য শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা সমর্থিত।"

মন্তব্য।—শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যটীকে জীববিষয়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে জীববিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্ম-বিষয়কই, সমগ্র শ্রুতিটী দেখিলেই বুঝা যাইবে। সমগ্র শ্রুতিটী এই। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কণীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন হি ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ॥ বৃহ, আ, ৪।৪।২২॥—এই মহান্ অজ বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি প্রাণ সমূহে (ইন্দ্রিয় বর্গের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে) অবস্থান করেন এবং যিনি (পরমাত্মারূপে ভূতগণের) হৃদয়াকাশে অবস্থান করেন, তিনি সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। ইনি (শাস্ত্রবিহিত) সাধুকর্ম্মদ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না, (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) অসাধুকর্ম্মদ্বারাও লঘুত্ব প্রাপ্ত হন না। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি,

ভূতসমূহের পালনকর্ত্তা, এই সমস্ত লোকের অসম্ভেদের (সাঙ্কর্য্যনিবারণপূর্ব্বক মর্য্যাদারক্ষণের) নিমিত্ত ইনি জগতের বিধারক সেতুস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, কামোপভোগবর্জ্জন দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাকে জানিয়াই লোক মুনি হয়। এই আত্মলোক লাভের নিমিত্তই লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন জ্ঞানিসকল প্রজা-কামনা করিতেন না—প্রজাদ্বারা আমার কি হইবে, এইরূপ মনে করিয়া। আত্মলোক লাভের আশায় তাঁহারা পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদিলোক-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপ নিষেধমুখেই আত্মাকে জানিতে হয়। আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হন না, আত্মা অশীর্য্য বলিয়া শীর্ণ হন না; আত্মা আসক্তিহীন বলিয়া কোথাও আসক্ত হন না; আত্মা বদ্ধ হয়েন না, ব্যথিত হন না, বিনষ্ট হন না। আমি পাপ করিয়াছি বা পুণ্য করিয়াছি—এইরূপ অভিমান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করেনা। আত্মজ্ঞ এই উভয়ের অতীত। কৃত বা অকৃত কিছুই আত্মজ্ঞকে অনুতপ্ত করে না।"

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, উক্ত শ্রুতিটী জীববিষয়ক নহে। শ্রুতিবাক্যটীর মধ্যে "প্রাণেষু"-শব্দ দেখিলে শ্রুতিটী জীববিষয়ক বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে "সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি শব্দ এবং উপাসনার কথা থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি, ব্রাহ্মণগণের এবং ব্রহ্মলোকেচ্ছু জনগণের উপাস্য পরব্রহ্মই এই শ্রুতির বিষয়। "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২।৩।২১ ।"-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যও বলেন—"স বা এষ মহানজ আত্মেতি * * * যদ্যপি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি জীবস্যোপক্রমস্তথাপি যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মেতিমধ্যে জীবতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ তস্যৈব তত্ত্বং ন জীবস্যেতি।" প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও যে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই, তাহাই "প্রাণেষু"-শব্দে সূচিত হইতেছে। সুতরাং এই শ্রুতিটী পরব্রহ্মবিষয়কই, জীববিষয়ক নয়।

নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ—ইত্যাদি ২।৩।২১-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের "স বা এষঃ মহান্ অজঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে পরব্রহ্ম বিষয়ক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

এমন কি শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও "নাণুরতচ্ছ্রুতেঃ"-ইত্যাদি সূত্রের-ভাষ্যে বৃহদারণ্যকের উল্লিখিত বাক্যটীকে ব্রহ্মবিষয়কই বলিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু," "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যেবঞ্জাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোঽণুত্বং বিপ্রতিষিধ্যতেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। কস্মাৎ। ইতরাধিকারাৎ। পরস্য হি আত্মনঃ প্রক্রিয়ায়াম্ এষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ।" ইহার মর্ম্ম এইরূপ। যদি বল—স বা এষ মহানজ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আত্মার অণুত্ববিরোধী, আত্মার বিভুত্বের প্রতিপাদক। উত্তরে বলা যায়—ঐ সকল শ্রুতিবাক্য আত্মার বিভুত্ব-প্রতিপাদকই বটে; কিন্তু তাতে কিছু দোষ নাই; কেননা, ইতরাধিকারাৎ। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্ম-প্রকরণের, জীব-প্রকরণের নহে। ভাষ্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য নজীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে।—"স বা মহানজ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া (জীববিষয়ক নহে বলিয়া) জীবের অণুত্ব-বিরোধী নহে। এস্থলে শ্রীপাদশঙ্কর পরিষ্কার কথাতেই উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের বাক্যটীকে ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়াছেন। অথচ, "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ"-ইত্যাদি ২।৩।২৯-সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই শ্রুতিবাক্যটীকেই তিনি জীববিষয়ক বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সমগ্রভাষ্য যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, দেখিতে পাইবেন, শ্রীপাদশঙ্করের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল—জীব-ব্রহ্মের একত্বস্থাপন এবং সেই উদ্দেশ্যে জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অত্যধিক আগ্রহবশতঃ অনেক স্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও তাঁহাকে শ্রুতির অর্থ করিবার সময়ে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে একই শ্রুতিরই একস্থলে এক রকম অর্থ এবং অন্যস্থলে ঠিক বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আলোচ্যসূত্রের ভাষ্যে জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা যে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ইহার পরে শ্রীপাদশঙ্কর জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক কয়েকটী বেদান্তসূত্রের আলোচনা করিয়া প্রকারান্তরে ব্যাসদেবের ত্রুটীই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধেও তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই।

(১) "ন চ অণোর্জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনা উপপদ্যতে। - জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সঙ্গত হয় না।" তাঁহার যুক্তি এই—যদি বল ত্বক্ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে; ত্বকের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সমস্ত দেহে বেদনার বিস্তার হইতে পারে। তিনি বলেন—কিন্তু তাহা হয় না। পায়ে যখন কাঁটা ফুটে, তখন কেবল পায়েই বেদনা অনুভূত হয়; সমগ্র দেহে হয় না। শঙ্করের এই যুক্তি সূত্রকার ব্যাসদেবের "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেন্ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২।৩।২৪ ॥"—সূত্রেরই প্রতিবাদ।

মন্তব্য। ত্বকের মধ্যে যে শিরা উপশিরা ধমনী আদি আছে, তাহারাই বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া শরীরে বিস্তারিত করে। যেখানে যেখানে বা যতদূর পর্য্যন্ত শিরাদি বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া নিতে পারে, সেখানে সেখানে বা ততদূর পর্য্যন্তই বেদনা অনুভূত হইতে পারে। সকল বেদনাই যে সমস্ত দেহে একই সময়ে বিস্তৃত হইবে, তাহা নয়। ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়ও নয়। প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই যে, আত্মা যখন অণুরূপে কেবলমাত্র হৃদয়েই অবস্থিত, হৃদয়ের অণুপরিমাণ স্থানের বাহিরে যখন তাহার ব্যাপ্তি নাই, অথচ সমগ্রদেহটী যখন জড়, তখন শরীরের যে কোনও স্থানেই হৃদয়স্থিত আত্মার চেতনার ব্যাপ্তি হইতে পারে কিনা। সূত্রকার বলিতেছেন—পারে। সমগ্রদেহেই চেতনা ব্যাপ্ত আছে। তাহার প্রমাণ কি? কাঁটা ফুটাইয়া দেখ, প্রমাণ পাইবে। শরীরের যে কোনও স্থানে কাঁটা ফুটাইলেই বেদনা অনুভূত হইবে। তাহাতেই বুঝা যায়, শরীরের সর্ব্বত্রই চেতনার ব্যাপ্তি আছে; এই চেতনা আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। এক স্থানে কাঁটা ফুটাইলে একই সময়ে একসঙ্গে সমগ্র শরীরে বেদনা সঞ্চারিত না হইলেও তদ্দ্বারা সমগ্র শরীরে চেতনার অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং "জীব অণু হইলে সমগ্রদেহে বেদনার বিস্তৃতি উপপন্ন হয় না"—ইহা প্রমাণ করার জন্য শ্রীপাদশঙ্কর পায়ে-কাঁটা ফুটার যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা নাই।

(২) ব্যাসদেব গুণাৎ বালোকবৎ ॥ ২।৩।২৫ ॥—সূত্রে বলিয়াছেন, প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও যেমন সমগ্র গৃহে আলো বিস্তার করে তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্রদেহে তাহার গুণ—চেতনা বা জ্ঞান—বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে গুণ তো গুণীতে থাকে গুণীর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই; আত্মার গুণ কিরূপে আত্মার বাহিরে—শরীরে—ব্যাপ্ত হইবে? তদুত্তরে ব্যাসদেব ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২।৩।২৬ ॥"—সূত্রে বলিতেছেন—ব্যতিরেক আছে; যে স্থানে গুণী থাকে না সে স্থানেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে পারে; যেমন গন্ধ।

উক্ত দুইটী সূত্রে ব্যাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদশঙ্কর—বলিতেছেন—ন চ অণোর্গুণব্যাপ্তিরুপপদ্যতে গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ। গুণত্বমেব হি গুণিনমাশ্রিত্য গুণস্য হীয়েত।—আত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে না; যেহেতু গুণ গুণীতেই থাকে। গুণীর আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে তাহার গুণত্বই থাকে না। তারপর তিনি বলিয়াছেন—প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্। —প্রদীপ ও প্রভার দ্রব্যান্তরত্ব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২।৩।২৫ ॥—সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—প্রদীপ ও তাহার প্রভা ভিন্ন দ্রব্য নহে তাহারা উভয়ে একই তেজোদ্রব্য। প্রদীপ হইল ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ আর প্রভা হইল তরল তেজ। "প্রদীপপ্রভাবদ্ভবেদিতি চেৎ, ন তস্যা অপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ। নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ প্রবিরণাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি ॥" তাৎপর্য্য হইল এই যে প্রভা প্রদীপের গুণ নহে স্বরূপ।

তিনি আরও বলিয়াছেন—চৈতন্যমেবহি অস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌষ্ণ্য-প্রকাশৌ নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যতে ইতি।—উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ। এস্থলে গুণ-গুণি বিভাগ নাই। অর্থাৎ চৈতন্য আত্মার গুণ নহে, স্বরূপ, পরন্তু ইহাই তাঁহার বক্তব্য।

উল্লিখিত যুক্তিসমূহ দ্বারা শ্রীপাদ শঙ্কর প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, "গুণাৎ বালোকবৎ।" সূত্রে ব্যাসদেব যে জ্ঞান বা চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

যাহাহউক, তারপর তিনি বলিয়াছেন—গন্ধোঽপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি অন্যথা গুণত্ব-হানিপ্রসঙ্গাৎ।—গন্ধ গুণ বলিয়া গন্ধের আশ্রয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হয় অন্যথা তাহার গুণত্ব হানি হয়। তাঁহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি ব্যাসদেবের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণ্যাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতি।—জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোন অনিপুণ ব্যক্তি জলের গন্ধ আছে বলে তবে সে গন্ধ পৃথিবীরই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে এবং বায়ুকে আশ্রয় করে।

মন্তব্য। গুণাৎ বালোকবৎ॥—সূত্রসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন যে আত্মা যদি অণু হয় সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নয়; যেহেতু গুণীর বাহিরে গুণ থাকিতে পারেনা। সুতরাং চৈতন্য যখন সমগ্র দেহেই আছে; তখন বুঝিতে হইবে আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাসদেব "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥"-সূত্র করিয়াছেন। এই সূত্রই শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির উত্তর।

আত্মার গুণ চৈতন্যের সঙ্গে আলোকের (প্রভাব) উপমা দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গুণই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদশঙ্কর তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রদীপ ও প্রভা একই তেজোজাতীয় বস্তু—ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজ প্রদীপ, আর, তরল তেজঃ প্রভা। এক জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রভা প্রদীপের গুণ হইতে পারেনা। প্রভা প্রদীপের স্বরূপ।

চৈতন্যসম্বন্ধেও তিনি তাহাই বলেন। উষ্ণতা এবং প্রকাশ (প্রভা) যেমন অগ্নির স্বরূপ, চৈতন্যও তেমনি আত্মার স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার গুণ নহে।

"গুণাৎ বালোকবৎ॥—সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজেই কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। চৈতন্য-গুণব্যাপ্তের্ব্বাঽণোরপি সতো জীবস্য সকল-দেহব্যাপিকার্য্যং ন বিরুধ্যতে।—জীব সূক্ষ্ম অণু হইলেও চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তিতে সকলদেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন করে, ইহাতে বিরোধ কিছু নাই। আবার তথা চ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥ সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্তশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।" পরবর্ত্তী পৃথগুপদেশাৎ ২।৩।২৮ সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাঽবগম্যতে।" কেবল উল্লেখ মাত্র নয়, চৈতন্য যে আত্মার গুণ, তাহার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এস্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিদ্বারাই তাঁহার আপত্তির উত্তর দেওয়া হইল।

আর জীব চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ—জ্ঞাতা নহেন কেবল জ্ঞানমাত্র ইহাই যদি আচার্য্যপাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা কিন্তু বেদান্তসম্মত হইবে না। যেহেতু, "জ্ঞঃ অতএব॥ ২।৩।১৮॥"-এই বেদান্তসূত্রে জীবকে জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। (পরবর্ত্তী জীবস্বরূপ এবং জ্ঞাতা—প্রবন্ধাংশে শ্রুতিপ্রমাণাদি দ্রষ্টব্য)

যাহা হউক, চৈতন্য আত্মার গুণ কি স্বরূপ, প্রভা প্রদীপের গুণ কি স্বরূপ—না কি স্বরূপ এবং গুণ উভয়ই, এস্থলে সে বিচারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যাসদেব এস্থলে সেই বিচার করিতেও বসেন নাই। গুণ ও গুণীতে, শক্তি ও শক্তিমানে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহা অন্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেখানে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সেখানে অভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে স্বরূপও বলা যায় আবার ভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে গুণও বলা যায়। শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন—নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যতে" একভাবে দেখিতে গেলে একথা মিথ্যা নয়। যেহেতু গুণ এবং গুণী—অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতার ন্যায় মৃগমদ এবং তাহার গন্ধের ন্যায় অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ তথাপি কিন্তু অগ্নির বহির্দ্দেশেও উষ্ণতার এবং মৃগমদের বহির্দ্দেশেও তাহার গন্ধের ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। ইহাই ভেদাভেদ-সম্বন্ধের মূল। এস্থলে সে বিচার অপ্রাসঙ্গিক। প্রভা প্রদীপের গুণ হউক বা না হউক প্রদীপ হইতে প্রভা বিস্তারিত হয় ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বস্তুতঃ এই সূত্রে ব্যাসদেব চৈতন্য ও প্রভার (আলোকের) বিস্তৃতিরই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন তাহাদের গুণত্বের প্রতি নয়। প্রদীপ হইতে প্রভা যেমন বিস্তৃত হয়) আত্মা

হইতে চৈতন্যও তেমনি বিস্তৃত হয়—ইহা প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য। প্রদীপের প্রভা প্রদীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না,—ইহা যদি শঙ্করাচার্য্য প্রমাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই ব্যাসদেবের উপমা ব্যর্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা হইতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহা অপ্রমাণিত হইত; কিন্তু আচার্য্যপাদ যখন তাহা করেন নাই, তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁহার এই আপত্তিরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

গন্ধ যে গন্ধের আধারে বা বাহিরেও বিস্তৃত হয়, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"—সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন—গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করিতে পারে না। তাঁহার উক্তির অনুকূলে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা উক্তি সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না; বরং ব্যাসদেবের সূত্রোক্তিই যেন সমর্থিত হয়। কারণ, ব্যাসদেব বলিয়াছেন—পৃথিবীতেই গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বায়ুকে সঞ্চারিত হয়। গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে বটে, কিন্তু জলে এবং বায়ুতেও তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। তদ্রূপ, আত্মার গুণ চৈতন্য, আত্মাতেই থাকে বটে; কিন্তু দেহেও তাহা বিস্তৃত হয়।

গুণ গুণীকে ত্যাগ করে না—সত্য। রূপও একটা গুণ; এই গুণটী রূপবানেই থাকে, তাহার বাহিরে আসে না। অন্যান্য কোনও কোনও গুণসম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু গন্ধসম্বন্ধে ব্যতিক্রম আছে—গন্ধ গন্ধের আশ্রয়ের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করে, ইহাই ব্যাসদেবের সূত্রের মর্ম্ম। গন্ধসম্বন্ধে যে এই ব্যতিক্রম আছে, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"—সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"যদি বল, গুণ যখন স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, তখন মনে করিতে হইবে, গন্ধদ্রব্যের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধ নাসাতে প্রবেশ করে, তখনই গন্ধের অনুভূতি হয়; তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, যদি গন্ধকে বহন করিয়া দ্রব্যপরমাণুই নাসাতে আসিত, তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্ব (ওজন) কমিয়া যাইত; বাস্তবিক, তাহা কমে না; বিশেষতঃ পরমাণু অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; অথচ নাগকেশরাদির গন্ধ স্ফুটভাবেই অনুভূত হয়। লৌকিক প্রতীতিই এই যে—গন্ধেরই ঘ্রাণ পাওয়া যায়, গন্ধবান্ দ্রব্যের ঘ্রাণ নয়। আবার যদি বল—রূপাদির যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, গন্ধেরও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি অসম্ভব। তাহা নয়, "ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ অনুমানাপ্রবৃত্তেঃ।—আশ্রয় ব্যতিরেকেও গন্ধের অনুভব, ইহা প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষস্থলে অনুমানের স্থান নাই।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিই "তদ্গুণসারত্বাত্তু"—ইত্যাদি সূত্রপ্রসঙ্গে অণুত্ব-খণ্ডনের প্রতি তাঁহার অনুরূপ যুক্তির উত্তর।

যাহা হউক, ইহার পরে তিনি "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২।৩।২৯"-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই সূত্রের শ্রীরামানুজভাষ্যের মর্ম্ম পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"তস্যা বুদ্ধের্গুণাস্তদ্গুণা ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যেবমাদয়স্তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্গুণাসারস্তস্য ভাবস্তদ্গুণসারত্বম্। নহি বুদ্ধেগুণৈর্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বম-কর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণঃ, নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাত্তদ্গুণসারত্বাদ্ বুদ্ধিপরিমাণেনাঽস্য পরিমাণব্যপদেশঃ। তদুৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশঃ, ন স্বতঃ।—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদি বুদ্ধিরই গুণ; বুদ্ধিই এসমস্ত গুণের সার; আত্মার স্বরূপতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি নাই; বুদ্ধির উপাধিসম্ভূত ধর্ম্মের অধ্যাস বশতঃই আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি, তাহাতেই তাহার সংসারিত্ব। বুদ্ধির গুণ ব্যতীত আত্মার (পরমাত্মার বা ব্রহ্মের) সাংসারিত্ব হইতে পারে না। এই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই আত্মাতে (সূক্ষ্মত্বাদি) পরিমাণের ব্যপদেশ। বুদ্ধির উৎক্রমণাদি বশতঃই আত্মার উৎক্রমণাদিরও ব্যপদেশ। আত্মার নিজের উৎক্রান্ত্যাদি নাই।"

মন্তব্য। ভাষ্যারম্ভের পূর্ব্বে অণুত্বখণ্ডনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যতগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীও যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রের ভাষ্যদ্বারাই তাঁহাকে জীবের বিভুত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু বিভুত্ব প্রতিপাদনের যুক্তির মধ্যেই তিনি জীবের বিভুত্ব ধরিয়া লইয়াছেন,—যেহেতু তিনি মায়ার বুদ্ধি-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকেই জীব বলিতেছেন। সুতরাং ইহা একটী হেত্বাভাস-নামক দোষ হইতেছে। তাই ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—"এনমুপাধিগুণসারত্বাজ্জীবস্যাণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষু উপাসনাসু উপাধিগুণসারত্বাদ্ অণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ"-ইত্যাদি ;—সগুণ উপাসনায় উপাধিগুণপ্রাধান্যে পরমাত্মাকে যেমন অণু, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি বলা হয়, তদ্রূপ উপাধির গুণপ্রাধান্যে জীবকেও অণু বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। এই সূত্রের "প্রাজ্ঞবৎ"-শব্দের "বৎ"-অংশ হইতেই বুঝায়, ব্যাসদেব এই সূত্রে একটী উপমার অবতারণা করিয়াছেন। দুইটী পৃথক্ বস্তু না হইলে উপমা হয় না—একটী উপমান এবং অপরটী উপমেয়। যেমন, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ ; এস্থলে চন্দ্র ও মুখ দুইটী পৃথক বস্তু ; সৌন্দর্য্যাংশে তাদের সাদৃশ্য। সূত্রে বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞের (ব্রহ্মের) যেমন ব্যপদেশ হয়, তেমনি জীবেরও ব্যপদেশ। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম দুইটী পৃথক্ বস্তু না হইলে উপমাই হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য জীবকেও ব্রহ্ম বলাতে সূত্রটীর স্থূল অর্থ দাঁড়ায় এই—ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেশ, তেমনি ব্রহ্মেরও ব্যপদেশ। যদি বল জীবকে তিনি তো ব্রহ্ম বলিতেছেন, মায়ার বুদ্ধি-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই বলিতেছেন। উত্তর এই--প্রকরণ হইতেছে জীবস্বরূপসম্বন্ধে—শুদ্ধজীব-সম্বন্ধে, মায়াবদ্ধ সাংসারিক জীবসম্বন্ধে নহে। মায়াবদ্ধ জীব শুদ্ধ জীব নয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবের স্বরূপই হইল ব্রহ্ম। ব্যাসদেবও তাঁহার সূত্রে জীবস্বরূপের বা শুদ্ধজীবের সঙ্গেই ব্যপদেশ-বিষয়ে ব্রহ্মের উপমা দিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মত অনুসারে সূত্রটীর স্থূলার্থ হইবে—"ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেপ, ব্রহ্মেরও তেমনি ব্যপদেশ।" ইহার কোনও অর্থই হয় না। এবং ইহাতে ব্যাসদেবের উপমাও থাকে না।

আরও বক্তব্য আছে। জীবকে তিনি মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আর যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকেও তিনি মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন—সগুণেষু উপাসনাসু উপাধিগুণসারত্বাদ্ অণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ। এবং সূত্রস্থ "প্রাজ্ঞ"-শব্দে সেই ব্রহ্মকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার কথা অনুসারে সূত্রটীর স্থূলার্থ দাঁড়ায়—মায়ার উপাধিযুক্ত (সগুণ) ব্রহ্মের যেমন ব্যপদেশ, মায়ার উপাধিযুক্ত (জীবরূপ) ব্রহ্মেরও তেমনি ব্যপদেশ। ইহাও পূর্ব্ববৎ মূল্যহীন। বিশেষতঃ প্রকরণসঙ্গতও নয়। যেহেতু, শুদ্ধজীব-বিষয়েই প্রকরণ ; মায়াবদ্ধ সংসারী জীব সম্বন্ধে নহে।

মায়োপহত ব্রহ্মই যে জীব, এবং মায়োপহত ব্রহ্মের উপাসনার কথাই যে শ্রুতি বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের এই মত শ্রুতিসঙ্গতও নয়।

যাহা হউক, সূত্রে অবতারিত উপমাদ্বারাই ব্যাসদেব জানাইতেছেন যে—জীব ও ব্রহ্ম দুইটী পৃথক বস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম যখন বিভু, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। কারণ, দুইটী পৃথক্ বিভু বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

তারপর উৎক্রমণ সম্বন্ধে। তিনি বলিয়াছেন, "বুদ্ধির উৎক্রমণাদিবশতঃই আত্মার উৎক্রমণাদিরও ব্যপদেশ। আত্মার নিজের উৎক্রান্ত্যাদি নাই।" ইহাও ব্যাসদেবের "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥" সূত্রের উক্তিরই প্রতিবাদ। যাহা হউক, এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করই যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, উৎক্রমণাদি স্বয়ং জীবেরই, বুদ্ধির নয়। "স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি। কৌষিতকী উপনিষৎ॥ ৩।৩॥—সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন এ সমস্তের (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) সহিতই গমন করে।" এস্থলে উৎক্রান্তি দেখান হইল। "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি॥ কৌষিতকী॥ ১।২॥—যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।' এস্থলে জীবের গতি দেখান হইল। "তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।৬॥—কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় পরলোক হইতে এই পৃথিবীতে আসে।" এস্থলে আগমন দেখান হইল। এসমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোনওটীতেই বুদ্ধির গমনাগমন বা উৎক্রমণের কথা বলা হয় নাই, জীবের (জীবাত্মার) গমনাগমনাদির কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শঙ্করচোর্য্যের উক্তি শ্রুতিবিরোধী বলিয়া শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

ভাষ্যের মধ্যে, "বালাগ্রশতভাগস্য"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক জীবের বিভুত্ব-প্রতিপাদনার্থ শ্রীপাদ-শঙ্কর একটা যুক্তিও দেখাইয়াছেন। তাহাও বিচারসহ নয়। সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে এই। "বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" এই বাক্যটীর দুইটী অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" আর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতেছে—স আনন্ত্যায় কল্পতে।" প্রথমার্দ্ধে জীবের সূক্ষ্মত্বের বা অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবের আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে। আনন্ত্য অর্থ অনন্তের ভাব। অনন্ত অর্থ—যাহার অন্ত নাই। অন্ত অর্থ—সীমাও হইতে পারে, শেষ বা বিনাশ বা ধ্বংসও হইতে পারে। সীমা অর্থ ধরিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হয় অসীম বা বিভু এবং আনন্ত্য-শব্দের অর্থ হইবে—বিভুত্ব। আর অন্ত-শব্দের শেষ বা ধ্বংস বা বিনাশ অর্থ ধরিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হইবে—ধ্বংসহীন বা অবিনাশী অর্থাৎ নিত্য এবং আনন্ত্য-শব্দের অর্থ হইবে নিত্যত্ব। শঙ্করাচার্য্য বিভুত্ব অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি বলিয়াছেন—"বালাগ্রশতভাগস্য"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীবকে (প্রথমার্দ্ধে) সূক্ষ্মও বলা হইয়াছে এবং (দ্বিতীয়ার্দ্ধে) বিভুও বলা হইয়াছে। একই জীবের অণুত্ব ও বিভুত্ব সম্ভব নয়। একটাই পারমার্থিক তত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—জীবের বিভুত্বই পারমার্থিক; তাহার অণুত্ব হইল ঔপচারিক, অথবা দুর্জ্ঞেয়ত্ব-জ্ঞাপক। এই যুক্তিদ্বারা তিনি জীবের বিভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

মন্তব্য। উল্লিখিত শ্রুতির উক্তরূপ অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যেস্থলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সেস্থলেই লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায়। মুখ্যাবৃত্তির সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় দুষণীয় (১।৭।১০৩-৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আনন্ত্য-শব্দের নিত্যত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে। আনন্ত্য-শব্দের নিত্যত্ব অর্থে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবের নিত্যত্ব সূচিত হয়, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথাই। সমগ্র-বাক্যটীর তাৎপর্য্য হইবে এই—জীব সূক্ষ্ম এবং এই সূক্ষ্ম জীব নিত্যও। ইহা বেদান্তসূত্র-সম্মত। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যেও আনন্ত্যশব্দের নিত্যত্ব অর্থই গৃহীত হইয়াছে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যামণুরেব সঃ। আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্ত্যো মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থঃ॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ-ইতি॥ ২।৩।২২ সূত্রস্য গোবিন্দভাষ্যঃ॥" শ্রীজীবগোস্বামীর মতে এই শ্রুতির আনন্ত্য-শব্দ সংখ্যাজ্ঞাপক। জীবের সংখ্যা অনন্ত। উক্ত শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক তিনি বলিয়াছেন—"তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। পরমাত্মসন্দর্ভ। ৪৪॥" এই অর্থেও মুখ্যাবৃত্তির অর্থের সঙ্গতি থাকে। জীব স্বরূপে অণুতুল্য সূক্ষ্ম, সংখ্যায় অনন্ত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ এবং তদনুগত যুক্তি শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না।

শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমার্দ্ধে জীবের যে সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিমাণগত সূক্ষ্মত্ব। কেশের অগ্রভাগের দশসহস্রভাগের এক ভাগের তুল্যই জীবের পরিমাণ—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। ইহাই স্পষ্টার্থ—কষ্টকল্পনাপ্রসূত অর্থ নহে। পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ঔপচারিক বা দুর্জ্ঞেয়ত্বসূচক সূক্ষ্মত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখিবার একটী বিশেষ কথা হইতেছে এই যে, বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—(১) জীবাত্মা অণু, (২) জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত এবং (৩) হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াই এই অণুপরিমিত আত্মা সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তৃত করে। এই তিনটি কথার প্রত্যেকটীর পশ্চাতেই শ্রুতির স্পষ্ট সমর্থন আছে। অণুত্বের সমর্থক "এষঃ অণুঃ আত্মা" ইত্যাদি মুণ্ডকোক্তি, "অণুপ্রমাণাৎ"—ইত্যাদি কাঠকোক্তি, "বালাগ্রশতভাগস্য ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোক্তির কথা, হৃদয়ে অবস্থিতি সম্বন্ধে—"হৃদি হি এষ আত্মা"-ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদুক্তি, "স বা এষ আত্মা হৃদি"—ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্তির কথা এবং সমগ্রদেহে চেতনার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"—এই বেদান্তসূত্রানুসারে এই সমস্ত

শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির অগোচর হইলেও গ্রহণীয়। তথাপি, হৃদয়ে থাকিয়া অণুপরিমিত জীবাত্মা কিরূপে সমগ্র দেহে তাহার চেতনা বিস্তার করে, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব চন্দন, আলোক ও গন্ধের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর এই দৃষ্টান্তগুলিরই (আলোকের এবং গন্ধের দৃষ্টান্তেরই) অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা যায় যে, দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গতি নাই, তাহা হইলেও, যে কথাটী বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা (সমগ্রদেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তির কথা) মিথ্যা হইয়া যাইবে না। দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দ্রাষ্ট্যান্তিক মিথ্যা হইয়া যাইবে না। কাহারও আঙ্গুল খুব বেশী রকম ফুলিয়া গেলে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, "আঙ্গুল ফুলিয়া যেন কলাগাছ হইয়াছে।" এখন কেহ যদি আঙ্গুল ও কলাগাছের স্বরূপ, গঠন ও ধর্ম্মাদির আলোচনা করিয়া বলেন যে কলাগাছের দৃষ্টান্ত খাটেনা, আঙ্গুল ফুলিয়া কখনও কলাগাছের মতন হইতে পারে না—তাহা হইলে আঙ্গুল ফুলার কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে না।

শ্রুতিতে অবশ্য আত্মার বিভুত্বের কথাও আছে। তৎসম্বন্ধে ব্যাসদেব "ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতিচেৎ ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২১॥" সূত্রে বলিয়াছেন,—শ্রুতিতে আত্মার বিভুত্বের কথা দৃষ্ট হয়, সত্য; কিন্তু সেই বিভুত্ব জীবাত্মা সম্বন্ধে নহে, পরমাত্মা সম্বন্ধে। এই সূত্রেই ব্যাসদেব জীবাত্মার বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রের "ইতরাধিকারাৎ—অন্য আত্মা বিষয়ক বলিয়া" শব্দ হইতে বুঝা যায়, ব্যাসদেব দুই আত্মার কথা বলিয়াছেন; এক আত্মা অণু, আর এক আত্মা বিভু। যে আত্মা অণু, তাহাই জীব, আর যে আত্মা বিভু তাহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সুতরাং জীবের বিভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসকে বেদান্তবিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর কেন এরূপ করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

যাহা হউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আলোচ্য বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে এবং তদুপলক্ষে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তৎসমস্তও বিচারসহ নহে।

সুতরাং জীবাত্মার অণুত্বই বেদান্তসম্মত।

জীবের অণুত্ব পরিমাণগত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য"-ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ। এই শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথাই জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মণামপ্যহং জীবঃ॥ ১১।১৬।১১॥—বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্টদের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম (বা ক্ষুদ্র) পরিমাণবিশিষ্টদের মধ্যে আমি জীব। "তস্মাৎ সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো জীবঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ যৎ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্মণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পরপ্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্যাস্তর্ধ্যোক্তৌ স্বারস্যভঙ্গাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৪॥ কাঠকোপনিষদের "অণুপ্রমাণাৎ। ১।২।৮।"—উক্তিও জীবাত্মার পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের প্রমাণই দিতেছে। এইরূপে পরিমাণগত অণুত্বই যখন স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঔপচারিক বা দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃ অণুত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

জীব চিৎ-কণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবশক্তি চিদ্রূপা। ইহাও বলা হইয়াছে—জীবশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের বা কৃষ্ণের অংশই জীব। ব্রহ্ম বা কৃষ্ণও চিদ্বস্তু। সুতরাং জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণও চিদ্বস্তু এবং তাঁহার অংশ জীবও চিদ্বস্তু। সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিদংশ। জীবের পরিমাণ অণু বা কণা। সুতরাং জীব হইল ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ হইলেন বিভু-চিৎ; আর জীব হইল অণু-চিৎ। ভগবানের স্বাংশ-ভগবৎ-স্বরূপগণ প্রত্যেকেই বিভু-চিৎ;—যেহেতু তাঁহারা প্রত্যেকেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ।" আর তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব হইল অণ-চিৎ।

জীবের নিত্যত্ব। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে; স্মৃতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমরা দেখি, মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি জীবের জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে॥ জীবাত্মারও কি তদ্রূপ উৎপত্তি-বিনাশ আছে? জীবাত্মার কি উৎপত্তি হয়? ইহার উত্তরে বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন: -

"ন আত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ॥ ২।৩।১৭॥"—"আত্মা ন"—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, জন্মে না। "শ্রুতেঃ"—শ্রুতি তাই বলেন। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ কঠ। ১।২।১৮॥—আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কোনও কারণান্তর হইতে আসে নাই, নিজেও অন্য কিছুর কারণ নহে। এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর হত হইলে ইহা শরীরের সহিত হত হয় না। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর॥ ১।৯॥—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্যা প্রকৃতি ইহারা সকলেই অজ (জন্মরহিত)। "নিত্যত্বাৎ ভাভ্যঃ"—শ্রুতি-স্মৃতি এই উভয় হইতে জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা জানা যায়। "চ"—চেতনত্বং চ-শব্দাৎ। চ-শব্দে আত্মার চেতনত্ব বুঝায়। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ ইত্যাদ্যাঃ।—নিত্যেরও নিত্য; চেতনেরও চেতন: অজ, নিত্য, শাশ্বত—এই প্রকার শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে।" (গোবিন্দভাষ্য)।

"এবং সতি জাতো যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহারো যশ্চ জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ সতু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ।—যজ্ঞদত্তের জন্ম হইয়াছে, যজ্ঞদত্তের মৃত্যু হইয়াছে, এই যে লৌকিক ব্যবহার এবং জীবের যে জাতকর্ম্মাদির বিধি—তাহা কেবল দেহাশ্রিত জীবের সম্বন্ধে।" বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলেন—স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ ইতি।—জীব জন্মসময়ে দেহপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে।" ছান্দোগ্য-উপনিষৎও বলেন—জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।—জীবের মৃত্যু যাই, জীব হইতে বিশ্লিষ্ট দেহেরই ধ্বংস ইত্যাদি। (গোবিন্দভাষ্য)।

এইরূপে জানা গেল, জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জীবাত্মা নিত্য। মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু।

নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব। জীবের অণুত্ব যখন তাহার স্বরূপগত, তখন তাহা নিত্যও; যেহেতু, কোনও অনিত্য বা আগন্তুক বস্তু স্বরূপের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গী, ১৫।৭॥-এই গীতাবাক্যেও জীব-স্বরূপকে—স্মৃতরাং জীবের অণুত্বকেও—সনাতন বা নিত্য বলা হইয়াছে।

"অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥-এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে—অন্ত্য বা শেষ অবস্থায় (মোক্ষ লাভের পরে) জীবাত্মা যে ভাবে অবস্থান করে, সে সময় আত্মা এবং আত্মার পরিমাণ এই উভয় পদার্থের নিত্যত হেতু "অবিশেষঃ"—মোক্ষের পুর্ব্বে ও পরে জীবাত্মার পরিমাণে কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। এই সূত্র হইতে জানা যায়, মোক্ষের পরেও আত্মা অণুপরিমিতই থাকে।

জীবের এই অণুত যখন নিত্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও যখন আত্মা অণুপরিমিতই থাকে, তখন সহজেই বুঝা যায়, জীবাত্মা কখনও বিভু হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়, তখনও কি বিভূত প্রাপ্ত হয় না? উত্তরে বলা যায়—না, তখনও বিভূত প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু জীবাত্মা স্বরূপেই অণু; কোনও অবস্থাতেই বস্তুর স্বরূপের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়া-কবলিত ব্রহ্মই জীব; মায়ামুক্ত হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন বিভূত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মত যে বিচারসহ নয়, পুর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কখনও মায়ার অজ্ঞানদ্বারা কবলিত হইতে পারেন না; হইতে পারিলে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতই থাকে না। সাযুজ্যমুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যমাত্র প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। ব্রহ্মানন্দরূপ মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র আনন্দ-কণিকার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বহুবিস্তীর্ণ জ্বলদগ্নিরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নির আকার ধারণ পুর্ব্বকই

স্বীয় পৃথক্ অস্তিত রক্ষা করে, তদ্রূপ। মুক্তাবস্থায়ও জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহতাপনী-ভাষ্যে (২।৫।১৬১) স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ —মুক্ত জীবগণও ভক্তির কৃপায় দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। দেহ-ধারণ-রূপ কার্য্যটী ভক্তির কৃপায় হইতে পারে; কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই যদি না থাকে দেহ-ধারণ করিবে কে? শঙ্করাচার্য্যের উল্লিখিত উক্তিদ্বারাই মুক্তাবস্থায়ও জীবের পৃথক অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রুতির উক্তি হইতেও মুক্তপুরুষদিগের ভজনের কথা—সুতরাং তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্বের কথা—জানা যায়। মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে। সৌপর্ণশ্রুতিঃ॥ ব্রহ্মসূত্রেও মুক্তপুরুষদিগের ভজনের কথা দৃষ্ট হয়। আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥ (এই সূত্রের ব্যাখ্যা ১।৭।৮১ পয়ারের টীকায় আদিলীলার ৫২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী-ভবতি। এই শ্রুতিবাক্য হইতেও মুক্তাবস্থায় জীবের পৃথক অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই শ্রুতিবাক্য বলেন—রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে। মুক্তাবস্থাতেই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইতে পারা যায়, তৎপূর্ব্বে নহে; তাঁহাকে পাইলে জীব আনন্দী হয়, একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন; আনন্দ হয়—একথা বলেন নাই। আনন্দ এক বস্তু, আনন্দী আর এক্ বস্তু; যেমন ধন এবং ধনী দুই বস্তু। সুতরাং "আনন্দী"-শব্দেই মুক্তজীবের পৃথক অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের "বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥ এই ৬।৭।৯৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে মুক্তজীবেরও পৃথক অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদস্তস্য জনকেঽপি অজ্ঞানে নাশং গতে, ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মনো জীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিকঃ তং ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি? অপিতু সন্তং বিদ্যমানমেব সর্ব্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। * * * মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ স্বাভাবিকশক্তিত্বাদেব॥ ২৬॥ পরমাত্মসন্দর্ভের অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—দেবমনুষ্যাদিনামরূপ-পরিত্যাগেন তস্মিন্ লীনেঽপি স্বরূপভেদোঽস্ত্যেব তত্তদং-শসদ্ভাবাৎ॥

উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে জানা গেল মুক্তজীবেরও পৃথক অস্তিত্ব থাকে।

জীব সংখ্যায় অনন্ত। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত "আনন্ত্য" শব্দের অর্থ যে শ্রীজীবগোস্বামী "অনন্ত-সংখ্যা" করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৪।)। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, জীবের সংখ্যা অনন্ত।

শ্রীমদভাগবতের "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি।" ইত্যাদি ১০।৮৭।৩০ শ্লোকের টীকায় তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন অপরিমিতা বস্তুত এব অনন্তসংখ্যা নিত্যাশ্চ যে তনুভৃতো জীবাস্তে ইত্যাদি। ৩৫।—জীবের সংখ্যা অনন্ত এবং জীব নিত্য। উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতেও ঐরূপ অর্থই জানা যায়। সুতরাং শ্রীমদভাগবতও বলিতেছেন—জীবের সংখ্যা অনন্ত।

জীবের স্বরূপগত অণুত্ব হইতেও তাহার সংখ্যার অনন্তত্ব সূচিত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা অনন্ত কোটী দেহধারী জীব দেখিতেছি। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই অণুরূপে জীবাত্মা বিদ্যমান। অনন্তকোটী দেহে অনন্তকোটী জীবাত্মা। সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাও অনন্ত।

জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীব চিদ্রূপ—চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা বেদান্ত-সূত্রও তাহাই বলেন—জ্ঞঃ অতএব ॥২।৩।১৮—জীব হইল জ্ঞঃ অর্থাৎ জ্ঞাতা। এসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ এই। অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা—যিনি জানেন ইহা আঘ্রাণ করিতেছি তিনি আত্মা। ছান্দোগ্য। প্রশ্নোপনিষদও বলেন—এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। ৪।৯।—এই জীবই দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা বোদ্ধা কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা।

পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চেতি। কিং তর্হি জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্তুনঃ প্রকাশমাত্রত্বেঽপি প্রকাশমানত্ববৎ—সারার্থ, জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞাতৃত্ব জানিতে হইবে।"

জীবাত্মা অণুচিৎ বলিয়া তাহার জ্ঞানও অবশ্য স্বল্প। জীব স্বল্পজ্ঞ। বিভুচিৎ বলিয়া ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ।

জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে। গোবিন্দভাষ্য বলেন—'জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ। কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্।—জীবই কর্ত্তা, মায়িকগুণ কর্ত্তা নহে। স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন—ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা চেতন কর্ত্তাতেই দেখা যায়। গুণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের নিরর্থকতা ঘটে। যেহেতু, শাস্ত্র—কর্ম্মই ফলের হেতু এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। জড়মায়ার জড়গুণে তদ্রূপ বুদ্ধির উৎপাদন সম্ভব নয়। জীবই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, জড়গুণ তাহা পারে না।" তাই জীবই কর্ত্তা, মায়িক গুণ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, জীবই যদি বাস্তবিক কর্ত্তা হয়, গুণ বা প্রকৃতি যদি কর্ত্তা না হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন—প্রকৃতির গুণই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে; ভ্রম বশতঃ মায়াবদ্ধজীব নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন—উল্লিখিত গীতোক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময়ে মায়ামুগ্ধ জীব সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করে।

আলোচ্য বেদান্তসূত্রে শুদ্ধজীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্বের কথাই বলা হইয়াছে। আর উদ্ধৃত গীতাশ্লোকে বলা হইয়াছে—মায়াবদ্ধ জীবের কথা। শুদ্ধজীব অনাদিকর্ম্মফলবশতঃ যখন প্রাকৃত জগতের সুখভোগের আশায় প্রাকৃত জগতের অধিষ্ঠাত্রী-মায়ার নিকটে আত্মসমর্পণ করে, তখনই মায়ার কবলে পড়িয়া যায়, মায়িক গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া যায়। ভূতে-পাওয়া মানুষ যাহা কিছু করে বা বলে, তৎসমস্ত যেমন বাস্তবিক তাহার নিজের কাজ বা কথা নয়, ভূতেরই কাজ বা কথা, লোকটীর শক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতেছে মাত্র; তদ্রূপ মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত মায়াবিষ্ট জীবও যাহা কিছু করে, তাহা বাস্তবিক মায়ার বা মায়াগুণের প্রেরণাতেই করিয়া থাকে; কিন্তু মায়ামুগ্ধত্ববশতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া মনে করে—সে নিজের কর্ত্তৃত্বের স্বাধীন-পরিচালনাতেই তাহা করিতেছে। কর্ত্তৃত্ব-শক্তি অবশ্য জীবেরই; কিন্তু তাহা পরিচালিত হয় মায়াদ্বারা। সুতরাং উদ্ধৃত গীতাশ্লোকে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে না।

পরবর্ত্তী "বিহারোপদেশাৎ ॥ ২।৩।৩৪॥, উপাদানাৎ ॥ ২।৩.৩৫ ॥, ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ॥ ২।৩।৩৬ ॥, উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ২।৩।৩৭ ॥, শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ২।৩।৩৮ ॥, সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ২।৩।৩৯ ॥, এবং, যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ২।৩।৪০ ॥"-বেদান্তসূত্রসমূহেও ব্যাসদেব জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তৃত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন। কিন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন নহে, পরন্তু পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীন। "এস হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নীনিষতে এষ হ্যেবসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।—পরমেশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উচ্চ লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা তিনি সাধুকর্ম্ম করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান।" অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।—সেই শাস্তা পরমেশ্বর জীবসমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দ্বারা সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন।"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন। তাই, "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২।৩।৪১ ॥"-এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, জীবের কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বরাধীনই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা থাকে কিরূপে? যেহেতু, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারেই কোনও কাজ করিতে বা না করিতে সমর্থ, তাহার জন্যই বিধি-নিষেধ। পূর্ব্বসূত্রোপলক্ষ্যেও বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর যাহাকে উচ্চলোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা সাধু কার্য্য করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে চাহেন, তাহাদ্বারা অসাধু কার্য্য করান। ইহাতে কি পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্ব প্রমাণিত হইতেছে না? এই প্রশ্নের উত্তর রূপেই ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন,—

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২ ॥"—জীবকৃতধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণ প্রযত্ন অনুসারেই পরমেশ্বর জীবের দ্বারা কার্য্য করাইয়া থাকেন; সুতরাং বিধি-নিষেধের ব্যর্থতার কথা উঠে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য হইতেই ফলের পার্থক্য। এই ফলপার্থক্যের জন্য পরমেশ্বর দায়ী নহেন; দায়ী জীব; কারণ জীবের হৃদয়েই ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের ভাব বিদ্যমান; এবং তদনুসারেই তাহার প্রয়াস। সেই প্রয়াস অনুসারেই ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্বকে প্রবর্ত্তিত করেন। শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ মেঘের দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয়; তাহাদের আবার, ফুল, ফল স্বাদ, গুণ প্রভৃতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কেবল বীজ থাকিলেই এসকল বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তাহাদের ফুল-ফলাদিও জন্মিতে পারে না। তজ্জন্য প্রয়োজন বৃষ্টির। মেঘ বারিবর্ষণ করে—সাধারণভাবে সকল জাতীয় বীজের বা বৃক্ষের উপরে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজের বা বৃক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৃষ্টি হয় না। এক রকম বৃষ্টির জল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুল-ফলাদি জন্মে। বৃক্ষসকলের এবং তাহাদের ফুল-ফলাদির বিভিন্নতার হেতু হইল বীজ। আবার কেবল বীজ হইলেও বৃক্ষাদি জন্মেনা, বৃষ্টির অপেক্ষা আছে। বৃষ্টি হইলেও বৃক্ষাদি জন্মিবে না, যদি বীজ না থাকে। তদ্রূপ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে যে কর্ম্মের বাসনা জন্মে, সেই বাসনা অনুসারে জীব যে কর্ম্মের জন্য প্রয়াসী হয়, সেই কর্ম্ম করার ক্ষমতামাত্র পরমেশ্বর তাহাকে দেন—মেঘ যেমন জল দান করিয়া বীজকে অঙ্কুরিত এবং পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল-ফলাদি আছে। বৃষ্টির জলে তাহারা বিকাশ লাভ করে। তদ্রূপ জীবের প্রয়াস বা প্রয়াসেরও মূল যে ইচ্ছা, তাহার মধ্যেই জীবের কর্ম্মাদি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। সেই ইচ্ছা কার্য্যরূপে বিকাশলাভ করে কেবল পরমেশ্বরের শক্তিতে। জীব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় ইচ্ছা-প্রয়াসাদিহীন বস্তু নহে; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জীবের সমস্ত কর্ম্মের জন্য পরমেশ্বরই দায়ী হইতেন। কিন্তু তাহা নয়। 'যদি বিধৌ নিষেধেচ পরেশ এব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়েত। গোবিন্দভাষ্য।" ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে বলিয়া জীবের যে কোনও কর্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। "কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্য্যতে॥ গোবিন্দভাষ্য।" জীব হইল প্রযোজ্য কর্ত্তা, আর পরমেশ্বর হইলেন প্রযোজক কর্ত্তা। "তস্মাৎ স জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা। গোবিন্দভাষ্য।" বৃষ্টির জল ব্যতীত যেমন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীতও জীব কোনও কাজ করিতে পারে না। "তদনুমতিমন্তরা অসৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতি। গোবিন্দভাষ্য।"

কাজ করার শক্তিমাত্র দেন পরমেশ্বর। সেই শক্তির পরিচালনাদ্বারা জীব তাহার ইচ্ছানুসারে কাজ করে। তাই কর্ম্মফলের জন্য ঈশ্বর দায়ী হন না, জীবই দায়ী হয়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।"

যাহা হউক, পরমেশ্বর যে জীবের প্রযত্নের বা ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেন (কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু), বিধিনিষেধাদির অব্যর্থতাই (বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ) তাহার প্রমাণ। পরমেশ্বরের কর্তৃত্বে (অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি পাইয়া) জীব বিধিনিষেধের পালন করে, এবং তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে—বিধির পালনে বিধিপালনের ফল এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই ফল পায়। কখনও পরমেশ্বর বিধিপালনকারীকে অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে অধর্ম্মের ফল দেন না এবং অধর্ম্মানুষ্ঠানকারীকেও ধর্ম্মের ফল দেন না। যদি তাহাই দিতেন, তাহা হইলে বিধি-নিষেধের ব্যর্থতা জন্মিত। কিন্তু তাহা হয় না। বৃষ্টির ফলে আমের বীজ হইতে বটগাছ জন্মেনা, বটের বীজ হইতেও

কাঁঠালগাছ জন্মেনা। বীজ-অনুরূপ গাছই জন্মে। গাছের বিশেষত্বের হেতু হইল বীজ, বৃষ্টি বীজকে অঙ্কুরিত করে মাত্র। তদ্রূপ, জীবের কর্ম্মের বিভিন্নতার হেতু হইল তাহার ইচ্ছা বা প্রয়াস। ঈশ্বরের শক্তি ইচ্ছানুগত-প্রয়াসে জীবকে প্রবর্ত্তিত করে মাত্র। ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত জীব ইচ্ছানুরূপভাবে নিজের কর্ত্তৃত্বের পরিচালনা করিয়া যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের ফলই পায়, অন্যরূপ ফল পায় না। বড় বড় সহরে তারযোগে বৈদ্যুতিক শক্তি সর্ব্বত্রই সরবরাহ হয়; নিজ ইচ্ছানুসারে কেহ তদ্দারা আলো জ্বালে, কেহ পাখা চালায়, কেহ জল তোলে, কেহ কোনও যন্ত্র চালায়। যাঁর বাড়ীতে বৈদ্যুতিক-শক্তিযোগে কেবল আলো জ্বালিবার বন্দোবস্তই আছে, অন্য কোনও বন্দোবস্ত নাই, তাঁর বাড়ীতে ঐ শক্তি কেবল আলোই জ্বালিবে, পাখা বা যন্ত্রাদি চালাইবে না। জীবের পক্ষে ঈশ্বরের শক্তি হইল বিদ্যুতের তুল্য, আর তার বিভিন্ন কর্ম্ম হইল—আলো, পাখাচালান-আদি বৈদ্যুতিক শক্তির বিভিন্ন কার্য্যের তুল্য। সূত্রস্থ "আদি"-শব্দে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ সূচিত হইতেছে। সাধুকর্ম্মে প্রবর্ত্তনই অনুগ্রহ এবং অসাধুকর্ম্মে প্রবর্ত্তনই নিগ্রহ। এই অনুগ্রহ বা নিগ্রহের মূল পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয়—ইহা জীবের ইচ্ছা বা প্রযত্ন। জীব যেরূপ ইচ্ছা করে বা প্রযত্ন করে, সেরূপ কর্ম্মই করে, কর্ম্ম করার শক্তিটী মাত্র পরমেশ্বর দেন। পর্ব্বত হইতে নদীরূপে জল আসে, জীব সেই জল যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে। তদ্রূপ, সমস্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর হইতে জীব শক্তি পায়, সেই শক্তিকে জীব তাহার ইচ্ছানুরূপভাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারের দায়িত্ব এবং ফল জীবের—পরমেশ্বরের নহে। নদীর জলে কেহ তৃষ্ণা নিবারণ করে, কেহ আহার্য্য প্রস্তুত করে, কেহ বা নিজে ডুবিয়া মরে বা অপরকে ডুবাইয়া মারে; এসমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব নদীর বা পর্ব্বতের নহে, এসমস্ত কার্য্যের ফলও নদী বা পর্ব্বত ভোগ করে না।

যাহা হউক, পরমেশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবের চিত্তেই বিদ্যমান্। অন্তর্যামিরূপেই তিনি জীবকে স্বস্ব-প্রযত্নানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। একথাই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা। ১৮।৬১॥"—এই শ্লোকে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।

জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ঈশ্বর হইলেন প্রবর্ত্তক কর্ত্তা বা প্রয়োজক কর্ত্তা; আর জীব হইল প্রবর্ত্তিত কর্ত্তা বা প্রযোজ্যকর্ত্তা। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন; পরমেশ্বরের শক্তি না পাইলে জীব নিজের কর্ত্তৃত্বকে বিকাশ করিতে পারেনা। পরমেশ্বরের শক্তিতে নিজের কর্ত্তৃত্ব-বিকাশের ফলে জীবের যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার দায়িত্ব জীবেরই, ঈশ্বরের নহে; এবং ফলভোক্তাও জীবই, ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর কর্ম্মফলের দাতা মাত্র। জীবের দায়িত্বের হেতু এই যে—জীব নিজের ইচ্ছানুসারেই ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তিকে ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম করে। জীব ভগবানের চিৎ-কণ অংশ। ভগবান্ পরম-স্বতন্ত্র। অংশীর ধর্ম অংশেও কিছু থাকে। অতি সামান্য হইলেও স্ফুলিঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকে। ভগবানের অংশস্বরূপ জীবেও সামান্য কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। ভগবান্ বিভু, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও বিভু। কিন্তু জীব অণু; জীবের স্বাতন্ত্র্যও অণু। জীব ভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যও ভগবানের বিভু-স্বাতন্ত্র্যদ্বারা অবস্থাবিশেষে নিয়ন্ত্রণের যোগ্য। একটা গরুকে যদি দড়ি দিয়া কোনও খুঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দড়ি যতদূর পর্য্যন্ত যাইবে ততদূর স্থানের মধ্যে গরুটী যথেচ্ছভাবে চরিয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু দড়ির বাহিরে যাইতে পারেনা। দড়ির গণ্ডীর মধ্যে গরুটীর চলাফেরা সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহা সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও এইরূপ সীমাবদ্ধ। জীবের এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশও কেবল তাহার ইচ্ছাতে। জীব যে কোনও ইচ্ছাই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে—ইহাই মাত্র জীবের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু যে কোনও ইচ্ছানুরূপ কাজ করার শক্তি জীবের নাই; তদনুরূপ শক্তিও জীব পরমেশ্বর হইতে পাইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জীবের জন্মিলেও সৃষ্টি কিন্তু করিতে পারে না। এসকল স্থলেই জীবের স্বাতন্ত্র্যের অণুত্ব বুঝা যায়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"-বাক্য হইতেই জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়। কর্ম্মকরণে জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকিলে কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী হইতে পারেনা

এবং সেই কর্ম্মের ফলও জীবের ভোগ্য হইতে পারে না। এই অনুস্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্ম্ম-শক্তিকে জীব যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে বলিয়াই কর্ম্মফলের দায়িত্ব জীবের।

জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি আছে। এমন কি একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।—হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি (অর্থাৎ ব্রহ্মই তুমি)। ৬।৮।৭॥"; ইহা অভেদ- বাচক বাক্য। আবার ভেদবাচক বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।—সকলই ব্রহ্ম; (যে হেতু) তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। ৩।১৪।১॥" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায়। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব তাঁহার উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথাই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকেও ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি।—আমি ব্রহ্ম হই।" ইহা বৃহদারণ্যকের অভেদবাচক বাক্য। "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি—স ইদং সর্ব্বং ভবতি।—যিনি জানেন, আমি ব্রহ্ম, তিনি সব হন। বৃ, আ, ২।৪।১০॥" আবার ভেদবাচক শ্রুতিও আছে। "স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—যেরূপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। ২।১।২০॥" এই শ্রুতিও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। একই শ্রুতিতে যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয় (এবং অন্যান্য বহুশ্রুতিতেও যখন তদ্রূপ বাক্যসকল দৃষ্ট হয়), তখন, জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে—একথা যেমন বলা চলে না, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিত না।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয়-প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের—তত্ত্বের—কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতির উক্তি বলিয়া উভয় প্রকারের বাক্যই অপৌরুষেয়—সুতরাং তুল্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই উভয় প্রকারের বাক্যেই সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক, আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছেন; তাই বেদান্তসূত্রের অপর এক নাম উত্তর-মীমাংসা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক—পারমার্থিক নহে—বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ উক্তির সমর্থনে তিনি কোনও শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করেন নাই। এই ব্যাপারে স্থলবিশেষে তিনি যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার মতেরই সমর্থন করে না; তাঁহার যুক্তির অনুকূল যে ব্যাখ্যা তিনি ঐ শ্রুতিবাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যামাত্রই তাঁহার অনুকূলে যায়; কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয় না। মুখ্যার্থ অন্যরূপ এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না। মুখ্যার্থের সঙ্গতিস্থলে অন্যরূপ অর্থ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলি যে ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়, ইহা শ্রীপাদশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র; ইহার সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্য নাই। তাই শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত বিচারে ইহার কোনও মূল্য থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয়ের একটীমাত্র পন্থা আছে; তাহা হইতেছে—উভয়কে তুল্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, উভয়কেই পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণায়ক মনে করা। শ্রীপাদ-শঙ্কর তাহা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—জীবে ও ব্রহ্মে ভেদও আছে,

অভেদও আছে ; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই প্রভু বলিয়াছেন, জীব হইল—'কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ২।২০।১০১ ॥"

বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবও ভেদাভেদ-তত্ত্বই স্থাপন করিয়া উভয় প্রকার শ্রুতিবাক্যের সমান মর্য্যাদা দিয়াছেন। কয়েকটী বেদান্তসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ৩।২।২৭ ॥"—উভয়ব্যপদেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মে ভেদ এবং অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলিয়া) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও তাহার কুণ্ডলের অনুরূপ বলা যাইতে পারে)। সাপ যদি কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, তাহা হইলে সাপ ও কুণ্ডলী স্বরূপতঃ উভয়েই সাপ ; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার সাপ ও কুণ্ডলী দৃশ্যতঃ ভিন্ন ; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ। তদ্রূপ, ব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু, জীবও চিদ্‌বস্তু ; চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ ভেদ নাই বলিয়া জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলা যায়। "চিন্তাবিশেষাচ্চ কচিদ্‌-ভেদনির্দ্দেশঃ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ২০ ॥" কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন বিভু-চিৎ, আর জীব হইল অণুচিৎ—ব্রহ্মের চিৎ-কণ অংশ ; এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। জ্বলদগ্নিরাশি এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ—অগ্নি হিসাবে উভয়ে অভেদ এবং পরিমাণাদিতে উভয়ে ভেদ আছে। জীব এবং ব্রহ্মেও তদ্রূপ ভেদ এবং অভেদ। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও উপসংহারে বলিয়াছেন—"যথাঽহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদ এবমিহাপীতি।"

"প্রকাশাশ্রয়দ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ৩।২।২৮ ॥"—সূর্য্য ও সূর্য্যালোক এই উভয়ের মধ্যে যেমন ভেদ এবং অভেদ (উভয়েই তেজ বলিয়া অভেদ), তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ।

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২।৩।৪৩ ॥"—জীব ব্রহ্মের অংশ (অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ অভেদ) ; আবার নানাব্যপদেশাৎ—জীবও ঈশ্বরের মধ্যে নানা অর্থাৎ ভেদের উল্লেখও আছে। অন্যথা চাপি—ভেদব্যতীত অন্যরূপ অর্থাৎ অভেদের উল্লেখও আছে। যেমন দাশকিতবাদিত্বম—অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈব ইমে কিতবাঃ'-বাক্যে সকল মানবকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে। এই সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ—অগ্নি এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গে যেমন ভেদও আছে, আবার উষ্ণত্বাংশে অভেদও আছে, তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মেও ভেদও আছে, আবার চৈতন্যাংশে অভেদও আছে। অতএব ভেদাভেদ উভয়ই বিদ্যমান বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ।

উক্তভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন—অংশ ও অংশীতে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান। জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম জীবের অংশী হওয়াতে উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই সঙ্গত।

ব্রহ্ম ও জীব—স্বরূপে উভয়েই চিদ্‌বস্তু বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ। আবার ব্রহ্ম বিভু-চিৎ, জীব অণুচিৎ ; ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ ; ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নহে ; ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব তৎকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ; ব্রহ্ম মায়াতীত, মায়ার অধীশ্বর ; কিন্তু জীব মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও কবলিত হওয়ার যোগ্য (অণু বলিয়া), ব্রহ্ম পরমানন্দঘনবিগ্রহ, জীব মায়াবদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখের আকর—ইত্যাদি কারণে জীব এবং ব্রহ্মে ভেদ আছে। "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২।১।২২ ॥—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন এবং অধিক।" "অধিকোপ-দেশাৎ ॥৩।৪।৮ ॥—ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক।" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে এবং "পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ১।৬ ॥—ব্রহ্ম জীবের প্রেরয়িতা বা নিয়ন্তা, জীব ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া উভয়কে পৃথক্ জানিবে।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা দৃষ্ট হয়।

এইরূপে শ্রুতিবাক্যানুসারে জীবও ব্রহ্মের মধ্যে যুগপৎ নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে থাকাতে তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হইল—মৃগমদ এবং তার গন্ধে, অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতায় যেরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, জীব এবং ব্রহ্মে—সাধারণতঃ শক্তি এবং শক্তিমানেও—তদ্রূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। ("অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবলমাত্র অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেই ভিত্তি করিয়া এবং ভেদাভেদ-তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলির মুখ্যাবৃত্তির অর্থসঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও গৌণী বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন ; তাঁহার সিদ্ধান্ত যে বিচারসহ নয়, ১।৭।১৩-পয়ারের টীকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। শক্তিমানের সেবাই শক্তির কর্ত্তব্য। অংশীর সেবাই অংশের কর্ত্তব্য। বৃক্ষের শিকড়, শাখা, পত্র প্রভৃতি হইল বৃক্ষের অংশ। শিকড় মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করে। শাখা-পত্রাদিও রৌদ্র- বায়ু হইতে বৃক্ষের জীবন-ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন ও শোভাবৃদ্ধি করে। অংশ শিকড়াদি এইরূপে অংশী বৃক্ষেরই সেবা করে।

জীব ভগবানের শক্তি এবং অংশ। সুতরাং ভগবানের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। নিজের সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া—নিজের ইহকালের কি পরকালের সুখসুবিধাদির কথা, এমনকি নিজের দুঃখনিবৃত্তির কথাকেও মনে স্থান না দিয়া—কেবলমাত্র সেব্যের প্রীতি-উৎপাদনই সেবার তাৎপর্য্য। এইরূপে কেবল ভগবৎ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। সেবা হইল দাসের ধর্ম্ম। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাসই হইল। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ অপি চ স্মর্য্যতে॥ ২।৩।৪৫-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত স্মৃতিবচন॥—জীব একমাত্র শ্রীহরিরই দাস, কখনও অন্য কাহারও দাস নয়।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন –"কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব॥ ২।২২।১৭॥ জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ২।২০।১০১॥"

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের আচরণের এবং মনোবৃত্তির কথা বিবেচনা করিলেও বুঝা যায়—সেবার ভাব তাহার যেন মজ্জাগত। সকল সময়ে কেহ অপরের সেবা না করিলেও কখনও যদি কেহ অপরের কোনওরূপ সেবা করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—মনে করে, একটা ভাল কাজ করিলাম। ইহাতেই বুঝা যায়, সেবাকার্য্যটী তাহার হার্দ্দ। রাজপুরুষগণের মধ্যে, এমনকি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিতেও, দেখা যায়, অতি দীনহীন একজন সাধারণ প্রজার নিকটেও পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহারা নিজেদিগকে "আপনার একান্ত অনুগত সেবক" রূপে অভিহিত করেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, সেবার ভাবটীই যে তাঁহাদের আদর্শ "আপনার একান্ত অনুগত সেবক"-বাক্য হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাজা-শব্দের অর্থও প্রজার অনুরঞ্জনকারী—প্রজার প্রীতিবিধানকারী। ইহাতেও প্রজার সেবাই রাজার কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হইতেছে। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেও জনসাধারণের সেবাই আদর্শ।

বিচার করিলে দেখা যায়—জ্ঞাতসারে হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের সকল জীবই পরস্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করে, ধনী অর্থোপার্জ্জন করে। ধনী অর্থের বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে শস্য গ্রহণ করে। পরস্পরের প্রয়োজনে এই বিনিময় সাধিত হইলেও তদ্দারা পরস্পরের উপকার বা সেবাই হইয়া যাইতেছে। কুকুর, শকুনি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের বিরক্তিজনক, অস্বস্তিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকারক দ্রব্যাদি অপসারিত করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে। চিকিৎসক রোগীর সেবা করিতেছে—ঔষধাদিদ্বারা, আবার রোগীও চিকিৎসকের সেবা করিতেছে—অর্থাদিদ্বারা। প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে যে সকল সেবার কথা বলা হইতেছে, তাহা তো বাস্তবিক সেবা নয়, যেহেতু এসকল তথাকথিত সেবার কাজ কেহই অপরের সুখসম্পাদনের উদ্দেশ্য নিয়া করে না, করে বরং নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উত্তরে বলা যায়—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সকলে কাজ করে সত্য ; কিন্তু তাহাতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে অপরের উপকার হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—নিজ প্রয়োজনসিদ্ধিমূলক প্রয়াসের মধ্যে সেবাবাসনাটী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই ঐ প্রয়াসেই অপরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। জীবস্বরূপ মায়াকবলিত হইয়া মায়িকদেহে এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী সেবাবাসনা দেহেন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির বর্ণে রঞ্জিত হইয়া

দেহেন্দ্রিয়-সেবার বাসনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের নিজ প্রয়োজনবুদ্ধি এবং তাহাতেই নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য তাহার প্রয়াস। এই প্রয়াসের প্রবর্ত্তক কিন্তু সেবাবাসনা—যদিও মায়ামুগ্ধ জীব তাহা জানে না। জানুক বা না জানুক, সেই সেবা-বাসনা তাহার ধর্ম্ম—সামান্যমাত্র হইলেও—প্রকাশ করিবেই—হয়তো বিকৃতভাবেই প্রকাশ করিবে। সেই সেবাবাসনাটী যেমন দেহধারী জীবের নিকটে প্রচ্ছন্ন, সেবাবাসনার স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রকাশটীও তাহার নিকটে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকে। তাই দেহধারী জীব মনে করে—তার প্রয়োজন-সিদ্ধি-মাত্রই সে করিল, অপরের সেবা করিল না। কিন্তু সেবা হইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ অজ্ঞাতসারেই যে সেবা হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—সেবাবাসনাটী জীবের স্বাভাবিক, স্বরূপগত।

দেহধারী জীব আমরা, দাসত্ব তো আমরা করিতেছিই, মুখ্যতঃ মায়ার দাসত্ব ; সুতরাং দাসত্ব যে আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বরূপতঃ কাহার দাস আমরা?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীব হইল ভগবানের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ। এই জীবশক্তি অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির যেমন অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমনি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়। সুতরাং জীবস্বরূপের সঙ্গে মায়াশক্তির স্বাভাবিক কোনও যোগ নাই। দেহধারী জীবের সম্বন্ধে মায়া আগন্তুক বস্তু, স্বরূপগত বস্তু নয় ; অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি যেমন আগন্তুক, তদ্রূপ। সুতরাং মায়ার দাসত্ব জীবের স্বরূপগত দাসত্ব হইতে পারে না। যত দিন জীব মায়ার কবলে থাকিবে, ততদিনই তাহার পক্ষে মায়ার দাসত্ব। যাঁহার সহিত জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক সম্বন্ধ, জীবের স্বরূপগত দাসত্বের সম্পর্কও হইবে তাঁহারই সঙ্গে। জীব ভগবানের অংশ বলিয়া তাহার নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধও হইতেছে ভগবানের সঙ্গে—আর কাহারও সঙ্গে জীবের এজাতীয় সম্বন্ধ নাই ; শিকড়ের বা শাখাপত্রাদির সম্বন্ধ যেমন বৃক্ষের সঙ্গে, তদ্রূপ। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস, অপর কাহারও নহে। তাই বলা হইয়াছে—"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥"

এক্ষণে অবোর প্রশ্ন হইতেছে—তত্ত্বের বিচারে না হয় স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জীব স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস। কিন্তু এই জগতের দেহধারী জীব আমরা তো ভগবানের দাসত্ব করিতেছি না। এই অবস্থায় কিরূপে জীবমাত্র-সম্বন্ধেই বলা যায়—"কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব।"

উত্তরে বলা যায়—দাসত্বের প্রাণবস্তু হইতেছে সেবা। সেবার আবার প্রাণবস্তু হইল সেবাবাসনা। সেবাবাসনাহীন সেবার—ইচ্ছাহীন বাধ্যতামূলক সেবার—কোনও মূল্য নাই। আমাদের সেবাবাসনা স্বরূপগত, নিত্য ; সুতরাং আমাদের দাসত্বও নিত্য। স্বরূপত: আমরা যখন ভগবানেরই দাস, অন্য কাহারও দাস নই, তখন কেবলমাত্র সেবাবাসনার নিত্যত্বেই আমাদের নিত্য-কৃষ্ণদাসত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছি না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতেই আমাদের কৃষ্ণদাসত্ব অন্তর্হিত হয় না। গাছের একটী পত্র যখন গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই পত্রদ্বারা আর গাছের সেবা চলিতে পারে না ; তথাপি কিন্তু তখনও পত্রটী সেই গাছের পত্রই থাকে।

আমাদের স্বাভাবিকী সেবাবাসনা নিত্যই বিকশিত হইতেছে। তাহার লক্ষ্য কিন্তু ভগবান্‌ই, অপর কেহ নহে ; যেহেতু অপর কাহারও সহিত তাহার স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ নাই। কিন্তু নিত্য বিকশিত হইলেও বিকাশের পথে মায়ার আবরণে প্রতিহত হইতেছে বলিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। কোনও পতিব্রতা রমণী দূরদেশস্থিত পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যদি পথ ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও পতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

বস্তুতঃ অজ্ঞাতসারে আমরা ভগবানেরই অনুসন্ধান করিতেছি। জীবের চিরন্তনী সুখবাসনাই তাহার প্রমাণ। আমরা যাহা কিছু করি, তৎসমস্তই সুখের জন্য। কিন্তু সংসারে আমরা যাহা কিছু সুখ পাই, তাহাতে এই চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না। তাহাতেই বুঝা যায়, আমরা যে সুখটী চাই, তাহার স্বরূপ আমরা জানি না ; সুতরাং তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করি না ; তাই তাহা পাইওনা। বস্তুতঃ সুখ-

স্বরূপ, রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর-জন্যই আমাদের চিরন্তনী বাসনা; তাঁহাকে পাইলেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥—শ্রুতিঃ॥" (বিস্তৃত আলোচনা ১।১।৪ শ্লোকের টীকায় আদিলীলার ৮—১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্য—শ্রীকৃষ্ণের জন্য—আমাদের এই চিরন্তনী বাসনাই আমাদের নিত্য কৃষ্ণদাসত্ত্ব-ভাবের পরিচায়ক—যদিও তাহার অনুভূতি আমাদের নাই।

যাহা হউক, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, জীব তাঁহার সেবক।

এই জগতের দাসত্ব-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, কৃষ্ণদাসত্ব কিন্তু সেরূপ নয়। পূর্ব্বে পৃথিবীর কোনও কোনও স্থলে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসদের দুর্দ্দশার অবধি ছিলনা। অনেক গৃহস্থও বাড়ীতে পাচক রাখেন, ভৃত্য রাখেন। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসের মত শোচনীয় না হইলেও খুব লোভনীয় নয়। তাহার কারণ, ক্রীতদাস বা পাচক-ভৃত্য এবং তাহাদের মনিব—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটী হইতেছে কেবলই স্বার্থের সম্বন্ধ। সকলেই নিজ নিজ সুখ-সুবিধাটী চায়; ভৃত্যাদির মনেও মনিবের সুখ প্রাধান্য লাভ করেনা, মনিবের মনেও ভৃত্যাদির সুখ প্রাধান্য লাভ করে না। তাই তাদের সম্বন্ধটী সুখময় হইতে পারে না। প্রীতির বন্ধন নাই।

সংসারে কিছু প্রীতির বন্ধন আছে—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে। মাতা শিশুসন্তানের সেবা করেন—কাহারও আদেশে বা অনুরোধে নয়; নিজের প্রাণের টানে। স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন, বা স্বামী স্ত্রীর সেবা করেন—সুখ-সুবিধাদির বিধান করেন, প্রীতির টানে। তাই এই সকল সেবায় কিছু সুখ আছে। কিন্তু ইহাতেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। কারণ, এস্থলেও প্রীতির সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনা আছে। মাতার সন্তান-সেবায় কিছুটা স্বসুখ-বাসনা আছে তাহাদের সম্বন্ধটাও স্বরূপগত নয়, আগন্তুকমাত্র। যে দু'জন এখন পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ, সামাজিক বা শাস্ত্রীয়-বিধি দ্বারাই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধ ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। মাতা ও সন্তান—জন্মের পূর্ব্বে, পূর্ব্বজন্মে হয়তো এই সম্বন্ধ ছিল না, পরজন্মেও হয়তো থাকিবে না। আবার লৌকিক জগতের এসব সম্বন্ধও মাত্র দেহের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ মুখ্যতঃ দেহের সম্বন্ধ। মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধও দেহের সম্বন্ধ—মাতার দেহ হইতে সন্তানের দেহের জন্ম। পরস্পরের সেবার সুখও দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখ। তাই যখনই সেবার ব্যাপারে দেহের দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তখনই সেই সেবা আর সুখকর হয় না। দেহ অনিত্য, এই সুখও অনিত্য।

কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হইতেছে নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য। আমাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন পিতা যদি বিদেশে থাকেন এবং তাহার বহু বৎসর পরে যদি পিতা আসিয়া সন্তানের সাক্ষাতে উপস্থিত হন, পুত্র তাঁহাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতেও পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

সংসারী জীব আমরা অনাদিকাল হইতে ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি; তাঁহার সহিত আমদের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমরা জানি না। কোনও ভাগ্যে যদি আমাদের এই অনাদি ভগবদ্-বিস্মৃতি দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে—মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায়। মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তাহার কিরণজালও যেমন স্বতঃই বিকশিত হয়, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেও সেই সম্বন্ধের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বের জ্ঞানও তেমনি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। তখনই জীব ভগবৎ-সেবার জন্য লুব্ধ হইবে, উৎকণ্ঠিত হইবে—কেন হইবে, এই প্রশ্ন উঠে না। ইহা সম্বন্ধেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সূর্য্য উদিত হইলে তাহার কিরণজালও যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয় তদ্রূপ। তখন ভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়া (নিত্যমুক্ত ও বদ্ধজীব প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য) ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইবে, নিজেকে পরম-কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

এই সেবাতে প্রাকৃত জগতের সেবার ন্যায় ক্লান্তি নাই, গ্লানি নাই, দুঃখের মিশ্রণ নাই। আছে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধমান আনন্দ। ইহা প্রীতির সেবা। জীব এই সেবা করে একমাত্র ভগবানের সুখের

উদ্দেশ্যে। এই সেবা কেবল এক তরফা নহে। ভক্ত জীব (যিনি ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলে। ভক্তজীব) যেমন সর্ব্বদা চাহেন ভগবানের সুখ, ভগবানও সর্ব্বদা চাহেন ভক্তেও সুখ। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ভক্ত ভগবানকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, ভগবানও ভক্তকে তদ্রূপ প্রিয় মনে করেন। ভক্ত যেমন ভগবানকে ছাড়া আর কিছু জানেন না, ভগবানও তেমনি ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ শ্রী, ভা, ৯।৪।৬৮॥" তখন ভগবানের সঙ্গে ভক্তের হয় নিতান্ত আপনা-আপনি ভাব—মদীয়তাময় ভাব। এই ভাবের ভগবৎ-সেবাতে অপরিসীম আনন্দ।

নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহার সাধনের সিদ্ধিতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সুখরাশিকে একত্র করিলেও এই ব্রহ্মানন্দের এক কণিকার তুল্যও হইবে না। প্রাকৃত জগতের আনন্দ হইল প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাত, জড়, অনিত্য, দুঃখসঙ্কুল এবং ক্ষুদ্র। আর ব্রহ্মানন্দ হইল অপ্রাকৃত—মায়াতীত, চিন্ময়, নিত্য, দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য এবং পরিমাণে বিভু। কিন্তু এতাদৃশ ব্রহ্মানন্দও শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায়—সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য। "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ হরিভক্তিসুধোদয়॥" তাহার হেতু এই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে চিচ্ছক্তির বিলাস নাই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ হইল কেবল আনন্দসত্তামাত্র—বৈচিত্রীহীন আনন্দসত্তা। ব্রহ্মে আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদনচমৎকারিত্বের বৈচিত্রী নাই, রসত্বেরও বিকাশ নাই। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সমগ্রশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহাতে আনন্দবৈচিত্রীর এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং রসত্বেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি। সেবার উপলক্ষ্যে ভক্তজীব অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতাময় এসকল আনন্দবৈচিত্রীর ও রসবৈচিত্রীর আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। আরও একটী হেতু আছে। অখিল-রসামৃতবারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তবাৎসল্যবশতঃ অনন্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করাইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সুখী করার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত; এই উৎকণ্ঠাবশতঃই তাঁহার বিবিধ লীলা। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" লীলাতে রসের উৎস প্রবাহিত হয়, ভক্ত তাহা আস্বাদন করেন। এই বস্তুটী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই; যেহেতু, চিচ্ছক্তির বিকাশের অভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ভক্তবাৎসল্যের বিকাশও নাই, রসের বিকাশও নাই, রসোৎসারিণী লীলাও নাই। ব্রহ্মের দিক্ হইতে মুক্তজীবকে আনন্দ আস্বাদন করাইবার কোনও চেষ্টা নাই। ব্রহ্মানন্দের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই মুক্তজীব তাহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন—তাহাও কেবল আনন্দসত্তামাত্রের। এসমস্ত কারণেই ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবানন্দের সর্ব্বাতিশায়িত্ব এবং পরম-লোভনীয়ত্ব।

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হইতে পারেনা। তাঁহার মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকাশের প্রতিকূল একটা ভাব আছে, যাহা সম্বন্ধবিকাশের বাধা জন্মায়। সাধনের আরম্ভ হইতেই এই ভাবটী তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান এবং সাধারণতঃ মুক্তাবস্থায়ও থাকে। এই ভাবটী জীবের স্বরূপানুবন্ধী নহে, ইহা আগন্তুক। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই এই ভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ঐক্যজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবক ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিবেনা। তাই সম্বন্ধের জ্ঞানটী সম্যক্ বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু সাধনকালে যদি কোনও সময়ে কাহারও ভক্তিবাসনা বা ভগবৎ-সেবার বাসনা কোনও ভাগ্যে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে না হইলেও অন্ততঃ মুক্তাবস্থাতেও সেই বাসনা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মুক্তজীবের সম্বন্ধজ্ঞান-বিকাশের প্রতিকূল ভাবকে অপসারিত করিয়া সম্বন্ধের জ্ঞানকে সম্যক্‌রূপে বিকশিত করে এবং সেই মুক্তজীবের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবাসনা জাগাইয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করাইয়া থাকে। একথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। নৃসিংহতাপনীর শঙ্করভাষ্য।" শ্রুতিও এইরূপ মুক্তজীবদের ভগবদ্ভজনের কথা বলিয়া থাকেন। "মুক্তা অপি হিএনম্ উপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতিঃ॥"

বেদান্তও একথা বলিয়াছেন। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥" (১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তাবস্থায় যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন আছেন, তাঁহারা আবার কিসের জন্য ভগবানের উপাসনা করিবেন? উত্তরে বলা যায়—কোনও উদ্দেশ্যদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন না; মুক্তজীবেরা ভগবদ্ভজন করেন—ভগবৎ-সেবার সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের লোভে লুব্ধ হইয়া। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি মিশ্রী পান করেন একটা প্রয়োজনবোধে—পিত্ত দূর করার প্রয়োজনে। কিন্তু পিত্তের প্রকোপ যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি মিশ্রী খাওয়া ছাড়িতে পারেন না—মিশ্রীর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া। "মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি সৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ॥ ৪।১।১২-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" উল্লিখিত শ্রুতি-বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও কৃষ্ণসেবানন্দের পরমলোভনীয়ত্ব সূচিত করিতেছে।

শ্রুতি পরতত্ত্ববস্তুকে আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ - সুতরাং পরম মধুর, পরম আস্বাদ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই রসস্বরূপের প্রাপ্তিতেই যে জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ তাঁহার প্রাপ্তিতে অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদনেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। কিন্তু "কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্যচর্ব্বণ ॥১।৬।৮৯॥—রসস্বরূপকে আস্বাদন করার একমাত্র উপায়—ভক্তভাব, সেবকের ভাব। তাঁহার মাধুর্য্যও আবার এমনই লোভনীয়, এমনই চিত্তাকর্ষক যে, অন্যান্যের কথা তো দূরে, এই মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া নিজেই প্রলুব্ধ হন এবং "আপনি আপনা চাহে করিতে আস্বাদন।"

এমন যে পরমলোভনীয় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য, তাহার আস্বাদন সম্ভব—কেবলমাত্র দাস্যভাবে, ভক্তভাবে। তাই, এই দাস্যভাবের জন্য সকলেই লালায়িত; (আদিলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৪১-৯৭ পয়ার ও টীকা দ্রষ্টব্য) এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥ ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥ ১।৬।৯৩-৯৫॥" এ জন্যই বলা হইয়াছে কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ। ১।৬।৮৭॥"

এতাদৃশ ভক্তভাব বা দাস্যভাবই জীবের স্বরূপানুবন্ধীভাব; এই ভাবের আনুগত্যেই জীব এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরম-লোভনীয় বস্তুর আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। প্রাকৃত জগতের দাস্য—জীবের স্বরূপানুবন্ধী দাস্যভাবের অতি বিকৃত ছায়ার সঙ্গেও তুলিত হইতে পারে না।

জীবের স্বরূপানুবন্ধি দাসত্ব—প্রাকৃত জগতের নীরস দাসত্ব নহে; ইহা হইতেছে—নিতান্ত আপনজনবোধে, পরম-প্রিয়তমজ্ঞানে অখিল-রসামৃতবারিধি স্বীয়-ভক্তজনের প্রীতিবিধানলোলুপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ মনপ্রাণঢালা-প্রীতিবিধান-প্রয়াস।

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধজীব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব সংখ্যায় অনন্ত। এই জীব দুই শ্রেণীর। একশ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ। আর একশ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। তদেবমনন্তা এব জীবাখ্য তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একোবর্গঃ অনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎ-পরাঙ্মুখঃ স্বভাবতঃ তদীয় জ্ঞানভাবাৎ তদীয় জ্ঞানাভাবাৎ চ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪৪॥ অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবদ্জ্ঞান (ভগবৎস্মৃতি) আছে তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, আর অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) যাহাদের নাই, তাহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য ভগবৎ-পরিকর-স্বরূপ। "তত্র প্রথমঃ অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য ভগবৎ-পরিকররূপঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভ॥ ৪৫॥"

আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ; ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াকর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া তাঁহারা সংসারী (সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীব) হইয়াছেন। "অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৪৫॥"

একথাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার॥ নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণপারিষদ নাম—ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ। নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদিদুঃখ॥ সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি মারে॥ ২।২২।৮-১১॥" এই কয় পয়ারে উপরে উদ্ধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির মর্ম্মই প্রকাশ করা হইয়াছে; সুতরাং পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তিরই আনুগত্যেই এই কয় পয়ারের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। সুতরাং পয়ারোক্ত "নিত্যসংসার", "নিত্যবদ্ধ" নিত্যবহির্ম্মুখ' এবং "নিত্যসংসারী" বাক্যসমূহের অন্তর্গত "নিত্য"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "অনাদি॥" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই "বদ্ধ, বহির্ম্মুখ এবং সংসারী।" এই শ্রেণীর জীবসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভ "অনাদি'-শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী ঐ "অনাদি"-অর্থেই "নিত্য"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "নিত্য'-শব্দের একটী ব্যঞ্জনা এই যে যেসমস্ত জীব এই সংসারে আছেন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত "নিত্য অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই" বহির্ম্মুখ, সংসারী এবং মায়াবদ্ধ। মধ্যভাগে তাঁহাদের কেহই কখনও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। সাধন-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ভগবদ্ধামে একবার যাঁহারা যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা। ১৫।৬:" নিত্য-শব্দের সাধারণ অর্থ হইতেছে—অনাদি এবং অনন্ত; উল্লিখিত পয়ারসমূহে 'নিত্য'-শব্দের এই সাধারণ অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, সংসারী জীবের সংসার বা মায়াবন্ধন নিত্য—অর্থাৎ ইহার অন্ত বা শেষ নাই। ইহা যে কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রেত নয়, পরবর্ত্তী পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তিরূপে কবিরাজগোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন—এই "নিত্যবদ্ধ', "নিত্য সংসারী' এবং "নিত্যবহির্ম্মুখ" জীব, "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥ ২।২২।১২-১৩॥"—মায়াবদ্ধ জীবও মহৎ-কৃপার ফলে মায়ামুক্ত হইয়া "কৃষ্ণনিকট যায়"—পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারে।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অনাদি, কিন্তু বিনাশী—দূরীভূত হওয়ার যোগ্য। নচেৎ সাধনোপদেশেরই সার্থকতা থাকেনা।

অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীব সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"অন্তরঙ্গা-শক্তিবিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপঃ।—অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া নিত্য ভগবৎ-পার্ষদরূপ।" যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ তাঁহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইতে হয় নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা অন্তরঙ্গাশক্তির বা স্বরূপশক্তির বিসাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত এবং এইভাবে অনুগৃহীত বলিয়াই অনাদিকাল হইতে তাঁহারা নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। স্বরূপ-শক্তিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত না হইলে, স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়া সত্ত্বেও পরিকররূপে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইত না—ইহাই পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে সূচিত হইতেছে। তাহার হেতু এই যে—জীবের স্বরূপে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই (১।৪।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং স্বরূপশক্তিই ভগবানের সেবার পক্ষে অপরিহার্য্যা; যেহেতু ভগবান্ হইতেছেন আত্মারাম, স্বরাট্ স্বশক্ত্যেক-সহায়। ভক্তি বা প্রেম ব্যতীত

ভগবানের সেবা হইতে পারে না। ভক্তি বা প্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ; তাই স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তি-বিশেষের কৃপা না পাইলে কেহই ভগবৎ-সেবা বা ভগবৎ-পার্ষদত্ব পাইতে পারেন না।

কিন্তু স্বরূপশক্তিহীন জীব কিরূপে এই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের কৃপা পাইতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিবিশেষকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; তাহা ভক্তচিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রীতিনামে খ্যাত হয় এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই পরমাস্বাদ্য হইয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্‌ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি; অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥" শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রেম রূপে পরিণত হইয়া ভগবৎ-সেবায় পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তাহাকে ভগবৎ-সেবার উপযুক্ত করে এবং পার্ষদত্ব দান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। এইরূপেই নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকেন।

সংসার-বন্ধনের হেতু। নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতেই পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কখনও মায়িক সংসারজালে আবদ্ধ হইতে হয় না। আর আমরা অনাদিকাল হইতেই মায়িক সংসারজালে আবদ্ধ; পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য আমাদের কখনও হয় নাই। স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করার সৌভাগ্যও কখনও আমাদের হয় নাই। অনাদিকাল হইতেই আমরা মায়ার গুণজালে জড়িত হইয়া কখনও স্থাবর-দেহে, কখনও বা জঙ্গম-দেহে বিচরণ করিতেছি।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই সংসারেও আমরা কিছু না কিছু সুখ তো উপভোগ করিতেছি। হ্লাদিনীই তো সুখ দিতে পারেন; অপর কেহ পারে না। হ্লাদিনী হইল ভগবানের স্বরূপ-শক্তি। এই সংসারেও আমরা সুখ যখন পাইতেছি, তখন আমাদের প্রতি হ্লাদিনীর বা স্বরূপশক্তির যে কৃপা নাই, তাহা কিরূপে বলা হয়?

উত্তর—এই সংসারে আমরা কিছু কিছু সুখ ভোগ করিয়া থাকি; সত্য। কিন্তু ইহা হ্লাদিনী-প্রদত্ত সুখ নহে। হ্লাদিনী হইল চিচ্ছক্তি, চেতনাময়ী-শক্তি। হ্লাদিনী হইতে জাত সুখও হইবে চিন্ময়সুখ, নিত্যসুখ। আমাদের জড়দেহের সঙ্গে তাহার যোগ হইতে পারে না; চিৎ-এর সঙ্গে কখনও জড়ের স্পর্শ হইতে পারে না। জড়ের সঙ্গেই জড়ের সম্বন্ধ; চিৎ-এর সঙ্গেই চিৎ-এর সম্বন্ধ। জড় খাদ্যদ্রব্য জড় দেহেই পুষ্টিসাধন করে, আত্মার ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত-জগতের সুখ হইল জড়-দেহের সুখ; সুতরাং তাহাও হইবে জড়বস্তু হইতে জাত—অনিত্য এবং জড় বা চিদ্‌বিরোধী। ইহা হ্লাদিনী হইতে জাত নহে; ইহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে জাত। সত্ত্বগুণ অনিত্য জড়সুখ জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার অপর একটী নাম হ্লাদকরী শক্তি। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিঃপুঃ, ১।১২।৬৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্বিকী।" মায়ায় এই সাত্বিকী-শক্তি কেবলমাত্র মায়াবদ্ধজীবেই থাকে; সুতরাং ইহাই জীবের পক্ষে হ্লাদকরী বা জীবের সুখোৎপাদিকা।

গীতা হইতেও এই কথাই জানা যায়। "তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ১৪।৬॥—হে অনঘ (অর্জ্জুন), মায়ার এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশত্ব এবং নিরুপদ্রবতাবশতঃ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেল—"অনাময়ং চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেন সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেন জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। এই টীকা হইতে জানা গেল, সত্ত্বগুণের কার্য্যই সুখ এবং জ্ঞান। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণি আত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাতমিতি মৃষৈব সুখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাঽবিদ্যা।... অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া- বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি।" এই

ভাষ্য হইতেও জানা গেল—বিষয় হইতেই সুখজন্মে (বিষয়ভূতস্য সুখস্য) এবং সুখ হইল অবিদ্যার আত্মভূত—অবিদ্যা হইতে জাত।

সুতরাং প্রাকৃত জগতের সুখ হ্লাদিনী হইতে জাত নহে।

কিন্তু আমরা কেন সংসারী হইলাম? আর নিত্যমুক্ত জীবেরা কেন নিত্যমুক্ত হইলেন?

পূর্ব্বোদ্ধৃত পরমাত্মসন্দর্ভবাক্যেই তাহার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতি যাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত, তাঁহারা নিত্যমুক্ত; মায়া তাঁহাদিগকে কবলিত করিতে পারেন নাই। আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবানকে ভুলিয়া আছেন, তাঁহারাই মায়ার কবলে পড়িয়া সংসারী হইয়াছেন। তাঁহারাই আমরা। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥ ২।২০।১০৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ॥ ১১।২।৩৭—পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই ভয় জন্মে।" অনাদি-কাল হইতেই ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকার তাৎপর্য্য হইতেছে অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতিহীন।

কিন্তু কেন আমরা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-স্মৃতিহীন, ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখ হইয়া আছি? এই কেন'র কোন অর্থ নাই। অনাদিসিদ্ধ বস্তুসম্বন্ধে কেন বলা চলে না।

মায়ার কবলে কেন এবং কিরূপে পড়িলাম? জীবের একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সুখবাসনা যে জীবস্বরূপেরই বাসনা, তাহাও বলা হইয়াছে। জীবস্বরূপের বাসনা বলিয়া ইহা নিত্য, অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। অনাদিকাল হইতেই আমরা সুখের অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু সুখের মূল উৎস সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছি বলিয়া, সুখের অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁহার কথা মনে জাগিতে পারে না। তাঁহার দিকে পেছন ফিরিয়া আছি বলিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিও পড়িতে পারে না, তাঁহাকে দেখিলেও অন্ততঃ বুঝিতে পারিতাম যে, আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি তাঁহার নিকটেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিও না। যেদিকে আমরা মুখ ফিরাইয়া ছিলাম, সেদিকে আছেন মায়া—তাঁহার প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সুখভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া (সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি)। আমরা মনে করিলাম, এই ব্রহ্মাণ্ডেই আমাদের সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে। তাই এই সংসারের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, পড়িয়া সংসারের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আমরাই মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, মায়ার চরণকে আলিঙ্গন করিয়াছি, মায়া আমাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনেন নাই। শ্রীমদ্‌-ভাগবত হইতে তাহাই জানা যায়। "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনুমৃত্যু-মপেতভগঃ। ১০।৮৭।৩৮॥—সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপবিস্মৃত হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হন। অজামবিদ্যাম্ অনুশয়ীত আলিঙ্গেত—স্বামী।" মায়াও আমাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্‌গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ৭।৫।১১॥"-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পর ইতি পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্‌বিমুখানাং জীবানাং অতএব নূনং সের্ষ্যয়া যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপবিস্মরণপূর্ব্বকদেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষেণ মোহিতবুদ্ধীনাং অসতাং যন্মায়ৈব পরঃ পরকীয়োঽর্থঃ।" এই টীকা হইতে জানা যায়, মায়া যেন আমাদিগকে "ঈর্ষ্যার সহিত" অঙ্গীকার করিয়া আমাদের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন। "ঈর্ষ্যার সহিত" বাক্যের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে—"যেখানে সুখের উৎস, সেখানে সুখ না খুঁজিয়া তুমি আসিয়াছ—আমার এই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সুখ খুঁজিতে—যেখানে সুখ বলিয়া কোনও জিনিসই নাই, যাহা আছে, তাহাও অনিত্য, জড়, দুঃখসঙ্কুল; সেখানে তুমি সুখের অনুসন্ধানে আসিয়াছ! আচ্ছা থাক; এখানকার সুখের মজা বুঝ।" এইরূপ মনে মনে ভাবিয়াই

যেন মায়াদেবী তাঁহার আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে সম্যক্‌রূপে আবৃত করিয়া দিলেন এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা তাহার চিত্তকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন—যেন জীব অন্য সমস্ত ভুলিয়া এই প্রাকৃত জগতের সুখভোগে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে। এইরূপে মায়া-কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়া সৃষ্টিসময়ে জীব একটী মায়িক দেহ পাইল—নিজের অভীষ্ট সুখভোগের উপযোগী দেহ। (জীব স্বীয় কর্ম্মফল অনুসারেই সেই কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকেও অনাদি বলিয়াছেন ; এই অনাদি কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহই জীব অনাদিকালে পাইয়াছে। সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া পরবর্ত্তীকালে নূতন নূতন ভোগায়তন দেহ পাইয়া থাকে)। সেই দেহেই জীব প্রবেশ করিল। তাহার স্বরূপের জ্ঞান নাই বলিয়া মনে করিল—এই দেহই আমি; ইহাই দেহাত্মবুদ্ধি। দেহের ইন্দ্রিয়াদিকে মনে করিল—এসকল ইন্দ্রিয় আমারই ; তাই ইন্দ্রিয়ের সুখকে নিজের সুখ মনে করিয়া প্রাকৃত জগতে ভোগ্য বস্তু খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হয়। আমাদের এই হয়রাণী এখনও শেষ হয় নাই। ইহাই প্রাকৃত জগতের সুখের "মজা"।

প্রশ্ন হইতে পারে, কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিলাম ? কেন আমরা অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ ? হয়তো আমাদের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেই আমরা অনাদিবহির্ম্মুখ, অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণস্মৃতিহীন।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে—জীব হইল চিদ্রূপা শক্তি। চিদ্-বিরোধী মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে মোহিত করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে। জীবের স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞানকে অজ্ঞানরূপা মায়া কিরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারে? ইহার উত্তর—শ্রীজীবগোস্বামী দিয়াছেন। তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।"—ইত্যাদি (বি, পু, ৬।৭।৬১) শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরয়িতুং সামর্থ্যমস্তীতি।—বহিরঙ্গা হইলেও এই মায়ার তটস্থা শক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য আছে।" উপরে উদ্ধৃত "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত" ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৮৭।৩৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিদংশে জীব ও ব্রহ্মে বা শ্রীকৃষ্ণে ভেদ যখন নাই, তখন মায়াশক্তি কেন জীবকে কবলিত করিতে পারে, কিন্তু কেন শ্রীকৃষ্ণকে কবলিত করিতে পারেনা ? উত্তর এই—জীব চিৎ-কণ (অতি ক্ষুদ্র) বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে ; শ্রীকৃষ্ণ চিন্মহাপুঞ্জ বলিয়া তাঁহাকে কবলিত করিতে পারেনা—অন্ধকার যেমন তামা, পিতল, সোনা প্রভৃতির তেজকেই আবৃত করিতে পারে ; কিন্তু সূর্য্যের তেজকে আবৃত করিতে পারেনা, তদ্রূপ। "ননু চিদ্রূপাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়া আলিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ মৈবং জীবঃ খলু চিৎ-কণঃ, ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ। তাম্রপিত্তল-স্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেন্নতু সূর্য্যতেজ ইত্যাহুঃ।"

শ্রীজীব বলিয়াছেন, মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও তটস্থাশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। চক্রবর্ত্তী বলেন, জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পরে। তাহা হইলে বুঝা গেল, তটস্থাশক্তিময় জীবের চিৎ-কণত্বই তাহার মায়া কর্ত্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু এবং সেই জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়ারও তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য। শ্রীজীবের উক্তির (তটস্থাশক্তিময় জীবকে আবৃত করিবার সামর্থ্য, এই উক্তির) ব্যঞ্জনা এই যে, জীব চিদ্রূপা তটস্থাশক্তি বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ। এই সঙ্গে চক্রবর্ত্তীর উক্তি যোগ করিলে তাৎপর্য্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে এই—জীব চিদ্রূপা তটস্থাশক্তির কণারূপ অংশ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা নিত্যমুক্তজীব, তাহারাও তটস্থাশক্তিময় এবং তাহারাও চিৎ-কণ। তটস্থাশক্তিময় বলিয়াই যদি জীবকে কবলিত করিতে মায়া সমর্থা হয় (শ্রীজীব যেমন বলেন) এবং চিৎ-কণ বলিয়াই যদি জীবকে মায়া আবৃত করার সামর্থ্য ধারণ করে (চক্রবর্ত্তী যেমন বলেন), তাহা হইলে মায়া নিত্যমুক্ত জীবকে কবলিত বা আবৃত করিতে সমর্থ হয়না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—নিত্যমুক্ত জীবে এমন কিছু বিশেষ বস্তু আছে কিনা, যাহা অনাদিবহির্ম্মুখ জীবে নাই। শ্রীজীব বলেন—আছে। নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তিদ্বারা অনুগৃহীত। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপ-শক্তির এই অনুগ্রহের অভাব। এই পার্থক্যই মায়ার সামর্থ্য-প্রকাশের পার্থক্যের হেতু। নিত্যমুক্ত এবং অনাদি-বহির্ম্মুখ—উভয় প্রকার জীবই চিদ্রূপ-তটস্থাশক্তির চিৎ-কণ অংশ.; নিত্যমুক্ত জীবে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ আছে বলিয়া (স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত বলিয়া) মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ নাই বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে। "অপরন্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ।৪৫॥"—এই পরমাত্মসন্দর্ভবাক্যে শ্রীজীব তাহাই প্রকাশ করিলেন।

মায়ার জীব-মোহন-সামর্থ্যের কথা বলিতে গিয়া শ্রীজীব যে জীবকে "তটস্থশক্তিময়" বলিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনাও হইতেছে এই যে, জীবে কেবল তটস্থা শক্তিই আছে, (প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্), স্বরূপশক্তি নাই।

মায়া যে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে মোহিত করিতে পারে না, এমন কি তাঁহাদের নিকটেও যাইতে পারে না, তাহার কারণও স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণে বা ভগবৎ-স্বরূপে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়াকে দূরে অবস্থান করিতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু স্থানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রারম্ভ-শ্লোকেই দেখা যায়—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" এস্থলে "ধাম্না"-শব্দের অর্থ চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিয়াছেন—"স্বরূপ-শক্ত্যা।" এই অর্থে "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এই যে—সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবেই কুহককে (মায়াকে) নিরস্ত (দূরে অপসারিত) করিয়াছেন। আবার দশম স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকেও নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্।" এস্থলে স্বতেজসা-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্ত্যা" এবং শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্তিপ্রভাবেন।" তাহা হইলে উল্লিখিত স্বতেজসা ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইতেছে। বিশেষতঃ "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা, ১।৭।২৩॥"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থান করে। মায়া যে ভগবান্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়াকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আক্রমণ করা তো দূরে, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।"-ইত্যাদি (শ্রীভা, ২।৫।১৩) শ্লোক-প্রমাণবলে জানা যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিত হয়। তাই দূরে দূরে, ভগবনের লীলাস্থলাদির বাহিরেই অবস্থান করে। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দূরে দূরে অবস্থানের কারণই হইল স্বরূপশক্তির প্রভাব। ভগবানে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে না, স্বরূপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে, ইহাই "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

স্বরূপে বিভু ভগবান্‌কে শক্তিতে বা প্রভাবেও বিভু করিয়াছে এই স্বরূপশক্তিই। স্বরূপে অণু নিত্যমুক্ত জীবকেও প্রভাবে বৃহৎ করিয়াছে এই স্বরূপশক্তি। যেহেতু, স্বরূপশক্তি (বা পরাশক্তি) নিজেই বিভু। "পরাস্য শক্তিরিত্যাদৌ স্বাভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ পরা বিভ্বী সৈব হ্রীতি॥—কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥ ৩।৩।৪০॥-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" কিন্তু স্বরূপে অণু অনাদিবহির্ম্মুখ জীব স্বরূপশক্তির কৃপা পায় নাই বলিয়া প্রভাবেও অণু রহিয়া গিয়াছে—অনাদি বহির্ম্মুখ জীব স্বরূপেও অণু, প্রভাবেও অণু; তাই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ, স্বরূপশক্তির অভাবজনিত এই প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিয়াছে।

সার কথা এই যে, অনাদিকাল হইতেই আমরা স্বরূপশক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত বলিয়া আমরা অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ এবং এই বহির্ম্মুখভাবশতঃই আমরা অনাদিকাল হইতেই মায়াবদ্ধ।

আরও গোড়ার কথা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, অনাদিকাল হইতেই আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি, কখনও তাঁহার কথা, তাঁহার অস্তিত্বের কথা, তাঁহার আনন্দস্বরূপত্বের বা সুখস্বরূপত্বের কথা আমাদের মনে জাগে নাই। আমাদের এই ভগবৎ-বিস্মৃতি অনাদিসিদ্ধ অথবা অনাদি-কর্ম্মের ফল। অথচ আনন্দস্বরূপের সহিত আমাদের নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবশতঃ আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিকী চিরন্তনী সুখবাসনা আছে। এই সুখ-বাসনা যে চরমা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে একমাত্র সেই আনন্দস্বরূপে বা রসস্বরূপ ভগবানে, তাঁহাকে ভুলিয়া আছি বলিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সুখসম্ভার সাজাইয়া রাখিয়াছেন (সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি), সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি গেল এবং সেই সুখসম্ভারই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিল; তাই আমরা যেন সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। ইহাই আমাদের অনাদিবহির্ম্মুখতা—যাহার মূল হইল অনাদি-ভগবৎ-বিস্মৃতি। ভগবান্‌কে ভুলিয়া ছিলাম বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তির কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। কারণ, স্বরূপশক্তি সর্ব্বদা ভগবানের স্বরূপেই অবস্থিত বলিয়া, ভগবদুন্মুখ জীবের প্রতিই তাঁহার কৃপা হইতে পারে।

মায়াবন্ধন ঘুচাইবার উপায়। আমাদের এই মায়াবন্ধন স্বরূপানুবন্ধি নয়, আগন্তুক; সুতরাং ইহা দূরীভূত হওয়ার যোগ্য – শুভ্র বস্ত্রের আগন্তুক মলিনতা যেমন দূরীভূত হওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ।

কিন্তু কিরূপে মায়াবন্ধন দূরীভূত হইতে পারে? মায়াবন্ধনের হেতু যাহা, তাহা দূরীভূত হইলেই এই বন্ধন ঘুচিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবন্ধনের হেতু হইতেছে ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা, বা তাহারও হেতু—ভগবদ্ বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিকে দূর করিতে পারিলেই ভগবদ-বহির্ম্মুখতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনও ঘুচিতে পারে।

কিন্তু বিস্মৃতিকে কিরূপে দূর করা যায়? বিস্মৃতি হইল স্মৃতির অভাব—অন্ধকার যেমন আলোর অভাব, তদ্রূপ। বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে স্মৃতিদ্বারা—অন্ধকারকে যেমন দূর করা যায় আলো দ্বারা। তাই বলা হইয়াছে—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ পাদ্মোত্তরখণ্ড ৭২।১০০॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ॥ ১।২।৫॥—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে; কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও নিষেধ আছে, সমস্তই এই দুই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর।"

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তো আমরা ভগবৎ-স্মৃতি হৃদয়ে স্থায়ী করিতে পারি না। ভগবৎ-স্মরণে মনঃসংযোগ করিতে চাহিলেও মন কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েতে যাইয়া উপস্থিত হয়। কখন যে ছুটিয়া যায়, তাহাও যেন টের পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি?

ইহার হেতু এই যে, মায়া আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে; বিষয় হইতে মনকে টানিয়া আনিতে চাহিলেও আমরা পারি না। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি; মহাপরাক্রমশালিনী; আর আমরা ক্ষুদ্রশক্তি জীব। মায়ার সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠি না। তাহা হইলে উপায়? উপায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহার আর অন্য উপায় নাই। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥" সর্ব্বশেষেও অর্জ্জুনকে তিনি বলিয়াছেন—"দেহের সুখমূলক বা দুঃখনিবৃত্তিমূলক যত রকম ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

কিন্তু কেবল মুখের কথাতেই শরণাপত্তি হয় না; তজ্জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। মনকে প্রস্তুত করার জন্য সাধনের প্রয়োজন। সাধনের ফলে ভগবৎ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া জীব স্বরূপে স্থিত হইয়া পার্ষদরূপে ভগবৎ-সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

পুরুষার্থ

পুরুষার্থ বলিতে কাম্য বস্তু বা অভীষ্ট বস্তু বুঝায়—পুরুষের (জীবের) অর্থ (প্রয়োজন—কাম্যবস্তু)। জগতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোক আছে; তাহাদের রুচি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন। তাই তাহাদের অভীষ্টও হয় ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য সাধারণভাবে সুখই সকলের অভীষ্ট বস্তু; কিন্তু রুচির বিভিন্নতাবশতঃ সুখ সম্বন্ধেও সকলের ধারণা এক রকম নয়। মিষ্ট জিনিস অনেকেই ভালবাসে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ গুড়ের মিষ্ট, কেহ চিনির, কেহ বা মিশ্রীর মিষ্ট ভালবাসে।

আমরা মায়াবদ্ধ; তাহার ফলে দেহেতে আমাদের আবেশ এবং দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখকেই আমরা আমাদের সুখ বলিয়া মনে করি।

কেহ চাহেন কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগ—আহার, নিদ্রা, উপস্থের তৃপ্তি। পশুদের এই অবস্থা। মানুষের মধ্যেও পশুপ্রকৃতির লোক আছেন; শিশ্নোদর-পরায়ণতা ছাড়া তাঁহারা সাধারণতঃ অন্য কিছু জানেন না। শিশ্নোদরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের উপায় সম্বন্ধেও তাঁহারা বিশেষ সতর্ক নহেন—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক দিক্ দিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সমর্থনযোগ্য কিনা, সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ অনুসন্ধান নাই। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল স্থূল ইন্দ্রিয়ের সুখ—যেন তেন প্রকারেণ। এই শ্রেণীর লোকের পুরুষার্থকে বলা হয় **কাম**।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগ চাহেন বটে; কিন্তু কেবলমাত্র স্থূলভোগ চাহেন না; স্থূলভোগের স্থলেও তাঁহারা ভোগের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনাশীল। দেহের, মনের এবং সমাজের স্বাস্থ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আছে। তাঁহাদের ভোগ-চেষ্টা একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই তাঁহাদের নৈতিক জীবনেরও অধঃপতন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম; কখনও পদস্খলন হইলেও তাঁহারা অনুতপ্ত হন এবং আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা সংযম হারাইতে চাহেন না। আর লোকের নিকটে মান-সম্মান; প্রসার-প্রতিপত্তিও তাঁহারা চাহেন; তাই তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। জনহিতকর কার্য্যেও যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য অর্থের প্রয়োজন। আর, সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উল্লিখিতরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই একতম প্রধান লক্ষ্য (বা অর্থ) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলা যায়—**অর্থ**।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—যাঁহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ ভোগও চাহেন এবং আরও কিছু চাহেন। উল্লিখিত ভোগসকল হইল কেবল ইহকালের ভোগ; কেবল ইহকালের ভোগেই তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। মৃত্যুর পরেও, পরকালেও স্বর্গাদি-সুখভোগ তাঁহারা কামনা করেন। পরকালের সুখভোগের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। তাঁহারা মনে করেন, এবং শাস্ত্রও বলেন—ধর্ম্মের (স্বধর্ম্মের) অনুষ্ঠানেই ইহকালের এবং পরকালের সুখভোগ মিলিতে পারে। তাই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই হয় তাঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহাদের পুরুষার্থকে বলা যায় **ধর্ম্ম**।

এস্থলে যে তিনটি পুরুষার্থের কথা বলা হইল, তাহারা হইল জীবের চিরন্তনী সুখবাসনারই তিনটী রূপ। এই তিন রকমের পুরুষার্থের পর্য্যবসানই হইল দেহের সুখে বা ইন্দ্রিয়ের সুখে। স্বর্গসুখও দেহের সুখ। কিন্তু স্বর্গসুখভোগের পরে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। গীতা। যে পুণ্যের ফলে স্বর্গলাভ হয়, সেই পুণ্য শেষ হইয়া গেলে আবার এই সংসারে আসিতে হয়।" এই সংসারের সুখও অবিমিশ্র নয়,—দুঃখমিশ্রিত, পরিণাম-দুঃখময় এবং অনিত্য—বড় জোর মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী। তারপর, জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ; নরকভোগের দুঃখ তো আছেই। এসমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যাঁহারা উক্ত তিনটী পুরুষার্থের প্রতি লুব্ধ হন না, এমন এক শ্রেণীর লোকও আছেন; অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা হয় তো খুবই কম। তাঁহারা মনে করেন—

ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম যখন বাস্তবিক নিরবচ্ছিন্ন সুখ দিতে পারে না, তখন ইহাদের সত্যিকারের পুরুষার্থতাও নাই। তাঁহারা খোঁজেন এমন একটা সুখ, যাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কামজনিত সুখের ন্যায় দুঃখসঙ্কুলও নয়, অনিত্য নয়। তাঁহারা আরও ভাবেন—ধর্ম্ম-অর্থ-কামজনিত সুখ হইল দেহের সুখ। দেহ অনিত্য; তাই এসমস্ত সুখও অনিত্য। যতদিন অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন জীব নিত্য সুখ পাইতে পারে না। অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ-চ্ছেদন কিসে হইতে পারে? মায়ার বন্ধনে আছে বলিয়াই জীবের মায়িক দেহের সহিত সম্বন্ধ। মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীব অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারে, তখন হয় তো নিত্য সুখের সন্ধান মিলিতে পারে।

উল্লিখিত রূপে চিন্তা করিয়া তাঁহারা মায়ার বন্ধন ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা করেন। বন্ধন ঘুচানের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। তাই এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলে মোক্ষ।

যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা বলেন—পরকালের স্বর্গাদিসুখ যেমন স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পাওয়া যায়, ইহকালের সুখ—অর্থ এবং কামও স্বধর্ম্মাচরণ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রুটী-বিচ্যুতিই ইহকালের সুখকে দুঃখমিশ্রিত করে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব বা বিরুদ্ধাচরণই নরকভোগের হেতু। তাই সমাজের প্রতি এবং ব্যক্তিগত সংযম ও চিত্তশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ বলেন—যাঁহারা নিবৃত্তির পন্থায় অগ্রসর হইতে অসমর্থ, তাঁহাদের সকলেরই স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত; স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরকালের স্বর্গাদিসুখ লাভ হইতে পারে, এবং ইহকালের সুখভোগ (অর্থ ও কাম) লাভও হইতে পারে। স্বধর্ম্মাচরণের জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজন; দেহরক্ষার জন্য দেহের ভোগের (কামের) প্রয়োজন। কিন্তু দেহের ভোগে (কামে) উচ্ছৃঙ্খলতা যেন না আসে। ততটুকু ভোগই স্বীকার করিবে, যতটুকু ভোগ দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন। তাহা হইলেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের আনুকূল্য হইতে পারে এবং ক্রমশঃ সংযম ও চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা জন্মিতে পারে। এইভাবে, অর্থ ও কাম হইল ধর্ম্মের অনুগত এবং এই ধর্ম্মানুগত কাম স্থূল-ইন্দ্রিয়ভোগে পর্য্যাপ্তি লাভ না করিয়া অনেকটা দ্বিতীয় পুরুষার্থ-"অর্থেরই" অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে। এইভাবের "কামই" সমাজের এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়া লোকের সত্যিকারের পুরুষার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে কিছু আনুকূল্য-বিধায়করূপে পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

যাহা হউক, অর্থ ও কামকে ধর্ম্মের অনুগত রাখিলে প্রথমোক্ত তিনটী পুরুষার্থের পর্য্যায় হইবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। এইরূপ পর্য্যায়ই শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত। এই তিনটীকে ত্রিবর্গও বলে।

কিন্তু এই ত্রিবর্গেও সংসার-যাতায়াতের অবসান হয় না। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়প্রীতি, তাহা হইতে আবার ধর্ম্মাদি; পরাম্পরাক্রমে এইভাবে চলিতে থাকে। "ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং, তস্য কামঃ তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিঃ তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপিধর্ম্মাদিপরম্পরেতি। শ্রীভা, ১।২।৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।" এজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ত্রিবর্গের বাস্তবিক পুরুষার্থতা নাই। উপচারবশতঃই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলা।

যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। "ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ শ্রীভা, ১।২।৯॥" ধর্ম্মার্থকামের দ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিয়া মোক্ষসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই মোক্ষ-কামীর কর্ত্তব্য। "কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ শ্রীভা ১।২।১০॥" এই মোক্ষলাভ হইলে সংসার-গতাগতি ছুটিয়া যায়, সংসার-দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, নিত্য-চিন্ময়-ব্রহ্মানন্দের অনুভবও হয়। সুতরাং মোক্ষেরই বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

এইরূপে দেখা গেল, পুরুষার্থ চারিটী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইহাদিগকে চতুর্ব্বর্গও বলে। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বারা ত্রিবর্গ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বারা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

কিন্তু নিত্য-চিন্ময় ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও তাহা হইতেও লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রহ্মানন্দ হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে উপলব্ধ আনন্দ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বলিয়া আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতার বৈচিত্রীও নাই। ইহা কেবল আনন্দসত্তামাত্র। ইহাতে নিত্য চিন্ময় সুখ আছে; কিন্তু সুখের বৈচিত্রী নাই, তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। আস্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদনের চমৎকারিত্ব নাই; প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মান আস্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহা আস্বাদন-বাসনার নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করে না। তাই ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম লোভনীয় বস্তু নহে—ইহা অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে।

কি সেই বস্তু, যাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও লোভনীয়? যে বস্তুতে ব্রহ্মত্বের চরমতম বিকাশ, তাহাই সেই পরম-লোভনীয় বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে রসত্ব বিকাশেরও তারতম্য (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রসত্বের বিকাশ যত বেশী, আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তির বিকাশ ন্যূনতম বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রসত্বের বিকাশও ন্যূনতম। আর শক্তির অসমোর্দ্ধ বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রসত্বের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে লোভনীয়। এজন্যই হরিভক্তিসুধোদয় বলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥" এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের আকর্ষকত্ব এতই বেশী যে, ইহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" কেবল ইহাই নহে। "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে॥ ২।২১।৮৬॥"

এই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রেম—স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম।—"প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন। ১।৭।১৩৭॥ এই প্রেমের সহিত রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ শ্রুতি॥"

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, যাহারা আত্মারাম (জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মানন্দনিমগ্ন), কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাঁহারাও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০॥" এবং যাহারা ব্রহ্মসাযুজ্যপর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, এই প্রেমলাভের জন্য সে সমস্ত মুক্তপুরুষদের ভজনের কথাও শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ নৃসিংহতাপনী। ২।৫।১৬। শঙ্করভাষ্য॥" মুক্তপুরুষদের ভগবদ্ভজনের কথা বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥" এই সূত্রে গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তম্ ওঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্‌প্রশ্ন্যাং যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তম্ উপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি—মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্॥" এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—কোনও শ্রুতি বলেন, মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য; আবার কোনও শ্রুতি বলেন মুক্তির পরেও

উপাসনা কর্ত্তব্য। এই মতভেদের মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—আপ্রায়ণাৎ—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তত্রাপি—তত্র (মোক্ষে) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থায়ও অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাসনা করিতে হইবে। হি—যেহেতু, দৃষ্টম—শ্রুতিতে সকল সময়েই উপাসনার কথাই দৃষ্ট হয়। মুক্তাবস্থাতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বলেন—সর্ব্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও, উপাসনা করিবে। শ্রুতি প্রমাণ এই—সর্ব্বদা এনম্ উপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে—সৌপর্ণশ্রুতিঃ। প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধিই বা কোথায়, ফলই বা কি ? উত্তর—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও, বস্তুসৌন্দর্য্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্তি ভজনে প্রবর্ত্তিত হন—যেমন পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তু-সৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রীভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত পুরুষও ভগবদ্ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ॥ ব্র, সূ, ১।৩।২ ॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতেও ঐ কথাই জানা যায়। এই সূত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম-মুক্ত সাধুদিগের উপসৃপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৩০ পৃঃ ॥" উক্ত সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও বলা হইয়াছে—"মুক্তানাং পরমা গতিঃ—ব্রহ্ম মুক্তদিগেরও পরম-গতি।" ইহাতেও বুঝা যায়, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য মুক্তপুরুষদিগেরও লালসা জন্মে।

এই পরম-লোভনীয় বস্তুটীর আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ প্রেম হইল—চতুর্থ পুরুষার্থ-মোক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থদ্বারা যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্যবস্তু বলিয়া এই পুরুষার্থটীও হইল **পরম-পুরুষার্থ**। মোক্ষ হইল চতুর্থ পুরুষার্থ ; তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রেম হইল **পঞ্চম-পুরুষার্থ**।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব

সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১।২॥"-এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদং সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বম্ হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্য উপনিষৎ॥—ওঙ্কারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্—এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ওঙ্কারই, ওঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতুভূত।" তৈত্তিরীয় উপনিষৎও বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ ১।৮॥ —ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎও ওঙ্কার বা ব্রহ্ম।"

উল্লিখিত মাণ্ডুক্য-শ্রুতি হইতে জানা গেল—ত্রিকালের প্রভাবাধীন যাহা কিছু (অর্থাৎ এই অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড), তৎসমস্তই ব্রহ্ম; এবং ত্রিকালের অতীত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তও ব্রহ্ম। কিন্তু ত্রিকালের অতীত কি বস্তু? প্রাকৃত জড় ব্রহ্মাণ্ডই কালের প্রভাবাধীন। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডের অতীতও কিছু আছে। যাহা প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, তাহা হইবে অপ্রাকৃত, চিন্ময়। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা আমাদের চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। প্রকৃতিভ্যঃ পরম্ যস্ত তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগদ্ধামাদিও হইল কালের প্রভাবের অতীত। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—তৎসমস্তও ব্রহ্মই।

এই অনন্ত অচিন্ত্য বৈচিত্রীময় জগতের সৃষ্টি-আদি যাহা হইতে সম্ভব, সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-শ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গৎ যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম॥ ১।১।২॥ বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্য।" পূর্ব্বোদ্ধৃত মাণ্ডুক্যশ্রুতিও ব্রহ্মকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী ইত্যাদি বলিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে তিনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন এবং ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তিনি প্রতি জীবের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ শ্রুতি।

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ৬।৮॥" এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তিই প্রধান—অন্তরঙ্গা, চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইল তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য্য। অনন্তকোটি জীব হইল তাঁহার তটস্থা জীবশক্তির বিকাশ। আর অনন্ত ভগদ্ধাম এবং তত্রত্য বস্তুসমূহ হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকাশ। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি। শ্রুতি॥—সেই ভগবান্ কোথায় থাকেন? স্বীয় মহিমায়।" তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষই তাঁহার মহিমা। শ্রুতিতেই তাঁহার ধামের কথা দৃষ্ট হয়। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংবভূব দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥ ৩।৩।৩৬॥—ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যোপক্রমে ধৃত মুণ্ডকোপনিষদ্‌বাক্য (২।৭)॥" এই শ্রুতিবাক্যের "সংব্যোমপুরই" ভগবানের ধাম। উল্লিখিত "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥"—এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—

সেই ভগবদ্ধাম সংব্যোমপুরের সমস্ত বস্তুজাত ব্রহ্মাত্মক (বিশুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ); দেখিতে কিন্তু এই পৃথিবীর বস্তু-সমূহের মতনই মনে হয়। "তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদি নির্ম্মিতবৎ স্ফুরতীত্যর্থঃ।" এক্ষণে বুঝা গেল শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ কালের প্রভাবাধীন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, কালাতীত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহও ব্রহ্মই।

ব্রহ্ম রস-স্বরূপ। রসো বৈ সঃ॥ তাঁহাতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী। সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ এবং সমস্ত রস-বৈচিত্রীরও পূর্ণতম বিকাশ যাঁহাতে, তাঁহাতে ব্রহ্মত্বের বা রসত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। রসত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তিদ্বারা সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া যে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহও যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। তিনি এক হইয়াও বহু। একোঽপি সন্ যো বহুধাবিভাতি। শ্রুতি।

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম॥"—এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের লীলা (ক্রীড়া) আছে। একাকী লীলা হয় না; লীলার সহচর বা পরিকর আবশ্যক। ব্রহ্ম আত্মারাম, স্বরাট্, স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায়। তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই অনাদিকাল হইতে তাঁহার লীলা-পরিকররূপে বিরাজিত। লীলা-পরিকরগণও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই।

এইরূপে দেখা গেল, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই বলুন, কি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামাদিতেই বলুন, ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোথায়ও অপর কিছুই নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

এক্ষণে বুঝা গেল, পরিদৃশ্যমান্ জগতের সঙ্গে এবং জগতিস্থ জীবনিচয়ের সঙ্গে এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের অতীত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের সঙ্গেও ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের একটা নিত্য, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ (সম্যক্‌রূপে বন্ধন) রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটী হইল অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখ জীব এই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই মায়ামুগ্ধ হইয়া জন্ম-মরণাদির অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—ব্রহ্ম তাঁহার শিবত্বের (মঙ্গলময়ত্বের), তাঁহার সুন্দরত্বের বিকাশে পরম-করুণ। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, কিন্তু তিনি জীবকে ভুলেন নাই। বহির্ম্মুখ জীবের আপনা হইতে কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রতও হইতে পারে না। "অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্। স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১১।২২।১০॥" ভগবান্ কৃপা করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়াছেন। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদপুরাণ॥ ২।২০।১০৭॥" শ্রুতি বলেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্‌বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণাম্॥ মৈত্রেয়ী। ৬।৩২॥—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণ—এসমস্ত সেই মহান্ ঈশ্বরের নিশ্বাসরূপে প্রকটিত হইয়াছে।" মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে ব্রহ্মের স্মৃতি জাগ্রত করাইয়া তাহাকে ভগবদুন্মুখ করাই এ সমস্ত শাস্ত্র প্রকটনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যই হইলেন ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, শ্রুতি-স্মৃতি আদি শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।—সমস্ত বেদ যাঁহাকে নমস্য, প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সমস্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, (তিনিই ব্রহ্ম)॥ কঠোপনিষৎ। ২।১৫। ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ গোপাল-তাপনী॥—বেদান্তবেদ্য, জগদ্‌গুরু,বুদ্ধি-সাক্ষী, অক্লিষ্টকারী, সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ গীতা। ১৫।১৫॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমি সমস্ত বেদের বেদ্য (প্রতিপাদ্য) আমিই বেদান্ত প্রকট করিয়াছি, আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা।" বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহা বেদান্তের প্রথম সূত্রেই বলা হইয়াছে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।১।১॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দৃষ্ট হয়। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ

কশ্চন॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহম্॥ ১১।২১।৩২-৩॥—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করা হয়? (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করা হয়? এসমস্ত বিষয়ে বৃহতীর (বেদের) তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না; (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে আমাকেই প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্কদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় (প্রতিপন্ন) করেন।" পদ্মপুরাণ বলেন—"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ পাতালখণ্ড। ৯৩।২৬॥—সেই সেই আগম ও পুরাণাদি শাস্ত্র, (পুরাণাদির সম্যক্ বিচারে অসমর্থ) চরাচর-জগদ্‌বাসী লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক, কিন্তু রূঢ়িপ্রভৃতিবৃত্তিদ্বারা আগমাদি-শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে নিশ্চিত হইবেন।"

এক্ষণে বুঝা গেল—বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যরূপেও ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব; অনন্ত-কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে এবং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে, অনন্ত-পরিকররূপে এবং অনন্ত-ভগবদ্ধামরূপেও শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, এবং জীবের ও জগতের সহিত তাঁহার একটা নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ-তত্ত্ব। "সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥ ১।৭।১৩২॥"

কিন্তু এই সম্বন্ধের সার্থকতা কোথায়? আর ভগবান্ যে কৃপা করিয়া বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিলেন, সেই কৃপারই বা সার্থকতা কোথায়?

কেহ বলিতে পারেন—ভগবানের প্রকটিত বেদপুরাণাদি শাস্ত্র মায়াবদ্ধ জীবের মায়ামুক্তির আনুকূল্য করিয়া থাকে। জীব যদি মায়ামুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলেই ভগবানের করুণাও সার্থক হয় এবং তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধও সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কেবলমাত্র মায়ামুক্তি হইল মোক্ষ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যমুক্তি। ইহাতে চিরকালের জন্য সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায় বলিয়া সাযুজ্যমুক্তিতে ভগবৎ-করুণা কিঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তাহা হইলেও ইহাতে করুণার সম্যক্ সার্থকতা নাই, সম্বন্ধেরও সম্যক্ সার্থকতা নাই। সম্বন্ধেব-সম্যক্ সার্থকতাতেই করুণারও সম্যক্ সার্থকতা।

যে দুইজনের মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধ বা বন্ধন থাকে, তাহাদের উভয়েই সেই বন্ধনের সুখ বা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। দুইজন লোককে যদি একই দড়িদ্বারা একসঙ্গে বাঁধা যায়, উভয়েই বেদনা অনুভব করিবে। দুই জনের মধ্যে যদি প্রীতির বন্ধন থাকে—যেমন মাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে—এই প্রীতির সুখ উভয়েই অনুভব করে। ব্রহ্ম বা ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ; জীবও চিদানন্দাত্মক; তাঁহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বা বন্ধন, তাহাও হইবে আনন্দাত্মক বন্ধন বা আনন্দাত্মক সম্বন্ধই—ইহা হইবে সুখকর সম্বন্ধ, উভয়ের পক্ষে সুখকর। যাহার স্বরূপই সুখকর, তাহার সঙ্গে দুঃখের কোনও সংশ্রবই থাকিতে পারে মা।

সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকে; জীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে বটে; কিন্তু তাহার মুক্তির ফলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোনও আনন্দ অনুভব করেন না। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্যক্ সার্থকতা লাভ করে—একথা বলা যায় না।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল সেব্য-সেবক সম্বন্ধ (জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সাযুজ্যমুক্তিতে এই সম্বন্ধের জ্ঞানও বিকাশ লাভ করিতে পারেনা—একথা "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। যখন সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইবে, তখন ভগবৎ-সেবার জন্য জীবের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিবে (পরবর্ত্তী "প্রয়োজন-তত্ত্ব" প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য) এবং তখন ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের কৃপা লাভ করিয়া জীব ভগবৎ-পরিকররূপে তাঁহার সেবা

করার সৌভাগ্য লাভ করিবে। লীলা-পরিকররূপে লীলাতে ভগবানের সেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই জীব ভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে এবং এই সেবার ব্যপদেশে পরিকরভুক্ত জীবের চিত্ত হইতে যে প্রীতিরসের উৎস প্রসারিত হইয়া থাকে, তাহা আস্বাদন করিয়া রস-স্বরূপ ভগবানও পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদনে ভগবানের আনন্দ এত বেশী যে, তিনি স্বতন্ত্র স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। (প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য)। ইহাতেই জীব-ব্রহ্মের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পূর্ণতম সার্থকতা এবং ইহাতেই ভগবৎ-করুণারও পূর্ণতম বিকাশ এবং সার্থকতা।

ভগবানের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ইহা কেবল অনুভববেদ্য। লীলাশুক বিল্বমঙ্গলঠাকুর এই মাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া "মধুর মধুরই" বলিয়াছেন, তাঁহার বপু মধুর, তাঁহার বদন মধুর, তাঁহার মধুগন্ধি হাসি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর—ইহাই বলিয়াছেন, আর কিছু বলিতে পারেন নাই। "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ কর্ণামৃত।৯২॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া ভাষার অভাবে কেবল আকুলি-বিকুলি মাত্রই যেন করিয়াছেন, মাধুর্য্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে পারেন নাই। "সনাতন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু। মোর মন সান্নিপাতি, সব পীতে করে মতি, দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর, তাতে যেই মুখসুধাকর। মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥ সুমধুর, হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে, দশ-দিকে বহে যায় পুর॥ ২।২১।১১৫-১৭॥

এমনই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য। শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—সুতরাং পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষকই—বলিয়াছেন। তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপের চরমতম-বিকাশেই তাঁহার ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। আনন্দস্বরূপত্বের রস-স্বরূপত্বের চরম-তম বিকাশেই তাঁহার মাধুর্য্যেরও চরম-তম বিকাশ। মাধুর্য্যের চরম-তম বিকাশই তাঁহার পরব্রহ্মত্বের বা স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার।—ভগবত্তার বা ব্রহ্মত্বের সারই হইল মাধুর্য্য। ২।২১।৯২॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ইহার প্রভাবের একটু দিগদর্শন দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা শিরোমণি; যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষণে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আবার "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২।২১।৮৬॥"

এতাদৃশ আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ অখিলরসামৃতবারিধি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব এবং পরিকররূপে জীবকর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের চরমতম সার্থকতা। "এইত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার। বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ একসার॥ ২।২।২॥"

অভিধেয়-তত্ত্ব

অভিধেয় অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য। অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই অভিধেয়। এই সংসারে আমাদের অভীষ্ট বস্তু একটা দুইটা নয়—বহু। কোন্ অভীষ্টটী পাওয়ার নিমিত্ত কর্ত্তব্য বা উপায়ের অনুসন্ধান এস্থলে করা হইতেছে? সংসারে আমাদের অভীষ্ট বহু হইলেও তাহাদের মূল হইতেছে একটা—সুখ। সেই সুখ কিন্তু আমরা সংসারে পাইনা; তাই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনাও এখানে চরমাতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, বাস্তবিক যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, তাহার স্বরূপ আমরা জানিনা; তাই তাহা পাওয়ার উপায়ও আমরা অবলম্বন করিতে পারিনা; সুতরাং তাহা পাইও না। সেই সুখটী হইতেছে—সুখস্বরূপ রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সহিত জীবের যে একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তিনিই যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে তাহা বিস্মৃত হইয়া আছে। সেই সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। আবার অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সেই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি-ত্রিতাপ-জ্বালাদির ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এই জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপ-জ্বালাদি হইতে উদ্ধার পাইতে হইলেও উক্ত নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। সেই স্মৃতিকে জাগ্রত করার উপায়ই হইতেছে জীবের মুখ্য কর্ত্তব্য—ইহাই অভিধেয়। ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই সেই স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যে সর্ব্বপ্রকারের ভয় দূরীভূত হয়, শ্রুতি-স্মৃতি তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন। শ্রুতি। ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারিলে কোনও ভয়ই থাকে না।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈ ক্লেশৈ র্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।—সেই দেবকে—ভগবানকে জানিতে পারিলেই সকল পাশ (বন্ধন) নষ্ট হয়। পাপ-ক্লেশ নষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুরও ব্যাঘাত জন্মে। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ইতি শ্রুতি হইতে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য উপায় নাই।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে:—আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭।১৬॥" মুণ্ডকশ্রুতি বলেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৮॥—পরব্রহ্মের দর্শন পাইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং সংসার-গতাগতিরও উপশম হয়।

উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মকে জানার কথাই বলা হইয়াছে। জানা অর্থ বিস্মৃতিকে দূর করা; কারণ যত দিন পর্য্যন্ত জীব তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানা যাইবে না।

কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? উপাসনাই তাঁহাকে জানিবার উপায়। শ্রুতি-স্মৃতি তাই ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২।১৬-১৭॥" এস্থলে ব্রহ্মকে জানার কথা, তাঁহাকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার অবলম্বনই উপাসনা।

শ্রুতি বলেন—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ১।১৪॥—নিজের দেহকে এক অরণি (ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদনার্থ কাষ্ঠ) করিয়া এবং প্রণবাত্মক ব্রহ্মকে আর এক অরণি করিয়া উভয়ের ঘর্ষণরূপে ধ্যান অভ্যাস করিলে সেই দেবের দর্শন পাইবে।" শ্রুতি আরও

বলেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" এস্থলেও ব্রহ্মের শ্রবণ-মননরূপ উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিলেন। কিন্তু উপাসনা তো অনেক রকম আছে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি। কোন্ রকমের উপাসনা বিধেয় ?

যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল অনিত্য। ইহাদ্বারা ইহকালের সুখ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ-ভোগ লাভ হইতে পারে; কিন্তু এসমস্ত সুখ অনিত্য; ইহা দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। স্বর্গলাভ হইলেও স্বর্গসুখ হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য; যতদিন পুণ্যকর্ম্মের ফল থাকিবে, ততদিনের জন্য। পুণ্যক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" শ্রুতিও বলেন—"যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যধৃতশ্রুতিবচন। শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—অগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ-সাধনানাং অনিত্যফলতাং দর্শয়তি—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে অগ্নিহোত্রাদি-সাধনের ফল যে অনিত্য, তাহাই বলা হইয়াছে। কর্ম্মের ফলে ইহকালে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্যের ফলে পরকালে যে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, তাহাও তেমনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকোপনিষৎও বলেন—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞ-রূপা॥ ২।৭ ॥—সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে যজ্ঞরূপ-তরণী অদৃঢ়। যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধনের দ্বারা সংসার-মোক্ষ অসম্ভব।" আরও বলা হইয়াছে—"এতচ্ছ্রেয়ো যে অভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ মুণ্ডক। ১।২।৭॥ যে সকল মূঢ়লোক যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মাঙ্গ-সাধনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।"

এসমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা গেল, কর্ম্মের বাস্তব অভিধেয়ত্ব নাই।

তারপর যোগ ও জ্ঞানের কথা। যোগমার্গের সাধকগণ জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার সঙ্গে এবং জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন চাহেন। উভয় প্রকার সাধনের সিদ্ধিতেই (অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলনে বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্তিতে), জীবের মায়াবন্ধন এবং তজ্জনিত সংসার-গতাগতি ঘুচিয়া যায়, আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা উভয়েই আনন্দস্বরূপ বলিয়া নিত্য চিদানন্দের আস্বাদনও জীব পাইতে পারে। সুতরাং যোগের বা জ্ঞানের অভিধেয়ত্ব আছে।

কিন্তু যোগ এবং জ্ঞান সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য অভিধেয় কিনা, সে সম্বন্ধে একটু বিবেচনা আবশ্যক। কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিশ্চিত এবং সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে, (১) সেই উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা, অর্থাৎ সেই উপায়টী অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এমন কোনও শাস্ত্রোক্তি আছে কিনা, (২) উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরিক-বিধি আছে কিনা, অর্থাৎ সেই উপায়টী অবলম্বন না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এমন কোনও শাস্ত্রোক্তি আছে কিনা, (৩) উপায়টী অন্যনিরপেক্ষ কিনা, অর্থাৎ অভীষ্ট-দান-বিষয়ে উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা। যদি অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যানুসারে অভীষ্ট লাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে; (৪) উপায়টীর সার্ব্বত্রিকতা আছে কিনা, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা। সর্ব্বত্র বলিতে—সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায়, বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে; এবং উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা, অর্থাৎ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন করা যায় কিনা। এই সদাতনত্ব না থাকিলে সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এতাদৃশ পাঁচটী লক্ষণই যে উপায়ের আছে, তাহাকেই অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে নিশ্চিত উপায়রূপে গণ্য করা যায়।

উপায়ের কথাই জিজ্ঞাস্য এবং এতাদৃশ উপায়েরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধেয়ত্ব থাকিতে পারে। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই (২।৯।৩৫)-শ্লোকে একথাই জানা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—যোগ ও জ্ঞানমার্গে উক্ত লক্ষণগুলি আছে কিনা।

প্রথমতঃ যোগমার্গ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি। ৫।৬।—যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন॥" ইহা যোগসম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগসম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক অন্বয়-বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

যোগসম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি দৃষ্ট হয় না;

গীতা আবার বলেন—"অসংযতাত্মনা যোগ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ; বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৬।৩৬॥—যাঁহার মন সংযত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলম্বন করিলে তিনিই সফল-কাম হইতে পারেন।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগে অধিকারীর বিচার আছে, যোগমার্গে সকলের অধিকার নাই। আবার "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত" ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে দেখা যায়, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা আছে। সুতরাং যোগের সার্ব্বত্রিকতাও নাই।

গীতার উল্লিখিত "অসংযতাত্মনা"—ইত্যাদি ৬।৩৬-শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ "উপায়ত' শব্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্ জ্ঞানাকারান্ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। ২।২২,১৪॥" শ্রীমদ্ভাগবতও ঐ কথাই বলেন। "তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ২।৪।১৭॥—তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী), যশস্বী (কর্ম্মিবিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিৎ (আগমশাস্ত্রানুগত সাধক) এবং সুমঙ্গল (সদাচারসম্পন্ন) ব্যক্তিগণও যাহাতে স্ব-স্ব-তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গলপ্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার, নমস্কার।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যোগের অন্য-নিরপেক্ষতা নাই।

সুতরাং যোগমার্গ নিশ্চিত উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা।

জ্ঞানমার্গ। যাঁহারা জীব-ব্রহ্মের অভেদ মনন পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহাদের সাধন-পন্থাকেই এস্থলে জ্ঞানমার্গ বলা হইতেছে।

শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইহা জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে অন্বয়বিধি। জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাধন ব্যতীত যে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মানুভব হইবেনা, এমন কোনও বিধান দৃষ্ট হয় না।

জ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষত্বও নাই। স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্। ১।৫।১২॥—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-শ্রীভগবানে ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।" শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—"শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১০।১৪।৪॥—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য-স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না।" গীতাও বলেন—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্॥ ১২।৫॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবল-ব্রহ্মোপাসকানান্তু কেবল-ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।"

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬॥"-এই গীতা-শ্লোকের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদশঙ্কর লিখিয়াছেন—"ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্ত সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা।—মোক্ষ ফল লাভের নিমিত্ত যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা ভগবদর্চ্চনরূপ ভক্তিযোগের ফল। অর্থাৎ ভক্তিযোগব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না, নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধান-রূপ জ্ঞান স্থিতিলাভ করিতে পারেনা, সুতরাং ফলদায়কও হয় না।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥—হে অর্জ্জুন, কেবলমাত্র অনন্যভক্তির সাহায্যেই তত্ত্বতঃ আমাকে জানা যায়, দেখা যায়, আমাতে প্রবেশ করা যায়।" ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্মসাযুজ্যই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য। গীতার এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—'যদি নির্ব্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা।" এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথঙ্‌ন কদাচিদপি যা ভবতি সা তু অনন্যা ভক্তিঃ। সর্ব্বৈরপি করণৈঃ বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সা অনন্যা ভক্তিঃ তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারঃ হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ;" শ্রীপাদ শঙ্করও এস্থলে বলিতেছেন—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-ভক্তিদ্বারা মোক্ষ লাভও হয়।

এসমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধন স্বীয় ফল প্রদানে অসমর্থ।

জ্ঞানের সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে। কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনের অধিকারী। আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানানুশীলনের বিরতি ঘটে।

সুতরাং ভগবদনুগ্রহের পক্ষে জ্ঞান একটী উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় নহে।

ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গ কেন স্ব-স্ব-ফলদানে অসমর্থ, তাহার একটী শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত হেতু আছে। শ্রুতি বলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নীতি॥"—ব্রহ্ম স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার মহিমা হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ-শক্তিতে বা স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষেই প্রতিষ্ঠিত, অন্যত্র নহেন। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবত আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ॥ ৪।৩।২৩॥—বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলে। বিশুদ্ধসত্ত্বে অপাবৃত পুরুষ প্রকাশিত হন।" স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব। সুতরাং স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষেই যে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, ইহাই জানা গেল। ইহার হেতুও আছে। ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌বস্তু; চিদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নয়। স্বরূপ-শক্তিও চিদ্‌বস্তু—চিচ্ছক্তি। তাই একমাত্র স্বরূপ-শক্তিতেই ব্রহ্মের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা বা অনুভব সম্ভব।

মায়াবদ্ধ জীব সাধন করে তাহার দেহের ও দেহের ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। ধ্যান মনের কাজ। মন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়। বুদ্ধির সাহায্যে যে ব্রহ্মের অনুশীলন, তাহাও প্রাকৃত মনের বৃত্তিবিশেষ বুদ্ধিরই কাজ। কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা তাহাদের বৃত্তি—সমস্তই মায়িক বলিয়া জড়; চিৎ এবং জড়—এই দুইটী হইতেছে পরস্পর-বিরোধী বস্তু—আলো ও অন্ধকারের ন্যায়। যেখানে আলো, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না; যেখানে অন্ধকার, সেখানে যেমন আলো থাকিতে পারে না; তদ্রূপ যেখানে চিৎ, সেখানে জড় থাকিতে পারে না এবং যেখানে জড়, সেখানে চিৎ থাকিতে পারে না। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

তাই ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারেন না; "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর॥" অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"তোমার নিজের

চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পাইবে না, দিব্যচক্ষু দিতেছি ; তাহাদ্বারা দেখ। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮ ॥"

সুতরাং প্রাকৃত মনের ধ্যানাদিদ্বারা অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি সম্ভব নয়। মন স্বরূপ-শক্তিদ্বারা অনুগৃহীত হইলেই তাহা সম্ভব। নিত্যমুক্ত জীবসম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গেও দেখা গিয়াছে, সম্যক্‌রূপে মায়াস্পর্শ বিবর্জ্জিত হইয়া স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্তিতেই তাঁহারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছেন।

মন এবং ইন্দ্রিয়াদিকে স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্য করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—ভক্তির অনুষ্ঠান। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তিস্বরূপতঃ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। "হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদ্রূপ ভক্তিঃ সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ। ইতরথা ভগবৎ-বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ। তথাভূতায়াস্তস্যা ভক্তকায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেন আবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারাত্বম্। চিৎসুখমূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেয়ম্।—অধ্যয়নমাত্রবতঃ। ৩।৪।১২ ॥-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"—শ্রুতি বলেন, ভক্তি হইল হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; তাহা সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করে। তাহা না হইলে, ভক্তির ভগবৎ-বশীকারিণী শক্তি থাকিতে পারে না। এতাদৃশী ভক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়াদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অনুষ্ঠানাদিরূপে প্রকাশিত হয়—চিৎসুখবিগ্রহ ভগবানের কুন্তলাদির ন্যায়।" ভগবান্ চিদানন্দবিগ্রহ ; তাঁহার কেশাদিও চিদ্‌বস্তু—চিদানন্দেরই প্রকাশ-বিশেষ ॥ তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা অনুষ্ঠেয় হইলেও হ্লাদিনীসারসংযুক্তা সম্বিৎ-শক্তির (অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিরই) বৃত্তিবিশেষ-ভক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ—ইন্দ্রিয়াদি ভক্তির সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে সাধকের দেহেন্দ্রিয়াদি স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে—ধ্যান ভক্তিমার্গেও আছে, জ্ঞানমার্গেও আছে। ভক্তিমার্গের ধ্যান স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইলে জ্ঞানমার্গের ধ্যান তাহা হইবেনা কেন ?

উত্তর এই। ভক্তি অর্থই হইল সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্। গোপালতাপনী শ্রুতি।" তাই ভক্তিতে সাধকের চিত্তে সেব্য-সেবকত্বভাব থাকে। জ্ঞানমার্গে তাহা থাকে না। সেব্য-সেবকত্বভাব থাকার একটা বিশেষত্ব আছে। যিনি সেব্য, তিনি হইবেন—ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়-সবিশেষ-স্বরূপ—ভগবান্। তাঁহাতে স্বরূপশক্তি আছে। এই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই তিনি ভক্তবৃন্দের চিত্তে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করেন—যাহা ভক্তচিত্তে আসিয়া ভক্তি-প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে। যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তি-অঙ্গরূপে তাঁহাদের নিকটে স্বরূপশক্তিকে প্রকটিত করেন। এই স্বরূপশক্তি কৃপা করিয়া যথা সময়ে সাধকের মনঃ-আদি ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অবশ্য অনুষ্ঠানের আরম্ভেই ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না, যথাসময়ে হয়। লৌহ আগুনে দেওয়া মাত্রই অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না, কিছুকাল পরে হয়। (বিশেষ আলোচনা ২।২৩।৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানমার্গের ধ্যান সম্বন্ধে অন্য কথা। এস্থলে সাধক ধ্যান করেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের, —আমিই ব্রহ্ম এই ভাব মনে জাগ্রত রাখিয়া। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিকাশ নাই ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপশক্তিকে রূপায়িত করিয়া সাধকের চিত্তে ধ্যানরূপে প্রকটিত করিতে পারেন না। জ্ঞানমার্গের সাধকের ধ্যান কেবলই তাঁহার প্রাকৃত মনের ক্রিয়া, ইহাতে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ নাই।

ব্রহ্ম বা ভগবানের কৃপার কথা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।২।৩ ॥—এই আত্মা (ব্রহ্ম) বেদাধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন, গ্রন্থার্থধারণের শক্তি (মেধা) দ্বারা লভ্য নহেন, বহু বেদবাক্য শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাহাকে (আপন-জন বা স্বীয়-সেবকরূপে) বরণ করেন, তিনিই এই আত্মাকে পাইতে পারেন ; এই আত্মা তাঁহার নিকটে স্বীয় তনু (বিগ্রহ) প্রকাশ বা দান করেন।" বরণ-শব্দেই ব্রহ্মের কৃপার কথা

জানা যায়। আর তনু-প্রকাশে বা তনু-দানেও কৃপার আতিশয্য প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতির এই বাক্য দেখিয়া মনে পড়ে আর একটী উক্তির কথা। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥—ভক্তি সহকারে যিনি একপত্র তুলসী বা এক গণ্ডুষ জল ভগবান্‌কে অর্পণ করেন, (সেই জল-তুলসীর সমান আর কিছু নাই বলিয়া) ভক্তবৎসল-ভগবান্ তাঁহার নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—নিজেকেই দান করেন (বৃণুতে তনুং স্বাম্)।" ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে তাঁহার স্বরূপশক্তিকে সাধকের জন্য প্রকটিত করা এবং সাধকের ইন্দ্রিয়াদিকে স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করা ব্রহ্মের কৃপারই পরিচায়ক। জ্ঞানমার্গের সাধকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে এইরূপ কৃপার অভিব্যক্তি নাই, যেহেতু নির্ব্বিশেষ স্বরূপে স্বরূপ-শক্তির বিলাস নাই; কৃপা ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ।

এইরূপে দেখা গেল জ্ঞানমার্গের ধ্যান এবং ভক্তিমার্গের ধ্যান স্বরূপতঃ এক বস্তু নহে। শ্রবণ-মননাদি সম্বন্ধেও এইরূপই।

এজন্যই বলা হইয়াছে, সাধনের সহায় ইন্দ্রিয়াদিকে একমাত্র ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইতে পারে। এরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত না হইলে চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত হইতে পারেন না, ধ্যানের বিষয়ীভূতও হইতে পারেন না। সাধক নিজের ইচ্ছামত ধ্যানের চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু সেই ধ্যানে অনুভব লাভ হইবে না।

যোগমার্গসম্বন্ধেও এইরূপ। এজন্যই যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন।

ভক্তি একমাত্র সবিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানেই প্রযোজ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ভক্তির (সেবার) অবকাশ নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী সাধক কিরূপে ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন?

সাযুজ্যকামীর মোক্ষদাতাও সবিশেষ স্বরূপ। মোক্ষদানের অনুরূপ শক্তিও নির্ব্বিশেষ স্বরূপে নাই। তাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মোক্ষদান করিতে পারেন না। সাধক নিজের শক্তিতেও মায়াকে অপসারিত করিয়া মোক্ষ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। কারণ, মায়া দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, অপর কেহ পারেন না এবং মায়ার কবল হইতে উদ্ধার না পাইলে মোক্ষও অসম্ভব। কারণ, মোক্ষ অর্থই হইল মায়ারবন্ধন হইতে মুক্তি।

উল্লিখিত গীতার উক্তি হইতে জানা গেল, মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের—সবিশেষ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ব্রহ্মের—কোনও সচ্চিদানন্দময় সবিশেষ স্বরূপেরই ভজন করিতে হইবে—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা। তাঁহার নিকটে প্রার্থনাও জানাইতে হইবে—তিনি কৃপা করিয়া যেন তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য জন্মাইয়া দেন। এরূপ করিলেই জ্ঞানমার্গের সাধন ফলদায়ক হইতে পারে।

যোগমার্গের সাধককেও তদ্রূপই করিতে হইবে।

এইরূপে ভক্তির সাহচর্য্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেই জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ফলপ্রদ হইতে পারে এবং তখনই জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের অভিধেয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে সিদ্ধ হইয়া কোনও সাধক সাযুজ্যমুক্তি বা পরমাত্মার সহিত মিলন লাভ করিলে তাঁহার সংসার-গতাগতির নিরসন হইতে পারে, সত্য; কিন্তু তাহাতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইবে না; সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিকাশ হইবে না; যতদিন পর্য্যন্ত এই সেব্য-সেবকত্ব-ভাব বিকশিত না হয়; ততদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধজ্ঞানেরও সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে বলা যায় না। তাই, যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গ অভিধেয় হইলেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নয়।

এক্ষণে ভক্তিসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫।—হে অর্জ্জুন, আমাতে মন অর্পণ কর, আমার

ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।" আমার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি। ১৮।৫৫।" ইহাও গীতার উক্তি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য। শ্রীভা, ১১।১৪।২৪॥" শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী। মাঠর শ্রুতি॥"—এসমস্ত হইল ভক্তিসম্বন্ধে অন্বয়বিধি।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩॥—চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা আত্মপ্রভব সাক্ষাৎ-ঈশ্বর পুরুষকে (না জানিয়া) ভজন করেন না, কিম্বা (জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।" "পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥—যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।"—এসমস্ত হইল ভক্তিসম্বন্ধে ব্যতিরেক বিধি।

ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতাও আছে। "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ শ্রীভা, ১১।২০।৩২-৩৩॥—কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা যোগদ্বারা, দানধর্ম্মদ্বারা, তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি অন্য শ্রেয়ঃ-অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারা সে সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে। ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবচ্চরণ-সেবাও পাইতে পারেন।" "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—" এই উক্তির "একয়া"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ভক্তি অন্য কাহারও সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। মাঠর শ্রুতির "ভক্তিরেব ভূয়সী"—বাক্যেও তাহাই সূচিত হইতেছে। এই সমস্ত প্রমাণে ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতা সূচিত হইতেছে। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরমা স্বতন্ত্রা; তাই পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে সমর্থা। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠর শ্রুতি॥"

ভক্তি জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষাও রাখেন না। "তস্মাদ্ মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ॥ শ্রীভা, ১১।২০।৩১॥—জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ॥"

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ শ্রীভা, ১১।৩।৩১॥"

উল্লিখিত প্রমাণবলে জানা যায়, ভক্তি সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা।

ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির-অনুষ্ঠান করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারেন। "শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥ ৩।৪।৬৩॥" "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা আভীর-শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ শ্রীভা, ২।৪।১৮॥—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাঁহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।" কেবল মনুষ্যের কথা তো দূরে, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিও ভক্তির প্রভাবে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাম্। উর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥ গরুড়পুরাণ॥—হরিতে সংন্যস্তকর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে; জ্ঞানিব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আর কি কথা।" দুরাচার ব্যক্তিও ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা। ৯।৩০।॥—যিনি অন্যদেবতার আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ আমার একান্ত নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।" এসমস্ত হইল ভক্তির সার্ব্বত্রিকতার প্রমাণ।

ভক্তির সদাতনত্বও আছে। সমস্ত অবস্থাতেই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্রুবাদি বাল্যে, অম্বরীষাদি যৌবনে, যযাতি-আদি বার্দ্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যুকালে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায়, ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থানকালেও ভজনক্রিয়া চলিতে পারে। "যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্‌বহন্তো দিবং যযুঃ ॥—যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।" হ, ভ, বি,।

সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় ভক্তির বিরতি নাই। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের (৯।৪।৬৭) শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই। "ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥—শ্রীহরিনামগ্রহণে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই; যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানেই নাম গ্রহণ করা যায়। উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।" তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ শ্রীভা, ২।২।৩৬ ॥—সকল লোকই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনই হইল সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অভিধেয়।

"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে নিয়া যায়, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। ভক্তিই গরীয়সী।" —এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় একমাত্র—(এব-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য) ভক্তির কৃপাতেই জীব ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারে, ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে, পার্ষদরূপে ভগবৎ-সেবার ব্যপদেশে রস-লোলুপ ভগবান্‌কে প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহার ভক্তবশ্যতা প্রকটিত করিতে পারে। ইহাতেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানের পূর্ণতম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভক্তির প্রভাবেই এই বিকাশ। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে সম্বন্ধজ্ঞানের এতাদৃশ বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং ভক্তিই হইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিধেয়।

বেদান্তেও ভক্তির অভিধেয়ত্বের কথা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—"অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে।—এই পাদে অনুরাগের হেতুভূতা ভক্তির কথা বলা হইতেছে।"

"বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩।৩।৪৮ ॥"—সূত্রে বলা হইয়াছে "বিদ্যাই মুক্তির একমাত্র কারণ।" এই সূত্রে বিদ্যা-শব্দের অর্থে গোবিন্দভাষ্যে বলেন—"বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ইত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাঃ তত্ত্বাভিধানাৎ।—'প্রজ্ঞাকে জানিয়া'-ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে বিদ্যা-শব্দে এস্থলে জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তিকে বুঝাইতেছে।" আরও বলা হইয়াছে—"তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতু র্নতু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বা। ইত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ।—সূত্রস্থ তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থক। একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষহেতু, কর্ম্ম বা বিদ্যাকর্ম্ম নয়। (বিদ্যাকর্ম্ম-শব্দে ভক্তিমিশ্র কর্ম্ম বুঝায়; ইহাদ্বারাও মোক্ষ লাভ হয় না)।"

মূল ভাষ্যে বিদ্যা-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি। জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি বলিতে কি বুঝায়? জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—তৎপদার্থের (বা পরতত্ত্ব ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপের) জ্ঞান, ত্বং-পদার্থের (বা জীব-স্বরূপের) জ্ঞান এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান। উভয়ের (জীব-ব্রহ্মের) ঐক্যজ্ঞানে সেব্য-সেবকত্বের ভাব নাই; সেব্য-সেবকত্ব-ভাব ব্যতীত ভক্তির (সেবার) অবকাশই হয় না। সুতরাং ইহা ভক্তিবিরোধী; ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের সাধকদের ভাব। ইহা ভক্তিবিরোধী বলিয়া "জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি"-বাক্যের অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দে এই ঐক্যজ্ঞানকে লক্ষ্য করা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের—

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান এবং জীবতত্ত্বজ্ঞানরূপ অঙ্গদ্বয়ের—সঙ্গে ভক্তির প্রতিকূল সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মকে জানার কথা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে জানা যায়॥ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"-ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রুতিবাক্য (৩।১।৯) হইতে জীবস্বরূপকে জানার কথাও পাওয়া যায়। তাহা হইলে "জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি"-দ্বারা "ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের জ্ঞানপূর্ব্বিকাভক্তিকেই" বুঝায়। সাধনে নিষ্ঠার জন্য—আমি কাহার উপাসনা করিতেছি, তাহা যেমন জানা দরকার, তেমনি আমার স্বরূপ কি, আমার উপাস্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি—তাহাও তেমনি জানা দরকার। এইরূপ জ্ঞানলাভের পরে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই এস্থলে "জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি" বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে কর্ম্ম এবং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। সুতরাং উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের মতে শুদ্ধাভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানে পরমপুরুষার্থ প্রেম প্রাপ্তি হইতে পারে। সুতরাং ইহাই সমস্ত অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ২।২২।১৪॥"

প্রয়োজন-তত্ত্ব

যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। অভিধেয়-তত্ত্বে বলা হইয়াছে—জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে উপাসনা। আরও বলা হইয়াছে—পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্মের সঙ্গে স্বীয় সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই জীবের সংসার-ভয়-জন্মিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধে স্মৃতি জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসার-ভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেই উপাসনার প্রবর্ত্তকমাত্র।

উপাসনার প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ · এই শ্রুতিপ্রমাণ বলে) যখন সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন বুঝা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান্ অপেক্ষা আপন-জন জীবের আর কেহই নাই এবং ইহাও তখন জানা যায় যে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধটীও অতি মধুর ; যেহেতু, সেই আনন্দস্বরূপ, রস-স্বরূপ ব্রহ্ম পরম-মধুর, তাঁহার মাধুর্য্যের সমান বা অধিক মাধুর্য্য আর কোথাও নাই। ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি॥ জীবকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য, সেই মাধুর্য্যভাণ্ডারের দ্বারা জীবকে বরণ করার জন্য রসঘনবিগ্রহ পরম-মধুর ব্রহ্মও বিশেষ আগ্রহান্বিত ; যেহেতু, তিনি সত্যং শিবম্ সুন্দরম্। ইহা যখন সাধক বুঝিতে পারে, তখন আর জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা তাহার থাকে না ; নিতান্ত আপনজনভাবে প্রাণমন ঢালা প্রীতির সহিত তাঁহার সেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। তাই, নৃসিংহদেব যখন কৃপা করিয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়া বরপ্রার্থনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"নাথ জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ভবাম্যহম্ ; তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ যা প্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥—হে প্রভো, আমার কর্ম্মফল অনুসারে আমাকে সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে ; কিন্তু প্রভো, যখন যে যোনিতেই থাকি না কেন, তোমার চরণে আমার যেন অবিচলা ভক্তি থাকে। অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েতে যেরূপ অবিচ্ছিন্না প্রীতি থাকে, আমার হৃদয়েও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ অবিচ্ছিন্না রতি থাকে, সেই প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়াই আমি যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার স্মরণ করিতে পারি।"

বস্তুতঃ, রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের মাধুর্য্যের আকর্ষণীশক্তি এতই অধিক যে, সাধক-জীবের কথা তো দূরে, জীবন্মুক্ত আত্মারাম-মুনিগণ পর্য্যন্তও তাঁহার সেবা পাওয়ার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ শ্রী,ভা, ১।৭।১০॥" আবার মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণও যে রসঘনবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হন, শ্রুতিতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুক্তা অপি এনং উপাসীত ইতি। সৌপর্ণশ্রুতি।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ২।৫।১৬॥" বেদান্তসূত্রেও একথা বলেন। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥—মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা করিবে ; মুক্তিতেও (তত্রাপি) উপাসনার কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।"

এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই এই সেবাবাসনা। স্বরূপশক্তি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে ইহার নাম হয় প্রেম। সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হইলে প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র পুরুষার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে, একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই তাহা সম্ভব। রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে—সম্বন্ধানুরূপ ভাবে তাঁহাকে পাওয়া, তাঁহাকে সেব্যরূপে পাওয়া।

যাহা হউক, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের রস-স্বরূপত্বের, আনন্দ-স্বরূপত্বের, মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এইরূপ সেবাবাসনা সাধকের চিত্তে জাগ্রত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠা হইল কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ—নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ। জীবের সহিত ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মও জীবের

উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। চুম্বকের সহিত লৌহের একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়াই চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের সহিত তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই চুম্বক স্বর্ণ বা রৌপ্যকে আকর্ষণ করে না। ভগবানের মাধুর্য্য হইল বিভু-চুম্বকতুল্য, আর জীব হইল অণু-লৌহ তুল্য। মৃত্তিকাস্তূপে আচ্ছন্ন ক্ষুদ্রলৌহ-শলাকা সমীপবর্ত্তী সুবৃহৎ চুম্বকখণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও চুম্বকের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু মৃত্তিকাস্তূপ অপসারিত হইলেই লৌহ-শলাকাটী ছুটিয়া আসিবে চুম্বকের নিকট। ভগবানের সহিত বহির্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধের জ্ঞানটী বহির্ম্মুখতার সুদৃঢ় আবরণে সম্যকরূপে আবৃত। তাই, সম্বন্ধজ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপ সেবাবাসনা ভগবানের দিকে ছুটিয়া যাইতে পারে না। ভগবৎ-কৃপা-পরিপুষ্ট সাধনের প্রভাব বহির্ম্মুখতার আবরণ দূরীভূত হইলেই সম্বন্ধের জ্ঞানটী জাগ্রত হয়, সেবাবাসনাটী ভগবানের দিকে ছুটিয়া যায়। সম্বন্ধের জ্ঞান জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচলিত করিয়া তোলে—তাঁহার সেবার জন্য। এই সেবাবাসনা সম্বন্ধের জ্ঞান হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ইহার পশ্চাতে জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপ-জ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার-লাভের বাসনার স্থান নাই, যদিও তাহা সাধনের প্রবর্ত্তক। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন যেন রাত্রিকালে, একটা ঘরের মধ্যে মাটী হইতে কিছু উপরে একটা দীপাধারের মাথায় একটা প্রদীপ আছে। প্রদীপটীর চারিদিকেই কাঠের আবরণ। এই অবস্থায় প্রদীপটীও দেখা যাইবে না, তাহার আলোও প্রকাশিত হইবে না। কাজেই ঘরটী হইবে অন্ধকারময়। ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্য যদি কেহ কাঠের আবরণটী সরাইয়া দেয়, তৎক্ষণাৎই প্রদীপটীও দেখা যাইবে, তাহার আলোও সকল দিকে প্রকাশিত হইয়া ঘরটীকে আলোময় করিয়া তুলিবে। এস্থলে, অন্ধকার দূর করার বাসনাই হইল আবরণ সরাইবার চেষ্টার প্রবর্ত্তক। অন্ধকার দূর করার বাসনা, বা আবরণ সরাইবার চেষ্টা কিন্তু প্রদীপটীতে আলো সঞ্চার করে না। প্রদীপে স্বভাবতঃই—আলো আছে, আবরণ দূর হইলে তাহা আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়। প্রদীপের সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত তাহার জ্যোতির বা দাহিকাশক্তির যে সম্বন্ধ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সহিতও সেবাবাসনার তদ্রূপ সম্বন্ধ। মায়াবদ্ধ জীবের এই সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সেবাবাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে—কাঠের আবরণে আবৃত প্রদীপের প্রভার ন্যায়। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় সম্বন্ধের জ্ঞান যখন প্রকাশ পায়, উজ্জ্বল হয়, তখন ঐ সেবাবাসনা আপনা-আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সাধকের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে—আবরণমুক্ত প্রদীপের প্রভায় ঘর যেমন আলোকময় হয়, তদ্রূপ। সাধন—সম্বন্ধকে যেমন জন্মায় না, সেবা-বাসনাকেও জন্মায় না। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেমন অনাদি, নিত্য, সেবাবাসনাও তেমন অনাদি, নিত্য—প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র। ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট-সাধন এই প্রচ্ছন্নতাকে দূর করে, তখন যাহা অনাদিকাল হইতেই আছে, তাহা প্রকাশ পায়।

শ্রুতিতে মায়াবদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কেবল ব্রহ্মকে জানার কথা এবং নিজেকে জানার কথাই বলা হইয়াছে। আত্মানং বিদ্ধি। জানিবার জন্যই জিজ্ঞাসার কথা—আত্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদান্তের প্রথম সূত্রই হইতেছে—অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। কি উপায়ে জানিতে হইবে, তাহা বলিতে যাইয়াই উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। গোড়ার কথা লইল—ব্রহ্মকে জানা এবং নিজেকে জানা. তৎ-পদার্থের জ্ঞান এবং ত্বং-পদার্থের জ্ঞান। এই দুইটী জানা হইলেই উভয়ের মধ্যের সম্বন্ধটী জানা যাইবে। তাহা হইলে বুঝা গেল, জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রুতিতে যত কিছু উপদেশ আছে, সমস্তের লক্ষ্যই হইল—জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান। এই জ্ঞানটী স্ফুরিত হইলে আর কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না; ইহার পরের বস্তুগুলি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে। সেবাবাসনাও তখন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে। এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধেরই একটা স্বরূপগত ধর্ম্ম—জ্যোতিঃ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, প্রভা যেমন প্রদীপের ধর্ম্ম—তদ্রূপ। "প্রদীপ আন" বলিলে যেমন আলোক আনাই বুঝায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—জীব-চিত্তে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবাবাসনাকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হইলেই সেবা পাওয়া যায় না। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের (ভক্তির) কৃপাতেই এই সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হয় ; তাহা অভিধেয়-তত্ত্বে বলা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় সাধকের প্রাকৃত মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার একটা বাসনা হয়তো জন্মিতে পারে ; কিন্তু তখনও ইহা প্রাকৃত মনের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃতই থাকিবে ; এই অবস্থায় ইহার সার্থকতা বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে মন যখন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সেবাবাসনাও তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন আর উহা প্রাকৃত থাকেনা—অপ্রাকৃত হইয়া যায়।

এতাদৃশী সেবাবাসনা যখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সর্ব্বদা নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী শক্তির (স্বরূপশক্তির) কোনও এক সর্ব্বা-নন্দাতিশায়িনী বৃত্তির সহিত মিলিত হয় (প্রতিসন্দর্ভ। ৬৫।), তখন ভগবৎ-প্রেম নামে অভিহিত হয়। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্‌বিকাশে সেবাবাসনা যেমন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষের সহিত সেবাবাসনার মিলনও তদ্রূপ আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়, ইহা কোনও চেষ্টার ফল নহে। ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট উপাসনার ফলে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হইলে আপনা-আপনিই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। শেষ ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে ইহাও বলা যায়—প্রেমপ্রাপ্তিই উপাসনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। এই প্রেমপ্রাপ্তিতেই সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে ; যেহেতু প্রেমলাভ হইলেই জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারে। ইহাই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ বা মুখ্যকামবস্তু। এজন্যই প্রেমকে মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়।

এস্থলে যাহা বলা হইল, বেদান্তের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হি অন্যে॥ ৩।৩।২৮॥" এই সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"সম্পরায়ো ভগবান্ সম্পরায়ন্তি তত্ত্বানি অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্র ভব ইত্যণ্ স্মরণাৎ। তস্মিন্ সতি ঐচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শঃ ন নিয়তঃ। কুতঃ তর্ত্তব্যাভাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেত্তস্য পাশস্য অভাবাৎ। তথাহি অন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।" এই ভাষ্যের স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ—যাঁহাতে সমস্ত তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনি সম্পরায় ; ইহাই সম্পরায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্ত্বের মিলন হয় পরব্রহ্ম ভগবানে। সুতরাং সম্পরায়-শব্দে ভগবানকেই বুঝায়। সম্পরায়-শব্দবাচ্য-ভগবদ্‌বিষয়কপ্রেমকেই সাম্পরায় বলে। চিত্তে প্রেম জাগ্রত হইলে ভগবচ্চিন্তা হইয়া পড়ে ঐচ্ছিকী—অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ; তখন ভগবানের—তাঁহার রূপগুণাদির সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের চিন্তাব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা মনে জাগে না ; অন্য চিন্তা আপনা-আপনিই মন হইতে দূরে সরিয়া যায় ; ইহাও স্বাভাবিক—কোনও কিছুদ্বারা নিয়ন্ত্রণের ফল নহে। যেহেতু, তখন সংসার-পাশ হইতে উত্তরণের বাসনাদিই থাকে না—তর্ত্তব্যাভাবাৎ। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রেমোদয়ে সংসার-পাশাদি ছেদনের বাসনাও স্বতঃই দূরে অপসারিত হইয়া যায়। তখন জীব শোক-মোহের অতীত হইয়া বীতশোক হয়। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টঃ যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ৩।১।২॥—শরীররূপ বৃক্ষে মায়ামুগ্ধ জীব মুহ্যমান হইয়া দীনচিত্তে শোক করিতে থাকে। সাধনের ফলে যখন ভগবানকে এবং তাঁহার মহিমাকে জানিতে পারে, তখন সেই জীবের আর কোনও শোকের কারণ থাকে না।" বস্তুতঃ তখন সংসার-পাশই থাকে না, প্রেমের আবির্ভাবে আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হইয়া যায়। একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন। "প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন॥ ১।৮।২৩।২৪॥" এই উক্তির অনুকূলে ভাষ্যকার "ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রেমের আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-সেবাবাসনা যে স্বাভাবিক ভাবেই স্ফূর্ত্ত হইয়া পড়ে, উল্লিখিত বেদান্তসূত্র হইতে তাহাই জানা গেল। সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার স্ফূর্ত্তিতেই সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণতম বিকাশের পরিচয়। সুতরাং যদ্দ্বারা সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার স্ফূর্ত্তি হয় এবং কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই হইল মুখ্যপ্রয়োজনতত্ত্ব। "ভক্তিফল—প্রেম প্রয়োজন॥ ২।২৩।২॥"

সাধ্য

সকল ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিতে সমান আনন্দ নহে। ভগবান আনন্দস্বরূপ ; সুতরাং যে কোনও স্বরূপই আনন্দময়—যে কোনও স্বরূপের উপলব্ধিতেই জীব আনন্দী হইতে পারে, নিত্য শাশ্বত আনন্দলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে কোনও স্বরূপের উপলব্ধিতে আনন্দ পাওয়া গেলেও স্বরূপের উপলব্ধিজনিত আনন্দ সমান নহে। চিচ্ছক্তির বিলাসেই আনন্দের বৈচিত্রী ; যে স্বরূপে চিচ্ছক্তির বিলাস যত বেশী, সেই স্বরূপেই আনন্দের বিলাসও তত বেশী, সেই স্বরূপেই মাধুর্যাদিও তত বেশী।

ব্রহ্মানন্দ বৈচিত্রীহীন স্বরূপানন্দ। নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ ; এই ব্রহ্মের উপলব্ধিতেও আনন্দ আছে ; কিন্তু চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি নাই বলিয়া এই ব্রহ্মে আনন্দের কোনওরূপ বৈচিত্রী নাই ; এই ব্রহ্মের উপলব্ধিতে যে আনন্দ, তাহা কেবল স্বরূপানন্দ ; তথাপি ইহাও নিত্য শাশ্বত আনন্দ—এই আনন্দেরও কোটিঅংশের এক অংশও মায়িক জগতে দুর্ল্লভ।

পরমাত্মার অনুভব। পরমাত্মায় শক্তির কিছু বিকাশ আছে ; শক্তির বিকাশে পরমাত্মার রূপ আছে, রূপ-মাধুর্য্য আছে ; পরমাত্মার অনুভবে, তাঁহার রূপ ও রূপমাধুর্য্যের অনুভবে এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া যায় ; ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা তাহা বহুগুণে লোভনীয়। কিন্তু পরমাত্মার লীলা নাই, লীলাপরিকর নাই। সুতরাং লীলাপরিকরদের সাহচর্য্যে লীলার ভিতর দিয়া আনন্দস্বরূপের যে আনন্দ স্ফুরিত হয়, পরমাত্মার উপলব্ধিতে সেই পরম-লোভনীয় আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণানুভবে আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যে সমস্ত স্বরূপের পরিকর আছে, লীলা আছে,—তাঁহাদের উপলব্ধিতে তাঁহাদের রূপ-গুণাদির সঙ্গে সঙ্গে লীলামাধুর্য্যের আস্বাদনও সম্ভব ; সুতরাং এই সকল স্বরূপের উপলব্ধিতে যে আনন্দ, পরমাত্মার অনুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষাও তাহার চমৎকারিতা অনেক বেশী। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ - সুতরাং রূপ-গুণাদির বা লীলার মাধুর্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—অসমোর্দ্ধ। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনুভবেই আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভগবৎ-সান্নিধ্য। ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিতে আনন্দ পাওয়া যায় সত্য ; কিন্তু উপলব্ধির উপায়টী কি ? আস্বাদনের নিমিত্ত আস্বাদ্য বস্তুর সান্নিধ্য অপরিহার্য্য ; সুতরাং জীবের পক্ষে ভগবানের আনন্দ-স্বরূপত্বের উপলব্ধির বা আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য অপরিহার্য্য ; কিন্তু জীব এই ভগবৎ-সান্নিধ্য কিরূপে পাইতে পারে ?

আবার ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হইলেই আনন্দাস্বাদন সম্ভব কিনা ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আনন্দাস্বাদনের নিমিত্ত জীবের একটা স্বাভাবিকী স্পৃহা আছে। অনিত্য এবং দুঃখ-সঙ্কুল বা পরিণাম-দুঃখময় হইলেও সংসারে জীব একরকম আনন্দ পায় এবং তাহার আস্বাদনে আনন্দাস্বাদন-বাসনা তৃপ্ত না হইলেও জীব তাহা আস্বাদন করে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সুখ অনুভবও করে ; সুতরাং আনন্দাস্বাদনের যোগ্যতাও যে জীবের আছে, তাহাও মনে করা যায়। আনন্দাস্বাদনের যোগ্যতা যখন জীবের আছে, তখন আনন্দস্বরূপের সান্নিধ্য লাভ হইলে তাহার পক্ষে আনন্দের আস্বাদন অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সান্নিধ্যবশতঃ আনন্দের আস্বাদন তাহার পক্ষে সম্ভব হইলেও আনন্দবৈচিত্রীর কিম্বা আনন্দ-চমৎকারিতার আস্বাদন কেবল সান্নিধ্য দ্বারাই লাভ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সেবাই আনন্দাস্বাদনের হেতু। রস-স্বরূপ হইয়াও ভগবান রসিক, রস-আস্বাদক। তিনি লীলারস আস্বাদন করেন ; লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার লীলা এবং লীলা-পরিকর। কিন্তু এই লীলায় কেবল নিজে রস-আস্বাদন করাই ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে,—তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লীলাপরিকরগণকে লীলারস আস্বাদন

করানও তাঁহার উদ্দেশ্য ; বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায় ; কারণ, তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তই তাঁহার প্রাণ, ভক্ত ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না ; সুতরাং ভক্তের সুখই তাঁহার প্রধান অভিপ্রেত। বিশেষতঃ হ্লাদিনীশক্তির ধর্ম্ম হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। হ্লাদিনী নিজকেও সুখ দেয়, অপরকেও সুখ দেয়—হ্লাদিনীর ধর্ম্মই এরূপ। শ্রীকৃষ্ণ "হ্লাদিনী দ্বারায় করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" হ্লাদিনী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও আনন্দ আস্বাদন করেন, ভক্তগণকেও আনন্দ আস্বাদন করান। আবার, পরিকর-ভক্তদের মধ্যে এই হ্লাদিনী প্রেমরূপে পরিণত হইয়া সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন এবং আশ্রয়-ভক্তকেও ভগবানের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করান। প্রেমের সহিত সেবাই আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের সর্ব্ববিধ মাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বার। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্বস্বপ্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে সমর্থ—এই আস্বাদনের উপায়ও প্রেমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা।

জীবের সাধ্য। তাহা হইলে দেখা গেল——শ্রীভগবানের লীলা-পরিকরত্ব লাভ করিয়া স্বাভীষ্ট লীলায় যদি ভগবানের লীলানুরূপ সেবা করা যায়, তাহা হইলেই ভগবানের আনন্দ-স্বরূপত্বের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে—তাহা হইলেই ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় এবং ভগবৎ-সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ জীব আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারে। কেবল সান্নিধ্য-দ্বারাও আনন্দাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু লীলা-পরিকরত্ব লাভ করিতে না পারিলে আনন্দের বৈচিত্রী-আস্বাদন—পরমানন্দের পরাবধি আস্বাদনের সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা আনন্দবৈচিত্র্যের আস্বাদন-লিপ্সু, পরিকরত্ব-লাভই তাঁহাদের কাম্য এবং পরিকররূপে ভগবানের সেবাই তাঁহাদের অভীষ্ট এবং ইহাতেই তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধি কৃষ্ণদাসত্বের পরিণতি বা পর্য্যবসান। কিন্তু পরিকররূপে সেবা পাইতে হইলে মুখ্য প্রয়োজন প্রেমের ; যেহেতু, প্রেমব্যতীত সেবা সম্ভব নহে। তাই প্রেম হইল জীবের মুখ্য সাধ্যবস্তু। এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য। আনন্দাস্বাদন জীবের স্বাভাবিক কাম্য হইলেও এবং যে কোনও ভগবৎস্বরূপের সান্নিধ্যে বা পরিকররূপে সেবা-দ্বারা সেই আনন্দাস্বাদন পাওয়া গেলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-জনিত আনন্দাস্বাদনের লোভই তাঁহাদের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক নহে ; সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছাই তাঁহাদের সেবার একমাত্র প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যই হইল কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা ; কারণ, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস ; শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রভু ; প্রভুর সেবাই দাসের কর্ত্তব্য এবং সেব্যের প্রীতিবিধানই সেবার একমাত্র তাৎপর্য্য। এই সেবায় আত্মসুখানুসন্ধানের স্থান নাই ; যদি কিছু আত্মসুখানুসন্ধান থাকে, তবে যতটুকু আত্মসুখানুসন্ধান থাকিবে, ততটুকু শ্রীকৃষ্ণসেবাই পণ্ড হইবে, ততটুকুই জীব-স্বরূপের কর্ত্তব্যের অবহেলা হইবে। কেবল ততটুকু কেন, কলসী পরিমিত দুগ্ধে বিন্দু পরিমাণ গোচনার ন্যায় সামান্য মাত্র স্বসুখবাসনাও সমস্ত-সেবাকে পণ্ড করিয়া দিতে পারে। তাই, স্বসুখবাসনা-গন্ধ-লেশ-শূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট বস্তু—ইহাই এই সম্প্রদায়ের সাধ্য বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে ব্রজে লীলা করিয়াছেন এবং কলিতে শচীনন্দনরূপে নবদ্বীপে লীলা করিয়াছেন। উভয় লীলাই তাঁহার স্বয়ংরূপের লীলা এবং উভয় লীলার সমবায়েই তাঁহার লীলার পূর্ণতা। তাই উভয় লীলার সেবাইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার পূর্ণ সার্থকতা। উভয় লীলার সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥" (নবদ্বীপলীলা-প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য।

জীবের সেবা আনুগত্যময়ী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাও চারিভাবে হইতে পারে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারিভাবের যে কোনও ভাবের আনুগত্যে জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারে। আনুগত্যে বলার হেতু এই যে—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস : আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার ; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় তাহার অধিকার নাই। তাই জীবের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হইবে আনুগত্য-

ময়ী—স্বীয়-অভীষ্ট-ভাবানুকূল পরিকরদের আনুগত্যে তদনুরূপ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইবে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

কোন্ ভাবে কাহার আনুগত্য। দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে যাঁহার লোভ জন্মিবে, দাস্যভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব লাভই হইবে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু। সখ্যভাবে লুব্ধ ভক্তের অভীষ্ট হইবে সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব, বাৎসল্য-ভাবে লুব্ধ ভক্তের অভীষ্ট হইবে নন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব এবং মধুর-ভাবে লুব্ধ ব্যক্তির অভীষ্ট হইবে শ্রীরাধিকাদি বা শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব লাভ করা।

চারিভাবের বিশেষত্ব। এই চারিভাবের মধ্যে দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধির আধিক্য, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি বিকাশেরও আধিক্য, সেবা-পরিপাটী-প্রকাশেরও আধিক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যত্বেরও আধিক্য। মধুরভাব অন্য-সমস্ত ভাব অপেক্ষা সেবা-মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ; মধুরভাব বা কান্তা-প্রেম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেবা পাওয়া যায়; "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।" এই মধুরভাবে আনন্দ-চমৎকারিতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক: সুতরাং মধুর-ভাবের সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মতে সাধ্য-শিরোমণি। (আদিলীলার ৪র্থ শ্লোকের টীকায় ১৪-১৭ পৃষ্ঠায় উন্নত এবং উজ্জ্বল শব্দদ্বয়ের অর্থ দ্রষ্টব্য)।

সাধন

ধাম, লীলা, পরিকর—মায়াতীত। জীবচিত্ত মায়ামলিন। ভগবৎ-সান্নিধ্য এবং তৎপরিকররূপে ভগবৎ-সেবালাভরূপ সাধ্য-বস্তুটী পাওয়ার উপায় কি? ভগবান্ মায়াতীত বস্তু; তাঁহার ধাম, লীলা, লীলা-পরিকর, সমস্তই মায়াতীত বস্তু। এ সমস্ত যে স্থানে আছে, সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার মায়ার নাই, মায়ার সংশ্রবযুক্ত বস্তুরও নাই। জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু হইলেও মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়িক দেহাদিকে অঙ্গীকার করিয়াছে। মায়ার সংশ্রবে তাহার চিত্তে ভুক্তি-বাসনাদি যে সমস্ত মলিনতার আবরণ পড়িয়াছে, তাহার ফলে জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে তাহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইবে না, সুতরাং স্বরূপানুবন্ধিনী-শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাও তাহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইবে না এবং সেবা-প্রাপ্তির অনুকূল অবস্থাও তাহার লাভ হইবে না।

ভগবানের করুণা। সাধন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়া ঈশ্বর-শক্তি, সুতরাং জীব তাঁহাকে অপসারিত করিতে সমর্থ নয়। যিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েন, ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহাকেই মায়ামুক্ত করিয়া দেন পরম-করুণ ভগবান্ সকলকেই সমানভাবে কৃপা করিতে—সকলকেই তিনি স্বচরণে শরণ দিতে উৎসুক; কারণ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।" কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত সেই কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার কৃপা বিতরিত হইতেছে। যোগ্যতা-অনুসারেই জীব-হৃদয় তাহা গ্রহণ করে। তাঁহার এই কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা-লাভের উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে; এই উপায় অবলম্বন করিলেই ভগবৎকৃপায় জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য এবং ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিতে পারে এবং ভগবৎ-সেবাদ্বারা কৃতার্থ হইতে পারে। ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিহিত উপায়ই হইল জীবের সাধন।

বিভিন্ন সাধনপন্থা। ভগবদুপলব্ধির অনুকূল যে সমস্ত সাধন শাস্ত্রে বিহিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কোনও সাধনেই যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব নহে। সকল অবস্থাতেই সাধক তাঁহার ভাবানুকূল উপলব্ধিই লাভ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা ৪।১১।"

জ্ঞানমার্গ। ভক্তির অপেক্ষা। জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের উপাসনা করেন; তিনি মনে করেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; তাঁহার সাধনও তদনুরূপ; ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তি তাঁহার কাম্য। ভক্তিশাস্ত্র বলেন—জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত মায়া অপসারিত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্ম অপসারিত করিতে পারেন না; তদনুরূপ করুণা-বিকাশও তাঁহাতে নাই। তাই, জ্ঞানমার্গের সাধককে ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের আরাধনা করিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে—তিনি যেন সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া মায়ার কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন; আর তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাধকের সাযুজ্য ঘটাইয়া দেন। এইরূপে শ্রীনারায়ণাদি কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনাতেই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; ইহা যিনি না করিবেন, তিনি সাযুজ্য পাইবেন না, তাঁহার চেষ্টা "স্থূলতুষাবঘাতীর" চেষ্টার ন্যায় কেবল বৃথা পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে। ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের অভিমত।

এস্থলে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা একটী পারিভাষিক শব্দ; নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকের সাধনকেই এই জ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ আছে—তৎ-পদার্থের জ্ঞান বা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, ত্বং-পদার্থের জ্ঞান বা জীব-স্বরূপের জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। পারিভাষিক জ্ঞান-শব্দে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-

জ্ঞানকে বুঝায়; ইহাতে সেব্য-সেবকত্বের ভাব নাই বলিয়া ইহা ভক্তিবিরোধী। সাধারণ অর্থে জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গ ভক্তিবিরোধী নহে। বস্তুতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান বলিতে—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান এবং উভয়ের সম্বন্ধের জ্ঞানকেই বুঝায়। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু ভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি। তাই ভক্তি এবং বিশুদ্ধ-জ্ঞানে বাস্তবিক পার্থক্য কিছু নাই।

সাযুজ্যে ব্রহ্মতাদাত্ম্য। ভগবৎ-কৃপায় যিনি সাযুজ্য লাভ করেন, তিনিও বস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না—এক হইতে পারেনও না; কারণ, এক হইয়া যাওয়ার অর্থ—নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলা। জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব নিত্য; মোক্ষলাভের পরেও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং সাযুজ্যমুক্তিতে জীব নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারায় না। অগ্নি-রাশিতে নিক্ষিপ্ত লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে; তদ্রূপ সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত লৌহ অগ্নির মধ্যে থাকিয়াও যেমন স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় পৃথক্ সত্ত্বা রক্ষা করে; ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত। জ্ঞানমার্গের প্রধান আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—এই নৃসিংহতাপনী ভাষ্যোক্তিও উক্ত মতেরই সমর্থন করে। যাহা হউক, ব্রহ্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে ব্রহ্মের কোনওরূপ সেবার অবকাশ নাই, সুতরাং ভগবৎ-সেবাজনিত আনন্দোপলব্ধিও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; তথাপি, স্বীয় স্বাভাবিকী আনন্দাস্বাদন-স্পৃহাবশতঃ ব্রহ্মতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিয়া আনন্দী হইতে পারেন। কিন্তু ইহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবের অভীষ্ট নহে; কারণ, ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎ সেবা নাই; বিশেষতঃ জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান ভক্তির প্রাণ সেব্য-সেবকত্ব ভাবের প্রতিকূল।

যোগমার্গ। যোগমার্গের সাধকের উপাস্য—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। সাধক পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ কামনা করেন। যোগমার্গেও ভক্তির আনুকূল্য অপরিহার্য্য। ভক্তির কৃপায়ই যোগমার্গের সাধক স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন; কিন্তু পরমাত্মার লীলা বা লীলাপরিকর নাই বলিয়া লীলাপরিকরের আনুগত্যে লীলাময় ভগবৎ স্বরূপের সেবা যোগমার্গের সাধকের পক্ষে অসম্ভব; তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত ইহাও কামনা করেন না।

ভক্তিমার্গ। লীলাময় ভগবানের সম্যক সেবা পাওয়া যায়—একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনে। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য। শ্রীভা ১১।১৪।২১।" শ্রুতিও বলেন "ভক্তিরস্য ভজনম্। গোঃ তাঃ। ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী। মাঠর শ্রুতি।"

অন্যান্য সাধনমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব দুইদিক দিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, ভগবদুপলব্ধি প্রাপকত্বের দিক্ দিয়া, দ্বিতীয়তঃ নিশ্চিততার দিক্ দিয়া। (অভিধেয় তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞান-যোগ মার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গেই ভগবদুপলব্ধির উৎকর্ষ; কারণ, ভগবান ভক্তিরই বশ, তাই তিনি ভক্তের নিকটেই আত্মদান করিয়া থাকেন; তাই ভক্তই তাঁহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবান জ্ঞান যোগাদির বশীভূত নহেন বলিয়া জ্ঞানী বা যোগী তাঁহার সম্যক উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন না।

ভক্তির অনন্যাপেক্ষত্ব। জ্ঞান-যোগাদি সাধনমার্গ ভক্তির অপেক্ষা রাখে; ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তাহারা স্ব-স্ব ফল দান করিতে পারেনা। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান। ২।২২।১৪" কিন্তু ভক্তি-রাণী কাহারও অপেক্ষা রাখেন না—তিনি স্বতন্ত্রা এবং প্রবলা। ভক্তি স্বীয় ফল তো দিতে পারেনই, অধিকন্তু ভক্ত ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে জ্ঞানযোগাদির ফলও অনায়াসে দিতে পারেন। (অভিধেয় তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তি সর্ব্বসাধন গরীয়সী। যাহা অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে শাস্ত্রে বিহিত, যাহা সার্ব্বত্রিক এবং সদাতন—সাধন-রাজ্যে তাহাই ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত পন্থা। জ্ঞান-যোগাদি ব্যতিরেক-মুখে বিহিত নহে, সার্ব্বত্রিক ও

সনাতনও নহে—অর্থাৎ জ্ঞান যোগাদি ব্যতীত যে ভগবদুপলব্ধি হইতে পারেনা, এমন কথা শাস্ত্র বলেন না; জ্ঞান-যোগাদির দেশকাল দশা পাত্রাদির বিচারও আছে। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধে অন্য কথা। শাস্ত্রে অন্বয় মুখে ও ব্যতিরেক মুখে ভক্তির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; ভক্তিমার্গে দেশ কাল পাত্রাদির বিচারও নাই! "সর্ব্বদেশ কাল পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার।" সুতরাং ভক্তিই নিশ্চিত সাধন পন্থা। সর্ব্ববিষয়েই ভক্তি সর্ব্ব সাধন গরীয়সী।

সাধনভক্তির তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল যে সাধন ভক্তি, তাহার লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ভ, র, সি ১।১।৯॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল ভাবে কায়মনোবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অনুশীলনই ভক্তি; ইহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণসেবার-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা না থাকে এবং ইহা যদি জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত না হয়—অর্থাৎ যদি এইরূপ অনুশীলনে মোক্ষ বাসনাদি না থাকে এইং ইহকালের বা পরকালের সুখ ভোগাদির বাসনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ আনুকূল্যময় অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে। গোপাল তাপনী শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন—ভক্তিরস্য ভজনম্, ইহা—মুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্ এতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্॥ পূঃ ১৫॥"

বৈধী ভক্তি। যাহা হউক, যাঁহারা ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ—যাঁহারা কেবল শাস্ত্র শাসনের ভয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হন। ভগবান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি জীবের পাপপুণ্যের ফলদাতা। আমি যদি ভজন না করি তাহা হইলে পরকালে হয়তো আমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়াও অনেক লোক ভজনে প্রবৃত্ত হন। ইহারাও যদি ভক্তি পথের অনুসরণ করেন তবে ইহাদের সাধন ভক্তিকে বলা হয় বৈধীভক্তি। শাস্ত্র শাসনের ভয়ই ইহার প্রবর্ত্তক। ইহাতে জীব-ঈশ্বরের সেব্য-সেবক সম্বন্ধের কথা সাধকের চিত্তে জাগরুক থাকিলেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে; কারণ, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভয়েই—ঐশ্বর্য্যাত্মক-শাসনের ভয়েই সাধকের ভজনে প্রবৃত্তি। সুতরাং বৈধীমার্গের ভজনে সিদ্ধ হইলে সাধক ভগবানের ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপের সেবাই প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা।" বিধিমার্গে—ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাওয়া যায় না—"বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।" কারণ, ব্রজভাব শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক, ইহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই।

রাগানুগা ভক্তি। দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা ইহকালের বা পরকালের কথা ভাবিয়া শাস্ত্র শাসনের তীব্রতার কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হন না—পরন্তু, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার সেবা-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। শাস্ত্র শাসনের ভয়—সুতরাং ভগবানের ঐশ্বর্য্য-ভীতি—এই ভজনের প্রবর্ত্তক নহে; পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ সেবার লোভ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের আকর্ষণ—এইরূপ ভজনের প্রবর্ত্তক। ইহাকে বলে রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা-ভক্তি-মার্গের সাধক শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব স্থান পায় না, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যই তাঁহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। সুতরাং শুদ্ধমাধুর্য্যময়-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই রাগানুগা ভক্তি সাধকের কাম্য।

বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বৈধী ও রাগানুগায় বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই—পার্থক্য কেবল সাধকের মনের ভাবে। বৈধী ভক্তির প্রবর্ত্তক শাস্ত্র শাসনের ভয়; আর রাগানুগার প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ সেবার লোভ। যেমন পাচকঠাকুরের রান্না এবং মা বা পত্নীর রান্না। উভয়ের অনুষ্ঠানই এক—রান্না। কিন্তু পাচক-ঠাকুর ভাল রান্না করে—চাকুরী বজায় রাখার জন্য; প্রভুর প্রীতি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ইহা বিধিমার্গের অনুরূপ। মা বা স্ত্রী ভাল রান্না করেন—সন্তান বা স্বামীর তৃপ্তির জন্য; ইহা তাঁহাদের চাকুরী নহে, প্রীতির কার্য্য। চাকুরী যাওয়ার ভয় তাঁদের নাই। ইহা রাগানুগার অনুরূপ। বিধিমার্গের সাধক একাদশী-ব্রত করেন—না করিলে নরকে গমন হইবে বলিয়া। রাগমার্গের সাধক একাদশী ব্রত করেন—করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হইবেন বলিয়া। উভয়েই একাদশী করিলেও তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে।

সাধন—বৈধী-ভক্তি

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গুরু-পদাশ্রয়াদি প্রথম দশটী অঙ্গ গ্রহণাত্মক; সেবা-নামাপরাধ-বর্জ্জনাদি দ্বিতীয় দশটী অঙ্গ বর্জ্জনাত্মক। এই বিশটী অঙ্গ ভক্তির দ্বারস্বরূপ—ভক্তিকে রক্ষা করিবার এবং ভক্তির অন্তরায়-সমূহকে দূরে রাখিবার উপায়-স্বরূপ। ইহার পরের চুয়াল্লিশ-অঙ্গই ভক্তির উন্মেষক সাধন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তিই উক্ত চুয়াল্লিশ অঙ্গের সার। চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন ভক্তির মধ্যে আবার—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবন—এই পাঁচটী অঙ্গের উৎকর্ষই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।" সর্ব্ববিধ সাধনভক্তির মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" এবং "নিরপরাধ নাম হৈতে পায় প্রেমধন" নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রভু আরও বলিয়াছেন—"নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥ সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম॥ কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে-মজ্জন॥ ৩।২০।৭-১১॥" নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আরও একটী সুবিধা এই যে, "খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ অন্ত্য ২০।"

নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে "এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥"

অন্যান্য অঙ্গের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়া এক অঙ্গের মাত্র সাধন এস্থলে অভিপ্রেত নহে; সকল অঙ্গের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনপূর্ব্বক রুচি-অনুসারে এক অঙ্গের অনুষ্ঠানাধিক্যই অভিপ্রেত।

বৈধীভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই প্রধানরূপে চিত্তে জাগরূক থাকে; সুতরাং বৈধী-ভক্তির সাধনে উন্মেষিত প্রেম মহিমাজ্ঞান-প্রধান; তাই সিদ্ধাবস্থায় বৈধীভক্তের ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে।

বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে কোনও ভাগ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান অন্তর্হিত হইতে পারে এবং শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লোভ জন্মিতেও পারে; এরূপ যখন হইবে, তখন হইতেই সাধকের ভক্তি রাগানুগায় পরিবর্ত্তিত হইবে।

সাধন—রাগানুগা ভক্তি

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি জনে। তার অনুগত ভক্তির "রাগানুগা" নামে॥ ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥ রাগময়ী ভক্তির হয় "রাগাত্মিকা" নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসি-ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥ 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে—সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ মধ্য ২২।

বাহ্য ও অন্তর সাধন। রাগানুগার সাধন দুই রকম—বাহ্য বা যথাবস্থিত দেহের সাধন এবং অন্তর বা মানসিক সাধন। যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির (অর্থাৎ চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন ভক্তির) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আর মনে মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই অন্তশ্চিন্তিতদেহে স্বীয় ভাবানুকূল পরিকরবর্গের আনুগত্যে সর্ব্বদা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চিন্তা করিবে; ইহাই মানসিকী সেবা বা অন্তর-সাধন।

ভাবানুকূল পরিকর বলার তাৎপর্য্য এই। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকর আছেন—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধক নিজের রুচি-অনুসারে যে কোনও এক ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা কামনা করিতে পারেন। যিনি দাস্যভাবের উপাসক, রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকরগণই তাঁহার ভাবানুকূল। এইরূপে নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য ভাবের অনুকূল পরিকর; অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। স্মরণ রাখিতে হইবে, উপাস্য-ভাব দীক্ষামন্ত্রের অনুকূল হওয়া দরকার॥

আর একটী কথা বিবেচ্য। নন্দ-যশোদাদি বা সুবলাদি; কি শ্রীরাধিকাদি ব্রজপরিকরগণ যে যে উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সেই উপায়ে শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার জীবের নাই। নন্দ-যশোদাদি-পরিকরবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহাদের সেবাও স্বাতন্ত্র্যময়ী; তাঁহাদের সেবাকে রাগাত্মিকা সেবা বলে। জীব কিন্তু স্বরূপ-শক্তি নহে, সুতরাং ঠিক স্বরূপ-শক্তির মতন সেবায় জীবের অধিকার নাই। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; আনুগত্যময়ী-সেবাতেই দাসের অধিকার; সুতরাং রাগাত্মিকভক্ত-নন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে, তাঁহাদের রাগাত্মিকা সেবার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাতেই জীবের অধিকার; এই রাগাত্মিকার অনুগতা সেবাকেই রাগানুগা-সেবা বলে।

সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহ সম্বন্ধেও একটী কথা বলা প্রয়োজন। জীবের যথাবস্থিত দেহ প্রাকৃত, জড়; এই দেহে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবানের সাক্ষাৎসেবা চলিতে পারে না, অথচ, সাক্ষাৎসেবাই ভক্তের প্রার্থনীয়। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে সাধক এমন একটী অপ্রাকৃতদেহ পাইতে ইচ্ছা করেন, যাহা তাঁহার অভীষ্ট-সেবার উপযোগী হইবে। এই দেহটীকেই সিদ্ধদেহ বলে। শ্রীগুরুদেব এইরূপ একটী দেহের পরিচয় দিয়া দেন। সাধক এই গুরু-নির্দ্দিষ্ট দেহ অন্তরে চিন্তা করিয়া তদ্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভাবানুকূল সেবা করেন বলিয়াই ঐ দেহটীকে অন্তশ্চিন্তিত-দেহও বলে। রাগানুগা-মার্গে মধুরভাবের উপাসকগণের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ—গোপ-কিশোরীদেহ; এই দেহে সাধকের রাধা-দাসী-অভিমান। শ্রীরাধার দাসীগণকে মঞ্জরী বলে; শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ-মঞ্জরীও আছেন, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির বিলাস; তাঁহাদের প্রধানার নাম শ্রীরূপ-মঞ্জরী। সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীয়-লীলায় শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে গুরুরূপা-মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইঙ্গিতে তিনি যেন সর্ব্বদা যুগলকিশোরের সেবা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তাই মানসিকী সেবা; রাগানুগাভক্তির সাধনে ইহাই মুখ্য ভজনাঙ্গ। "সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা।" "মনের স্মরণ প্রাণ।" (বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের লীলা করিয়া থাকেন। স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রানুসারে সাধক যে ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবের শ্রেষ্ঠ-পরিকরের আনুগত্যে তিনি স্বীয় সিদ্ধদেহে সেই ভাবের অষ্টকালীন লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা করিয়া থাকেন। মধুর-ভাবের অষ্টকালীন লীলার উল্লেখ পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের ৫২শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপগোস্বামীও অল্প কয়েকটী শ্লোকে সূত্রাকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার "গোবিন্দলীলামৃতে" এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে" উক্ত লীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন।

গত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়। সেই কলিতেও তিনি রাগানুগা-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন; তাই বোধ হয়, পদ্মপুরাণে অষ্টকালীন লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই কলির উপদেশাদি ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই পরম-কৃপালু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বর্ত্তমান্ কলিতে আবার অবতীর্ণ হইয়া রাগানুগাভক্তি প্রচার করিয়া জীবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। একথাই শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ পূর্ব্ব-প্রচারিত রাগানুভক্তির অবশেষ দাক্ষিণাত্যে শ্রীল রামানন্দরায়-প্রমুখ দু'চারজন ভক্তের মধ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতেই সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের উক্তি প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বপ্রচারিত রাগানুগাভক্তির অন্তর্নিহিত নীতি যে অন্য সাধক-সম্প্রদায়ের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন দক্ষিণমথুরা হইতে কামকোষ্ঠিতে আসিয়াছিলেন, তখন এক রামভক্ত বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া—"কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে। ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥ মহাপ্রভু কহে তাঁরে—শুন মহাশয়। মধ্যাহ্ন হইল, কেনে পাক নাহি হয়॥ বিপ্র কহে—প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥ তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা। আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা। ২।৯।১৬৫-৬৯॥" বিপ্র শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী-লীলার স্মরণ করিতেছিলেন, ইহাই উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল। এইরূপ লীলা-স্মরণ রাগানুগা সাধন-ভক্তিরই অনুরূপ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা এবং বৃন্দাবন-লীলা—এই উভয় লীলার সেবাই গোড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য। সুতরাং বাহ্যপূজাদিতে নবদ্বীপে সপরিকর পঞ্চতত্ত্বের পূজাদি করিয়া ব্রজে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করা কর্ত্তব্য এবং মানসিকী সেবাতেও নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা স্মরণের পরে বৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাস্মরণই বিধেয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় নবদ্বীপ-লীলায় আবেশ জন্মিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইতে পারে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে।"

অপরাধ

বৈধী কি রাগানুগা উভয় ভক্তিমার্গের সাধককেই অপরাধ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ আমরা পাপ ও অপরাধকে একার্থক বলিয়া মনে করি। কিন্তু বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে এই দুইটী শব্দের বাচ্যে পার্থক্য আছে। নামাভাসেও পাপ দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু অপরাধের কুফল সহজে নিরাকৃত হয় না।

নামাপরাধ। কতকগুলি বিশেষ রকমের অসদাচারকেই অপরাধ বলে। অপরাধ সাধারণত দুই শ্রেণীর—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। যথাবস্থিত-দেহে শ্রীভগবৎ-সেবা-বিষয়ে কতকগুলি নিষিদ্ধাচারের অনুষ্ঠানে সেবাপরাধ হয়; সেবাপরাধ অনেক রকমের। একান্তচিত্তে ভগবৎসেবাদ্বারাই সেবাপরাধের কুফল দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু নামাপরাধ বড় গুরুতর। নামাপরাধ দশ রকমের:—সাধু-নিন্দাদি; (২) শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদি হইতে শ্রীশিবের গুণ-নামাদিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করা; (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা; (৪) শাস্ত্রনিন্দা; (৫) হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা; (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি; (৭) শ্রীনামের ফলের সঙ্গে ব্রত-হোমাদির ফলের তুল্যতা জ্ঞান করা; (৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনবধানতা বা চেষ্টাশূন্যতা; (৯) নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া "আমি-আমার"-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতে প্রাধান্য দেওয়া এবং (১০) যে শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে উপদেশাদি শুনেনা অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া। বিশেষ বিবরণ ২।২২।৬৩-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাপরাধ। কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদরবশতঃ বৈষ্ণবের অভিনন্দনাদি না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই কয়টীকে বৈষ্ণবাপরাধ বলে; বৈষ্ণবাপরাধও প্রথম প্রকারের নামাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত।

নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ বড় ভয়ানক জিনিস। অপরাধী ব্যক্তির সমস্ত অনুষ্ঠানই প্রায় নিরর্থক হইয়া যায়। হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইতে পারে; কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি বহু বহু নামকীর্ত্তন করিলেও তাহার দেহে প্রেমের লক্ষণ বিকাশ পায় না।

খণ্ডনোপায়। নামাপরাধ-খণ্ডনের উপায়:—বৈষ্ণব-নিন্দাদিজনিত অপরাধ হইলে, যাঁহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, সেবাদি দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি-বিধান করিতে হইবে; তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ দূর হইতে পারে। আর, কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না যায়, অথবা জানা গেলেও কোনও প্রকারেই যদি তাঁহার সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তৃণাদপি-শ্লোকে উপদিষ্ট-বিধান-অনুসারে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; হরিনাম করিতে করিতে নামের কৃপায় অপরাধ খণ্ডিত হইতে পারে। গুরুদেবের অবজ্ঞাদি-জনিত অপরাধ-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। শাস্ত্রাদির নিন্দাজনিত অপরাধস্থলে তত্তৎশাস্ত্রাদির প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অন্যান্য অপরাধস্থলে, নূতন অপরাধের হেতু হইতে দূরে থাকিয়া একান্তভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

নামাপরাধ বড় সাংঘাতিক। ভক্তিরাণী যাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অপরাধ জন্মিলে তৎক্ষণাৎই তিনি তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। সুতরাং অপরাধ-বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকাই ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ।

সাধন-ভক্তির প্রাণ

কৃষ্ণস্মৃতি। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে বিধি ও নিষেধ অনেক আছে। কিন্তু সমস্ত বিধির সার-বিধি একটী—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি; আর সমস্ত নিষেধের সার-নিষেধও একটি—শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫॥" অন্যান্য সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী-সার বিধিরই কিঙ্করতুল্য—তাহাদের অনুপূরক ও পরিপূরক মাত্র। যত কিছু ভজনাঙ্গ বিহিত হইয়াছে, সমস্তের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির স্ফুরণ ও রক্ষণ। আর যত কিছু নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যও শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূরে সরাইয়া রাখা—সুতরাং প্রকারান্তরে—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখা। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল মূল্য লক্ষ্য—এ কথা স্মরণ রাখিয়াই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রত্যেক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে হইবে। ইহাই ভজনের মূল-রহস্য। মালা গাঁথিতে হইলে যেমন প্রত্যেকটী মালার ভিতর দিয়াই একই সূত্রকে চালাইয়া নিতে হয়, একই সূত্রদ্বারা বিভিন্ন মালা সংবদ্ধ হইয়াই যেমন ব্যবহারোপযোগী মালায় পরিণত হয়—তদ্রূপ, বিভিন্ন ভজনাঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে। সূত্রহীন মালা যেমন ব্যবহারের উপযোগী হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিহীন ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানও অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই ভজনের প্রাণ, সাধন-ভক্তির প্রাণ।

কৃষ্ণস্মৃতির বৈচিত্রী। এস্থলে সাধারণ ভাবেই—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির কথা বলা হইল। প্রত্যেক সাধকের শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই তাঁহার ভাবের বা অভীষ্ট-সেবার অনুকূল হওয়া দরকার। কারণ, "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্কমাত্র সে বিচার॥ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা॥" সুতরাং সাধকের ভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে। যিনি মধুর ভাবের সাধক, ভজনকালে তিনি মনে করিবেন—ব্রজে শ্রীশ্রীযুগল-কিশোর সখীমঞ্জরীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন (অথবা অন্য কোনও অবস্থায় লীলায় বিলসিত আছেন), আর সাধক স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সেই স্থানে গুরুরূপা-মঞ্জরীগণের ইঙ্গিতে সাক্ষাদ্‌ভাবে যুগল-কিশোরের সেবার আনুকূল্য করিতেছেন। ভাগ্যবান্ ভক্তগণ এইভাবে অষ্টকালীন-লীলারই স্মরণ করিয়া থাকেন। এইরূপই মধুর-ভাবের সাধকের অন্তরঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। অন্যান্য ভাবের সাধকদের স্মৃতিও এইরূপ—সকলেই স্মরণ করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধদেহে নবদ্বীপে সপরিকর গৌরসুন্দরের এবং ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভীষ্ট-সেবা করিতেছেন। এইরূপ সাক্ষাৎসেবার প্রবৃত্তিকেই শ্রীজীব-গোস্বামী ভজন-নৈপুণ্য বা আসঙ্গ বলিয়াছেন। এই নৈপুণ্যহীন (সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তিহীন) ভজনকে তিনি অনাসঙ্গ-সাধন বলিয়াছেন। অনাসঙ্গ-সাধনে—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥"

অনাসঙ্গ ভজন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন—হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ; এই সুদুর্ল্লভত্ব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ—কিছুতেই পাওয়া যায় না, একেবারে অলভ্যা; দ্বিতীয়তঃ—পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নয়। এই দুই রকম সুদুর্ল্লভা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে"—সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা। পূঃ ১।২২॥—অনাসঙ্গ (সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তিহীন) শত সহস্র সাধন দ্বারাও একেবারে অলভ্যা; আর শ্রীহরিকর্ত্তৃক সহসা অদেয়া—এই দুই রকম সুদুর্ল্লভা ভক্তি।"

সাসঙ্গ ভজন। সাসঙ্গ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিময়) ভজনে হরিভক্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥"

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন—“ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ঃ ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥ ৫।৩৪॥—জপ-হোমাদি-কর্ত্তার জপ-হোমাদি সমস্ত ক্রিয়াঃ বিধানানুসারে আচরিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।” ভূতশুদ্ধির প্রকার সম্বন্ধে নানা সম্প্রদায়ে নানা মত প্রচলিত আছে; শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ সন্দর্ভে বলিয়াছেন—পার্ষদ-দেহ-চিন্তনই ভক্তের প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। সুতরাং সাধক নিজ নিজ ভাবানুকূল পার্ষদদেহে (বা সিদ্ধদেহে) চিন্তা করিয়া ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইলেও নিষ্ফল হইবে – তদ্দ্বারা হরিভক্তি লাভ হইবে না। পার্ষদদেহে চিন্তা করিতে গেলেই উপাস্যের সাক্ষাতে উপস্থিতি চিন্তা করিয়া তদীয়-সেবা চিন্তা করিতে হয়; সুতরাং ইহাতেই সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তি সূচিত হয় এবং এইরূপ ভজনই সাসঙ্গ-ভজন। হরিভক্তি-লাভের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

সাধকের ভক্তি-বিকাশের ক্রম

শ্রদ্ধা। স্বরূপগতভাবে জীবমাত্রেরই ভগবদ্‌ভজনে অধিকার থাকিলেও ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনার দিক দিয়া বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী। মধ্য, ২২॥" যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী, তাঁহার অনুষ্ঠানই ফলপ্রদ হইতে পারে। শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে; "শ্রদ্ধা-শব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়। মধ্য ২২॥ এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, ভক্তির অনুষ্ঠানেও তাঁহার অধিকার নাই, অর্থাৎ তাঁহার অনুষ্ঠান ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নাই।

হৃদয়ে শ্রদ্ধার উন্মেষের নিমিত্ত চেষ্টার উপদেশও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি। শ্রীভা, ৩৷২৫৷২৫॥ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-বিষয়ে অভিজ্ঞ সদ্-ভক্তদের সঙ্গ করিলে তাঁহাদের মুখে হৃৎকর্ণরসায়ন হরিগুণকীর্ত্তন শ্রবণের প্রভাবে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়।"

এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে কিরূপে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে :— "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ভ, র, সি, ১৷৪৷১১॥" উক্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—"কোনো ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥ অনর্থ-নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥ রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥ সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম॥ মধ্য ২৩॥"

সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের ভগবৎ-কথাদিতে বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তখন সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। সাধুদিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভজন করিয়াও থাকে। এইরূপে ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনাদি (অনর্থ) দূরীভূত হয়। দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ পায়;) এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই আসক্তি গাঢ় হইলেই শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে; অর্থাৎ চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া গেলে চিত্ত যখন শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং তাহাই কৃষ্ণরতি-রূপে পরিণতি লাভ করে। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্তির মুখ্য হেতু।

অনর্থ। যত রকম অনর্থ আছে, সাধনের প্রভাবে সমস্ত দূরীভূত হয়। অনর্থ—যাহা অর্থ (অর্থাৎ পরমার্থ) নহে, তাহাই অনর্থ; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি-দুর্ব্বাসনা; কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর মতে অনর্থ চারিপ্রকারের :—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, ভক্তি-জাত। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলে। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতজাত অনর্থ। নামাপরাধ-সমূহই (সেবাপরাধ নহে) অপরাধজাত অনর্থ। আর ভক্তির সহায়তায় (অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানকে

উপলক্ষ্য করিয়া) ধনাদি-লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা-প্রভৃতি প্রাপ্তির আশাই ভক্তিজাত অনর্থ; ভক্তিরূপ মূল-শাখাতে ইহা উপশাখার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল-শাখা (ভক্তিকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়।

অনর্থ নিবৃত্তি। উক্ত চতুর্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ রকমের—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। বহুপরিমাণে আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে বহুদেশ-বর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। যখন প্রায় সমস্ত অনর্থেরই নিবৃত্তি হইয়াছে, অল্পমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে প্রায়িকী নিবৃত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকিলেও আবার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের তৃতীয় লহরীর ২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি-ভক্তের রতিও লুপ্ত হয়, অথবা হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ় আসক্তি জন্মিলে রতি ক্রমশঃ রত্যাভাসে, অথবা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায়, জাতরতি-ভক্তেরও বৈষ্ণবাপরাধাদির সম্ভাবনা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃত্তিতে পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে।

অপরাধজাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি—ভজন-ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-লাভে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। দুষ্কৃতজাত অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং আসক্তির পর আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

রতি। বলা হইয়াছে, ভজনাঙ্গে আসক্তির পরে রতির উদয় হয়; রতির অপর নাম ভাব বা প্রেমাঙ্কুর; ইহা প্রেমরূপ সূর্য্যের রশ্মিস্থানীয় এবং স্বরূপ-লক্ষণে ইহা হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। চিত্তে রতির আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা জন্মে। জাতরতি ভক্তের শ্রীভগবানে মমতাবুদ্ধি জন্মে—অথাৎ "ভগবান আমারই" এই জ্ঞানটুকু জন্মে; এবং ভগবানে তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধিও তিরোহিত হয়।

জাতরতির লক্ষণ। জাতরতি ভক্তের মধ্যে প্রধানত: এই নয়টী লক্ষণ প্রকাশ পায়:—(১) **ক্ষান্তি**—সাংসারিক আপদ-বিপদে সাধারণ লোকের চিত্তে দুঃখ, বিষণ্ণতা বা ক্ষোভ জন্মে, জাতরতি ভক্তের তদ্রূপ কোনও ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হন না। (২) অব্যর্থ-কালত্ব—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা ভজন-সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কাজে তিনি এক মুহূর্ত্ত সময়ও ব্যয় করেন না; অন্য কাজে সময় ব্যয় করাকে তিনি সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। (৩) বিরক্তি—ইহকালের বা পরকালের কোনও ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার কোনওরূপ বাসনা থাকে না। "ভুক্তি-সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।" (৪) মানশূন্যতা—ভক্তিবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি নিজেকে নিতান্ত অধম, নিতান্ত ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন। (৫) আশাবন্ধতা—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন, তাঁহার চিত্তে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। (৬) সমুৎকণ্ঠা—অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা বা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদি পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মে। (৭) নাম-গানে সদা রুচি—সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনে আনন্দ পান। (৮) ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি—শ্রীকৃষ্ণগুণাদি-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আনন্দ পান এবং কৃষ্ণ-গুণাদি-কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। (৯) শ্রীবৃন্দাবনাদি ভগবল্লীলা-স্থানে অত্যন্ত প্রীতি জন্মে।

প্রেম। দুগ্ধ যেমন গাঢ় হইলে ক্ষীর হয়, তদ্রূপ রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। প্রেমোদয়ে চিত্ত অত্যন্ত মসৃণ হয়, শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা বুদ্ধি জন্মে; ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও প্রেম ধ্বংস হয় না। শ্রীমন্-মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়। তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ মধ্য ২৩॥" তাঁহার কোনওরূপ বাহ্যাপেক্ষাই থাকে না, ভগবানের নামগুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় তিনি কখনও

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও বিলাপ করেন, কখনও গান করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি করেন।

সাধকের যথাবস্থিত-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইতে পারে। জাতপ্রেম ভক্তের দেহ-ভঙ্গের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থলে তাঁহার জন্ম হয় এবং ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার উপযোগী করিয়া থাকে। তখন তিনি অভীষ্ট সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

———

সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা

সাধু বা মহত্তের লক্ষণ। সাধন-প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত হওয়ায় যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই সাধু বা মহৎ বলা যায়। যাঁহাদের চিত্ত এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছে, বাহিরে তাঁহাদের যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে। "মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ শ্রীভা ৫।৫।২-৩॥" মহদ্-ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সরল-চিত্ত (কুটিলতা-বর্জ্জিত), প্রশান্ত এবং ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত, ক্রোধহীন, সকলেরই সুহৃৎ ; তাঁহারা সাধু, কখনও পরের দোষ গ্রহণ করেন না ; ভগবৎ প্রীতিকেই তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে তাঁহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন ; ভোজন-পানাদিতে বা স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতে আসক্তির কথা ত দূরে – ভোজন-পানাদিতে আসক্ত ব্যক্তি-সমূহের প্রতি—তাহাদের জীবিকা বা কথাদিতে যাহারা প্রীতি লাভ করে, তাহাদের প্রতিও – মহদ্ব্যক্তিদের প্রীতি নাই। স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত গৃহাদিতে অবস্থান করিলেও স্ত্রী-পুত্রাদি বা গৃহ-বিত্তাদিতে তাঁহারা প্রীতিযুক্ত নহেন। যে পরিমাণ ধনাদি দ্বারা ভগবৎ-সেবাত্মিকা ভক্তির অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদতিরিক্ত বিত্তাদি তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা নির্লোভ, দেহ-দৈহিক বস্তুতে তাঁহাদের কোনওরূপ আসক্তি নাই।

এইরূপ মহদ্-ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন - ইঁহারাই আমার হৃদয়, আমিও ইঁহাদের হৃদয়, তাঁহারাও আমা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানিনা (শ্রীভা, ৯।৪।৬৮)। এ সমস্ত মহাত্মারা গৃহে থাকিলেও নিষ্কিঞ্চন ; নিষ্কিঞ্চনের পোষাক ধারণ করিলেই কেহ বাস্তবিক নিষ্কিঞ্চন হয় না। যিনি একমাত্র ভক্তি-বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া দেহ দৈহিক বস্তুতে সম্যকরূপে আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই নিষ্কিঞ্চন।

সাধু মায়াতীত। মহৎ কৃপা ও ভক্তি। মহদ্ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত ; মায়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে পারে না ; কারণ, তাঁহাদের চিত্ত চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়-চিত্ত মহদ্ ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহার চিত্ত হইতেও বিষয়-বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাঁহার চিত্তেই ভক্তির উদ্রেক হয় – কৃপা-শক্তির সহযোগে তাঁহাদের চিত্ত হইতে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভক্তি তাঁহার চিত্তে প্রবাহিত হইয়া যায়। বাস্তবিক, ভক্তির উন্মেষের পক্ষে সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা অপরিহার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" মহৎকৃপাব্যতীত কৃষ্ণভক্তি জন্মিতে পারে না। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুব ঐকান্তিকভাবে "পদ্মপলাশ-লোচনকে" ডাকিতেছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা পদ্মপলাশ-লোচনের মনেও স্পন্দন জাগাইয়াছিল। ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু ধ্রুব তখনও দর্শন লাভের যোগ্যতা লাভ করেন নাই ; যেহেতু, তাঁহার চিত্তে ছিল বিষয়-বাসনা। পদ্ম-পলাশ-লোচন নারায়ণ নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নারদকে ধ্রুবের নিকট পাঠাইলেন। নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনা দূর হইল ; তখন তিনি শ্রীনারায়ণের দর্শন পাইলেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া গিয়াছিল। তাই শ্রীনারায়ণ যখন তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন ধ্রুব বলিলেন—"প্রভু, কাঁচের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি দিব্য রত্ন পাইয়াছি। বর আর চাইনা ; তোমার চরণসেবাই চাই।

কর্ম্মকারেরা কয়লার আগুনে কাজ করে। একটী পাত্রে কতকগুলি কাঠ-কয়লা রাখিয়া তাহার মধ্যে একটী জ্বলন্ত কয়লা দিয়া ফু দিতে থাকে; ফু দিতে দিতে জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শে কালো কয়লাগুলিও জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটী জ্বলন্ত কয়লা না দিয়া কেবল কালো কয়লার উপরে সমস্ত দিন ভরিয়া ফু দিলেও কয়লা জ্বলিবে না। সাধকের জীবনে মহতের কৃপা হইতেছে জ্বলন্ত কয়লার তুল্য, আর সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে—ফু দেওয়া। বাসনা-মলিন চিত্তই কালো কয়লা। মহৎ-কৃপারূপ জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শ ব্যতীত কেবল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বাসনামলিন চিত্তরূপ কালো কয়লা জ্বলিবেনা—চিত্তের মলিনতা দূর হইবে না। শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণরূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, মহতের লক্ষণও তাহাই। শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণযুক্ত গুরুকৃপাও মহৎ-কৃপাই।

ভক্ত-পদরজঃ, ভক্ত-পদোদক এবং ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—ভক্তিশাস্ত্রে এই তিনটী বস্তুর বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিনমহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ অন্ত্য, ১৬শ॥

সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত। এখন দেখিতে হইবে, কৃষ্ণ-ভক্ত কাহাকে বলে। যাঁহাদের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণ-ভক্তা ইতীরিতাঃ॥" ভ, র, সি, ২।১।১৪২॥ কৃষ্ণভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহারা জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই, এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক-ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বিল্বমঙ্গল-তুল্য সাধক-সকলই সাধক-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। "উৎপন্ন-রতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৪॥ বিল্বমঙ্গল-তুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৫॥" যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিল-ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৬।" ভগবান্ ভক্তের বশীভূত; তাই ভগবৎ-কৃপাও ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ। এজন্যই ভক্তিবিষয়ে ভক্তকৃপার অপরিহার্য্যতা।

———

গুরুতত্ত্ব

গুরুতত্ত্ব। গুরু দুই রকমের, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকটে উপাস্যদেবের মূল-মন্ত্র পাওয়া যায়, তিনি দীক্ষাগুরু। আর যাঁহার নিকটে ভজন-বিষয়ে কিছু শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥" শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত; কিন্তু সাধক তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াই মনে করিবেন।

স্বরূপতঃ প্রিয়তম ভক্ত। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মন॥ —রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্মরণ কর।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—"মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্—মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই লোকের গুরু।" শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদও গুর্ব্বষ্টকে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥—সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেব সাক্ষাৎ হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সৎ-লোকগণ ঐরূপ ভাবনা করিলেও, তিনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই। আমি সেই গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।"

গুরু কৃষ্ণবৎ পূজ্য। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও "কৃষ্ণ গুরুরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে," "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি বচনে গুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্যই বলা হইয়াছে; এস্থলে প্রিয়তমত্বাংশে এবং পূজ্যত্বাংশেই তুল্যত্ব অভিপ্রেত—স্বরূপাংশে বা তত্ত্বাংশে তুল্যত্ব অভিপ্রেত নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতিত্বে" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্বপ্রতিপাদকমিতি।" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে—শ্রীশিব ও শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন করেন।"

গুরু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ-জীব বলিয়া মনে করাতো দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে; কারণ, তাহাতে গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে; গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই, হউন, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই; কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির সহিত ও গুরুশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীভগবানের গুরু-শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টি-গুরু; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন না—তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ঐ গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভজনার্থীকে কৃপা করেন। তাই বলা হইয়াছে "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-শক্তি আবির্ভূতা হয় বলিয়া শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। অন্য ভক্তের যোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহা-শক্তি আবির্ভূতা হইয়া ভজনার্থীকে কৃতার্থ করিতে পারেন সত্য; কিন্তু গুরু-শক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অন্য ভক্তের কৃপা সম্যক্‌রূপে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগ্রহা-শক্তি ও গুরু-শক্তি উভয়েই শিষ্যের সম্বন্ধে আবির্ভূত হয়েন; ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব ভগবানের অমূর্ত্ত করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতা অমূর্ত্ত-গুরু-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, গুরু শক্তির আবির্ভাব মূর্ত্তি,—সুতরাং

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। যে বস্তুটীর আশ্রয় শ্রীভগবান্, কিন্তু তিনি মূল আশ্রয় বা মূল অধিকারী হইয়াও সাধারণতঃ সাক্ষাদ্‌ভাবে যাহা কাহাকেও দান করেন না, তাঁহার প্রিয়তম-ভক্তের দ্বারাই যাহা দান করান—একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বস্তুটী পাইতে পারে; সুতরাং শিষ্যের নিকটে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণতুল্যই। শ্রীভগবান্ ভক্তপরাধীন বলিয়া এবং শ্রীভগবৎকৃপা ভক্ত-কৃপার অপেক্ষা রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয় বস্তুটী তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়া থাকেন। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ·২৬।২৭ পয়ারের টীকায় বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।

গুরুর যোগ্যতা। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ততা। বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি-বিশেষ শ্রীগুরুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃপা করেন; সুতরাং যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আবির্ভাবের যোগ্য, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ কোনও ভক্তই দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্য; তাঁহার শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই ভগবদাবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে এবং ভগবদাবির্ভাব হইলেই তাঁহার পক্ষে ভগবানের অনুভূতি লাভ সম্ভব হইতে পারে। শ্রুতি এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদনুভূতিই গুরুর প্রধান লক্ষণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; অবশ্য শিষ্যের সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার থাকা দরকার—তিনি শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রজ্ঞ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (ভগবদনুভূতি-সম্পন্ন) হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও বরং চলিতে পারে; কিন্তু ভগবদনুভূতি-সম্পন্ন না হইলে কিছুতেই চলে না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" বস্তুতঃ, যাঁহার নিজের অনুভব নাই, তিনি কিরূপে অপরের অনুভব জন্মাইবেন? কেবল মন্ত্রটী জানিবার নিমিত্তই গুরুর প্রয়োজন নয়; মন্ত্র গ্রন্থেও পাওয়া যায়। অনুগ্রহ-শক্তির এবং গুরুশক্তির কৃপার নিমিত্তই গুরুর প্রয়োজন; যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই দুইটী শক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয় নাই—তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও ভজন-বিষয়ে সাধকের বিশেষ কিছু আনুকূল্যের সম্ভাবনা থাকে না।

শিক্ষাগুরু। এই গেল দীক্ষাগুরুর কথা। শিক্ষাগুরু দুই রকমের—অন্তর্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ পরমাত্মা-রূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে হিতাহিত উপদেশ করিতেছেন; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, তিনি সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কিছু বলেন না, ইঙ্গিতে হৃদয়ে জানান মাত্র। মহান্তরূপী শিক্ষাগুরু সাক্ষাদ্‌ভাবে উপদেশাদিদ্বারা জীবকে কৃতার্থ করেন। যাঁহার নিকটে ভজন-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাওয়া যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একাধিক হইতে পারেন না। কিন্তু মহান্তরূপী শিক্ষাগুরুর কোনওরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ গুরু-আজ্ঞা পালনীয় নহে। গুরুর আদেশ যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা পালন করিবার বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—যে গুরু অন্যায় কথা বলেন, আর যে শিষ্য তাহা পালন করেন, তাঁহাদের উভয়কে অনন্ত কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিতে হয়। "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ২৩৮॥" (২।১০।১৪১ পয়ারের এবং ২।১০।১৪-শ্লোকের টীকায় বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ বামনরূপে যখন বলি-মহারাজের নিকট উপনীত হইলেন, বলি-মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বামনদেবের আদেশ মত কোনওরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে বলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলি সেই নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া বামনদেবের আদেশ-পালন করিয়াছেন এবং তাহাতেই ভগবৎকৃপা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

কোন্ গুরু পরিত্যাজ্য। গুরু যদি অবলিপ্ত হন, ভালমন্দ না জানেন এবং উৎপথগামী হন, তাহা হইলে সেই গুরু-পরিত্যাগের বিধিই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামী দিয়া গিয়াছেন। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ২৩৮॥" এইরূপ অবৈষ্ণবোচিত লক্ষণযুক্ত গুরুর পরিত্যাগে কোনও অপরাধ হয় না—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত।

প্রকট ও অপ্রকট লীলা

প্রকট ও অপ্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলা দুই রকমের। যে লীলা কখনও লোক-নয়নের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে বলে অপ্রকট-লীলা। আর যে লীলা শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া সময় সময় লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন, তাহাকে বলে প্রকট লীলা। প্রত্যেক লীলার ও প্রত্যেক ধামেরই—প্রকট ও অপ্রকট – এই দুই রকম প্রকাশ আছে। লীলা-প্রাকট্য-সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, ব্রহ্মার এক দিনে বা এক কল্পে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে একবার লীলা প্রকট করেন। এইরূপে গত দ্বাপরের শেষে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ একবার তাঁহার ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন।

প্রাকট্যের নিয়ম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা নরলীলা। মানুষের মধ্যে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্ম আগে হয়। নরলীলায়—শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতারূপে যাঁহাদের অভিমান, তাঁহাদের প্রাকট্যও শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যের পূর্ব্বে হওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণ—

> "প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
> আদৌ প্রকট করায় মাতাপিতা ভক্তগণে।
> পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে॥"—মধ্য ২০ ।"

প্রকট ব্রজলীলা

উদ্দেশ্য। ব্রজ-লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন এবং তদ্দ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার।

কিন্তু যে রকম ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মে, জগতে সেইরকম ভক্ত কেহ ছিলেন না, কোনও সময়ে থাকিতেও পারেন না। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল ; ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে প্রেম শিথিল হইয়া যায় ; এইরূপ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদিগকে সঙ্গে করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাদেরই প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করিলেন।

অপ্রকট দুর্ল্লভ রসাস্বাদন। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি স্বীয় নিত্যপরিকরদের প্রেমরসই আস্বাদন করিতে হইল, তবে আর লীলা প্রকটনের প্রয়োজনই বা কি ছিল? অপ্রকট লীলাতেই তো তাঁহাদের প্রেমরস তিনি আস্বাদন করিতেছিলেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্তই করিবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, স্বীয় নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় যে সকল রস বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন, অপ্রকট লীলায় সে সকল রস বৈচিত্রীর সম্ভাবনা ছিলনা ও থাকিতে পারে না। অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই নিত্যকিশোর। কিশোর পুত্রের সংস্রবে যতটুকু বাৎসল্য প্রকটিত হইতে পারে, অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দযশোদা ততটুকুমাত্র বাৎসল্যই আস্বাদন করিতে পারেন। পুত্রের বাল্য ও পৌগণ্ডকালে যেরূপ বাৎসল্যের প্রয়োজন হয়, অপ্রকট লীলায় গোকুলে সেরূপ বাৎসল্য স্ফুরণের অবকাশ নাই। প্রকট লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সদ্যোজাত শিশুরূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং ক্রমশঃ কৈশোরে উপনীত হয়েন ; সুতরাং বাৎসল্যের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, প্রকটে তৎসমস্তই আস্বাদিত হইতে পারে। জন্মলীলা প্রকটনবশতঃ দাস্য সখ্য রসেরও অপূর্ব্ব বৈচিত্রী প্রকটলীলায় স্ফুরিত হইয়া থাকে—যাহা অপ্রকটে অসম্ভব।

স্বকীয়া ও পরকীয়া। প্রকট লীলায় সকল রস অপেক্ষা কান্তারসেই অপূর্ব্ব বৈচিত্রী স্ফুরিত হইয়াছে। কান্তা দুই রকমের—স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পতি পত্নীর মধ্যে যে ভাব, তাহার নাম স্বকীয়া কান্তাভাব। আর যাহারা বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এরূপ যুবক যুবতীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে পরকীয়া কান্তাভাব বলে। গোকুলে বা অপ্রকট ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির স্বকীয়া ভাব। এই অনাদি লীলায় বিবাহের অবকাশ নাই ; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের অভিমান—তিনি শ্রীরাধিকাদির পতি এবং শ্রীরাধিকাদিরও অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বৈধপত্নী, অন্যান্য গোকুলবাসীরাও তাহাই মনে করেন। ('অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

প্রকটের সম্বন্ধ অনুষ্ঠানমূলক। লোক সমাজে—বিহিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; তারপর সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার চলিতে থাকে। প্রকট লীলাও নরলীলা বলিয়া লোক সমাজের রীতির অনুরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয় দ্বারা লীলা। পরিকরদের সহিত শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকটিত করা হয়। পার্থক্য এই—যে সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিলনা, অনুষ্ঠানাদিদ্বারা লোকসমাজে সে সম্বন্ধ "স্থাপিত" হয় ; আর অনুষ্ঠানের অনুকরণ বা অভিনয় দ্বারা প্রকটলীলায় নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকটিত হয় মাত্র—স্থাপিত হয় না ; স্থাপিত হইতেও পারে না ; কারণ পরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, অনাদি ; প্রকটেও তাহা আছেই, তবে প্রথমে প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র।

অপ্রকটের সম্বন্ধ অভিমানমূলক। অপ্রকটলীলায় অনুষ্ঠানের অবকাশ নাই। কারণ, অপ্রকটে সমস্ত সম্বন্ধই নিত্য, অনাদি ; অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্বন্ধ অনাদি হইতে পারে না। অপ্রকটে অনুষ্ঠানাদি ব্যতীতই—কেবল অনাদি সিদ্ধ অভিমানদ্বারাই সম্বন্ধ নির্ণীত হয় এবং তদনুরূপ আচরণ চলিতে থাকে। পুত্রের জন্ম ব্যতীত মাতার জননীত্ব বা পিতার জনকত্ব সিদ্ধ হয় না—ইহা লোকসমাজের রীতি। শ্রীকৃষ্ণ অজ—তাঁহার জন্ম নাই ; তথাপি যশোদামাতার

অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী ; আর নন্দ-মহারাজের অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জনক। এই অভিমান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধানুগত বাৎসল্যরস সিদ্ধ হইয়াছে !

অপ্রকটে পূর্ব্বরাগ নাই। যাহা হউক, অপ্রকট-ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-সুন্দরীদিগের স্বকীয়া-ভাবে মিলন আছে ; সুতরাং মিলনের পূর্ব্বের পূর্ব্বরাগাদিও অপ্রকট-লীলায় থাকিতে পারে না।

পরকীয়া-ভাবের বৈশিষ্ট্য। মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই মিলনানন্দের পুষ্টি-সাধক। উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্বকীয়া কান্তার সহিত বা স্বকীয় পতির সহিত মিলনে গুরুতর বাধাবিঘ্ন কিছু না থাকায় ঐরূপ মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিরও অবকাশ বেশী থাকে না ; সুতরাং স্বকীয়া-ভাবের নায়ক-নায়িকার মিলনে আনন্দ-চমৎকারিতাও বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ পায় না। কিন্তু পরকীয়া-নায়ক-নায়িকার মিলনে বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্তই বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করে ; তাহাতে মিলনোৎকণ্ঠাও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ পায় ; সুতরাং এইরূপ উৎকণ্ঠাধিক্যের পরে নায়ক-নায়িকার মিলনেও আনন্দ-চমৎকারিতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। গোকুলের স্বকীয়া ভাবে এইরূপ আনন্দ—চমৎকারিতার স্থান নাই। এই পরকীয়া-ভাবের রসবৈচিত্রী কেবল প্রকট লীলাতে আস্বাদিত হইতে পারে। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গেরও জন্মলীলা প্রকটিত করাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহার লীলা-সহায়-কারিণী শক্তি—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকাদির পরস্পরের নিত্য-সম্বন্ধের জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিত্য স্ব-পতি এবং শ্রীরাধিকাদি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, তাহা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই মুগ্ধতা প্রকটিত হইল, অপ্রকট-লীলায় ইহা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজেদের স্বরূপের জ্ঞান এবং সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন হয় নাই। তাঁহাদের চিত্তে এই প্রেম সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল ; তবে এই প্রেমের বিষয় কে, প্রথমে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। প্রেমজনিত মিলন-স্পৃহা, মিলনাভাবে চিত্তের হা-হুতাশ, প্রেমের তুষানল-প্রায় ধক্-ধকি জ্বালা সর্ব্বদাই ছিল। কিন্তু কাহার জন্য তাঁহাদের প্রাণের এই আকুলি-বিকুলি, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ইহারই নাম ললনা-নিষ্ঠ প্রেম। এই প্রেমের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, কৃষ্ণকে দেখার পূর্ব্বেও কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও বস্তুর দর্শন-শ্রবণাদিতে তাঁহাদের প্রেমনদীতে যেন উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইত। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"ধিক্ আমাকে ; একজনের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি পাগলিনীর ন্যায় হইলাম। আর এক জনের (শ্যাম) নাম শুনিয়া সেই নামীর নিকটে যেন উড়িয়া যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইলাম। অপর আর একজনের চিত্রপট দেখিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কুলবতী আমি ; তিন পুরুষ আমার মন তিন দিকে আকর্ষণ করিতেছে। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।" বংশীধ্বনি, নাম এবং চিত্রপট যে একজনেরই, শ্রীরাধা তখনও তাহা জানেন না ; কারণ, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান নাই। তথাপি যে তাঁহার সম্বন্ধীয় তিনটী বস্তুই তাঁহার চিত্তকে প্রেমপ্রবাহে উদ্বেলিত করিয়াছে, তাঁহার প্রেমেরই ইহা বিশেষ ধর্ম্ম। এই প্রেম অপ্রচ্ছন্ন ভাবেই ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে বিরাজিত ; শ্রীকৃষ্ণের, চিত্তেও অনুরূপ ভাব নিত্য বিরাজিত। পরস্পরের রূপগুণাদির শ্রবণে তাহা উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়ে ; পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। নিরতিশয়রূপে এই উৎকণ্ঠার বৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়া তাঁহাদের মিলনে একটা গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত করিলেন—গোপকুমারীদের বিবাহের নিমিত্ত তাঁহাদের পিত্রাদির মনে ইচ্ছা জন্মাইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেওয়ার বলবতী ইচ্ছা তাঁহাদের পিত্রাদির মনে থাকিলেও যোগমায়া সেই বিবাহের অসম্ভাব্যতা প্রকটিত করিলেন এবং অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের বিবাহ স্থিরীকৃত করাইলেন ; সর্ব্বশেষে কোনও এক অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যপদেশে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীতই, সকলের মনে প্রস্তাবিত বিবাহ-সিদ্ধির প্রতীতি জন্মাইলেন। এইরূপে যোগমায়া গোপসুন্দরীদিগের পরকীয়া-ভাব প্রকটনের সুযোগ করিয়া দিলেন। বিবাহ-প্রতীতির পরে

গোপসুন্দরীগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগমায়ার প্ররোচনায় পতিম্মন্যদিগের গৃহে আসিতে হইল। তাঁহাদের গৃহ ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই বাসস্থানের নিকটে ; সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদির অধিকতর সুযোগ হইল ; তাহার ফলে কেবল মিলনোৎকণ্ঠাই বৰ্দ্ধিত হইল ; কিন্তু মিলনের পক্ষে প্রবল বিঘ্ন হইল—তাঁহাদের পরপত্নীত্বের প্রবাদ। এইরূপে পূর্ব্বরাগ প্রকটিত হইল। অধিকতররূপে পরস্পরের দর্শনাদির ফলে তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ও অনুরাগের স্রোত প্রবলতা ধারণ করিয়া একদিন লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাঁহাদের মিলন হইল। লোকদৃষ্টিতে তাঁহাদের এই মিলন অবৈধ ; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে লোকধর্ম্মাদিকে তাঁহারা পদদলিত করিয়া থাকিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না ; সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত ইহার ফল হইল এই যে—"কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" তাহাতে সর্ব্বদাই মিলনোৎকণ্ঠা বৰ্দ্ধনের অবকাশ থাকিত, সুতরাং মিলনানন্দের চমৎকারিতা-বৰ্দ্ধনেরও অবকাশ থাকিত। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রকট-লীলায় পরকীয়া-কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন।

প্রকটে স্বকীয়াতে পরকীয়াত্ব। প্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বকীয়াতে পরকীয়া-ভাব। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া শক্তি, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া কান্তা ; এই স্বকীয়া কান্তাতেই প্রকট-লীলায় পরকীয়াভাব পোষণ করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা নহেন। (অপ্রকটব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

স্বকীয়া বলিয়াই ব্রজের পরকীয়াভাব রসদুষ্ট হয় নাই। প্রকৃত পরকীয়াতে রস হয় না—ইহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রের-বিধি।

ব্রজলীলা কামক্রীড়া নহে। ব্রজের মধুর-ভাবাত্মিকা লীলা আপাতঃদৃষ্টিতে কামক্রীড়ার অনুরূপ বলিয়া মনে হইলেও ইহা কামক্রীড়া নহে। প্রচ্ছন্নই থাকুক আর অপ্রচ্ছন্নই থাকুক, কামক্রীড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি। ব্রজলীলায় ইহার একান্ত অভাব, পরস্পরের প্রতি প্রীতি-নিবেদনই ব্রজ-নায়ক-নায়িকার একমাত্র উদ্দেশ্য। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কাম-ক্রীড়া-সাম্য-সূচক কেলি-বিলাসই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি তাহাদের প্রেম-অভিব্যক্তির দ্বার বা প্রকার-বিশেষ। ইহাতে কামগন্ধ নাই। লৌকিক-জগতেও পৌত্রী-দৌহিত্রী আদির আলিঙ্গন-চুম্বনাদির দ্বারা কামগন্ধহীন প্রীতির অভিব্যক্তির রীতি দেখা যায়।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়া এমন সকল অনির্ব্বচনীয়-লীলা করিলেন, যাহার কথা শুনিয়া মায়িক-সুখ-মুগ্ধ জীব সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং উক্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইতে পারে। এইরূপে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিলেন—লোভের বস্তুটী জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন ; কিরূপে সেই বস্তুটী পাওয়া যাইতে পারে, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াও দিলেন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য

একটা সাধারণ কথা আছে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও তদ্রূপ।" শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা॥" গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥ ৮।৬॥—অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণকরতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন।" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥ ১১।৯।২২॥—স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় বশতঃ দেহী যে যে বিষয়ে অনন্যভাবে মনকে স্থাপিত করে, সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ৩।১।১০॥—বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া যে যে লোকের চিন্তা করে বা যে যে কামনা মনে পোষণ করে, জীব সেই সেই লোক প্রাপ্ত হয় এবং সেই সেই কামনাও তাহার সিদ্ধ হয়।"

এসমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা যায়—যিনি যেরূপ ভাবনা করিবেন, যেরূপ চিন্তা করিবেন, সেরূপ ফলই পাইবেন। চিন্তা বা ভাবনার প্রবর্ত্তক হইতেছে ইচ্ছা। সুতরাং ইচ্ছানুরূপ ফল প্রাপ্তির কথাই পাওয়া গেল। উল্লিখিত মুণ্ডকশ্রুতি কামনা-শব্দের উল্লেখে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে (জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে) বলা হইয়াছে—জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য আছে এবং এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কেবল ইচ্ছার ব্যাপারে, অর্থাৎ ইচ্ছার পোষণেই জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম্মই হইতেছে এই যে, ইহা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও তাহার ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বা হইতে পারে না। বোধ হয় এজন্যই উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য-সমূহে ইচ্ছার প্রাধান্যের কথা দৃষ্ট হয়।

যে অভীষ্ট মনে পোষণ করিয়া জীব সাধন করেন, সেই অভীষ্টই তাহার লাভ হয়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"-ইত্যাদি গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই!

কঠোপনিষৎ বলেন—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। "এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ ২।১৬॥"

বেদান্তের "প্রাজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্॥ ৩।৩।৫২॥"-এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে। তত্রৈকা শাব্দী অন্যা তু উপাসনা। তয়োঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ। তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি। তদুক্তমিতি। যথাক্রতুরিত্যাদৌ তত্তারতম্যমুক্তমিত্যর্থঃ। তথা চ উপাসনানুযায়ি ভগবদ্দর্শং ততো বিমুক্তিরিতি। সাম্যপারম্যং তু নৈরঞ্জন্যাংশেন বোধ্যম্॥—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বতি"—এই বাক্যে দুইটী প্রজ্ঞা কথিত হইয়াছে, একটী শাব্দী এবং অপরটী উপাসনা। উহার পৃথকত্বই ভেদ। তদ্রূপ উপাসকদিগেরও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পার্থক্য আছে। বেদে যজ্ঞানুসারে ফলের তারতম্যের কথা দৃষ্ট হয়। অতএব উপাসনানুসারেই ভগবদ্দর্শন ও মুক্তি বুঝিতে হইবে।" এজন্যই সালোক্যাদি নানাবিধ মুক্তির কথা এবং ভগবানের প্রেমসেবা প্রাপ্তির কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা! ১।২।১৯ বৃহদ্-ভাগবতামৃতও বলেন—"উপাসনানুসারেণ দত্তেহি ভগবান ফলম্॥২।৪।২৮৯॥"

ইহার পশ্চাতে বোধ হয় যুক্তিও আছে। অভিধেয়-তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, চিত্তে স্বরূপ-শক্তির বা তাহার বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ব্যতীত ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নয়। মহৎকৃপা বা ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইলে, তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের চিত্তে

আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বাসনানুসারে রূপায়িত হয়। "হ্লাদিনী সন্ধিনীসংবিদ্"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৬৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—হ্লাদিনী সন্ধিনী-সংবিদাত্মক শুদ্ধসত্ত্ব "সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা।" শুদ্ধসত্ত্বে যদি সংবিদংশের প্রাধান্য থাকে, তবে তাহাকে বলে আত্মবিদ্যা, আর যদি তাহাতে হ্লাদিনীসারাংশের প্রাধান্য থাকে, তবে তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"জ্ঞান-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কাত্মবিদ্যয়া তদ্‌বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং—ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ-বৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে।—আত্মবিদ্যার দুইটী লক্ষণ, জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। জ্ঞানমার্গের উপাসকের জ্ঞান হইল আত্মবিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। আত্মবিদ্যার সহায়তায় (করণে) জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর গুহ্যবিদ্যারও দুইটী লক্ষণ—ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক। প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিও গুহ্যবিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। গুহ্যবিদ্যারূপ করণের সহায়তায় উপাসকের চিত্তে ভক্তি প্রকাশ পায়।" একই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান-সাধকের চিত্তে আত্মবিদ্যারূপে পরিণত হইয়া সাধকের চিত্তে জ্ঞান-প্রকাশনের সহায় হয় এবং ভক্তি-উপাসকের চিত্তে গুহ্যবিদ্যারূপে পরিণত হইয়া সাধকের চিত্তে ভক্তি-প্রকাশনের সহায় হয়। এই পার্থক্যের হেতুই বোধ হয় সাধকের বাসনার পার্থক্য। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান-সাধকের চিত্তে জ্ঞানরূপে এবং ভক্তি-সাধকের চিত্তে ভক্তিরূপে রূপায়িত হয়।

যাহা হউক, সাধকের বাসনানুসারে শুদ্ধসত্ত্ব এইরূপে রূপায়িত হইয়া সাধকের চিত্তকেও নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করায়। তাহাতে, জ্ঞান-সাধকের চিত্তে সংবিদংশ এবং ভক্তিসাধকের চিত্তে হ্লাদিনীসারাংশ প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের চিত্ত দুই পৃথক্‌রূপে রূপায়িত হয়; সুতরাং তাহাদের অনুভবও হয় দুই পৃথক্‌রূপে।

জ্ঞান-সাধকের অনুভব জন্মায় তাঁহার চিত্তস্থিত জ্ঞান; আর ভক্তি-সাধকের অনুভব জন্মায় তাঁহার চিত্তস্থিত ভক্তি। অনুভবও হইবে চিত্তের অবস্থার এবং সাধন-পন্থার অনুরূপ। ভক্তি-সাধকের ভক্তিতে সেব্য-সেবকত্বের ভাব আছে; হ্লাদিনীসারাংশদ্বারা কষায়িত তাঁহার চিত্তও সেবক-ভাবেরই অনুকূল; তাই তিনি সেব্যরূপেই পরব্রহ্মের অনুভব পাইবেন। আর জ্ঞান সাধকের জ্ঞানে সেব্য—সেবকত্বের ভাব নাই, আছে "অহং ব্রহ্ম" ভাব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহার একত্বের ভাব; তাই তাঁহার অনুভবও হইবে তদ্রূপ।

সাধনের প্রবর্ত্তকও হইল সাধকের ইচ্ছা, সাধনকে রূপদানও করে সাধকের ইচ্ছা, তাঁহার চিত্তও রূপায়িত হয় তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে এবং শেষফলও হয় ইচ্ছানুরূপই।

এজন্যই রায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়।" উপায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন, প্রাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্ন হইতে পারে, পরতত্ত্ব বস্তু তো একই; তাহা হইলে প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় কিরূপে? উত্তর—পরতত্ত্ব-বস্তু একই সত্য; কিন্তু তাঁহাতে অনন্ত রসবৈচিত্রী বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সকলের চিত্ত একই রস বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার চিত্ত যে বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহার প্রাপ্তিও হয় সেই বৈচিত্রীরই। এইরূপে বিভিন্ন ভাবের সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া একই পরতত্ত্ববস্তুর বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর উপলব্ধি পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রাপ্তির পার্থক্য কেবল পরতত্ত্বের রসবৈচিত্রীতে। স্থূলভাবে বলিতে গেলে সকলে একই পরতত্ত্ব বস্তুকেই পাইয়া থাকেন; কিন্তু প্রাপ্তির পার্থক্য আছে, অনুভবের পার্থক্য অনুসারে। যেহেতু সকলের অনুভব একরূপ নহে।

রায়রামানন্দ ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় রায়রামানন্দ বক্তা এবং প্রভু শ্রোতা।

চতুর্ব্বর্গ। আমাদের অভীষ্ট বস্তুকেই আমরা পুরুষার্থ বলি এবং এই পুরুষার্থই আমাদের সাধ্য। পুরুষার্থ-নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের পুরুষার্থ পাঁচটী – ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ প্রেম। আমাদের একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে বলিয়া সুখ চাই এবং দুঃখ চাই না। সুতরাং সুখই হইল আমাদের প্রধান এবং মুখ্য কাম্যবস্তু; আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিও কাম্য। উক্ত প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের বাস্তব পুরুষার্থতাই নাই; যেহেতু, এই ত্রিবর্গদ্বারা আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না, নিত্য সুখও পাওয়া যায় না। ইহাও বলা হইয়াছে যে আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি এবং নিত্য ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি হয় বলিয়া মোক্ষের (সাযুজ্যমুক্তির) বাস্তব পুরুষার্থতা আছে বটে; কিন্তু মোক্ষও মুখ্য পুরুষার্থ নহে; যেহেতু, মুক্তজীবদিগেরও পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের জন্য লোভ দেখা যায়।

চতুর্ব্বর্গ অজ্ঞানতম। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চতুর্ব্বর্গকেই অজ্ঞান-তম—কৈতব বলিয়াছেন। "অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ১।১।৫০-৫১॥" এস্থলে চতুর্ব্বর্গের বাসনাকেই অজ্ঞান-তম এবং কৈতব বলা হইয়াছে। অজ্ঞান বলিতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব বুঝায়। এই অভাবই তমঃ বা অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারে যেমন কেহ কিছু দেখিতে পায় না, জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাববশতঃ আমরাও তেমনি আমাদের চিরন্তনী সুখ বাসনার চরমাতৃপ্তি কোথায়, তাহা দেখিতে পাইনা! তাই সাক্ষাতে যাহা কিছু দেখি, তাহাকেই আমাদের সুখ বা সুখ সাধন বস্তু মনে করিয়া বঞ্চিত হই—ইহাই কৈতব বা আত্ম-বঞ্চনা।

সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমাদের নিজের স্বরূপের জ্ঞানও আমাদের নাই; তাই আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে; কারণ, দেহকেই সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ দেখি। দেহের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে করি এবং তাহাতে কেবল বঞ্চিতই হই। যেহেতু, দেহের সুখ স্বরূপতঃ আমার নিজের সুখ নয়; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে সুখবাসনার চরমাতৃপ্তিই হইত; কিন্তু তাহা হয় না। এই দেহাত্মবুদ্ধির ফলেই দেহের সুখসাধন ধর্ম্ম অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গের পশ্চাতে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বিচার করিয়া যদিও বুঝি, ইহারা আমাদের কাম্য নিত্য সুখ দিতে পারিতেছে না, তথাপি ইহাদের আপাতঃ-রমণীয়তাতে মুগ্ধ হইয়া আমরা ইহাদিগকে ছাড়িতে পারিতেছিনা এবং অন্য উপায়ের সন্ধানও করিতে পারিতেছিনা। গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকারের ন্যায়, নিত্যসুখ-সাধন অন্য উপায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকেই যেন ইহারা প্রতিহত করিয়া দিতেছে। তাই এই ত্রিবর্গ অজ্ঞান-তমঃ এবং কৈতব। বস্তুতঃ আমাদের দেহাবেশই দৈহিক সুখের আপাতঃ-রমণীয়তায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া নিত্যসুখ-সাধন উপায়ের প্রতি আমাদের অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে; ত্রিবর্গ তাহার আনুকূল্য করিতেছে। এই দেহাবেশও অজ্ঞান তমঃ এবং কৈতব।

মোক্ষে (সাযুজ্যমুক্তিতে) দেহাবেশ নাই; সুতরাং দেহাবেশ-রূপ তমঃ মোক্ষে নাই। কিন্তু মোক্ষেও জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব আছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল সেব্য সেবক সম্বন্ধ। মোক্ষে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব; যেহেতু মোক্ষাভিসন্ধিৎসু সাধক জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান পোষণ করেন। এই ঐক্যজ্ঞানই সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী এবং মুক্তজীবের প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানকে সম্যক্ রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, প্রকাশ হইতে দেয় না। তাই মোক্ষ বাসনাও অজ্ঞান তমঃ। আর মোক্ষপ্রাপ্ত জীব বৈচিত্র্যহীন আনন্দসত্তামাত্ররূপ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া তাহাকেই চরমতম কাম্য মনে করিয়া পরম লোভনীয়

প্রেমানন্দের কথা চিন্তা করিবার অবকাশও পায় না; সুতরাং কোটিব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী প্রেমানন্দের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সাধকও ঐ ব্রহ্মানন্দের লোভেই প্রেমানন্দের কথা চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না; সুতরাং প্রেমসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। তাই মোক্ষ বা মোক্ষ-বাঞ্ছাও কৈতবতুল্য।

মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। ত্রিবর্গলভ্য সুখের লোভে যাঁহারা সংসারে গতাগতি করেন, কোনও ভাগ্যে কোনও সময়ে হয়তো তাঁহাদের ভক্তির কৃপা লাভের সৌভাগ্য হইতে পারে; প্রেমসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদের আছে। কিন্তু মোক্ষ লাভ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইবেন, পূর্ব্বভক্তিবাসনা না থাকিয়া থাকিলে, তাঁহাদের আর তদ্রূপ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। তাই মোক্ষ-বাঞ্ছাকে "কৈতব-প্রধান" বলা হইয়াছে। সাধনের সময়ে কোনও সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের ভক্তিবাসনা জন্মে, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান-সাধনের অপরিহার্য্যা সহায়কারিণীরূপে সাধন-কালে তাঁহারা যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মুক্তাবস্থায় সেই ভক্তিই পূর্ব্বভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ আবরণকে দূরীভূত করিয়া পরম-পুরুষার্থ প্রেমের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং প্রেমসুখের পরমলোভনীয়তায় ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ মনে করিয়া তাঁহারা ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" কিন্তু এই সৌভাগ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহারা "কৈতবেই" থাকিয়া যান।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের পুরুষার্থতা নাই।

পরমধর্ম্ম। যাহা হইতে "কৈতব" সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে সেই ধর্ম্মকেই "পরম-ধর্ম্ম" বলা হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি॥ ১।১।২॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।—এই শ্লোকে প্রোজ্‌ঝিতকৈতব-শব্দের অন্তর্গত প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধানকেও নিরস্ত করা হইয়াছে।" অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, যে ধর্ম্মে মোক্ষ-বাসনা থাকিবে, সে ধর্ম্মও পরম-ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী মোক্ষ-শব্দে কেবল সাযুজ্যমুক্তিকেই লক্ষ্য করেন নাই; পরন্তু সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যাহাতে এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিবে, তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার কারণ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হইতে পারে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। সাযুজ্যমুক্তি-বাসনায় এই জ্ঞান যে মোটেই বিকশিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্য চারি রকমের মুক্তিবাসনাতেও সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাব উদ্বুদ্ধ হয় বটে; কিন্তু সালোক্যাদি প্রাপ্তির বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনা গৌণ হইয়া পড়ে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটী অঙ্গ—সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনার জ্ঞান। দুইটীর সম্যক্ বিকাশেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ। সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হইলে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্যই বাসনা থাকে না; নিজের জন্য কোনও অনুসন্ধানের ছায়াও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবায় স্থান পায় না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সালোক্যাদির বাসনা প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া, অন্ততঃ সেবা-বাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে বলিয়া, তাহাতে যে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এজন্যই শ্রীজীবগোস্বামী পঞ্চবিধামুক্তির যে কোনও মুক্তিবাসনাকেই পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়াছেন।

সাধ্যবস্তু। ইহাতেও জানা গেল—ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, পঞ্চবিধা মুক্তিরও সম্যক পুরুষার্থতা নাই তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, একমাত্র পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমেরই সম্যক্ পুরুষার্থতা আছে; যেহেতু প্রেমে সেব্য সেবকত্বের ভাব তো জাগ্রত হয়ই; অধিকন্তু, সেবার ভাবও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়,—স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশশূন্যা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা সম্যক্‌রূপে উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়া; সুতরাং পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমই হইল মুখ্যসাধ্য

বস্তু। পরম-ভাগবতোত্তম রায়রামানন্দের মুখ হইতে এই মুখ্য সাধ্যবস্তুটীর কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। ২।৮।৫৪ ;—রামানন্দ! সাধ্যবস্তু কি, তাহা বল ; এবং যাহা বলিবে, তাহার সমর্থক প্রমাণও দিবে।"

রামানন্দ রায় কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটি বলিলেন না। প্রেমই পরমপুরুষার্থ, পরম সাধ্য বস্তু, একথা প্রথমেই—বলিলেন না। বলিলে দেহাত্মবুদ্ধি-আমরা তাহা হয়তো গ্রহণ করিতাম না। দেহের সুখকেই আমরা পরম সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করি। আমাদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই পরম-করুণ রায়রামানন্দ একেবারে প্রথম পুরুষার্থ "ধর্ম্ম"-হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ মোক্ষের (জ্ঞানমিশ্রাভক্তির) কথাও বলিয়াছেন। এইরূপে চতুর্বর্গের কথা শেষ করিয়া সর্ব্বশেষে পঞ্চমপুরুষার্থের অবতারণা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের কথা না বলিয়া অন্য পুরুষার্থের কথা বলিয়াছেন, সে পর্য্যন্তই প্রভু কেবল "এহো বাহ্য, এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। যখন প্রেমের কথা আরম্ভ করিলেন, তখন বলিলেন "এহো হয়।" প্রেমের সহিত যে সেবা, সেই সেবারও অনেক স্তর আছে। রায়রামানন্দের মুখে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তরের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু সর্ব্বশেষে "সাধ্যবস্তুর অবধির" কথা প্রকাশ করাইলেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা রায়রামানন্দের সহিত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ। এই ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা, উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

স্বধর্ম্ম। রায়মহাশয় প্রথমেই বলিলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা। "রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥" ইহা প্রথম পুরুষার্থ ধর্ম্মের কথা। ইহা পরম-ধর্ম্ম নয় ; ইহা দেহাবেশের কথা, তাই ইহার পুরুষার্থতাই নাই। প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ। দ্বিতীয় কথা—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥' ইহাও প্রথমপুরুষার্থ ধর্ম্মেরই আর একটা দিক। ইহাতেও দেহাবেশ। কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ।" ইহারও পুরুষার্থতা নাই। তাই প্রভু বলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর॥"

স্বধর্ম্ম ত্যাগ। তার পরের কথা—স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্যসার॥" ইহাতে প্রথমপুরুষার্থ-ধর্ম্মের ত্যাগের কথা থাকিলেও ইহাতে সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা নাই। এই উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ গীতা হইতে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"—শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শেষ উপদেশ। কিন্তু প্রভু ইহাকেও বলিলেন "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" সাধারণ দৃষ্টিতে প্রভুর এই উক্তিকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার এই চরম কথাকে "সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য" বলিয়াছেন। "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।" ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত অপেক্ষাও ইহা পরম-রহস্যময়। এই পরমরহস্যময় বাক্য যাহার তাহার নিকটে বলা যায় না। অর্জ্জুন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। "ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥" এমন পরম-রহস্যময় এবং গীতার সারভূত কথাকেও প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য।"

ইহার হেতু এই। এই গীতাশ্লোকে যে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের কথা আছে, সেই ত্যাগ স্বতস্ফূর্ত্ত নয়, শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভবশতঃ অন্য সমস্ত ধর্ম্মের ফলের অকিঞ্চিৎকরতা-বুদ্ধিজাতও নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দিতেছেন, তাই এই ত্যাগ ; তথাপি কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মত্যাগজনিত পাপের আশঙ্কাও যেন আছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিতেছেন—"পাপের জন্য ভয় করার হেতু নাই, সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত ধর্ম্ম নির্ভয়ে ত্যাগ করিতে পার।' ইহাতে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের দেহাবেশের পরিচয়ও পাওয়া যায়, দেহাবেশ না থাকিলে পাপের ভয় জন্মিতে

পারে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাবেশ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নই থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরম-পুরুষার্থ প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব নয়। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। ইহার পরে রামানন্দরায় বলিলেন—"জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১৮।৫৪॥" শ্লোকের উল্লেখ করিলেন।

এস্থলে ভগবানে পরাভক্তির কথা বলা হইল। পরাভক্তিই কিন্তু প্রেমভক্তি—সুতরাং পঞ্চম-পুরুষার্থ, সাধ্য। তথাপি প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" কিন্তু কেন?

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় প্রভুর "এহো বাহ্য"-এই উক্তি সম্বন্ধে শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"এহো বাহ্য ইতি। অত্র শোকাদিবিঘ্নসত্ত্বে ভজনাপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষা তদ্ভাবেতু সা পুনর্ভজনবিঘ্ন এবেতি বাহ্যম্।—শোকাদি-বিঘ্ন থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা; কিন্তু জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে শুদ্ধাভক্তিমার্গে ভজনের বিঘ্ন জন্মে; তাই প্রভু বাহ্য বলিয়াছেন।" চক্রবর্ত্তীপাদ এস্থলে রামানন্দরায়প্রোক্ত "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি"-শব্দের অন্তর্গত "জ্ঞান" এর কথাই বলিতেছেন। এই জ্ঞানকে তিনি "ভজনবিঘ্ন"—ভজনের বিঘ্নজনক বলিতেছেন, "ভজনবিরোধী" বলেন নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, এই জ্ঞানকে তিনি জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্ব-মায়াতত্ত্বাদির জ্ঞান বলিয়াই মনে করেন, জ্ঞানমার্গের সাধকের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান মনে করেন না; যেহেতু, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই সেব্য-সেবকত্বভাবের প্রতিকূল বলিয়া ভক্তিমার্গের ভজনবিরোধী। শ্রীপাদচক্রবর্ত্তী এস্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥১।২।১২০॥" শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীজীব লিখিয়াছেন—'জ্ঞানমত্র ত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেবেত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়তে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তদ্ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাচ্চ॥—অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় অন্যবস্তুতে চিত্তের আবেশ (এবং তজ্জনিত শোকাদিবিঘ্ন) দূর করার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী (জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদিবিষয়ক) জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে-প্রবেশ-লাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই; তখন এসমস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তির বিঘ্ন জন্মে।"

এক্ষণে বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তিপাদের মতে "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" বলিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানব্যতীত জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতভক্তি বুঝায়। ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ; ইহা জানিয়া রাখাই ভজনের পক্ষে যথেষ্ট বলা চলে। ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি কেহ নানাবিধ তত্ত্বাদির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে কেবল যে ভজনের অনুকূল ব্যাপারে তাঁহার সময়ই বৃথা নষ্ট হইবে, তাহাই নহে, ক্রমশঃ তত্ত্বালোচনার দিকে তাঁহার একটা মোহও জন্মিতে পারে। এইরূপ মোহ জন্মিলে তত্ত্বালোচনাকেই তিনি হয়তো তাঁহার ভজনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মনে করিতে পারেন। তখন এই তত্ত্বালোচনা রীতিমতই তাঁহার ভজনের বিঘ্নজনক হইবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সার সহিত মিশ্রিত যে ভক্তিমার্গের ভজন, তাহাকেই এস্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে ভজনে আবেশ জন্মিতে পারে না বলিয়া জীবেশ্বরের সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা থাকে না। তাই প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন।

উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায়, রায়রামানন্দ সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-মূলক জ্ঞানমার্গের সাধনসম্বন্ধে কোনও কথারই অবতারণা করিলেন না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে—

জ্ঞানমার্গের সাধন সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিরোধী, সুতরাং জীব-ব্রহ্মের মধ্যে যে সেব্য-সেবকত্বভাব বিদ্যমান, তাহার স্ফুরণেরও বিরোধী, কাজেই সাধ্যবস্তু যে পরমপুরুষার্থ-প্রেম, সেই প্রেমের আবির্ভাবেরও বিরোধী। প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির কথা বলিলেন, সে সমস্তও তো সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফূর্ত্তির অনুকূল নয়; তবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির কথাই বা বলিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফুরণের অনুকূল নহে সত্য; কিন্তু প্রতিকূলও নয়। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য ভক্তির সংস্রব তাঁহাদেরও রাখিতে হয়; কারণ, কর্ম্মফলদাতা হইলেন ভগবান। "ফলমতঃ উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৮ ব্রহ্মসূত্র॥" বিশেষতঃ, ভক্তিবিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান তাঁহাদিগকে চিত্তে পোষণ করিতে হয় না। কোনও সময়ে শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদের নষ্ট হয় না।

কিন্তু নিজের উক্তির সমর্থনে রায়রামানন্দ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি যে শ্লোকটী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানবিষয়ক, তাহা শ্রীধরস্বামীর এবং চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতেই বুঝা যায়। তাহাতে মনে হয়, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিকেই রায়রামানন্দ "জ্ঞানমিশ্রা" ভক্তি বলিয়াছেন। অভিধেয়-তত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক সাযুজ্যমুক্তির সাধনেও ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এই সাধনের সহায়কারিণী ভক্তি থাকেন তটস্থা হইয়া, তাঁহার কাজ কেবল সাধকের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের চিন্তাকে সাফল্য দান করা; তাঁহার অন্য কোনও কাজ নাই। এই জাতীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাযুজ্যমুক্তির সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের (সেব্য-সেবক-ভাবের) বিকাশের প্রতিকূল। তাই প্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। গীতার শ্লোক বলে—"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" পরাভক্তি হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি; ইহাই পরম-পুরুষার্থ; সুতরাং এই পরাভক্তিকে "বাহ্য" বলা চলে না। প্রভু পরাভক্তিকে বাহ্য বলেন নাই: জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরাভক্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উক্তশ্লোকের অর্থ করিলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তাৎপর্য্য কি হয়, তাহা বিবেচনা করা দরকার। সাযুজ্যমুক্তির সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি হইতে যে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে না—অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ ভক্তির সহিত জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জড়িত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই শ্লোকে পরাভক্তি লাভের কথা বলা হইল কেন? চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"মায়িক উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলে সাধক যখন ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য ব্রহ্মরূপ) হয়েন, তখন তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন (অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় নষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন না) এবং (বাহ্যানুসন্ধান থাকে না বলিয়া বালকের ন্যায় ভালমন্দ) সকল বস্তুতেই সমদৃষ্টিসম্পন্নও হয়েন। তখন নিরন্ধন অগ্নির ন্যায় (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-) জ্ঞান শান্ত হইয়া গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানসাধনের অন্তর্ভুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপশক্তির বিলাসভূতা (সুতরাং) অবিনশ্বরা ভক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। পূর্ব্বে মোক্ষ-সাধক-সাধনে সেই সাধনকে সফল করার জন্য অংশরূপে যে ভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় তখন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না। এক্ষণে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানচিন্তার আর প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় তাহা যখন শান্ত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই ভক্তি—মাষ মুদ্গাদির সহিত মিলিত কাঞ্চন-কণিকা প্রথমতঃ অদৃশ্যভাবে থাকিলেও মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন নষ্ট হয় না, তাহা যেমন অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ। ভক্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া নষ্ট হয় না। সাধক তখন সেই ভক্তিকে লাভ করেন। যাহা পূর্ব্বেই ছিল, অন্য বস্তুর (ঐক্যজ্ঞান-চিন্তার) সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে যাহাকে তত্টা লক্ষ্য করা হয় নাই, এখন অন্য বস্তু না থাকায়, কেবল ভক্তিমাত্রই থাকায়, সহজেই তাহাকে পাওয়া যায়। এজন্যই শ্লোকে "অনুষ্ঠান করে"—না বলিয়া "লাভ করে" বলা হইয়াছে। তখন প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভ-

সম্ভাবনা হয়। "সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি"। এইরূপই এই শ্লোক-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী পাদের উক্তির তাৎপর্য্য। (এই চক্রবর্ত্তীপাদ হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।)

যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে স্বতন্ত্রা হইয়াছে, সেই ভক্তির কথাই চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিলেন। রায়রামানন্দ এইরূপ ভক্তিকেই যদি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা বাহ্যই; কারণ, চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, ঈদৃশী ভক্তির ব্যাপারে, সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণা প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা-মাত্র থাকে—তাহাও প্রায়শঃ, নিশ্চয়তার কথা তিনি কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তার কথা না বলার হেতুও আছে। সাধক ব্রহ্মভূত হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের চিন্তা তাঁহার লোপ পাইয়া হয়তো যাইতে পারে; কিন্তু তটস্থা ভক্তি তখন যে প্রবলা হইয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; যদি তাহার নিশ্চয়তাই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তির সাহচর্য্যযুক্তা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান চিন্তাকে সাযুজ্য-মুক্তির সাধন বলা হইত না, প্রেমভক্তিলাভের সাধনই বলা হইত। ঐ অবস্থায় তটস্থা ভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে—যদি সাধক কোনও পরমভাগবত-মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে। অন্যথা নহে। কিন্তু এইরূপ মহৎকৃপা লাভেরও কোন নিশ্চয়তা নাই। এজন্যই বোধহয় চক্রবর্ত্তিপাদ প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা মাত্রের কথা বলিয়াছেন, নিশ্চয়তার কথা কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই ইহা "বাহ্য।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।" এবং এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতি "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪।৩॥"-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এই যে জ্ঞান লাভের জন্য কোনওরূপ চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা সাধুদিগের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের মুখোচ্চারিত ভগবৎ-রূপ-গুণ-লীলাদির কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, স্বতন্ত্র—সুতরাং অপরের পক্ষে অজিত—হইলেও ভগবান তাঁহাদের বশীভূত হন। এই শ্লোকে জ্ঞান-শব্দের অর্থ—ভগবানের মহিমাদির জ্ঞান, তত্ত্বাদির জ্ঞান। তাহা হইলে রায়রামানন্দ-কথিত "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" হইল—ভগবানের মহিমাদির, তত্ত্বাদির জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। ভগবানের তত্ত্বাদি না জানিলেও তাহা জানিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে, প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। ইহাই রায়ের উক্তির এবং উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য॥

রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥ "

রায় যাহা বলিলেন, তাহা নববিধা ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ। ইহাদ্বারা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়।" এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। যে পরম-রমণীয় শ্রীমন্দিরে সাধ্যবস্তুটী প্রতিষ্ঠিত, তাহার দিকে অগ্রসর হইবার রাস্তায় যেন এতক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছেন, সেই শ্রীমন্দির যেন এতক্ষণে দৃষ্টিপথের গোচরীভূত হইয়াছে, তাই প্রভু বলিলেন—হাঁ, রামানন্দ, জ্ঞানশূন্যাভক্তির কথা যাহা সাধারণভাবে বলিলে, তাহা ঠিক কথাই। বিশেষ করিয়া আরও কিছু বল।"

প্রেমভক্তি। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়েরও যেন একটু উৎসাহ জন্মিল। তিনি বলিলেন—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।" ইহার সমর্থনে দুইটী শ্লোকও বলিলেন, তাহাদের একটীর মর্ম্ম হইতেছে এই যে, ভগবান্ কেবলমাত্র প্রেমই আশা করেন, প্রেমবিরহিত নানাবিধ উপচারেও তিনি প্রীতিলাভ করেন না। আর একটীর মর্ম্ম হইতেছে এই যে, তাই সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় মতিকে, বুদ্ধি-আদিকে কৃষ্ণরস-পরিষিঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে।

রায় যেন এবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে—মন্দিরে আরোহণ করিবার প্রথম সোপানে আনিয়া উপনীত করাইয়াছেন। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর॥"—ঠিকই বলিয়াছ, ইহাও কিন্তু সাধারণ কথা। আরও বিশেষ করিয়া বল। মন্দিরের ভিতরে কি আছে, তাহা যেন এখনও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি না, তাহা দেখাও।

দাস্যপ্রেম। রায় যেন প্রভুকে নিয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, ইহা যেন একটী চতুস্তল মন্দির। প্রথমে যেন নিম্নতলে প্রবেশ করিলেন, সেখানে যেন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস্যভাবময় নিত্যপরিকরদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহাদের অলভ্য বা অলব্ধ যেন কিছুই নাই। তাঁহাদিগকে দেখাইয়াই যেন রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥"

প্রভু যেন দেখিলেন, দাস্যভাবের পরিকরগণ খুব প্রীতির সহিত, খুব আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। কিন্তু প্রভুর যেন মনে হইল, মাঝে মাঝে তাঁদের মনে যেন একটু সঙ্কোচ আসে; এই সঙ্কোচের জন্য তাঁরা যেন আশ-মিটাইয়া সেবা করিতে পারিতেছেন না। আরও যেন তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবায় খুব আনন্দই পাইতেছেন বটে, কিন্তু যেন প্রাণ-মন মাতানো আনন্দ পাইতেছেন না। তাই যেন প্রভুর মন ততটা প্রসন্ন হইল না। তাই তিনি রামানন্দরায়কে বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর ॥"—রামানন্দ, দাস্যপ্রেমসম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা বেশ। কিন্তু ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।

এখানে একটী কথা বলা দরকার। রায়রামানন্দ এস্থলে দাস্যভাবের কথা বলিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তাভাবের কথাও বলিবেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং কান্তা—এই চারি ভাবের পরিকর ব্রজেও আছেন, দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন। দ্বারকা-মথুরার সকল ভাবের সহিতই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ এই জ্ঞান—মিশ্রিত আছে। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান থাকিলে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়—যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্যপ্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। বাৎসল্য এবং কান্তাভাবও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। (১।৪।১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত। ১।৪।১৬ ॥" দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি ততটা গাঢ় নয় যাহাতে প্রীতির আবরণে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রজপরিকরদের কৃষ্ণপ্রীতি এতই গাঢ় যে, তাহার নিবিড় আবরণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, আর তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর—এই অনুভূতি ব্রজে কৃষ্ণ-পরিকরদেরও নাই এবং তাঁহাদের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণেরও নাই। তাঁহারা সকলেই মনে করেন তাঁহারা মানুষ। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে নরলীলা বলে। প্রেমমুগ্ধবশতঃই এরূপ হয়। প্রেম যতই গাঢ় হয়, ততই এই প্রেমমুগ্ধত্বও গাঢ় হয় এবং প্রেমমুগ্ধত্ব যত নিবিড় হয়, প্রেমের আস্বাদ্যত্বও তত বৃদ্ধি পায়। ব্রজের ভাব শুদ্ধমাধুর্য্যময়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ; কিন্তু এখানে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত, বিমণ্ডিত, সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত। তাই ব্রজের ঐশ্বর্য্য নিজস্ব রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। যখন ঐশ্বর্য্য বিকশিত হয়, মাধুর্য্যবিমণ্ডিত হইয়াই বিকশিত হয়, মাধুর্য্যের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। প্রকাশও পায় কেবল মাধুর্য্যের সেবার নিমিত্ত, মাধুর্য্যের এবং লীলারসের পুষ্টি সাধনের জন্য; যেহেতু, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত। তাই ব্রজের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সঙ্কুচিত হইতে পারে না এবং সঙ্কুচিত হইতে পারে না বলিয়া ব্রজপরিকরদের সেবাবাসনা এবং সেবাও প্রতিহত হইতে পারে না। তাই ব্রজপ্রেম পরম-আস্বাদ্য—দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের কৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা কোটী কোটি গুণে আস্বাদ্য। সাধ্য-তত্ত্ব-বিচারে রায়রামানন্দ ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির কথাই বলিতেছেন—তাহাদেরই পরমোৎকর্ষত্ববশতঃ।

ব্রজের যে চারিভাবের ভক্তি দান করার সঙ্কল্প নিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বনিম্নটী হইল দাস্যভাব। রায়রামানন্দ সেই দাস্যভাবের কথাই এস্থলে বলিলেন। এই দাস্যভাবকেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভ বলা যায়। আর গীতার শেষ উপদেশ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোকে—স্বধর্ম্মত্যাগে পর্য্যবসিত। এইরূপে দেখা যায়, গীতার যেখানে শেষ, তাহারও তিন স্তর পরে—ঊর্দ্ধে—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভ। (স্বধর্ম্মত্যাগের পরে রায়রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি, প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন; তাহার পরে চতুর্থ স্তর দাস্যভক্তির কথা বলিয়াছেন)। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বস্তু বাস্তবিকই সাধারণের পক্ষে দুরবগাহ।

সখ্যপ্রেম। যাহা হউক, ব্রজের দাস্যপ্রেমের কথা শুনিয়াও প্রভু যখন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু থাকিলে তাহা জানিতে চাহিলেন, তখন রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে নিয়া মন্দিরের দ্বিতলে উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সুবল-মধুমঙ্গলাদি তাঁহার সখাদের সঙ্গে খুব আপনা-আপনি ভাবে নানাবিধ খেলা খেলিতেছেন। পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সাজাইতেছেন; কখনও বা নিজেদের ছায়ার সঙ্গেই লড়াই করিতেছেন; কখনও বা বকের মত জলের ধারে সকলে মিলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; কখনও বা উড্ডীয়মান পাখীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছেন; কখনও বা গাছের ডালে উপবিষ্ট বানরের লেজ ধরিয়া টানিতেছেন; একেবারে যেন চঞ্চল নরশিশু। আবার কখনও বা পণ রাখিয়া খেলা করিতেছেন: কোনও সখা খেলায় হারিলে, কৃষ্ণকে কাঁধে করিয়া পণ-অনুসারে তিনি অনেকদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেছেন; আবার কৃষ্ণ যদি খেলায় হারেন, তাঁহারও কাঁধে চড়িতেছেন, তাঁহার বক্ষেও পাদস্পর্শ হইতেছে। আবার কখনও বা কোনও একটী ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া খুব ভাল লাগিলে ঐ উচ্ছিষ্ট এবং লালামিশ্রিত ফলই কৃষ্ণ তাঁহার সখাদের মুখে দিতেছেন—খা ভাই—বলিয়া; আবার সখারাও কৃষ্ণের মুখে গুঁজিয়া দিতেছেন—"খা ভাই কানাই, বড় মিষ্টি ফল।" কাহারও কোনও সঙ্কোচ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সখারা কৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান-ই মনে করেন, কোনও অংশেই তাঁহাদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ আনন্দসত্তামাত্ররূপে যাঁহার অনুভব লাভ করেন, দাস্যভাবের সাধকগণ যাঁহাকে পরমারাধ্য-প্রভুরূপে মনে করেন—সুতরাং যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেও সন্ত্রস্ত হন, যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয় এবং অধীশ্বর, লোকপালগণ বহু দূরে থাকিয়া যাঁহার পাদপীঠের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই পরম-ব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এত মাখামাখিভাবে ব্রজরাখালগণ খেলা করিতেছেন—ইহাই যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখিতে পাইলেন।

এই সমস্ত খেলা-ধূলা দেখাইয়াই যেন রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন—"সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥"

প্রভু যেন দেখিলেন—দাস্যভাবের ভক্তগণ যেমন কৃষ্ণগত-প্রাণ, কৃষ্ণছাড়া তাঁরা যেমন আর কিছুই জানেন না, সখারাও তদ্রূপ কৃষ্ণগত প্রাণ, সখারাও কৃষ্ণছাড়া আর কিছুই জানেন না; দাস্যের ন্যায় সখ্যেও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা আছে, কিন্তু দাস্যে যে একটা সঙ্কোচ আছে, সখ্যে তাহা নাই। কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং সেবা দাস্যে এবং সখ্যে উভয়ই আছে; সখ্যে অধিক আছে সঙ্কোচহীনতা। প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট কিছু আছে কিনা, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। তাই সখ্যপ্রেমসম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম, আগে কহ আর॥"—রামানন্দ, সখাদের কৃষ্ণপ্রীতি বাস্তবিকই অতি উত্তম। ইঁহাদের প্রেম এত গাঢ় এবং শ্রীকৃষ্ণে ইঁহাদের মমতাবুদ্ধিও এত গাঢ় যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ইঁহারা নিজেদের মত একজন রাখাল বলিয়া মনে করেন; এবং তাঁদের প্রেমমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণও নিজেকে তাঁদেরই তুল্য একজন রাখালমাত্র মনে করিতেছেন। দাস্যভাবের পরিকরগণও অবশ্য কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানেন না; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ বলিয়া কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের একটা গৌরব-বুদ্ধি আছে; তাই স্বচ্ছন্দ সেবায় তাঁদের সঙ্কোচ—নিজেদের মুখের উচ্ছিষ্ট ফলটা তাঁহারা কৃষ্ণের মুখে দিতে পারেন না। কিন্তু এই সখাদের মধ্যে দেখিতেছি—কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই। স্বচ্ছন্দ-সেবাদ্বারা সখারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেছেন, কৃষ্ণের সেবাও তাঁরা করিতেছেন, আবার কৃষ্ণকৃত সেবা তাঁরা গ্রহণও করিতেছেন। গোচারণে বা খেলা-ধূলায় ক্লান্ত হইয়া গাছের ছায়ায় কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইতেছেন, পত্রগুচ্ছ লইয়া কৃষ্ণ তাঁদের ব্যজন করিতেছেন, তাঁদের গা-হাত-পা টিপিয়া দিতেছেন। কোনও সঙ্কোচই নাই। কৃষ্ণও যেন একেবারে তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া আছেন। সখ্যপ্রেম বাস্তবিকই উত্তম। কিন্তু রামানন্দ, ইহা অপেক্ষাও উত্তম কিছু আছে কি?

"প্রভু কহে এহোত্তম, আগে কহ আর॥" এইবারই সর্ব্বপ্রথম প্রভু "উত্তম" বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা-অপেক্ষা বড় মনে করেন, আর আমাকে তাঁহা-অপেক্ষা ছোট মনে

করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রেমের অধীন হইয়া থাকি। নিজেকে বড় এবং আমাকে ছোট মনে করিতে না পারিলেও যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, আমি তাঁহার প্রেমেরও অধীন হইয়া থাকি। আপনাকে বড় মানে, আমারে সমহীন। সর্ব্বভাবে আমি হই তাঁহান্ অধীন॥ ১।৪।২০॥" সখ্যভাবে সমান-সমান ভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাদের প্রেমাধীন হইয়া তাঁহাদিগকে সেবাও করেন, তাঁহাদিগকে নিজের কাঁধে পর্য্যন্ত বহন করেন, তাহাতে তিনি নিরতিশয় আনন্দ অনুভবও করেন। এজন্যই প্রভু "এহোত্তম" বলিলেন। দাস্যে এই মাখা-মাখি ভাব নাই।

বাৎসল্য-প্রেম। যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের ত্রিতলে উঠিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁরা যেন দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন শিশু; নন্দ-যশোদা তাঁহার লালন-পালন করিতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ যশোদার কোলে বসিয়া স্তন্যপান করিতেছেন; কখনও বা নন্দবাবার পাদুকা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া অক্ষম দুটী ছোট হাতে বাবার পায়ে পরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, আর নন্দবাবা প্রাণ-গোপালকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে তুলিয়া নিয়া সুন্দর কচিমুখে চুমো খাইতেছেন; গোপালও তখন বাবার গালে চুমো দিতেছেন। কখনও বা গোপাল মায়ের দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, ক্ষীর-নবনী চুরি করিয়া নিজেও খাইতেছেন, কতকগুলি বানরকেও দিতেছেন। মা তাড়না করেন, ভর্ৎসনা করেন, কখনও বা উদূখলে বাঁধিয়া রাখেন। "অবোধ শিশু, নিজের ভালমন্দ নিজে জানেনা, বুঝে না। আমি ওর মা; আমি যদি এখনই শাসন করিয়া ইহার সংশোধন না করি, ভবিষ্যতে ইহার বড় অমঙ্গল হইবে।"—এইরূপই যশোদামাতার মনের ভাব।

প্রভু এসব দেখিলেন, দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন কি অপূর্ব্ব ভাব! শ্রীকৃষ্ণে নন্দ-যশোদার কত গাঢ় মমত্ব-বুদ্ধি! কি অদ্ভুত বাৎসল্যপ্রেম! শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক তো কাহারও পুত্র নহেন, পুত্র হইতেও পারেন না, তিনি যে অজ, নিত্য, সর্ব্বকারণ-কারণ। তথাপি কত গভীর গাঢ় নন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রীতি—যদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া নন্দ মনে করিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আর যশোদা মনে করিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা!! তাঁহারা মনে করিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক, অনুগ্রাহক, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের লাল্য পাল্য, অনুগ্রাহ্য!!! আর তাঁদের এই শুদ্ধ-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণও মনে করিতেছেন—তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। মা-যশোদা, নন্দ-বাবা শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণছাড়া আর কিছুই জানেন না। গোপাল তাঁদের জীবন, তাঁদের সব। গোপালেরও ভাব—মা-বাবা না হইলে তাঁহার যেন একমুহূর্ত্তও চলে না। এসব দেখিয়া প্রভু যেন মনে করিলেন—সখাদের প্রেমও গাঢ় বটে, কিন্তু এত গাঢ় নয়—যাতে কোনও অন্যায় দেখিলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসন করিতে পারেন সখ্যের ন্যায় বাৎসল্যেও কৃষ্ণনিষ্ঠা আছে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা আছে, সঙ্কোচাভাব আছে অধিকন্তু আছে মমত্ববুদ্ধির অধিকতর গাঢ়ত্ববশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে লাল্যত্বের পাল্যত্বের এবং অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের অপেক্ষা হেয়তার জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ যেন নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত অবোধ—এরূপ একটা ভাব। স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার মহিমার অন্ত পান না, যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ধ্যান করিয়াও যাঁহার চরণ-নখ-জ্যোতির আভাসেরও সন্ধান পান না. তিনি এখানে নন্দমহারাজের পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছেন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্তন্যপানের জন্য মা-যশোদার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। স্বয়ং ভয়ও যাঁহার স্মৃতিতে ভীত হয়, যশোদামাতার তাড়নার ভয়ে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি যশোদামাতার হাতে বন্ধনপর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিতেছেন। কি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি, কি অনির্ব্বচনীয় ভগবানের প্রেমবশ্যতা।

প্রভু যেন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে যেন আরও কৌতুহল জন্মিল—ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আরও কিছু আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য। তাই বাৎসল্যপ্রেম সম্বন্ধে রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

"এহোত্তম, আগে কহ আর।"

কান্তাপ্রেম। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়রামানন্দ যেন প্রভুকে লইয়া শ্রীমন্দিরের চতুর্থ তলে উঠিয়া গেলেন। উঠিয়া তাঁহারা যেন দেখিলেন—পরম-মনোরম একটী বন। তাহাতে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ। প্রতি বৃক্ষ লতাজালে পরিবেষ্টিত। প্রতি লতায় কত সুগন্ধি কুসুম প্রস্ফুটিত। মধুলুব্ধ কত ভ্রমর কুসুমোপরি গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোকিল-পাপীয়ার পঞ্চম তানে বন মুখরিত। মৃদু পবন কুসুমের গন্ধসম্ভার বহন করিয়া লতাজালকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছে। সমস্ত বন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। বনের মধ্যে একটী বিস্তীর্ণ চত্বর, যেন সবুজ মকমলে ঢাকা। তাহার মধ্যস্থলে এক কিশোর মূর্ত্তি। কি অপূর্ব্ব তাঁর দেহের বর্ণ—নীলোৎপল হার মানিয়া যায়। কি অপূর্ব্ব সুগন্ধ সেই দেহ হইতে সব দিকে বিস্তারিত হইতেছে—মৃগমদ এবং নীলোৎপলের মিলিত গন্ধও তার নিকটে পরাজিত। ঈষদ্‌বিকশিত ওষ্ঠদ্বয়ে কি সুন্দর প্রাণ-মাতান স্নিগ্ধোজ্জ্বল মন্দহাসি; আর সেই আকর্ণবিস্তৃত লালিমাভ নয়নদ্বয়ে কি সুন্দর চাহনি—যেন সমগ্র বিশ্বকে ঐ চাহনির দিকে টানিয়া নিতেছেন; কিশোর মূর্ত্তি অধরে একটা বাঁশী ধরিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। কপাল এবং গণ্ডদ্বয় অলকা-তিলকায় সজ্জিত। নাসায় মুক্তার নোলক দুলিতেছে; কর্ণদ্বয়ে মণিরত্ন-খচিত কুণ্ডল—গণ্ডদ্বয়ের নীলাভ জ্যোতিতে যেন ঝলমল্ করিতেছে। মস্তকে পত্র-পুষ্পের মুকুট—তাতে ময়ুর-পুচ্ছ। বাহুতে ফুলের অঙ্গদ, ফুলের বালা। নীলাকাশে বক-পাঁতির ন্যায় বক্ষে মুক্তার হার। গলায় নানারকমের ফুলের মালা—এক ছড়া মালা খুব লম্বা, যেন চরণদ্বয়কে চুম্বন করার জন্য লালায়িত। পরিধানে পীত ধটী। চরণে নানামণি খচিত সোনার নূপুর—নখচন্দ্রের শোভা দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন রুনু রুনু ধ্বনি তুলিয়া তাঁর জয়গান করিতেছে।

সেই কিশোরের বামপার্শ্বে এক নবীনা কিশোরী—যেন অমিয়ায় ছানা ঘন বিজুরীতে গড়া। অনুরূপই তাঁর বসনভূষণ, হাব-ভাব। মূর্ত্ত প্রেম। তাঁহাদের ঘেরিয়া অসংখ্য ব্রজ-কিশোরী—যেন অনন্ত-প্রেম-বৈচিত্রীর—সৌন্দর্য্য-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত প্রকাশ। প্রাণের অন্তস্তল হইতে প্রীতিরসের উৎস প্রবাহিত করিয়া ইঁহারা কিশোর-যুগলের প্রীতিসম্পাদনের জন্য ব্যস্ত। এমন আপন-ভোলা সেবা আর কোথাও দেখা যায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখের, ইহকাল-পরকালের কোন অনুসন্ধানই ইঁহাদের নাই। ইঁহাদের সমস্ত বাসনা, সমস্ত চেষ্টা ঐ কিশোর-যুগলের সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে ঘেরিয়া।

নবীন-কিশোরের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী যিনি, তাঁহার নাম শ্রীরাধা; তিনি এই ব্রজ-কিশোরীদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা, সকল বিষয়ে তিনি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই নবীনা কিশোরীবৃন্দ যেন তাঁরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁর নবীন-কিশোরের সেবায় তাঁর সহায়কারিণী। ইহারা—শ্রীরাধাও—চাহেন কেবলমাত্র সেই নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণের সুখ; তজ্জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহারা করিতে পারেন, করিতেছেন। তাঁদের প্রাণবল্লভ সেই নবকিশোর নটবরের জন্য তাঁরা সকলেই বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, দেহ, গেহ, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্ত মলবৎ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁদের সেবায় দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন—সবই আছে; অধিকন্তু আর একটী জিনিস আছে, যাহা অন্যত্র নাই—স্বীয় অঙ্গদ্বারা পর্য্যস্ত সেবা। প্রেমবতী কান্তা প্রেমবান কান্তকে যে ভাবে সেবা করে, ইহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তদপেক্ষাও প্রীতিময়ী। কত রকমই বা ইঁহাদের প্রীতিবিকাশের ভঙ্গী, আর কত রকমই বা শ্রীকৃষ্ণেরও প্রেম-বিকাশের ভঙ্গী। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর-কণ্ঠালিঙ্গিতবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা গান করিতেছেন, কখনও বা পরস্পরকে ফুলসজ্জায় সাজাইতেছেন, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিতেছেন। আবার কখনও বা মান-অভিমান চলিতেছে। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া অভিমানিনী শ্রীরাধার পদপ্রান্তে ভূমিতে লুটাইতেছেন। সমস্তেই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ যেন এক আনন্দের মহাবন্যায় নিমগ্ন হইয়া সাঁতার দিতেছেন।

প্রভু যেন সমস্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আছেন। এ সময় রায় রামানন্দ বলিলেন—প্রভু "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এস্থলে দু'চারিটী কথা বলা দরকার। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদিগকে মানুষী বলিয়া মনে করিলেও স্বরূপতঃ তাঁরা জীবতত্ত্ব নহেন। (সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাগণ এবং নন্দ-যশোদাদিও জীবতত্ত্ব নহেন)। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীরাধা স্বয়ং হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী। স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজস্ব-শক্তি বলিয়া তত্ত্বতঃ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াত্ব সম্বন্ধ এবং শ্রীজীবাদি বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তারূপেই তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অভিমান বা দৃঢ়প্রতীতি। কিন্তু লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের অনুরোধে প্রকট-ব্রজলীলায় তাঁহাদের পরকীয়া-অভিমান। তাঁহাদের ভাব হইল স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব। পরকীয়া নায়িকার পক্ষে অভীষ্ট নাগরের সহিত মিলনের পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক। "কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।" যখন মিলনের সুযোগ থাকে না, তখন মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তাহার ফলে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে রসপুষ্টির সহায়তা হয়। শ্রীকৃষ্ণসেবার বলবতী উৎকণ্ঠায় স্বজন-আর্য্যপথ-বেদ-লোকধর্ম-কুলধর্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রীতির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণ বেদধর্ম লোকধর্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া (কৌমার অবস্থাতেই পরনারীর সহিত মিলিত হওয়াতে)—তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী প্রভাবও সূচিত হইতেছে। এই সম্পর্কে আর একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এইরূপ মিলন অবৈধ হইলেও কোনও পক্ষেরই স্বসুখ বাসনার গন্ধমাত্রও ইহাতে নাই; পরস্পরের প্রীতিসম্পাদনই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥—"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখোক্তি। তাঁহাদের এই মিলনে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মিলনের ন্যায় জুগুপ্সিত কাম-ক্রীড়াও নাই। আলিঙ্গন চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ ব্যাপার—তাঁহাদের ভিতরের উদ্বেলায়মান প্রেমের নির্বাধ উল্লাসের বহির্ব্বিকাশের দ্বারমাত্র; প্রাকৃত কামক্রীড়ার ন্যায় আলিঙ্গন চুম্বনাদিই তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। (গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগাবতারে সঙ্কীর্ত্তনরূপ দ্বার দিয়াই এই প্রেম বিকশিত এবং আস্বাদিত হইয়াছে)। ইহাদের লীলা যদি কামক্রীড়াই হইত তাহা হইলে আজন্ম বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসলীলা বর্ণনান্তে বলিতেন না যে, ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এসমস্ত ক্রীড়ার কথা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা শ্রবণ বা বর্ণন করেন, শীঘ্রই তাঁহারা পরাভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয় (বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥), এবং পারলৌকিক মঙ্গলকামী আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতও এসকল কথা শ্রবণ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন না। আর, পরম ভাগবত উদ্ধব মহাশয়ও ব্রজসুন্দরীদের চরণ রেণু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বৃন্দাবনে তৃণগুল্ম হইয়া জন্মলাভের সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেন না (আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥) এবং তাঁহাদের হরিকথোদ্‌গীতকেও ত্রিভুবন পাবন বলিতেন না (বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥)।

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের আর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা কোনওরূপ অপেক্ষার ধার ধারে না। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের প্রত্যেকেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—দাসদের প্রভু, সখাদের সখা, পিতা মাতার পুত্র। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বিকাশ এই সম্বন্ধের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁহাদের সেবা সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাই দাস্যভাবের পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফল দিতে পারেন না, সখারা শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন ভর্ৎসন করিতে পারেন না; যশোদামাতাও সন্তানের প্রতি মাতা যাহা করিতে পারেন, তদতিরিক্ত কোনও সেবা করিতে পারেন না। তাঁদের বেলায় সম্বন্ধ আগে, তারপর সেবা—তাঁদের প্রীতির বিকাশ হইবে সম্বন্ধের অনুগতভাবে, তাই তাঁদের কৃষ্ণরতিকে বলে সম্বন্ধানুগা রতি। কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের বেলায় অন্যরূপ। তাঁদের কৃষ্ণপ্রীতি আগে, তারপর সেবা—প্রীতির

প্রেরণায়। তাই তাঁদের কৃষ্ণরতিকে বলে প্রেমানুগা। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য যখন যাহা করা দরকার, তখন তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন; কোনও কিছুরই অপেক্ষা নাই। এই প্রীতির উচ্ছ্বাসেই তাঁহারা বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিও ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। প্রীতির প্রবল বন্যায় বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদির বাধা কোন্ দূর-দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে—প্রবল স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায়। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিতে সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে, তাই লোক-ধর্ম্মাদির অপেক্ষাও আছে। এই সম্বন্ধের উচ্চপ্রাচীরে দাস-সখাদির সেবা-বাসনা যেন প্রতিহত হইয়া আসে। ব্রজসুন্দরীদের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা প্রীতিবাসনার বিকাশে কোনও বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদের কান্ত-কান্তা সম্বন্ধ হইল তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতির বা কৃষ্ণসেবাবাসনার অনুগত। যথাপ্রয়োজন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সুযোগ পাওয়ার জন্যই তাঁহাদের এই সম্বন্ধ। তাই তাঁহাদের প্রীতির বিকাশ সকল সময়েই অবাধ, অপ্রতিহত। তাঁহাদের প্রীতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনের কথাদি সমস্তই তাঁহারা জানিতে পারেন। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন "মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ আদিপুরাণ॥—হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন; অন্য কেহ তাহা জানেন না।" তাই গোপিকারাই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারেন এবং এজন্যই কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে॥ ২।৮।৬৯॥" আর প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ এই কান্তাপ্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ ২।৮।৬৯॥" গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।—আমাকে যিনি যেভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করি"। কিন্তু গোপীদের ভজনে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে; তিনি তাঁহাদের সেবার অনুরূপ সেবা করিতে পারেন না। তাই তিনি নিজমুখেই তাঁদের নিকটে নিজের চিরঋণিত্ব স্বীকার করিয়া স্পষ্টকথায় বলিয়াছেন—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২২—হে গোপীগণ! দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। আমার সহিত তোমাদের যে মিলন, তাহা অনিন্দ্য। দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও তোমদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হউক।" এরূপ ঋণিত্ব আর কোনও পরিকরের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, যিনি পরব্রহ্ম পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্, তিনি কিনা গোপ-কিশোরীদের নিকটে নিজেকে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন! নিরুপাধি প্রেমের কি অনির্ব্বাচ্য, অচিন্ত্যনীয় প্রভাব! যাহা পরম-স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত যেন "তৃণাদপিসুনীচ"-ভাব ধারণ করায়। তাই, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী।" এতাদৃশী গরীয়সী হইতেছে গোপিকাদের কৃষ্ণপ্রীতি। তাঁদের মতন নিগূঢ় প্রেম-ভাজনও শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই; একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥ আদিপুরাণ॥—হে পার্থ! গোপীগণ তাঁহাদের নিজের দেহকেও আমার (আমাতে অর্পিত আমার সুখসাধন) বস্তুজ্ঞানে (মার্জ্জনভূষণাদিদ্বারা) যত্ন করেন। এতাদৃশী গোপিকাগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহ নাই।"

গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতি প্রেমবিকাশের চরম-স্তরে গিয়া উঠিয়াছে। এই স্তরের নাম মহাভাব। দ্বারকা-মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের কান্তা; কিন্তু এই মহাভাব তাঁদের পক্ষেও সুদুর্লভ। "মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্লভঃ।" এই মহাভাবের একটী স্বভাব এই যে, ইহা মহাভাববতীদিগের দেহেন্দ্রিয়াদিকে নিজের স্বরূপতা—মহাভাবতা—প্রাপ্ত করায়; "স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।" মহাভাব হইল হ্লাদিনীর সারভূত বস্তু—সুতরাং স্বরূপতঃই পরম-আস্বাদ্য—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ।" ব্রজসুন্দরীদের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি মহাভাব-রূপতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহারাও পরম-আস্বাদ্য। তাই তাঁহাদের তিরস্কারও রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরম-আস্বাদ্য। "প্রিয়া যদি

মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ ১।৪।২৩ ॥" চিনি স্বরূপতঃই মিষ্ট; চিনি দ্বারা যদি একটা নিমফল তৈয়ার করা হয়, তাহা হইলে তাহা দেখিতে তিক্ত নিমফলের মত হইলেও, তাহার স্বাদ মিষ্টই হইবে। তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীদের তিরস্কারের রূপটী তিক্ত—অপ্রীতিকর—হইলেও মহাভাবেরই বৈচিত্রীবিশেষ বলিয়া তাহার আস্বাদন পরম-লোভনীয়। পরমাস্বাদ্য-মহাভাবরূপ হৃদয় হইতে মহাভাবরূপ মুখ দিয়া মহাভাবের তরঙ্গে পরিনিষিক্ত হইয়া যাহা বিকশিত হয়, তাহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতা মহাভাবেরই ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। তিরস্কারকেও পরম আস্বাদ্য করিয়া তোলে যে প্রেম, সেই প্রেমের মধুরিমা যে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

ব্রজদেবীদের প্রেমের কৃষ্ণবশীকারিতার কথা বলিয়া রায়রামানন্দ তাহার আর একটী অদ্ভুত কথাও বলিলেন, তাহা এই। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য স্বভাবতঃই "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" কিন্তু তিনি যখন ব্রজদেবীদিগের সঙ্গে থাকেন, তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবে সেই মাধুর্য্য আরও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যায়। "যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥ ২।৮।৭২ ॥"

গীতার সর্ব্বশেষ উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন। সেই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া পরম-সার্থকতা লাভ করিয়াছে একমাত্র গোপীপ্রেমেই, অন্যত্র কোথাও নয়।

কান্তপ্রেম সম্বন্ধে এসমস্ত জানিয়া প্রভু রামরায়কে বলিলেন—"এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥" প্রভুর পিপাসা এখনও চরমা তৃপ্তি লাভ করে নাই। রামানন্দরায়ের প্রকাশ-চাতুর্য্যে সূর্য্যোদয়ে কমলের ন্যায় বিষয়টী যেন স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইতেছে—স্তরে স্তরে। রায়ের রস-পরিবেশন-পরিপাট্যও অপূর্ব্ব।

রাধাপ্রেম। প্রভুর কৌতূহল বুঝিয়া রামানন্দ বলিলেন—"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥"

রায়ের কথা শুনিয়া, রাধাপ্রেমের মহিমার কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু যেন একটা আপত্তি উত্থাপন করিবার সূচনা করিয়া বলিলেন—"আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে। অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥"

এইরূপ সূচনা করিয়া স্পষ্টভাবেই প্রভু আপত্তিটী জানাইলেন। বলিলেন—রায়, তুমি যে বলিতেছ, রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি; কিন্তু তাহার প্রমাণ যেন জাজ্জ্বল্যমানরূপে পাওয়া যাইতেছে না। রাধাপ্রেমের মহিমা যদি সর্ব্বাতিশায়ীই হইবে, তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ "চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ রাধালাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥" এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। কথা হইতেছে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) সম্বন্ধে। শ্রীরাধার প্রেম অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে—ইহা যদি প্রভু বলিতেন, তাহা হইলেই যেন তাঁহার আপত্তিটী প্রকরণসঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি প্রশ্ন তুলিলেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গাঢ়তা সম্বন্ধে—রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ গাঢ় নয়; যেহেতু, তাহার এই অনুরাগ এত প্রবল নয়, যাহাতে তিনি গোপীদিগের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্যত্র যাইতে পারেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর প্রশ্নটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এই প্রশ্নটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয় তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবদ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণ দ্বারা জ্বরের পরিমাণ জানা যায়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জনিতে হয়। ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গাছের দোলানীর পরিমাণ দ্বারা, তদ্রূপ, রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক

রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগসমুদ্রকে এমনভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রীতি-বিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে, সর্ব্ববিধ অন্যাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে রাধাপ্রেমের প্রভাব— মহিমা—সর্ব্বাতিশায়ী। প্রভু বলিলেন— কিন্তু তাতো নয়। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের অপেক্ষা রাখেন।

রামানন্দরায় অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। রসের বৈচিত্রীবিশেষ প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে, কিম্বা অন্য কোনও কারণে শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে তিনি অন্য গোপীর অপেক্ষা রাখেন— সময়ে সময়ে এইরূপ দেখা যাইতে পারে। সকল সময়েই যদি তাঁহার এইরূপ অন্যাপেক্ষা দৃষ্ট হইত, যদি কোনও সময়েই তাঁহার ব্যবহারে অন্যাপেক্ষা-হীনতা দেখা না যাইত, তাহা হইলেই বুঝা যাইত যে তিনি কিছুতেই অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা হইলেই বুঝা যাইত—শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করিতে সমর্থ নয়; কিন্তু তাহা নয়। জয়দেব-বর্ণিত রসন্তরাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রায়রামানন্দ প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীরাধার উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ভাবেই—তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বিষয়টী এই। শতকোটি গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্তরাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক রাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্নসূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল। রাসলীলা রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ আর যেন বহিতেছেনা। কেন এমন হইল? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরীই নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধারে খোঁজে যাইতেছি। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

যত যত স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে, এমনকি ব্রজেও শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে, তৎসমস্তের মধ্যে রাসলীলাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী। একথা তিনিই নিজমুখে বলিয়াছেন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তাঃ মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ বৃহদ্বামন॥—আমার অনেক মনোহারিণী লীলা আছে বটে; কিন্তু রাসের কথা মনে হইলে আমার মন যে কিরূপ হয়; তাহা বলিতে পারি না।" এতাদৃশী রাসলীলার সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী হইলেন শ্রীরাধা; তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্র শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলিয়াছেন এবং শ্রীল জয়দেবগোস্বামী শ্রীরাধাকে—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাসলীলার বাসনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে—শৃঙ্খলসদৃশা বলিয়াছেন। "কংসারেরপি সংসাররাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা—কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে সারভূত-বাসনাকে (রাসলীলার বাসনাকে) আবদ্ধ করিয়া রাখিবার শৃঙ্খলরূপা। তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসলীলার বাসনাও থাকেনা।" শতকোটি গোপী বিদ্যমান থাকিতেও শ্রীরাধাব্যতীত রাসলীলা নির্ব্বাহিত হইতে পারেনা, ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাধিক্য প্রমাণিত হইতেছে।

রায়ের মুখে এই বিবরণ শুনিয়া, রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী মহিমা উপলব্ধি করিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি প্রীতিগদ্‌গদ্-কণ্ঠে রামানন্দকে বলিলেন—"যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।"

কিন্তু যদিও প্রভু মুখে বলিলেন—"এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।" তাঁহার কৌতূহল যেন তখনও উপশান্ত হয় নাই। তাই তিনি আবার রায়কে বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" মনে হয়, রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধেই তিনি আরও কিছু জানিতে চাহেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন যেন অন্য কথা।

তিনি বলিলেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধিকা-স্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥" এই প্রশ্ন শুনিলে মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন জানা হইয়া গিয়াছে ; এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর কৌতূহল নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে চাহিলেন ; উদ্দেশ্য যেন—রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব। রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে একটী মাত্র প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করিলেন। বসন্তরাসের দৃষ্টান্তে রায় তাহার সমাধান করিলেন। সেই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার কৌতূহল তখনও রহিয়া গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন—এক্ষণে "সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম। কিন্তু "রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি—তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম।"—একথা প্রভু বলিলেন না। এক্ষণে তিনি রাধাপ্রেমের মহিমাকে বিকশিত করার জন্য প্রকাশ্যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন না করিয়া একটী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায়। আর এক স্তবক বিকশিত হইবে বিলাস-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায়।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করাইয়াছে, সেই কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমা সম্যক্‌রূপে জানা যাইতে পারে না। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

যে-রাধার প্রেম কৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না-জানিলেও তাঁহার প্রেমের মহিমা সম্যক্ জানা যাইতে পারে না। তাই রাধাতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

আর যে প্রেমের এমন প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব—সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও তাহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে না। তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না ; যেহেতু, এই রাধাপ্রেমের প্রভাবেই রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ এবং রাধাপ্রেমের দ্বারাই সেই রসের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব। তাই রসতত্ত্বসম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

রায়রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে সমস্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত-বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত অবতারের আধার। কত বড় বিরাট তত্ত্ব! অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। এতাদৃশ বস্তুকে যে প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে পারে, সে প্রেমের মহিমা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়।

রসতত্ত্ব। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আর একটা দিকের কথা বলিলেন—রসের দিক। শ্রীকৃষ্ণ রসিক শেখর। শ্রুতির "রসো বৈ সঃ।" রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ বলিয়া সর্ব্বশক্তির প্রভাবে তিনি সর্ব্বরসপূর্ণ; অখিল-রসামৃত-বারিধি, সমস্ত রসের বিষয় এবং আশ্রয়। বিভুতত্ত্ব হইয়াও রসাস্বাদন করিবার এবং করাইবার জন্য, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান সচ্চিদানন্দ-তনু। অজ, নিত্য, শাশ্বত হইয়াও; সর্ব্বকারণ-কারণ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশে তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বের অভিমান। আস্বাদ্যরসরূপে নিত্য-নবায়মান আস্বাদ্য-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া, সকলের চিত্তে তাহার আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসা এবং তজ্জনিত পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তিনি সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন ; তাই তিনি "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" এবং "পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥" ব্রজদেবীদিগের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যবৃদ্ধির হেতু। শ্রীরাধায় প্রেমবিকাশের চরম-পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যবিকাশেরও পরাকাষ্ঠা। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড়

করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে নাহি হারি॥” শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, তখন শ্রীরাধার প্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—উভয়েই যেন জেদাজেদি করিয়া বাড়িতে থাকে, কেহই যেন আর কাহারও নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। মাধুর্য্যের এই চরম-বিকাশেই শ্রীকৃষ্ণ মদন-মোহন—“সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।” যাঁহার মোহিনী-শক্তির এক কণিকার আভাস মাত্র পাইয়া প্রাকৃত মদন সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই অপ্রাকৃত মদনও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এবং তাঁহার রসত্বের অত্যধিক বিকাশই সূচিত হইতেছে এবং এই অত্যধিক বিকাশের হেতুও শ্রীরাধার প্রেম। ইহাও রাধাপ্রেমের মহিমাব্যঞ্জক।

সমস্ত রসের মধ্যে মধুররস বা শৃঙ্গাররসই সকল বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রসত্বের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপে বিরাজিত। “শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্ত্তিধর।” শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিত্বের বিকাশ এবং সার্থকতা এবং তাহাতেই তিনি “লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥” ইহাতেও রাধাপ্রেম-মহিমার অসাধারণত্ব সূচিত হইতেছে।

এস্থলেই রায়রামানন্দ রসতত্ত্বের কথা বলিলেন এবং রাধাপ্রেমের মহিমাতেই যে রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসত্বের চরম বিকাশ, ভঙ্গীতে তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

প্রেমতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব। ইহার পরে রায়-মহাশয় রাধাতত্ত্ব এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রেমতত্ত্বের কথাও বলিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব যেমন একই বস্তু, স্বরূপতঃ রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বও একই বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে সর্ব্বশক্তি গরীয়সী হইল হ্লাদিনী—আনন্দস্বরূপা—আনন্দদায়িকা শক্তি। এই হ্লাদিনীর সার বা ঘনীভূত অবস্থার নামই প্রেম; তাই প্রেম পরম-আস্বাদ্য। “রতিরানন্দরূপৈব। ভ, র, সি,।” হ্লাদিনীর এই আনন্দ—আস্বাদ্যত্ব—হইল চিদানন্দ, চিন্ময় এবং পরম আস্বাদ্য বলিয়া তাহাও রসস্বরূপ। তাই প্রেমের আর একটী নাম—“আনন্দচিন্ময় রস।” প্রেমের এই আনন্দ—চিদ্‌বস্তু বলিয়া স্বপ্রকাশ; তাই ইহা নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে; নিজেকেও নিজে আস্বাদন করিতে পারে; অপরের মনেও আস্বাদন বাসনা জাগাইতে পারে এবং অপরের দ্বারা নিজেকে আস্বাদন করাইতেও পারে। ইহাই প্রেমের সাধারণ তত্ত্ব।

প্রেমের পরম-সারকে—চরম-গাঢ়তাপ্রাপ্ত প্রেমকে—বলে মহাভাব। এই মহাভাব সমস্ত ব্রজদেবীগণেই বিরাজিত; অপর কোনও কৃষ্ণপরিকরে মহাভাব নাই। মহাভাবেরও চরমতম বিকাশের—গাঢ়তার চরমতম-পরাকাষ্ঠার—নাম হইল মাদনাখ্য-মহাভাব। এই মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারও মধ্যেই নাই—অপর ব্রজদেবীগণেও না। আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া আত্মারাম, স্বরাট্‌, পূর্ণতমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মত্ততা জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার নাম মাদন। এই মাদন-শব্দই মাদন-ভাববতী শ্রীরাধার প্রেমের অসাধারণ মহিমা সূচিত করিতেছে। এই মাদনেই প্রেমতত্ত্বের চরমতম বিকাশ।

শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব—মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ, এবং মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রীও। তাঁহার স্বরূপই মহাভাব। ভগবান্ এবং তাঁহার বিগ্রহ যেমন একই অভিন্ন বস্তু, যে-ই বিগ্রহ, সে-ই যেমন ভগবান এবং যে-ই ভগবান, সে-ই যেমন বিগ্রহ (অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র), তদ্রূপ, মহাভাব এবং শ্রীরাধা—উভয়ই এক এবং অভিন্ন বস্তু। মহাভাবই শ্রীরাধার বিগ্রহ। “প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমবিভাবিত।” শ্রীরাধা মহাভাব-ঘনবিগ্রহা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন আনন্দঘনবস্তু, শ্রীরাধাও তেমনি প্রেমঘন বস্তু। শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই ঘনীভূত-মহাভাব দ্বারা গঠিত—মহাভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত নয়—মহাভাবের স্বরূপতাপ্রাপ্ত নয়—মহাভাবই, মহাভাব দ্বারা গঠিতই।

মহাভাব হইল কান্তাভাবের প্রেম। শ্রীরাধা যখন মহাভাব-স্বরূপা, তাঁহার প্রেমও যখন বিকাশের চরম-তম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, তখন সহজেই বুঝা যায়, তিনি “কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা।”

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারসের অশেষ-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্য নিজেই ললিতাদি-সখীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংভগবান, শ্রীরাধাও তেমনি স্বয়ং-কান্তাপ্রেম। রসবৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীরাধাও অনন্ত কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখিল-রসামৃতসিন্ধু, শ্রীরাধাও তেমনি অখণ্ড-রসবল্লভা।

শ্রীরাধা স্বয়ংপ্রেমস্বরূপা হওয়াতেই তাঁহার প্রেমের-অসাধারণ মহিমা।

বিলাস-মহত্ত্ব। রায়ের মুখে প্রভু রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শুনিলেন। শুনিয়া—অখণ্ড-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ং-কান্তাপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিল-রসামৃতবারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ সাক্ষাৎ-মন্মথ মদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম মহিমার যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই তিনি রায়কে বলিলেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস মহত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিয়া রায় বলিলেন—"কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।" এবং ধীরললিতত্বের ব্যঞ্জনা কি, তাহাও বলিলেন। প্রেয়সীদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া এবং সর্ব্বাধিকরূপে শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস সুখে নিমগ্ন থাকেন। রায় আর কিছু বলিলেন না। শ্রীরাধাপ্রেমের মহা আকর্ষকত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণবশীকরণবিষয়ে তাহার মহাসামর্থ্যের ব্যঞ্জনা জানাইয়াই রায়মহাশয় নীরব হইলেন।

প্রভুর কৌতূহল কিন্তু এখনও নিবৃত্তি লাভ করে নাই। তিনি বলিলেন—"এই হয়, আগে কহ আর।"—রামানন্দ, রাধাকৃষ্ণের বিলাস মহত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা বেশ, অতি চমৎকার। কিন্তু আরও কিছু আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, বিলাস সম্বন্ধে আরও কিছু বল।

রায় যেন বিস্মিত হইয়াই বলিলেন—"ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥ যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥"—প্রভু, আমার মুখে কৃপা করিয়া তুমি যাহা প্রকাশ করাইয়াছ, তাহার উপরে তো আমার বুদ্ধির গতি নাই। তবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে তোমার কৃপায় আমার সামান্য যাহা একটু অনুভব লাভ হইয়াছে, আমার রচিত একটী গীতে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। জানি না, তাহা শুনিয়া তুমি সুখ পাইবে কিনা ; তথাপি আমি তাহা ব্যক্ত করিতেছি। এইরূপ বলিয়া রায়মহাশয় স্বর-তান-লয় যোগে স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতটী গান করিলেন।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।
অব সেই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুষ-প্রেমকি ঐছন রীতি॥

গানটী শ্রীরাধার উক্তি। গানের "না সো রমণ না হাম রমণী"—পদে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের ইঙ্গিত। বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ পরিপক্ক অবস্থা (শ্রীজীব) এবং বিপরীত (চক্রবর্ত্তী)। উভয় অর্থই এস্থলে গ্রহণ করা যায়। পরিপক্ক অবস্থার ফলে বৈপরীত্য। প্রেমের চরম-পরিপক্ক অবস্থায় পুনঃ পুনঃ মিলনেও মিলনবাসনার অতৃপ্তিবশতঃ মিলনের জন্য যে বলবতী উৎকণ্ঠা, তাহার ফলে বাস্তব মিলনেও যে স্বপ্নবৎ প্রতীতি, নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি এবং বৈপরীত্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক। একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিষয়টীর আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর বিশেষ কিছু বলা হইল না।

যাহা হউক, গীতটী শুনিয়া প্রেমোল্লাসবশতঃ প্রভু স্বহস্তে রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। আর মুখে বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে প্রভুর পিপাসা সম্যক্‌রূপে উপশান্ত হইল। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে রাধাপ্রেম-মহিমার যে পরিচয় পাইলেন, তাহাই চরমতম সাধ্যবস্তু বলিয়া প্রভু স্থির করিলেন—জীবের কথা তো দূরে, অনন্ত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত ভগবৎ-পরিকর আছেন, তাঁহাদের কথাও দূরে; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞানকে পর্য্যন্ত যাহা স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে, সেই প্রেমের আশ্রয় যে তাঁহার ব্রজপরিকরগণ, তাঁহাদের মধ্যেও ইহা অপেক্ষা উন্নততর সাধ্যবস্তুর কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। তাই প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।

সাধন। ইহার পরে প্রভু সাধনসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। "সাধ্যবস্তু সাধনবিনু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥"

প্রভু যে সাধনের প্রসঙ্গ তুলিলেন, সেই সাধন জীবের। যে রাধাপ্রেমকে প্রভু "সাধ্যবস্তুর অবধি" বলিলেন, তাহা নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধায় বিদ্যমান। ইহা তাঁহার কোনরূপ সাধনের ফল নহে। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি হইলেও সাধনের প্রভাবে কেহ তাহা পাইতে পারে না। ইহা প্রেমবিকাশের সর্ব্বোপরিতন স্তর মাদনাখ্যমহাভাব। অন্যের কথা দূরে, অন্য ভগবৎ-পরিকরদের কথাও দূরে, অন্য ব্রজদেবীগণেরও ইহা দুর্ল্লভ। জীবের কথা আর কি বলা যাইবে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। দাসের সেবা সর্ব্বদাই আনুগত্যময়ী—রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবাই জীব পাইতে পারে। কিরূপ সাধনে জীব "সাধ্যবস্তুর অবধি"-রূপ রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবা পাইতে পারে, তাহাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীরাধার প্রেমের বিকাশও হয় লীলাতে। রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবার অবকাশও লীলাতেই। কিন্তু শ্রীরাধার সখীগণ ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলায় অন্য কাহারও অধিকার নাই। "সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ সখীবিনু এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥ সখীবিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।" সখীগণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে এই লীলার সেবা দিয়া থাকেন, তিনিই তাহা পাইতে পারেন; অন্যের পক্ষে এই সেবা একান্ত সুদুর্ল্লভ। তাই, "সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

সখীভাবে সখীদের আনুগত্যে ভজন করিতে হইবে। সখীভাবে অর্থ—"আমি নিজে শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপা এক গোপকিশোরী"—এইরূপ ভাব। কিঙ্করী বলিয়া যে গৌরব-বুদ্ধি-আদিদ্বারা সেবাবুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, তাহা নয়; সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচাভাব—শ্রীরাধার সখীস্থানীয়া গোপসুন্দরীদিগের আনুগত্যে স্বচ্ছন্দে প্রাণমন-ঢালা সেবা। ইহাই "সখীভাব" শব্দের ব্যঞ্জনা।

ইহাকে রাগানুগা-ভজন বলে। এই ভজনে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-জ্ঞান হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাগানুগার ভজন আরম্ভই হয় না। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভই এই সাধনের প্রবর্ত্তক। রাগানুগা-ভজন একটী পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

রাধাপ্রেমের (কান্তাভাবের) আনুগত্যময়ী সেবা জীবের পক্ষে সাধ্যবস্তুর অবধি হইলেও সকলেই যে এই সেবা প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হয়, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। তাই রুচিভেদে দাস্যভাব, সখ্যভাব এবং বাৎসল্যভাবের আনুগত্যময়ী সেবার অনুকূল ভজনও দৃষ্ট হয়। এসমস্ত ভাবের ভজনও রাগানুগা-ভজন। যিনি যে ভাবের সেবা চাহেন, তিনি—শ্রীকৃষ্ণের সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যেই ভজন করিয়া থাকেন। ব্রজের কোনও ভাবের ভজনেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে ব্রজভাবের সেবা পাওয়া যায় না। নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার না করিলেও ব্রজভাবের ভজন সার্থক হয় না।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন, রায়রামানন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ত্বের কথা বলিলেন। যিনি বিদগ্ধ, যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত, এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সে-রূপ বশীভূত—এই সমস্তগুণ যে নায়কের মধ্যে বর্ত্তমান, তাঁহাকেই ধীরললিত বলা হয়। "বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ॥" ধীরললিত কৃষ্ণ "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ ২।৮।১৪৮॥" বিলাসের কি অদ্ভুত শক্তি, কি অদ্ভুত লোভনীয়তা! যিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পান না, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেয়সীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্ব্বব্যাপকতত্ত্ব হইলেও প্রেয়সীসঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহত্ত্বের কথা রায়রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইল না; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। "প্রভু কহে—এই হয় আগে কহ আর।" রামানন্দ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিলাস-মহত্ত্বের সব কথা যেন বলা হয় নাই। আরও যেন গূঢ় রহস্য কিছু আছে। তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। বল রামানন্দ।"

তখন রায়রামানন্দ বলিলেন—"যে বা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল॥—"প্রভু, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটী গূঢ়তম রহস্য আছে—সত্য। আমার নিজের রচিত একটী গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, জানি না। যদি না পারিয়া থাকি, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবে না—যাহা জানিবার জন্য তোমার বাসনা জাগিয়াছে, আমার গীতের ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিতে আমি যদি অসমর্থ হইয়া থাকি, তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবে না; সুখও পাইবে না। তাই প্রভু, নিজের অসামর্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে—গীতটী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি; তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটী ইহাতে আছে কিনা দেখ।"

এইরূপ উপক্রম করিয়া রামানন্দ গীতটী গাহিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া প্রভুর প্রেমের বন্যা যেন উথলিয়া উঠিল। প্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, রায় যেন আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু কেন এরূপ করিলেন, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

যে গীতটী রামানন্দ গাহিলেন, তাহা হইতেছে এই। "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী, দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥ এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥ অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী। সুপুরুষ প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

এই গীতটীর অন্তর্গত—"না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"-এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটী নিহিত আছে।

কিন্তু এই রহস্যটী কি? "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রহস্যটীর উদ্ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। তাই ঐ শব্দটীরই অর্থালোচনা করা যাউক।

বিবর্ত্ত-শব্দটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "বিপরীত।" উজ্জ্বল-নীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বকারেঃ সুমুখি নববিবর্ত্তঃ" স্থানে "বিবর্ত্তঃ" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরিপাকঃ।" আর বিবর্ত্তের একটী সাধারণ এবং সর্ব্বজনবিদিত অর্থ আছে—ভ্রম।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে। অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, "বিপরীত" এবং "ভ্রম" অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থের বহির্লক্ষণ-সূচকরূপে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ হইল—প্রেমবিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটী বৈপরীত্য, আর একটী ভ্রান্তি। যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, লক্ষণদ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারাই ইহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবর্ত্তিপাদ একটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীত বা বৈপরীত্য।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টিপ্পনীতে লিখিত আছে যে—"বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা।" বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা তখন জন্মে, যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকে না,—কোনও স্মৃতি থাকে না, তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস; কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকে না, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য— নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে। "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থে এই বৈপরীত্যের কথাই সম্ভবতঃ বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল। বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক। এস্থলে বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ—পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা; তাহার ফল বা লক্ষণ—ভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য।

কিন্তু এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়; এবং এইরূপ বৈপরীত্য বোধ হয় প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণও নয়। কারণ, নায়ক-নায়িকা—প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে—পরামর্শ করিয়াও তাঁহাদের চেষ্টার বৈপরীত্য ঘটাইতে পারেন; ইহা নায়ক-নায়িকার সাধারণ ভাব—ইহাতে বিলাস-মহত্ত্ব নাই। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেন, শ্রীরাধা প্রীতিভরে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হন; যদি কখনও শ্রীরাধাই বংশীধ্বনি করেন এবং তাহার শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাপ্লুত হন, তাহাতেও তাঁহাদের চেষ্টার বৈপরীত্য—বিপরীত বিলাস—প্রকাশ পাইবে। যদি পরস্পরের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় মিলিত হওয়ার পরে পরস্পরের সুখবর্দ্ধনের জন্য উৎকণ্ঠার আধিক্যবশতঃ, নিজেদের অজ্ঞাতসারে—কেবলমাত্র উৎকণ্ঠাধিক্যের প্রেরণাতেই ঐরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই এই বৈপরীত্যকে পরমোৎকণ্ঠার একটী বিশেষ লক্ষণ বলা চলে, অন্যথা নয়। পরবর্ত্তী আলোচনায় বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইতে পারে।

একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। "প্রেমবিলাসের" অর্থাৎ প্রেমজনিত—আত্মসুখবাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয়ের সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে উদ্ভূত, তাদৃশ প্রেমের প্রেরণায় সংঘটিত—"বিলাসের" কথাই বলা হইতেছে।

কাম-বিলাসের অর্থাৎ স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত বিলাসের কথা বলা হইতেছেনা; কাম-বিলাস হইতেছে পশুবৎ বিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই—ইহা বরং জুগুপ্সিত। "প্রেমবিলাস"-শব্দের অন্তর্ভূত "প্রেম"-শব্দেই কাম-বিলাস নিরসিত হইয়াছে।

(২)

বিলাসমাত্রৈক তন্ময়তাজনিত ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের চরম-পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীল কবিকর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়ো র্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্ণোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপাদ্যবাদীৎ ॥—শ্রীল রামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তদুভয়ের পরম-একত্ব সূচক একটী গীত বলিয়াছিলেন। ১৩৷৪৫ ॥"

(৩)

বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত বিপরীত বিলাস যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীব-গোস্বামীর গোপালচম্পূ গ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূর "সর্ব্বমনোরথপূরণ"-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীজীব এই পূরণটীর নাম দিয়েছেন—সর্ব্বমনোরথ-পূরণ। ইহাতেই এই পূরণে বর্ণিত লীলার অপূর্ব্বত্ব এবং অসাধারণত্ব সূচিত হইতেছে। যাহা হইক, এই পূরণের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে—"তদেবং রামানুজস্য রমণীনামপ্যমুষাং দিনং দিনমপ্যনুপরমণং রমণমতীব জীবনসমতামবাপ ॥ ২ ॥—রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের রমণীদিগের (শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তা ব্রজতরুণীদিগের) দিনের পর দিন অনুপরমণ (যাহার উপরমণ—উপরতি বা উপশান্তি নাই, এইরূপ) রমণও (বিলাসও) অতীব জীবন-সমতা লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ উপরতিহীন বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না। দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণাশান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।

রামানন্দরায় শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে "নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥"—ইত্যাদি বাক্যে ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কেলিবাসনার উদ্দামতা এবং উপশান্তিহীনতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আর এস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির কেলিবিলাস-বাসনার উদ্দামতা এবং উপশান্তিহীনতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ নায়ক-নায়িকার প্রত্যেকের মধ্যেই যদি কেলিবিলাস-বাসনা সমানরূপে উদ্দামতা এবং তৃপ্তিহীনতা লাভ করে, নিজ-বিষয়ক অনুসন্ধানে সম্যক্‌রূপে জলাঞ্জলি দিয়া পরস্পরের সুখবিধানের জন্য প্রত্যেকের মনেই যদি সমানরূপে দুর্দ্দমনীয়া বলবতী লালসা জন্মে, তাহা হইলেই বিলাস-সুখের চরম-পরকাষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। কেবলমাত্র এক পক্ষের মধ্যেই যদি এইরূপ বাসনার উদ্দামতা থাকে, তাহাতে বিলাসের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। রামানন্দরায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীরাধার কথা কিছু বলেন নাই; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বলিলেন—বিলাস-মহত্ত্বের আরও রহস্য আছে, রামানন্দ; তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হয; খুলিয়া বল। রামানন্দ একেবারে খুলিয়া বলিলেন না, ইঙ্গিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস-বাসনার উদ্দামতার তাৎপর্য্যসম্বন্ধে আরও দু'একটী কথা বলা দরকার। ইঁহারা কেহই নিজের সুখ চাহেন না। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য কান্তাপ্রীতির মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরাধা তাঁহার উচ্ছলিত প্রেমভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরসনির্য্যাস পান করাইবার উদ্দেশ্যে। তাঁহার সেবাবাসনা উদ্দামতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাগ্রহণ-বাসনাও যদি শ্রীরাধার সেবাবাসনার সমান উদ্দামতা লাভ করে, তাহা হইলেই শ্রীরাধার সেবা-

বাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আবার শ্রীরাধার সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনার মূলে যদি তাঁহার স্বসুখ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলেও সেবাগ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, শ্রীরাধার সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে যেমন স্বসুখ বাসনার ছায়ামাত্রও নাই, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তেমনি নাই। তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই তাঁহার শ্রীরাধিকাদি ভক্তবৃন্দের সুখের নিমিত্ত; একথা তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণ॥" বাস্তবিক, মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের এমনই এক অদ্ভুত প্রভাব যে, তাঁহাদের সেবাবাসনার উদ্দামতা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণবাসনার উদ্দামতা জাগাইয়া তোলে। উভয় পক্ষের বাসনার উদ্দামতাতেই তাঁহাদের মিলন এবং বিলাসাদি মহামহিমময় হইয়া উঠে। অন্যান্য ব্রজসুন্দরী অপেক্ষা মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার সেবাবাসনার উদ্দামতাই সর্ব্বাতিশায়িনী, যেহেতু তাঁহার মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম বিকাশ, এবং তাঁহার সেবাবাসনার উদ্দামতাই শ্রীকৃষ্ণের মনেও সেবাগ্রহণ-বাসনার অনুরূপ উদ্দামতা জাগাইতে সমর্থ। তাই এই উভয়ের মিলনেই তাঁহাদের বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশের সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের এই চরমতম বিকাশের কথাই মহাপ্রভু জানিতে চাহিয়াছেন। "শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।'

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত গোপালচম্পূবর্ণিত কেলিবিলাস-বাসনার অপরিতৃপ্তির ফলে তাঁহাদের মিলনোৎকণ্ঠা এতই অধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলন কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে ছিল না, তথাপি তাহাদের মিলন-স্পৃহা কখনও প্রশমিত হইত না; বাস্তব-মিলনও তাঁহাদের নিকট স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হইত—পিপাসু ব্যক্তি স্বপ্নে জলপান করিলে যেমন তাহার পিপাসার উপশম হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের বাস্তব-মিলনেও তাঁহাদের মিলন-স্পৃহা যেন কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমিত হইত না। "যদপি পরস্পরমিলনং হরিগোপীনাং চিরান্ন বিচ্ছিন্নম্। তদপি ন তৃষ্ণা শান্তা স্বাপ্নিকপানে যথা পিপাসূনাম্॥ গো, চ, পূ, ৩৩।৪॥"

উপশান্তিহীন কেলিবিলাস-বাসনার প্রেরণায় কিরূপ লীলা-প্রবাহে তাঁহারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেন, শ্রীজীব তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। "অন্যোহন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষত্যলং চুম্বতি। ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদি-শত্যুদ্ভূষয়ত্যন্বহম্॥ গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্ব্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে। শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং স্বকরবং কুর্বীয় কিং বেত্ত্যপি॥ ৫॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপনস্থানে যাইতেন, মিলিত হইতেন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেন, চুম্বন করিতেন, উল্লসিত করিতেন, রতিকথা বলিতেন, আমার বেশরচনা কর—এইরূপ আদেশ করিতেন এবং পরস্পর পরস্পরের বেশ রচনাও করিতেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃপুনঃ বহুবিধ কেলিবিলাসে নিরত থাকিতেন। কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তাঁহাদের থাকিত না॥'

উল্লিখিত শ্লোকের "অন্যোহন্যম্-শব্দ হইতেই জানা যায়, শ্লোকে উল্লিখিত আলিঙ্গন-চুম্বন-বেশরচনাবিষয়ে আদেশাদি-ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী হইতেন এবং কখনও বা শ্রীরাধিকাই অগ্রবর্ত্তিনী হইতেন—শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিতেন, বেশরচনার জন্য আদেশ দিতেন, আবার কখনও বা শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে। কেই বা রমণ, আর কেই বা রমণী—আর কেই বা কান্ত, কেই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল; ইহাই রায়রামানন্দের গীতের "না সো রমণ, না হাম রমণী বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই রায়রামানন্দের গীতের 'দুহু' মন মনোভব পেষল জানি।"—বাক্যের তাৎপর্য্য। যতক্ষণ চিত্তের ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই কে কান্ত এবং কে কান্তা—এই জ্ঞান বর্ত্তমান

থাকে ; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে প্রেম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ চিত্তের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই কান্তাকান্তের ভেদ-জ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায় ; তখন বর্ত্তমান থাকে একমাত্র বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তা এবং প্রেমকেলি-বাসনার অতৃপ্তিই এই তন্ময়তাকে নিবিড়তম গাঢ়তা দান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত "অন্যোহন্যং রহসি"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিলাস-বৈপরীত্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেও জানা যায়। রাসকেলি-বর্ণনাত্মক "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ১০।৩৩।২৫॥"—এই শ্লোকের "অনুরতাবলাগণঃ" শব্দের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"রমণস্য কর্তৃত্বং স্বং তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ। অনু তদ্রমণান্তরং রতা রমণকর্ত্র্যঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ।—রমণকর্ত্তার স্বীয় কর্তৃত্ব সেই সমস্ত গোপীগণও পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রমণের পরে অবলাগণও রমণকর্ত্তা হইয়াছিলেন (এস্থলেই বিলাসের বৈপরীত্য সূচিত হইয়াছে)।" এই বিলাস বা রমণ বলিতে কি বুঝায়, তাহাও চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সিষেব" শব্দের টীকায়। "মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতি বৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া—ভক্ত যে ভাবে মহাপ্রসাদান্ন সেবা করেন, শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবে কামবিলাস সেবা করিয়াছিলেন ; যেহেতু, এসমস্ত কামবিলাস প্রাকৃত কামবিলাস নহে (ইহাদ্বারা পশুবৎ বিলাস নিরসিত হইয়াছে)।" এই বিলাস কি রকম, "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"-শব্দের টীকায় তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। "তদা চ ভগবতো রাত্রিন্দিবং তৎকেলিবিলাসৈকতানমনস্ত্বভূদিত্যাহ। আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনঃ ভাবহাববিব্বোককিলকিঞ্চিতাদয়ঃ বাম্যোৎসুক্যহর্ষাদয়ঃ স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ দর্শনস্পর্শনাশ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ।—সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কেলিবিলাসবিষয়ে একতানমনা—কেলিবিলাসৈক তন্ময়তা প্রাপ্ত—হইয়াছিলেন। কিরূপে? সুরতসম্বন্ধীয় হাব, ভাব, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিতাদি, বাম্য, ঔৎসুক্য, হর্ষাদি এবং স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্যাদি—(অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাব এবং সঞ্চারি ভাবাদি) এবং দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গনাদি ভাব সমূহকে মনে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই রমণ-ক্রীড়ায় সংলাপাদিরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৈষ্ণবতোষণীতে উক্তরূপ অর্থ করিয়া পরাশর-বৈশম্পায়নের একটী উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণাদির কাম-পারবশ্য নাই বলিয়া সৌরত-শব্দের অনুরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি নাই। "স্মরপারবশ্যাভাবমাত্র-প্রতিপাদনায়, সৌরতঃ সৌরতশব্দস্য ব্যাখ্যান্তরম্ অপ্রসিদ্ধম্ ইতি জ্ঞেয়ম্।" শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"এবমপি আত্মনি এব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতঃ যস্য ইতি কামজয়োক্তিঃ।—যাঁহার চরমধাতু স্খলিত হয় নাই ; ইহাতে কামজয় সূচিত হইয়াছে।" উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামীও উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। "সৌরত-শব্দেন চ সুরতসম্বন্ধি-হাবভাবাদয় এব উচ্যন্তে। ধাতুবিশেষরূপস্য তদর্থস্য কুত্রাপি অশ্রুতত্বাচ্চ। তদেবমাত্মন্যবরুদ্ধেতি মনসি নিগৃহিত-তদীয়তত্তদ্ভাব ইত্যেবার্থঃ।" এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি এবং সংলাপাদিই হইতেছে বিলাস-ক্রীড়ার অঙ্গ, পশুবৎ ক্রিয়া নহে ; বিলাস-বিবর্ত্তে এসমস্ত বিলাসাঙ্গেরই বৈপরীত্য।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ পরস্পরের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব বলিতেছেন—কি করিয়াছি, কি করিব—ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান না থাকিলেও, পরমোৎকণ্ঠাবশতঃ একটী বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান ছিল। সেই বিষয়টী হইতেছে এই যে—আলিঙ্গন-চুম্বনাদি জাগ্রতাবস্থায় হয় নাই, ইহা স্বপ্নাদিজনিত চিত্তবিভ্রম-মাত্র। "কিন্তু এতদেবোহত, তচ্চ এতন্ন হি জাগরস্থমপি তু স্বপ্নাদিচিত্তবিভ্রমঃ। ৭॥—ইহাই উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির চরম-পরাকাষ্ঠা।

উল্লিখিতরূপ কেলিবিলাসাদিসত্ত্বেও ব্রজসুন্দরীদিগের মনের ভাবনা কিরূপ, তাহাও শ্রীজীব বর্ণন করিয়াছেন। "তদনুভবেন চ তাসাং ভাবনেয়ম্। ৮। উৎপত্তিরক্ষোরভিতো ন সৎফলা যাভ্যাং ন তস্যাদ্ভুতরূপমীক্ষিতম্। হা কর্ণয়োরপ্যলমর্থদা ন সা যাভ্যাং শ্রুতং নৈব হরেঃ সুভাষিতম্॥—যে নেত্রযুগল শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ দর্শন করে নাই

তাদের জন্মই বৃথা ; যে শ্রবণযুগল তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণ করে নাই, তাদের জন্মও বৃথা। ৯॥ হা চক্ষুরাদীনি-হরেঃ সমাগমে যন্ত্যাগমিষ্যন্ শ্রবণাদি কর্ম্ম চ। তদা ব্রজিষ্যন্ বিষয়ীণি নাপ্যমূন্যসূয়য়া ধিগ্ ব্যতিদূষয়মানতাম্॥ ১০॥—যদি শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আমাদের চক্ষুকর্ণাদি তাঁহার দর্শন-শ্রবণাদি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইত—প্রতি ইন্দ্রিয়ই মনে করিত, তাহা অপেক্ষা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদির অধিকতর অনুভব লাভ করিতেছে, তাই তাদের প্রতি অসূয়া জন্মিত।"

আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গিত অবস্থাতেও তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিত ; ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের পরমগাঢ়তাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাদের বাহ্যবৃত্তিকে যেন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিত এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সাক্ষাতে উপস্থিত কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিকেও যেন বিলুপ্ত করিয়া স্বপ্নবৎ প্রতীতি জন্মাইত। "সাঙ্গালিঙ্গনলঙ্গিমেঽঙ্গবলয়াসঙ্গেঽপি শার্ঙ্গী তদা গোপীনাং স্ফুরতি স্ম দূরগতয়া প্রেমাপগাপূরতঃ যস্মাদুৎপুলকাকলাপবলনাবৃত্তিং বহির্লুম্পতী স্বপ্নাভাং দিশতী-সতীমপি দৃশি-স্ফূর্ত্তিং মুহুর্লুম্পতি॥ ১১॥" পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ সকল গোপীরই এইরূপ অবস্থা। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যখন প্রেমসম্পত্তিতে সর্ব্বপ্রধানা এবং ঐরূপ উৎকণ্ঠার হেতু যখন প্রেমেরই গাঢ়তা, তখন শ্রীরাধিকাতেই যে ঐ প্রেমোৎকণ্ঠা এক অনির্ব্বচনীয় চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ বর্দ্ধিতোৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "শ্রীরাধায়াস্তু সুতরামনির্ব্বচনীয়মেব সর্ব্বং তৎপ্রথমতয়া মিথস্তন্মিথুনস্যাপি॥ ১২॥"

এইরূপ সর্ব্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীরাধার যে প্রেমোন্মত্ততা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে—"রাধাঽজ্ঞানা-দসঙ্গে দনুজবিজয়িনঃ সঙ্গমারাদসঙ্গং সঙ্গে চৈবং সমস্তাদ্ গৃহসময়সুখস্বপ্নশীতাদিকানি। এতস্যা বৃত্তিরেষাজনি সপদি যদান্যদ্বিচিত্রং তদাসীৎ কান্তাকান্তস্বভাবোঽপ্যহহ যদনয়োর্বৈপরীত্যায় জজ্ঞে॥ ১৩॥—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ; এবং এইরূপে গৃহ, সময়, সুখ, স্বপ্ন, শীতাদি সর্ব্ববিষয়েই বৈপরীত্য অনুভব করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ গৃহকে বন এবং বনকে গৃহ, ক্ষণপরিমিত সময়কে কল্পপরিমিত এবং কল্পপরিমিত সময়কেও ক্ষণপরিমিত, নিদ্রাকে জাগরণ এবং জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ এবং উষ্ণকে শীত, সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ—ইত্যাদি অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ যখন রাধার অবস্থা, তখন আর একটী অদ্ভুত মহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল—কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্বৈপরীত্যং জজ্ঞে জাতম্—কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) আচরণ কান্তায় (শ্রীরাধায়) এবং কান্তার (শ্রীরাধার) আচরণ কান্তে (শ্রীকৃষ্ণে) পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত। রামানন্দরায়ের গীতোক্ত "না সো রমণ না হাম রমণী"—বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বিপরীত বিহার নায়ক-নায়িকার সঙ্কল্পপূর্ব্বক বা ইচ্ছাকৃত নহে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিপরীত বিহারে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত বিপরীত-বিহারের বা বিলাস-বিবর্ত্তের হেতু হইতেছে, নায়ক-নায়িকার প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠা—যাহা নায়ক-নায়িকার অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন মিলনেও কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম লাভ করে না, বরং উত্তরোত্তর প্রবল বেগে বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত এই প্রেমোৎকণ্ঠা পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ কেলি-বিলাস-বাসনাকে এবং কেলি-বিলাস-প্রচেষ্টাকেও সম্বর্দ্ধিত করিয়া বিলাসের এমন এক অনির্ব্বচনীয় তন্ময়তা জন্মাইয়া দেয়, যাহা তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভেদজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং তাঁহাদের চিত্তের একাত্মতা জন্মাইয়া উভয়ের চিত্তকেই বিলাসসুখৈক-তৎপরতাময় করিয়া তোলে। এতাদৃশী তৎপরতা হইতেই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বিলাস-বিবর্ত্ত হইল চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্ব্বচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্বিকাশ মাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগাদি যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ,

তদ্রূপ এই বিলাস-বিবর্ত্তও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাসসুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রায়রামানন্দ এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্য মাত্রই নয়—বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা তাহাই ; প্রেম-বিলাসসুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যটী প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তারপর সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাভাবস্বরূপত্ব, আনন্দচিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেমবিভাবিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রায়রামানন্দের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অখণ্ড-রসবল্লভ-শ্রীনন্দনন্দনের এবং অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর—বিলাস মহত্ত্ব প্রকটিত করাইবার জন্য রসঘন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে লইয়াই বিলাস ; সুতরাং কেবল নায়কে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাস-মহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না ; নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রসিক-ভক্তকুল মুকুটমণি রায়রামানন্দ তাঁহার বক্তব্য যেন শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটী গুণবৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥"—ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া "প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ কিন্তু তাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই ; তাই পুনরায় বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায় তাহাও বলিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসানের কথা কিছু নাব লিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদি কেহ বলেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ"-ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি বাকী রহিল ? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। "শতকোটি গোপীতে যাহা নাই শ্রীরাধাতে তাহা আছে," এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; কিন্তু এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। বিলাস-মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বের প্রয়োজন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা। উঃ নীঃ নায়িকা ৪৯ ॥" স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ ঘটয় জঘনে কাঞ্চী মঞ্জুস্রজা কবরীভরম্। কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি।" প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ়তা লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব-সম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে রায়রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব্ব রহস্য-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা তাহা জানিবার উদ্দেশ্যই বোধ হয় রায়রামানন্দের এই ভঙ্গী।

ব্যাপারটী পরম-রহস্যময়। অর্জ্জুনের নিকট সর্ব্বশেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ"—বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অর্জ্জুনকে যে শরণাগতির কথা বলা হইল, তাহার পশ্চাতে দুইটী খুব বড় কথা রহিয়াছে—একটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, আর একটী "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"—এই পরম আশ্বাসের বাণী। সুতরাং এই শরণাগতি হইল বিচারপুর্ব্বিকা, স্বতঃপ্রবৃত্তা নহে। এস্থলে শরণাগতিও কেবল এক পক্ষের। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার চরম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—কাহারও আদেশে নহে, স্বধর্ম্মাদিত্যাগের প্রত্যবায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অনুকূল আশ্বাস কাহারও নিকট হইতে পাওয়ার পরেও নহে; কোনওরূপ বিচার-বিতর্ক-পুর্ব্বকও নহে। তাঁহাদের এই ত্যাগ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য বলবতী বাসনার প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। "আত্মসুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১।৪।১৪৯ ॥" শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার "অশুল্কদাসিকা" হইয়াছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদনুরূপ। তিনিও ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের বলবতী বাসনার প্রবল আকর্ষণে বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন—দেহি পদপল্লবমুদারং পর্য্যন্ত বলিয়া। কোনও পক্ষের ত্যাগের মূলেই আত্মানুসন্ধান নাই, কাহারও প্ররোচনা নাই; শরণাগতিও পারস্পরিকী। যাঁহারা এই ভাবে পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থই কেবলমাত্র প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রীতিবিধানমূলক লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিলাস-মহত্ত্বের কথা—গীতোক্ত 'সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ'-অপেক্ষা যে কত কোটী কোটীগুণে গুহ্যতম, রসিক-ভক্তকুল-শিরোমণি রায়রামানন্দ তাহা জানিতেন; তাই ইহা প্রকাশ করা প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার জন্যই যেন তিনি একটু নীরব হইলেন। চতুর-চূড়ামণি প্রভুও বলিলেন—"এই হয়—আগে কহ আর ॥"

প্রেম যতই গাঢ়তা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং উৎকণ্ঠার চরমোৎকর্ষতা দ্বারাই প্রেমপরিপাকেরও চরমোৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়। মাদনাখ্যমহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে যখন এই উৎকণ্ঠা চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন তাহার প্রভাবে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাও চরম-পরাকাষ্ঠাত্ব লাভ করিয়া থাকে। এতাদৃশী উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হন, এবং পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যখন কেলিবিলাসে রত হন, তখন চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের উৎকণ্ঠা প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে এবং তাহার ফলে, পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত বাসনা ও চেষ্টার চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত তীব্রতায়—তাঁহাদের কান্তা-কান্তত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, উভয়ের সমগ্র-মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া যায় প্রীতিবিধানের বাসনায়, কেলিবিলাস-সুখের চরম-প্রাকট্যের বাসনায়। এইরূপে, কান্তাকান্তত্বের বিস্মৃতিতে এবং তাহারই ফলে বিহারাদির বৈপরীত্যে যে প্রবৃদ্ধপ্রেম সূচিত হয়, তাহাই প্রেমবিকাশের চরমোৎকর্ষ। এইরূপ ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমের চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তিতে কবিকর্ণপুরও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি স্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি নমু চিত্রং কিমপরম্ ॥—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্তা এবং তুমি আমার কান্ত—এইরূপ (ভেদ-) জ্ঞানই ছিলনা, তুমি ও আমি—এইরূপ (ভেদজ্ঞানমূলা) মনোবৃত্তিও তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ তুমি ভর্ত্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইয়াছে; তথাপি এখনও আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? (৭।১৬-১৭)।" দূতীর মুখে শ্রীরাধার এই

কথাগুলি শ্রীল রায়রামানন্দই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই ভাবেই কবিকর্ণপুর বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সময়ে উভয়ের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য দ্বারা প্রেমভক্তির যে চরম পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই রায়রামানন্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে ইহারই অভিব্যক্তি।

শ্রীলরামরায়ের গীতের মর্ম্ম এবং উল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের উক্তির মর্ম্ম একই। নাটকের উক্তির প্রথমার্দ্ধের মর্ম্মই রামরায়ের গীতের "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুহু মন মনোভব পেষল জানি॥" এই—বাক্যাংশে ব্যক্ত হইয়াছে। এই বাক্যাংশেই প্রেমপরিপাকের চরম-পরাকাষ্ঠা—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—সূচিত হইয়াছে। নাটকের উক্তির দ্বিতীয়ার্দ্ধে এবং গীতের "অব সোই বিরাগ"—ইত্যাদি অংশে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহ সূচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এস্থলে যে ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা কিন্তু নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য নহে। জ্ঞানমার্গের সাধকের মতে—বৃহৎ আকাশের (মহাকাশের) কোনও অংশ একটি ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন ঘটাকাশ রূপে অভিহিত হয়, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অংশ অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা আবৃত হইলেই জীব-নামে অভিহিত হয়; মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন যেমন ঘটাকাশের পৃথক্ কোনও অস্তিত্বই থাকেনা; তদ্রূপ, মায়ার বা অজ্ঞানের আবরণ দূর হইয়া গেলেও শুদ্ধজীব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন আর ব্রহ্মের সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকেনা, তাহার পৃথক্ কোন অস্তিত্বও থাকেনা। ইহাই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ নহে। শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের কেহই অজ্ঞানাবৃত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন; তাঁহারা অনাবৃত সবিশেষ ব্রহ্ম—তাঁহারা একই রসস্বরূপ—সশক্তিক আনন্দরূপ ব্রহ্ম; অনাবৃত সবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহারা ঘটাকাশোপম অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মরূপ জীবের ন্যায় অনিত্য বস্তুও নহেন; তাঁহারা নিত্য, তাঁহাদের লীলাও নিত্য। লীলারস আস্বাদনের জন্যই স্বরূপতঃ এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে তাঁহারা দুইরূপে বিদ্যমান। "রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ১৪৮৫॥ একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। ১১৫ শ্লো॥ (১৪৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রসঙ্গে তাঁহাদের দেহের ভেদরাহিত্যের কথাও বলা হয় নাই, তাঁহাদের ভাবের ভেদরাহিত্যের কথাই বলা হইয়াছে—একজনের মনে রমণের ভাব, অপর জনের মনে রমণীর ভাব—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে, এই রমণ-রমণী ভাবের পার্থক্যই বিলুপ্ত হইয়াছিল, "না সো রমণ, না হাম রমণী" ইত্যাদি বাক্যে, বা "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিত্যাদি" বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিপাকবশতঃ উভয়ের মন যেন একাত্মতা লাভ করিয়াছিল। "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি।" মন এক হইয়া যাওয়াতে মনের ভাবও একরূপতা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে রমণের মনোভাব ছিল রমণীর সুখসম্পাদন এবং রমণীর মনোভাব ছিল রমণের সুখোৎপাদন। উভয়ের মন—সুতরাং মনোভাবও—যখন একরূপতা লাভ করিল, তখন কেবল সুখোৎপাদনই হইল উভয়ের সাধারণ মনোভাব; তাই তাঁহাদের বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তা, বিলাস-সুখবিষয়েই উভয়ের চিত্তের একাত্মতা; এই তন্ময়তা ও একাত্মতা বশতঃই "কে রমণ, আর কে রমণী" এই বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান-হীনতা, "ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।" রমণ বা রমণী ইঁহাদের কেহই বিলুপ্ত হন নাই; কে রমণী, আর কে রমণ—এবিষয়ে অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি বা মনোবৃত্তিই যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা।" ইহা প্রণয়েরই চরম-পরিপক্কতার ফল। প্রণয়ে কান্তের প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি, পরিচ্ছদাদির সহিত নিজের প্রাণ-মন-দেহাদির ঐক্যভাবনা জন্মে। (উ, নী, ম, স্থা, ৭৮ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ও লোচনরোচনী টীকা)। ইহাও ভাব-গত ঐক্য, বস্তুগত ঐক্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুবলাদি সখাগণের গাঢ় প্রণয় ছিল; তাঁহাদের দেহ-মন-আদিরও ভিন্নতা ছিল; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দেহ-মন-আদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন—ভাবের অভিন্নতা, অভিন্ন-মননমাত্র। শ্রীরাধাতে

প্রণয়ের চরম-পরাকাষ্ঠা ; সুতরাং এজাতীয় ঐক্যমননেরও পরাকাষ্ঠা। প্রেমবিলাস-বিবর্তেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহ যখন পৃথক্ ছিল, দেহস্থ মনও পৃথক ছিল ; উভয়ের মনের ভাবই একরূপতা লাভ করিয়াছিল। সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানমার্গের সাধকের পৃথক অস্তিত্ব থাকেনা, কোনওরূপ অনুভূতিও তাঁহার থাকেনা—যেহেতু চরম অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই তিনটীর কোনটীই জ্ঞানমার্গের সাধকের থাকেনা। কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, বিলাস-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী অনুভূতিও থাকে ; তখনও তাঁহাদের বিলাসচেষ্টা এবং বিলাস থাকে—ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত জ্ঞানী সাধকের ন্যায় তাঁহারা নিশ্চেষ্টতা লাভ করেন না।

এক্ষণে মূলবিষয়সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রেমবিলাস-বিবর্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা ; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত ; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যেখানে, সেখানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দরায়ের নিকটে মহাপ্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাসমহত্ত্বসম্বন্ধে। "শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ব।" রামানন্দরায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচক "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই ; বরং প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ২।৮।১৫৭ ॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তুতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ব জানিবার বাসনাও সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্তেই বিলাস-মহত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ।

মহাভাবের দুইটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে—স্ব-সম্বেদ্যদশাত্ব এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব (২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এই দুইটীই যে প্রেমবিলাস-বিবর্তে চরমতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই দেখান হইতেছে। অনুরাগ যখন স্ব-সম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়, সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাব দ্বারা বাহিরে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়, তখনই তাহাকে ভাব বা মহাভাব বলে। "অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উ, নী, স্থা, ১০৯॥" সম্বেদন-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপেজানা বা অনুভবকরা। স্বম্বেদ্য—অর্থ অনুভবযোগ্য। স্ব-সম্বেদ্য অর্থ নিজের দ্বারা নিজের অনুভবের যোগ্য। অনুরাগের যে অবস্থাটী (দশাটী) অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই তাহার স্ব-সম্বেদ্যদশা। এক্ষণে, অনুরাগদশার তিনটী স্বরূপ—ভাব করণ ও কর্ম্ম। প্রথমে করণ ও কর্ম্ম স্বরূপের আলোচনা করিয়া পরে ভাবস্বরূপের আলোচনা করা হইতেছে। করণ অর্থ উপায়, যাহার সাহায্যে কোনও কাজ করা হয়, তাহাকে বলে করণ। সংবিদংশে অনুরাগদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয়। "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ ১।৪।৪৪ ॥" সুতরাং অনুরাগ হইল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্ব্বোৎকর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হইল করণ। তারপর, অনুরাগের কর্ম্মস্বরূপ। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম্ম। অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী-আস্বাদয় ॥ ১।৪।১৫৭-৫৮॥" গোপিকাদিগের এই যে আনন্দ, ইহাই কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। গোপীদিগের অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রভাবে অনুরাগোৎকর্ষও অসমোর্দ্ধরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে

হোড় করি। অন্যোন্যে বাঢ়য়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ ১।৪।১২৪॥" এইরূপে, অনুরাগোৎকর্ষের যে অনুভব, তাহাই অনুরাগের কর্ম্ম-স্বরূপ। সর্ব্বশেষে অনুরাগের ভাব-স্বরূপ। ভাব-স্বরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ কেবলমাত্র অনুভব বা অনুভবের জ্ঞান---আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকেনা, আস্বাদ্য মাধুর্য্যাদির স্মৃতিও থাকেনা; থাকে কেবল আস্বাদন বা অনুভবের জ্ঞান। এই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। যেমন, রসগোল্লাতে অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগোল্লা পাইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তাহার স্বাদুতায় এতই তন্ময় হইয়া পড়ে যে, তাহার আর নিজের কথাও মনে থাকে না, রসগোল্লার কথাও মনে থাকেনা, মনে থাকে কেবল রসগোল্লা আস্বাদনের কথা, রসগোল্লার স্বাদুতার কথা। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ। যে অবস্থায় ভাব, করণ ও কর্ম্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাহাদের অনুভবেরও পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্যদশা বলে। "স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য...ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয়েত্যর্থ আয়াতি। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা॥" এস্থলে চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় অনুরাগোৎকর্ষের স্বসম্বেদ্যদশায় তিনটী সুখের কথা বলিয়াছেন---"সুখত্রয়ম্।" সেই তিনটী সুখ কি কি, তাহাও তিনি বলিয়াছেন---"অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য ইত্যুক্তে অনুরাগদশায়াঃ ভাবত্ব-করণত্ব-কর্ম্মকত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যাম্ অনুরাগোৎকর্ষোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপঃ ইতি প্রথমং সুখম্। ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভবচরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণ অনুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবেন অয়ং অনুরাগোৎকর্ষঃ অনুভূয়ত ইতি তৃতীয়ং সুখম্ ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয়েত্যর্থ আয়াতি।" প্রথম সুখ হইল ভাবরূপে ---শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। দ্বিতীয় সুখ হইল করণরূপে---প্রেমাদিদ্বারা অনুভবযোগ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা অনুভূত হইতেছেন। তৃতীয় সুখ হইল কর্ম্মরূপে---শ্রীকৃষ্ণানুভবদ্বারা অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ সুখ। অনুরাগ হইল সম্বিৎসংযুক্তা হ্লাদিনীর বৃত্তি, তাই স্বয়ংই আস্বাদ্য। "বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বিয়ম্॥" প্রথমতঃ আনন্দাংশে বা হ্লাদাংশে স্বসংবেদরূপত্ব, তারপর সম্বিদংশে শ্রীকৃষ্ণাদিক-কর্ম্মসংবেদনরূপত্ব এবং তারপর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এতদুভয়ের যোগে স্বসম্বেদ্যরূপত্ব। অনুরাগের এই স্বসম্বেদ্যদশার চরমতম অভিব্যক্তি হয় মাদনে। সুতরাং মাদনে এই তিনটী সুখেরও চরমতম বিকাশ। ভাবস্বরূপের চরমতম বিকাশে আস্বাদকের স্মৃতি এবং আস্বাদ্যবস্তুর স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়---থাকে কেবলমাত্র আস্বাদন-সুখের অনুভব; ইহাই প্রেমবিলাস-বৈচিত্রীর বিলাসসুখৈকতন্ময়তা এবং তাহা হইতেই "না সো রমণ না হাম রমণী" এইরূপ ভাব।

তারপর অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব। আশ্রয় বলিতে অনুরাগের আশ্রয় বা ভিত্তি। প্রেমবিকাশে রাগের পরবর্ত্তী স্তরই হইল অনুরাগ; সুতরাং রাগই হইল অনুরাগের ভিত্তি বা আশ্রয়। "আশ্রয়শ্চাত্র রাগ এব, তমাশ্রিত্যৈব অনুরাগস্তাদৃশতাং প্রাপ্নোতি। শ্রীজীব।" যাবৎ-শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বুঝায়। "যাবদাশ্রয়মিতি ইয়ত্তায়ামব্যয়ীভাবঃ॥ শ্রীজীব।" বৃত্তি-শব্দের অর্থ সত্তা। অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমান্তপর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে। বলা হইল---অনুরাগের ভিত্তি হইল রাগ; রাগের ভিত্তি কিন্তু আবার প্রণয়; যেহেতু, প্রেমবিকাশে প্রণয়ের পরবর্ত্তী স্তরই হইল রাগ। সুতরাং যেস্থলে রাগবিকাশের চরমসীমা, সেস্থলে প্রণয়বিকাশের---অর্থাৎ দেহ-মন-আদির ঐক্যমননেরও---চরমসীমা। সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবে---এবং তজ্জন্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের দেহ-মন-আদির ঐক্যমননের চরম-পরাকাষ্ঠা। "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মনোভাবের একাত্মতা---বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই তাহার অভিব্যক্তি।

প্রেমের গাঢ়তা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেবার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাদনাখ্য-মহাভাবে প্রেমের গাঢ়তার চরম-পরাকাষ্ঠা বলিয়া মাদনেই উৎকণ্ঠারও চরম-পরাকাষ্ঠা। এই চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ঔৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীরাধিকা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনকেও

স্বাপ্নিকবৎ মনে করিতেন, (স্বাধীনভর্তৃকাত্বের চরমতমবিকাশে) কিরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিতেন এবং বেশরচনাদির জন্য তাঁহাকে আদেশ দিতেন, কিরূপে বিলাসাদি-বিষয়ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় হইত, বিহারাদিতে কিরূপে বৈপরীত্য জন্মিত, পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীগোপাল-চম্পুর উক্তি হইতে তাহা জানা গিয়াছে। শ্রীশ্রীগোপালচম্পুর উক্তি হইতে আরও জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি দর্শনের সময়েও দর্শনাভাব মনে করিয়া শ্রীরাধিকাদি চক্ষুর অসাফল্যের এবং তাঁহার কথা-আদি শ্রবণের সময়েও শ্রবণাভাব মনে করিয়া কর্ণের অসাফল্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধার এইরূপ ভাবের পরাকাষ্ঠার কথাও চম্পূ বলিয়াছেন। মিলনে যে এই মিলনাভাবের ভাব, বিরহের ভাব, ইহাও মাদনেরই এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য "যদাতু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধং বিয়োগানুভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি। উ, নী, স্থা-১৬০-শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা॥" সম্ভোগসময়েও পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃই এইরূপ বিচিত্র ব্যাপার সম্ভব হয়। "সহস্রধা সম্ভোগকালে সহস্রধা এব উৎকণ্ঠা ইত্যন্তুমেব। উক্ত টীকা॥" এসমস্ত হইতে বুঝা যাইতেছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তও মাদনেরই একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বে বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থের কথা বলা হইয়াছে—ভ্রান্তি, বৈপরীত্য এবং পরিপক্কতা। উল্লিখিত আলোচনায় তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে—প্রেমের চরম-পরিপক্কতাজনিত চরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ বিলাসাদিতে বৈপরীত্য এবং বাস্তব-মিলনেও স্বাপ্নিক প্রতীতিরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া।

(৪)

মাদনেই যে বিলাস-মাহাত্ম্যের চরম-পরাকাষ্ঠা, মাদনের লক্ষণগুলির আলোচনাদ্বারাও তাহা বুঝা যায়। মাদনে মহাভাবের সাধারণ লক্ষণগুলিতো আছেই, তদতিরিক্ত কয়েকটী বিশেষ লক্ষণও আছে। বিশেষ লক্ষণগুলি হইতেছে এই—(১) মাদন সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী, (২) ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই আছে, সর্ব্ব-ভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ, নী স্থা, ১৫৫।"; (৩) সম্ভোগেই মাদনের উদয়, বিপ্রলম্ভে বা বিয়োগে মাদনের উদয় হয় না; কিন্তু (৪) সম্ভোগসময়েই চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগসুখের অনুভবমধ্যেই বহুবিধ বিয়োগদুঃখের অনুভব হয়; (৫) মাদনে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যলীলার যুগপৎ-সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে—স্ফূর্ত্তিদ্বারাও নহে, কায়ব্যূহদ্বারাও নহে স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যপ্রকার সম্ভোগাত্মিকা লীলার আনন্দ, মাদনের উদয়ে, শ্রীরাধা একই সময়ে অনুভব করেন। "যোগ এব ভবদেষ বিচিত্র কোঽপি মাদনঃ। যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রশঃ॥ উ, নী, স্থা, ১৬০॥ যোগে সম্ভোগে এব নতু বিপ্রলম্ভে। সহস্রাদিশব্দানামসংখ্যত্ব এব তাৎপর্য্যাৎ সহস্রধা অসংখ্যপ্রকারা নিত্যাঃ প্রতিক্ষণভবা লীলা আলিঙ্গন-চুম্বনাদ্যা যস্য মাদনস্য বিলাসাঃ কার্য্যাঃ অনুভবা ইতি যাবৎ। বিশেষেণ রাজন্তে তস্যাঃ প্রত্যক্ষতয়া প্রকটী ভবন্তীতি স্ফূর্ত্তিতো বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। যদাতু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়ত তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধঃ বিয়োগানুভ ইতি একস্মিন্ এব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি। —আনন্দচন্দ্রিকা টীকা॥" সম্ভোগানন্দে মত্ততা জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম মাদন।

এক্ষণে এই লক্ষণগুলির আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসিত্ব। মাদনে সমস্তভাবই যুগপৎ উদিত হইয়া বিশেষরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভাব বলিতে প্রেমের বা ভাবাদির যত রকমের বৈচিত্রী আছে, তৎসমস্তকে বুঝায়। রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত—রতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ, ভাবও মহাভাব এই—সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই তাহাদের সমস্ত অনুভাব ব বিক্রিয়ার সহিত একই সময়েই অত্যুজ্জলরূপে মাদনে অভিব্যক্ত হয়। মাদন হইল প্রেমের পূর্ণরূপ বা স্বয়ংপ্রেম। রতি-স্নেহাদি প্রেমবৈচিত্রী তাহার অংশ স্বরূপ। স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবকালে তাঁহার অংশবিগ্রহ সমস্ত ভগবৎ স্বরূপই যেমন তাঁহারই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া আবির্ভূত হন, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রেমরূপ মাদনের অভ্যুদয়েও তাহার অংশতুল্য সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই তাহারই মধ্যে—

মাদনেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া—অভ্যুদয় লাভ করে। এক্ষণে ভাববৈচিত্রী। কান্তাভাবের অনন্তবৈচিত্রী ; শ্রীরাধাতেই সমস্ত বৈচিত্রীর সমাহার ; শ্রীরাধাই অনন্ত-কান্তাভাব-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ—কান্তাভাবের স্বয়ংরূপ, অখিল-কান্তাভাব বিগ্রহ। অখিল রসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনন্ত ভগবৎ স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, এসমস্ত অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ যেমন তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীরই অনন্তপ্রকাশ ; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত কান্তারস বৈচিত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী-মহিষী-ব্রজদেবী প্রভৃতি অনন্ত কৃষ্ণকান্তারূপে অখিল কান্তাভাববিগ্রহরূপা শ্রীরাধাই অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। এসমস্ত অনন্ত কৃষ্ণকান্তাও তদ্রূপ তাঁহার অনন্ত কান্তাভাব বৈচিত্রীরই অনন্ত প্রকাশ। "অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥ ১।৪।৬৬॥ আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥ ১।৪।৬৮ ৭০॥" কান্তাপ্রেমের মূল উৎস বা স্বয়ংরূপ হইল প্রেমের গাঢ়তম বা পরিপক্কতমরূপ মাদন। তাই অখিল কান্তাভাব বিগ্রহরূপা শ্রীরাধাকে মহাভাব স্বরূপা বা মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপা বলা হয়। ব্রজদেবী আদি কৃষ্ণকান্তাগণ হইলেন কান্তাভাবসমষ্টিরূপ মাদনেরই অনন্তবৈচিত্রীর অনন্ত প্রকাশ। স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবে যেমন তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীর প্রকাশরূপ অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ, স্বয়ংকান্তাভাবরূপ মাদনের অভ্যুদয়েও অনন্ত কৃষ্ণকান্তানিষ্ঠ অনন্ত কান্তাভাব বৈচিত্রীও মাদনের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলিত হয়। নিষ্কর্ষার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার মধ্যে যখন মাদনাখ্য-মহাভাবের উদয় হয়, তখন অনন্ত ব্রজদেবীগণের মধ্যে যে অনন্ত কান্তাভাব বৈচিত্রী আছে, তৎসমস্ত বৈচিত্রীও শ্রীরাধার মধ্যে উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়া মধুর-রসের অনন্ত-বৈচিত্রীকে উল্লসিত—তরঙ্গায়িত—করিয়া তোলে। বিভিন্ন কান্তার যে সমস্ত বিভিন্নভাব রসের বৈচিত্রী সম্পাদন করে, তাহারাও তখন শ্রীরাধার মধ্যে উল্লাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে, প্রেমবিকাশের অশেষ বৈচিত্রী, কান্তাভাবের অনন্ত-বৈচিত্রী, কৃষ্ণকান্তাগণের অনন্তভাববৈচিত্রী সমস্তই শ্রীরাধার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং কান্তারসের অনন্ত-বৈচিত্রী প্রত্যেক বৈচিত্রীকেই উত্তাল-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে।

সম্ভোগকালেই মাদনের উদয়। সম্ভোগেরও আবার অশেষ বৈচিত্রী—আলিঙ্গন, চুম্বন, সলালস-স্পর্শ বেশ-রচনা ; মকরীচিত্রাঙ্কনাদি, সম্প্রয়োগাদি। ইহাদের যে কোনও এক রকমের সম্ভোগেই সমস্ত সম্ভোগবৈচিত্রীর সুখানুভব একই সময়ে একই সঙ্গে হইয়া থাকে এবং পুর্ব্বোল্লিখিত অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্র্যের অনুভবও একই সময়ে হইয়া থাকে—যাহার ফলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ আনন্দোন্মত্ততা প্রাপ্ত হইয়া ঐ সুখাস্বাদন-তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। আর একটী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, অনন্তরূপে অনন্ত মধুর রসবৈচিত্রী আস্বাদন করা সত্ত্বেও প্রেমপরকাষ্ঠার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই যে উপরিতিহীন পরমোৎকণ্ঠার অভ্যুদয় হয় তাহারই ফলে সম্ভোগরস-আস্বাদন-সময়েই নানাবিধ বিয়োগজনিতভাবের উদয় হইয়া থাকে—সম্ভবতঃ নিত্য-নবনবায়মান আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্যই মাদনের এই অদ্ভুত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। তাহারই ফলে উৎকণ্ঠা আরও সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বিলাস-সুখচেষ্টৈকতন্ময়তা আরও নিবিড়তা লাভ করিতে থাকে। নিবিড় তন্ময়তার ফলে শ্রীরাধার রমণ-রমণীত্বের জ্ঞানও—অনুভূতিও—বিলুপ্ত হইয়া যায়, অনুভূতি থাকে একমাত্র বিলাসসুখের। ইহা মহাভাবের রূঢ়াখ্যা বৃত্তিরই চরম বিকাশের প্রভাব। রূঢ়-মহাভাবের একটী লক্ষণ হইতেছে—মূর্চ্ছাদির অভাবেও সমস্ত ভুলিয়া যাওয়া—"মোহাদ্যভাবেঽপি সর্ব্ববিস্মরণম্।" উ, নী, স্থা, ১২১॥ মোহো মূর্চ্ছা আদিশব্দাদাবেগবিষাদাদ্যাঃ। সর্ব্বেষামহন্তাস্পদেদন্তাস্পদানাং বিস্মরণং তত্র হেতুর্মমতাস্পদস্য শ্রীকৃষ্ণরূপগুণদেস্তু স্মৃত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ॥—আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।" শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিলাসাদিজনিতসুখের—স্মৃতির আতিশয্যবশতঃ রূঢ়-মহাভাববতীগণ "আমি, ইহা—বিশ্ব, আমার, ইহার"—ইত্যাদি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়েন। মাদনে রূঢ়মহাভাবের এই লক্ষণটীরও চরমতমবিকাশ ; সুতরাং উক্তরূপ বিস্মৃতিরও চরমতম বিকাশ। তাই

বিলাসসুখ-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীরাধা নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের কথাও ভুলিয়া গেলেন, রমণ-রমণীত্বের অনুভূতিও তাঁহার বিলুপ্ত হইয়া গেল ; রহিল কেবল বিলাস-সুখের অনুভূতি।

রূঢ়-মহাভাবের আর একটি লক্ষণ হইতেছে—আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়নম্, এই রূঢ়-ভাব উদিত হইলে যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তেও ইহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়া তাঁহাদের চিত্তকেও আলোড়িত করিয়া থাকে। মাদনে, অন্যান্য সমস্ত লক্ষণের ন্যায় এই লক্ষণেরও চরম-বিকাশ। শ্রীরাধার চিত্তে যখন মাদনের উদয় হয়, তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও ইহার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তাই গোপালচম্পূতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"শ্রীরাধায়াস্ত সুতরাম্ অনির্ব্বচনীয়মেব সর্ব্বং তৎপ্রথমতয়া মিথস্তন্মিথুনস্যাপি॥ পূ, ৩৩।১২॥— (উৎকণ্ঠারাশির অভ্যুদয়ে বাহ্যবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত থাকাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত আছেন—এরূপ মিলনেও অমিলনের ভাবরূপ) অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার প্রথমে শ্রীরাধার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণেও তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাতে বাস্তব-বিরহের অভাবেও সম্ভোগকালে বিরহের স্ফূর্ত্তির কথা জানা যায়।

বাস্তব বিরহের অভাবেও সম্ভোগকালে বিরহের অনুভূতি একদিকে যেমন উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি সাধিত করে, অপর দিকে আবার সম্ভোগসুখের আস্বাদন-চমৎকারিত্বেরও প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মানতা বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান ঔৎকণ্ঠ্য এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বের নব-নবায়মানত্ব আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত সম্ভোগ-বৈচিত্রীর এবং অনন্ত মধুর-রসবৈচিত্রীর যুগপৎ-আস্বাদন-মাধুর্য্যকে এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বতা দান করিয়া থাকে। ইহাতেই বিলাস-সুখের চরম-পর্য্যবসান, বিলাস-মহত্ত্বের চরম বিকাশ, প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরাকাষ্ঠা। মাদন ব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই অনন্ত মধুর-রসবৈচিত্রীর এবং অনন্ত সম্ভোগ-বৈচিত্রীরও যুগপৎ আস্বাদন নাই এবং সম্ভোগসুখের সঙ্গে সঙ্গে বিরহভাবের মিশ্রণজনিত উৎকণ্ঠার এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বের ক্রমবর্দ্ধমান নব-নবায়মানত্বও নাই।

শ্রীল রায়রামানন্দের গীতটীতে যে মাদনাখ্য-মহাভাবের রূপটাই প্রকটিত হইয়াছে, গীতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইবে (মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৫)

যাহা হউক, রামানন্দরায়ের মুখে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক গানটী শুনিয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥" কিন্তু কেন ?

এ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানঃ। ব্যধিকরণতয়া বা আনন্দ-বৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাহপধত্ত॥— (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ-ইত্যাদি কথা যখন রামানন্দরায় বলিতেছিলেন, তখন) ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত শ্রীল রামানন্দরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে—হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা, হয়তো আনন্দ-বিবশতাবশতঃই—স্বীয় করকমলদ্বারা প্রভু রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতেঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতঃ ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্। ৭।১৭।—নিরুপাধি (কপটতাহীন) সুনির্ম্মল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীরাধামাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরম-পুরুষার্থসূচক ঐ প্রথমার্দ্ধস্থ বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্তৃক রামানন্দরায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।"

প্রভুকর্তৃক রায়রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। ভগবান্ সম্বন্ধে কোনও রহস্যের কথা খুলিয়া বলিলেও সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল, রহস্যের উদ্দীপক কোনও বস্তু দেখিলেই তাঁহারা সেই রহস্যটী যে কেবল বুঝিতে পারেন, তাহাই নয়, রহস্যটীর উপলব্ধিও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। তাই নবমেঘের বা নবমেঘস্থ ইন্দ্রধনুর দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধা প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িতেন। সেই শ্রীরাধারই ভাব-বিগ্রহ হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু; সুতরাং "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যটী যে ঐ বাক্যটী শ্রবণমাত্রেই প্রভুর চিত্তদর্পণের সাক্ষাতে সমুজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস-মহত্ত্বের চরম-তম উৎকর্ষতাজ্ঞাপক প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব রসধারায় তাঁহার চিত্ত যে পরিনিষিক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই আস্বাদনে তাঁহার যে আনন্দ-বিবশতা জন্মিয়াছিল—ইহা অস্বাভাবিক নয়। কর্ণপুর বলিতেছেন—হয়তো বা এই আনন্দ-বৈবশ্যবশতঃ প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন তিনি আর কিছু বলিতে না পারেন। কিন্তু কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই। দেখা গিয়াছে, প্রভু প্রায় সকল সময়েই স্বীয় ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করেন। রামানন্দের গীতটী শুনিয়া তাঁহার চিত্তে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে তাঁহার আনন্দ-বিবশতা জন্মিয়াছে। এই বিবশতার ভাব হয়তো তিনি চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন; তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করে নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্ব্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন; হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাব-তরঙ্গ হয়তো এমন ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে যে, তাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। তাই তিনি রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপুর-কথিত অন্য হেতুটী হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্ত্বটী আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রামানন্দ যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

"তখনও সময় হয় নাই"—এই কথাটীর তাৎপর্য্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দরায় যে রহস্যটির ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাকে যদি তিনি উদ্ঘাটিত করেন তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। রামানন্দের নিকটে তখনই যদি প্রভুর স্বরূপের তত্ত্বটী উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, তখনই যদি তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর আলোচনা তখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। জগতের সকলের জন্য যে সমস্ত তথ্য রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার সঙ্কল্প প্রভুর ছিল, তাহাদের সকল তথ্য তখনও প্রকাশিত হয় নাই; তখনও কিছু বাকী রহিয়াছে এবং যাহা বাকী রহিয়াছে, তাহাই (রাগানুগ-ভক্তির কথা) জগতের জীবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রেমিক রায়রামানন্দ কি এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর স্বরূপের পরিচয় পান নাই? এই প্রশ্নের উত্তর কবিরাজগোস্বামীই দিয়াছেন। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥ ২।৮।১০২-৩॥" মহাপ্রেমী পরম-ভাগবত রায়রামানন্দের বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল চিত্ত-দর্পণের সাক্ষাতে প্রভুর স্বরূপ মাঝে মাঝে যেন চপলা-চমকের ন্যায় ভাসিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনও রামানন্দ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করুক; কারণ স্বরূপের উপলব্ধি জন্মিলে আলোচনা বন্ধ হইয়া যাইবে। রামানন্দের মুখে প্রভু যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন সেই সমস্ত তত্ত্বের মূর্ত্তরূপই যে প্রভু—তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি জন্মিলে রায় তাহা বুঝিতে পারিবেন; ইহা বুঝিতে পারিলে প্রভুর প্রশ্ন সত্ত্বেও রায়ের পক্ষে আর কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত না। তাই প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই চপলা-চমকের মত উপলব্ধির তরল আভাস রামানন্দের চিত্ত হইতে অপসারিত হইত; আলোচনাও বন্ধ হইত না।

এপর্য্যন্ত স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই প্রভু রামানন্দের উপলব্ধিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশসম্বন্ধীয় আলোচনায় রায়রামানন্দের চিত্তের সাক্ষাতে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের যে রূপটী উকিঝুঁকি মারিতেছিল, অধিকতর আলোচনায় সেই রূপটী যদি সম্যক্‌রূপে রায়ের চিত্তের সাক্ষাতে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাবকে দমন করা প্রভুর ইচ্ছাশক্তির সামর্থ্যে কুলাইবে না—ইহা প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তি হইল—ঐশ্বর্য্য; আর প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের রূপ হইল ব্রজের শুদ্ধমাধুর্য্যের চরম-তম বিকাশ—যাহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য কখনও স্বীয়রূপে আত্মপ্রকট করিতে পারে না। শুদ্ধমাধুর্য্য-বিকাশের গতিকে অন্য পথে চালাইতে পারে—একমাত্র শুদ্ধ প্রেম। শুদ্ধপ্রেম-স্ফুরিত আনন্দ-বৈবশ্য দ্বারা প্রকম্পিত স্বীয় হস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়া প্রভু রামানন্দের উপলব্ধির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন—যেন অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারে। সমস্ত বিষয়ের আলোচনার পরে প্রভু কৃপা করিয়া রায়রামানন্দকে স্বীয় স্বরূপের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামানন্দরায়ের গীতে যে রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। একথার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মনে হয়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই প্রভুর স্বরূপ। কেন একথা বলা হইল, সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের এবং শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের চরম-তম বিকাশ; উভয়ের নিত্য মিলন; প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ উভয়ের চিত্তের ভাবগত একত্ব এবং তাহার ফলে আত্মবিস্মৃতি এবং ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ পরম-উৎকণ্ঠাজনিত মিলনেও বিরহ-ভাব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে এই কয়টীই উজ্জ্বলতমরূপে পরিস্ফুট।

শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের বিকাশ হইল শ্রীরাধার সহিত নিত্য মিলনে এবং শ্রীরাধার নিকট স্বীয় বশ্যতাস্বীকারে। আর শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের বশীভূত করিয়া রাখার মধ্যে। শ্রীরাধা যেন প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া—কবলিত করিয়া—শ্যামকে গৌর করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রূপ। শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে পর্য্যন্ত—সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রতি অঙ্গের অধীন—বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে। কেবল দেহের বশ্যতা নয়—চিত্তেরও। শ্রীরাধা স্বীয় চিত্তদ্বারাও যেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে কবলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে স্বীয় চিত্তের ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও এইভাবে শ্রীরাধা-চিত্তদ্বারা কবলিতত্ব—আনন্দের সহিত অঙ্গীকার করিয়া নিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল—দেহ, মন প্রাণ সমস্ত বিষয়েই শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের অধীন করিয়া স্বীয় স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের চরম বিকাশ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্‌রূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া, এবং নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় ধীরললিতত্বের চরম-বিকাশ সাধিত করাইয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের—ব্রজ অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়ী নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবিড়তম মিলনও—এই শ্রীশ্রীগৌররূপেই।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য একত্বও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। ব্রজে শ্রীরাধা যে প্রেমের আশ্রয় ছিলেন, রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তের ভাবগত একত্ব চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

সাধারণতঃ প্রেমবান্ নায়কই প্রেমবতী নায়িকাকে আলিঙ্গন করেন। গোপালচম্পূর উক্তি হইতে জানা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে নায়িকাও অগ্রণী হইয়া নায়ককে আলিঙ্গন করেন, নায়ককে যেন পুতুলের

মত নাচাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপেও দেখা যায়, নায়িকা শ্রীরাধাই নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ভাবের আবেশ জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যেন নানারূপ উদ্ভট নৃত্য করাইতেছেন। শ্রীরাধাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপের জ্ঞান পর্য্যন্তও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই গৌরস্বরূপে ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং ভ্রান্তি বা আত্মবিস্মৃতি—এতদুভয়েরই চরম-পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে—প্রেম-পরিপাকের চরমোৎকর্ষবশতঃ মিলনের নিমিত্ত পরম উৎকণ্ঠা এবং তাহার ফলে মিলনেও বিরহের ভাব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে ইহা সমুজ্জলরূপে বিরাজিত। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যেও বিরহ-জনিত ভাবের চরম বিকাশ প্রভুর গম্ভীরালীলাদিতে জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকটিত।

এমসস্ত কারণেই বলা হইয়াছে, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

প্রণবের অর্থবিকাশ

প্রণব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে বলিয়াছেন,

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ২।২৫।৭৮

প্রণবের যাহা অর্থ, গায়ত্রীরও তাহাই অর্থ। সেই অর্থই শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রণবের অর্থ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২ ॥—হে সত্যকাম! যাহা ওঙ্কার (প্রণব) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম।"

মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ বলেন—"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১ ॥—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ "ওম্"-এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।"

"সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম ॥ ২ ॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাও ব্রহ্ম।"

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥—ইনি (এই ওঙ্কার) সর্ব্বেশ্বর, ইনি সবর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্তভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।"

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সবর্বম্। ১।৮ ॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ॥"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে প্রণবসম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহা মোটামুটি এই :—

(ক) প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্বযোনি।

(খ) প্রণবই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ; ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—সমস্তই প্রণব, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অতীতে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে যেরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, তৎসমস্তই প্রণব বা প্রণবাত্মক ব্রহ্ম। ইহা হইতে বুঝা গেল, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকল সময়েই কালের প্রভাবাধীন।

প্রণব বা ব্রহ্মই এই কালপ্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়।

(গ) প্রণব এই কাল-পরিণামী পরিদৃশ্যমান জগৎ হইলেও স্বয়ং কিন্তু কালাতীত এবং পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরেও অবস্থিত। প্রণব কালাতীত হওয়াতে তাঁহার উপর কালের প্রভাব নাই; সুতরাং প্রণব নিত্য।

(ঘ) প্রণব জগতের যোনি বলিয়া এবং প্রণবই জগৎ বলিয়া জগতের অধিষ্ঠানও প্রণবই। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগতের স্থানেও প্রণব আছেন—কিন্তু কালাতীত ভাবে।

মন্তব্য (ঙ) কালপরিণামী জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও প্রণব কালাতীত। ইহাতেই ধ্বনিত হইতেছে যে—জগতের সঙ্গে প্রণবের স্পর্শ নাই; সুতরাং প্রণব এবং জগৎ একজাতীয় বস্তু নহে; অর্থাৎ জগৎ যে জাতীয় বস্তু, প্রণব তাহার বিরুদ্ধজাতীয় বস্তু। দেখা যাইতেছে, জগৎ জড়বস্তু; সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইবে জড়বিরোধী বস্তু। জড়বস্তুর উপরই কালের প্রভাব। জড়বিরোধী বস্তুর উপর কালের প্রভাব নাই। জড়বিরোধী বস্তু হইল—চিৎ। সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌বস্তু।

(চ) প্রণবই জগতের যোনি, প্রণব হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সুতরাং প্রণবই জগতের সর্ব্ববিধ কারণ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ॥ আবার জগৎকেই যখন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। কুম্ভকারও ঘটের (নিমিত্ত) কারণ এবং মাটীও ঘটের (উপাদান-) কারণ। তথাপি কিন্তু ঘটকে মাটীই বলে, কুম্ভকার বলে না—ঘট মাটিরই পরিণতি বলিয়া। তদ্রূপ প্রণব এই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া এবং প্রণবই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রণবই জগৎ—একথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিণাম-বাদের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

(ছ) প্রণব হইতে জগতের উৎপত্তি-আদি এবং প্রণব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর এবং অন্তর্য্যামী। সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম সবিশেষ বস্তু। এস্থলে শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিলেন। প্রণবের স্বরূপ-কথনেই প্রণবের বিশেষত্বের স্পষ্টোক্তি থাকাতে সবিশেষত্বই প্রণবের বা ব্রহ্মের তত্ত্ব।

(জ) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত (সুতরাং জগতিস্থ জীবের সহিতও) প্রণবের বা ব্রহ্মের একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। তাই প্রণব বা ব্রহ্মই হইল **সম্বন্ধ-তত্ত্ব**।

(ঝ) জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কেন এবং কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না। তবে জগৎকে কালপরিণামী বলাতে তাহার একটু ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

(ঞ) ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ যখন নিত্য এবং অচ্ছেদ্য, তখন যে কারণে এই সম্বন্ধের বিস্মৃতি জন্মিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আগন্তুক কারণ হইবে এবং আগন্তুক বলিয়া তাহাকে অপসারিত করা সম্ভব—অর্থাৎ সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।

(ট) কিন্তু কি উপায়ে সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হইতে পারে? এখন ব্রহ্মকে আমরা জানি না, তাই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি তাহাও আমরা জানি না। তাঁহাকে জানিলেই সম্বন্ধের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাহাই নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত॥ ১।১।১॥—ওম্—এই অক্ষররূপী অক্ষরের উপাসনা করিবে।"

কঠোপনিষৎ বলেন—"সর্ব্বে বেদা যৎপদম্ আনমন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ॥ ২।১৫॥—সমস্ত বেদ যাঁহার পদে সম্যক্রূপে নমস্কার করে (প্রাপ্তব্যরূপে যাঁহাকে প্রতিপন্ন করে), সমস্ত তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকে (যাঁহাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়), যাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা তোমাকে (নচিকেতাকে) আমি (যম) সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনিই এই ওঙ্কার।"

"এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ হি এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ ২।১৬॥—এই অক্ষরই (ওঁম্ এই অক্ষরই) (অপর) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর (ব্রহ্ম)। এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

"এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২।১৭॥—ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, এই ওঙ্কারাক্ষরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম-আলম্বন। এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মধামে) মহীয়ান্ হইতে পারা যায়।"

পাতঞ্জল-দর্শন বলেন—ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও (চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতে পারে। সেই প্রণিধান কিরূপ তাহা বলিতেছেন)। তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্॥ সমাধিপাদ। ২৮॥—তাঁহার (ঈশ্বরের) জপ, তাঁহার অর্থচিন্তা। (কি জপ করা হইবে?)। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ। ২৭॥—প্রণবই ঈশ্বরের বাচক (নাম)।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১।১৪ ॥—নিজের দেহকে একটী অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্মথন (ঘর্ষণ) অভ্যাস করিলে নিজ দেহমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আত্মাকে দর্শন করা যায়। (পুরাকালে ঋষিগণ দুইখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। এই কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে অরণি বলা হইত)।

কৈবল্যোপনিষৎও ঐ কথাই বলেন—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥—পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় দেহকে এক অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্মথনদ্বারা (সংসার) পাশ দগ্ধ করেন।"

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়-কারিকাও বলেন—"যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৫ ॥—প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে; প্রণবই অভয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিত চিত্ত, তাঁহার কোথাও ভয় থাকে না।

"সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈবচ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥—প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এতাদৃশ প্রণবকে জানিলেই সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।"

"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮ ॥—প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী ওঙ্কারকে জানিয়া শোকাতীত হন।"

উল্লিখিত বাক্যগুলি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার মর্ম্ম এই :—

(ঠ) প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। সম্বন্ধজ্ঞানও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে—সাধক ইচ্ছা করিলে।

(ড) জানিবার উপায় হইল—প্রণবের উপাসনা, ধ্যান, প্রণবে মনঃসংযোগ, প্রণবকে শ্রেষ্ঠ-আলম্বনরূপে গ্রহণ করা, প্রণবকেই ঈশ্বর (সর্ব্বেশ্বর) রূপে মনে করা, তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ইত্যাদি।

(ঢ) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এবং কৈবল্যশ্রুতিতে জীবের দেহদ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়) উপাসনার কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(ণ) উপাসনার বা সাধনের উপদেশেই শ্রুতিতে **অভিধেয়-তত্ত্বের** কথা বলা হইয়াছে।

(ত) উপাসনার কয়েকটী ফলের কথাও বলা হইয়াছে। উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন; ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের লোকে যাইয়াও মহীয়ান্ হইতে পারেন; নির্ভয় হইতে পারেন, শোকাতীত হইতে পারেন, সংসার-পাশ ছেদন করিতে পারেন; ইত্যাদি।

(থ) সাধনের ফলের উল্লেখে শ্রুতিতে **প্রয়োজন-তত্ত্বের** কথাই বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। (দ) উপাসনাত্মক শ্রুতিবাক্যগুলিতেও প্রণবের স্বরূপ উল্লেখ আছে। ইহা স্বাভাবিকই।

(ধ) পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রশ্নোপনিষদের বাক্যে প্রণবকে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কালের প্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৎসংশ্লিষ্টবস্তুই অপর ব্রহ্ম; আর কালাতীত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। উল্লিখিত (ত) অনুচ্ছেদে উপাসনার যে কয়টী ফলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী হইল—যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন। যিনি অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ মনুষ্যলোকের সুখভোগাদি, স্বর্গাদি লোকের সুখভোগাদি যাহা ইচ্ছা করেন), তিনি তাহা পাইতে পারেন। এসমস্ত কালের প্রভাবাধীন বলিয়া অনিত্য। আর যিনি পরব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাও পাইতে পারেন—ব্রহ্মলোকেও (ব্রহ্মের ধামেও) যাইতে পারেন। ব্রহ্মলোক কালাতীত, সুতরাং নিত্য। তাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরই বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

(ন) উপাসনার যত রকম প্রকার-ভেদ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রণবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা হইয়াছে। প্রণব ব্রহ্মও বটেন, আবার ব্রহ্মের বাচকও (বা নামও) বটেন। নাম ও নামীতে যে অভেদ, তাহাও এস্থলে জানা গেল। আবার সাধনের মধ্যে নামই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাও জানা গেল।

(প) প্রণবই যে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য—স্নতরাং সম্বন্ধতত্ত্ব—কঠোপনিষদের উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলিতে অনেকগুলি বিষয় প্রচ্ছন্ন আছে—বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুতঃ প্রণব বীজস্বরূপই। প্রণব হইতেই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের অভিব্যক্তি।

প্রণবের অর্থসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে প্রদত্ত হইল। এক্ষণে গায়ত্রীর অর্থালোচনার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গায়ত্রী। মূল-গায়ত্রীমন্ত্রটি হইতেছে এই—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ইহা মূল গায়ত্রী হইলেও ইহার আরও দুইটি অঙ্গ আছে—ব্যাহৃতি ও শিরঃ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটী হইল ব্যাহৃতি। তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটী হইল মহাব্যাহৃতি। আর আপঃ জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ওম্ ইহারা গায়ত্রীর শিরঃ।

শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—প্রণবযুক্ত, ব্যাহৃতিযুক্ত এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীই সমস্তবেদের সার। "গায়ত্রীং প্রণবাদি-সপ্তব্যাহৃত্যুপেতাং শিরঃসমেতাং সর্ব্ববেদসারমিতি বদন্তি।"

প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরঃ—এই তিন বস্তু সমন্বিত সর্ব্ববেদসার গায়ত্রীর রূপ হইবে এই :—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্, ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।"

উহাই গায়ত্রীর পূর্ণরূপ হইলেও সাধারণতঃ পূর্ণরূপের জপ করা হয় না। মনু বলেন—"এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতি-পূর্ব্বিকাম্। সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্‌বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥—প্রণবযুক্তা ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা গায়ত্রীমন্ত্র দুই সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদবিদ্ বিপ্র বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন।"

শ্রীপাদশঙ্করও বলেন—"সপ্রণব-ব্যাহৃতিত্রয়োপেতা প্রণবান্তা গায়ত্রী জপাদিভিঃ উপাস্যা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটী ব্যাহৃতিযুক্তা গায়ত্রীর পূর্ব্বে ও পরে প্রণবযোগ করিয়া জপাদি দ্বারা উপাসনা করিবে।

তাহা হইলে সাধারণতঃ জপের জন্য গায়ত্রীর রূপ হইল এই :—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

গায়ত্রী-শব্দের অর্থ ব্যাসদেব এইরূপ বলেন—"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।—যিনি তোমার গান (কীর্ত্তন) করেন, তাঁহাকে ত্রাণ কর বলিয়া তোমার নাম গায়ত্রী"।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"সা ইয়ং গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গায়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম॥ ৫।১৪।৪ (গয়া এব গায়াঃ, গয়স্বার্থে ষ্ণ, গায়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী।—প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী নাম হইয়াছে। গায়-শব্দের অর্থ—প্রাণ)"

ঋক্, যজু ও সাম্—এই তিন বেদেই গায়ত্রী দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদে—৩।৪।১০; যজুর্ব্বেদে ৩।৩৫; সামবেদে—৬।৩।১০।১।

মূল গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন। "যঃ" সবিতাদেবঃ "নঃ" অস্মাকম্ "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়েৎ, "ত-" তস্য "দেবস্য সবিতুঃ" সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতস্য "বরেণ্যং" সর্ব্বৈরূপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং "ভর্গঃ" অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ "ধীমহি" ধ্যায়েম। (ভর্গস্-ভ্রস্জ অসুন্; ক্লীবলিঙ্গ)।

সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অন্বয় হইবে এইরূপ :—যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, তৎ দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি।

সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ হইল এইরূপ—"যে সবিতাদেব আমাদের কর্ম্মসমূহকে অথবা ধর্ম্মাদিবিষয়ে বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করেন (যিনি আমাদেব ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যাঁহার প্রেরণায় বা কৃপায় আমরা ধর্ম্মবিষয়িণী বা কর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি পাইয়া থাকি), সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বুদ্ধি-প্রেরকের, সেই জগৎ-স্রষ্টার, সেই আত্মভূত পরমেশ্বরের—সকলের উপাস্য এবং সকলেরই জ্ঞেয় বলিয়া সকলেরই সম্যক্‌রূপে ভজনীয় ভর্গকে, অর্থাৎ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যকে সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিতে (ধানকে আগুনের উপরে খোলায় ভাজিয়া ফেলিলে তাহার যেমন আর অঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ মায়া এবং মায়ার কার্য্যকে ফল প্রদানে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ করিতে) সমর্থ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজকে ধ্যান করি"।

এই অর্থকে আর একটু পরিস্ফুট করিলে দাঁড়ায় এইরূপ।—আমরা তাঁহার তেজকে (অর্থাৎ শক্তিকে) ধ্যান করি। কি রকম তেজ ? স্বয়ংজ্যোতিরূপ—স্বপ্রকাশ, যাহা নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—সূর্য্যের ন্যায়। আর কি রকম ? পরব্রহ্মাত্মক তেজ—পরব্রহ্মই আত্মা বা অধিষ্ঠান যাহার, সেই তেজ বা শক্তি। স্বপ্রকাশ বলিয়া এই তেজ বা শক্তি হইল চিচ্ছক্তি; আর পরব্রহ্মে তাহার অধিষ্ঠান বলিয়া এই তেজ হইল পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি—যাহাকে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি "স্বাভাবিকী পরাশক্তি' বলিয়াছেন তাহা; "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ। শ্বেতা। ৬।৮।"

এই তেজ বা পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি আবার কি রকম ? ভর্গ-শব্দে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তেজ না বলিয়া ভর্গ বলার একটা তাৎপর্য্য আছে। ভ্রস্‌জ্‌ ধাতু হইতে ভর্গ শব্দ নিষ্পন্ন। ভ্রস্‌জ্‌ ধাতুর অর্থ ভাজা —আগুনের উপরে খোলা চড়াইয়া তাহাতে যেমন ধান বা ডাইল ভাজা হয়। যে ধানকে বা ডাইলকে খোলায় ভাজা হয়, তাহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মেনা—ইহাই ভ্রস্‌জ (ভাজা) ধাতুর তাৎপর্য্য। অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যার কার্য্যকে ধানের বা ডাইলের মত করিয়া ভাজিতে পারে যে তেজঃ, তাহাকেই "ভর্গঃ—তেজঃ" বলা হয়। অবিদ্যার বা মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি আমাদের স্বরূপের স্মৃতিকে এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের স্মৃতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—স্বরূপের এবং সম্বন্ধের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং তাহার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেহেতে আমাদের আবেশ জন্মাইয়াছে। তাহার ফল হইয়াছে— আমাদের সংসার-বন্ধন, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু। পরব্রহ্মের এই তেজ বা স্বরূপশক্তি এই মায়াকে এবং তাহার কার্য্যকে (অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞানহীনতাকে এবং আমাদের দেহাবেশকে) ভাজিয়া দিতে পারে—একেবারে নিঃশক্তিক করিয়া দিতে পারে; মায়ার কবল হইতে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিয়া আমাদের সংসার-বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। তাই পরব্রহ্মের এই তেজকে (স্বরূপশক্তিকে) ভর্গ বলা হইয়াছে।

এত মাহাত্ম্য যাঁহার তেজের বা শক্তির, তিনি কিরূপ ? তৎ দেবস্য সবিতুঃ—তিনি সবিতাদেব। তিনি জগৎ-প্রসবিতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের অন্তর্য্যামী, সকলের বুদ্ধির প্রেরক; তিনি পরমেশ্বর—তাঁহা অপেক্ষা বড় ঈশ্বর (শক্তিশালী) আর কেহ নাই, তিনি আত্মভূত—পরমাত্মা, পরব্রহ্ম—শ্রুতি যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৬।৮॥" এবং "এষঃ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্য॥৬॥" এই সবিতাদেবই তিনি। দেব-শব্দে তাঁহার স্বপ্রকাশতা (দিব্‌ দীপ্তৌ) এবং সচ্চিদানন্দত্বও সূচিত হইতেছে।

তিনি "নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ"—আমাদের বুদ্ধির (ধী-অর্থ—বুদ্ধি) প্রেরক। কোন্ বুদ্ধির প্রেরক তিনি ? ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি যাহাই কিছু আমরা করিনা কেন, তজ্জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সেই বুদ্ধি তিনিই দিয়া থাকেন। (জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে ঈশ্বরাধীন কর্তৃত্ব অংশ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য হইল এই—যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি আমাদের অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্ববিষয়ণী বুদ্ধির প্রেরক, যিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এবং যাঁহার

স্বরূপশক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে সম্যক্‌রূপে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিকে আমরা ধ্যান করি।

সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর চারিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, প্রথম প্রকার অর্থের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে তস্য অর্থে সবিতুঃ-এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে "ভর্গঃ" এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে—গায়ত্রীর-অন্বয় হইবে এইরূপ :—"যৎ ভর্গঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, দেবস্য সবিতুঃ তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি।" এইরূপ অন্বয়েও শব্দসমূহের অর্থ প্রথম প্রকারের অর্থের শব্দসমূহের অর্থের অনুরূপই হইবে। কেবল পরমেশ্বরকে বুদ্ধির প্রেরক না বলিয়া এস্থলে পরমেশ্বরের ভর্গ বা তেজকে বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। আর সমস্ত প্রথম প্রকারের অর্থের অনুরূপ। প্রথম প্রকারের এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তাৎপর্য্যের কোনও পার্থক্য নাই।

সায়নের তৃতীয় প্রকারের অর্থ সূর্য্যবিষয়ক। "যঃ" সবিতা—সূর্য্যঃ "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়তি তস্য "সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ "দেবস্য" দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য "তৎ" সর্ব্বৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং "বরেণ্যং" সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং "ভর্গঃ" পাপানাং তাপকম্‌ তেজোমণ্ডলং "ধীমহি" ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম।

এস্থলে ধী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—কর্ম্ম। আর তাহার প্রেরক বা প্রবর্ত্তক—সবিতা বা সূর্য্য। সূর্য্যোদয়েই লোকের কর্ম্ম আরম্ভ হয়; তাই সূর্য্যকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। ভর্গ-শব্দের অর্থ হইয়াছে—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল, সকলেই এই সূর্য্যতেজ চাহিয়া থাকে, কেহ অন্ধকারে থাকিতে চায় না—কেবল অন্ধকারে কেহ বাঁচিতেও পারে না। তাই এই ভর্গ—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল হইল বরেণ্যং—প্রার্থনীয়, কাম্য। সূর্য্য হইতে এই জগতের—আমাদের এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহের—উদ্ভব বলিয়া সূর্য্যের নাম সবিতা—জগৎ-প্রসবিতা। এইরূপে সায়নাচার্য্যকৃত গায়ত্রীর তৃতীয় অর্থের তাৎপর্য্য হইল এইরূপ—যে সূর্য্য হইতে জগতের উদ্ভব, যে সূর্য্য আমাদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক সেই সূর্য্যের তেজোমণ্ডলকে—যে তেজোমণ্ডল সকলেই দেখে এবং সকলেরই কাম্য, সেই তেজোমণ্ডলকে—ধ্যেয় বস্তু বলিয়া আমরা মনে ধারণা করি।

সায়নাচার্য্যের চতুর্থ রকমের অর্থে ভর্গঃ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—অন্ন, আর ধীঃ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে কর্ম্ম। "ভর্গঃশব্দেন অন্নমভিধীয়তে। যঃ সবিতা দেবঃ ধিয়ং প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাৎ অন্নাদিলক্ষণং ফলং ধীমহি ধারয়ামঃ তস্য আধারভূতাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। ভর্গঃশব্দস্য অন্নপরত্বে ধীশব্দস্য চ কর্ম্মপরত্বে চ আথর্ব্বণমিত্যাদি।"

এস্থলেও সবিতা-অর্থ—সূর্য। প্রথম তিন প্রকারের ব্যাখ্যায় ধীমহি ক্রিয়াপদ ধ্যানার্থক "ধ্যৈ"-ধাতু হইতে এবং চতুর্থ প্রকারের অর্থে আধারার্থক "ধীঙ"-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রকারের অর্থের তাৎপর্য্য এই—যে সূর্য্যদেব আমাদের সমুদয় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন অন্নাদিরূপ ফল ধারণ করিতে পারি।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের অর্থ পরব্রহ্ম বিষয়ক নয়।

এক্ষণে গায়ত্রীর ব্যাহৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্‌—এই সাতটী ব্যাহৃতিতে সপ্তলোক বুঝাইতেছে। প্রণবের অর্থে যাহাকে কেবল "ইদম্‌—ইহা" বলা হইয়াছে, যেন পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই "ইদম্‌—ইহা" বলা হইয়াছে, কোনও নাম করা হয় নাই, গায়ত্রীতে তাহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে—ভূঃ, ভুবঃ-ইত্যাদি। ভূর্ভুবাদি সাতটী লোককেই ওম্‌-এর অর্থে "ইদম্‌—ইহা" বলা হইয়াছে। এই সাতটীও প্রণবই ব্রহ্মই—প্রণবের বা ব্রহ্মের পরিণতি। এই সপ্তলোক ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সপ্তলোক ব্যাপিয়াও ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহাই সূচিত হইল। গায়ত্রীর সঙ্গে এই সপ্তলোকের উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—যিনি এই সপ্তলোক ব্যাপিয়া বিরাজিত, অথবা, যিনি এই সপ্তলোকরূপে নিজকে পরিণত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরই আমাদের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার মায়ানিবর্ত্তিকা স্বরূপ-শক্তির ধ্যানই আমরা করি। তাঁহা হইতে সপ্তলোক জন্মিয়াছে, তাই তিনি সবিতা—জগৎ-প্রসবিতা।

ব্যাহৃতি-শব্দের অর্থ—বাক্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম—এই সাতটী শব্দের উচ্চারণ (ব্যাহরণ) করিয়াছিলেন বলিয়া এই সপ্তলোককে ব্যাহৃতি বলে।

এক্ষণে গায়ত্রীর শিরঃ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এবং ওম্—এই নয়টী হইল গায়ত্রীর শিরঃ বা মস্তকতুল্য। এই কয়টী শব্দ সাক্ষাদভাবেই পরব্রহ্মকে বুঝায়। তাই ইহারা গায়ত্রীর উত্তমাঙ্গস্থানীয়। ব্যাহৃতিগুলি কারণরূপ-ব্রহ্মের বাচক; অর্থাৎ সপ্তব্যাহৃতি পরম্পরাক্রমেই ব্রহ্মকে বুঝায়। অথবা, সপ্তব্যাহৃতি হইল অপর-ব্রহ্মবাচক। আর শিরঃ হইল পরব্রহ্ম-বাচক। প্রণবও পর এবং অপর উভয়-ব্রহ্মবাচক।

গায়ত্রীর শিরোবাচক শব্দগুলি কিরূপে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

আপঃ—আপ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আপ্-ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। তাই, আপঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্বব্যাপক। ইহাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বব্যাপক সত্তাই সূচিত হইতেছে।

জ্যোতিঃ—শব্দে প্রকাশকত্ব সূচিত হয়। যেমন সূর্য্য—নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। জ্যোতিঃ-শব্দ স্বপ্রকাশত্ব বুঝাইতেছে; স্বপ্রকাশ বলিয়া চিদরূপত্বও বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ।

রসঃ—শ্রুতির "রসো বৈ সঃ।" ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—আস্বাদক, রসিক। আর রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ,—আস্বাদ্যবস্তু। ব্রহ্ম হইলেন পরম-আস্বাদ্যবস্তু এবং পরম-আস্বাদকও।

অমৃতম্—জন্ম-জরা-মৃত্যুশূন্য। ইহাদ্বারা নিত্য-মায়ামুক্তত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-মায়ানির্মুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব।

ব্রহ্ম—বৃহত্ত্ব। সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে—সমস্ত বিষয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রণব বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—পরব্রহ্ম (বা প্রণব) সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধবুদ্ধনিত্যমুক্ত-স্বভাব, স্বপ্রকাশ, সৎ-চিৎ-আনন্দময়, পরম-আস্বাদক।

ইহার পরেই গায়ত্রীর শিরের অপর তিনটী বস্তু—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ। ব্যাহৃতিতেও এই তিনটী বস্তু আছে; কিন্তু ব্যাহৃতির সাতটী বস্তুই প্রণবার্থের "ইদম্ বা এতৎ"-শব্দের বিবৃতি বা বাচ্য। "ইদম্ বা এতৎ"-শব্দবাচ্য বস্তুগুলি যে কালপরিণামী, একথা প্রণব-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সাতটী ব্যাহৃতিই কালপরিণামী। গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ-স্থানীয় বস্তুগুলি কালপরিণামী হইতে পারে না। তাই, মনে হয়, শিরঃ-স্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" এই তিনটীও কালপরিণামী নয়, অর্থাৎ ব্যাহৃতিতে যে "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-এর উল্লেখ আছে, শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ তাহা নয়। একার্থবোধক বা একবস্তুজ্ঞাপক শব্দ একই গায়ত্রীতে দুইবার উল্লেখের সার্থকতাও দেখা যায় না। শিরঃস্থানীয় ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ হইবে প্রণবের বা ব্রহ্মেরই ন্যায় কালাতীত। এক্ষণে কালাতীত ভূ, ভুবঃ, স্বঃ"-এর কি তাৎপর্য্য হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

প্রণবের অর্থই গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রণবসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যগুলিতে যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই:—(১) ইদম্ বা এতৎ (পরিদৃশ্যমান কালপরিণামী), (২) অপরব্রহ্ম, (৩) পরব্রহ্ম (কালাতীত), (৪) প্রণবের বা ব্রহ্মের উপাসনা, (৫) উপাসনার ফল—অপরব্রহ্মপ্রাপ্তি, (৬) উপাসনার ফল পরব্রহ্মপ্রাপ্তি (৭) ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি।

গায়ত্রীতে এই সমস্ত থাকিলেই গায়ত্রীকে প্রণবের অর্থবাচক বলা সঙ্গত হইবে। এ পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অর্থে উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্ কোন্টী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। (১) ব্যাহৃতিতে "ইদম্ বা এতৎ"-এর বিবৃতি, (২) ব্যাহৃতিতেই অপর ব্রহ্মের বিকাশ, (৩) মূলগায়ত্রীস্থিত সবিতাদেব-শব্দে, সায়নাচার্য্যের প্রথমও দ্বিতীয় ভাষ্যানুসারে, পরব্রহ্ম এবং গায়ত্রীশিরঃস্থানীয় আপঃ জ্যোতিঃ রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম শব্দসমূহেও পরব্রহ্ম, (৪) ধীমহি-শব্দে উপাসনা, (৫) উপাসনায় ব্যাহৃতির চিন্তায় অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, সায়নাচার্য্যের তৃতীয় ও চতুর্থ

প্রকারের অর্থেও অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, (৬) গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় আপঃ; জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্মের চিন্তাগর্ভ উপাসনায় পরব্রহ্মপ্রাপ্তি—এই কয়টী বিষয় পাওয়া গিয়াছে। গায়ত্রীর যে অর্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় নাই। তাহাতে মনে হয়, পূর্ণ গায়ত্রীর অবশিষ্ট অংশের—শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-এই অংশের—ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ "ব্রহ্মলোকই" বিবৃত হইয়াছে।

ভূঃ এবং ভুবঃ—এই উভয় শব্দই ভূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভূ-ধাতুতে সত্তা বুঝায়। সুতরাং এই উভয় শব্দই স্থানবাচক—লোকবাচক হইতে পারে। অভিধানে দেখা যায়, ভূ-শব্দে স্থানমাত্রকেই বুঝায় (মেদিনী)। সুতরাং এস্থলেও ভূ-শব্দে স্থানবিশেষ বা লোকবিশেষকে বুঝাইতে পারে এবং ভূ-শব্দ গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় বলিয়া এই স্থান হইবে কালাতীত স্থান—কালাতীত ব্রহ্মের ধাম-বিশেষ।

প্রণবের উপাসনাবাচক শ্রুতিবাক্যে, "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান" হওয়াকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা বলা হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার ফলও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কালাতীত কোনও নিত্যবস্তুই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মলোক যে কালাতীত নিত্যবস্তু তাহাই বুঝা গেল। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধামের কথা পাওয়া যায়। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য এষ মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে হ্যেব বোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২।২।৭" ঋক্‌পরিশিষ্টেও বিষ্ণুলোকের কথা দৃষ্ট হয়। "যত্র তৎপরমং পদং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" অন্যত্রও এইরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি॥" ছাঃ উঃ ৭।২৪।১॥" ব্রহ্মের এই "স্বীয়-মহিমা" তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষই তাঁহার ধাম বা লোক; তাই ব্রহ্মলোক হইবে—নিত্য, লোকাতীত। কারণ, ইহা লোকাতীত ব্রহ্মের ধাম।

এক্ষণে বুঝা গেল, গায়ত্রী-শিরঃস্থানীয় ভূঃ-শব্দে কালাতীত নিত্য ব্রহ্মলোকই বুঝাইতেছে।

ভুবঃ-শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশও হয় (শব্দকল্পদ্রুম); আকাশে ব্যাপ্তি বুঝায়। সুতরাং ভুবঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক সর্ব্বব্যাপক—ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা, ভূ-ধাতুর প্রকাশন অর্থও হইতে পারে। 'ভুবঃ ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে (শঙ্করাচার্য্য)—সমস্তকে প্রকাশ করে, এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ ভুবঃ-শব্দে চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে।" এই অর্থে ভুবঃ-শব্দে স্বপ্রকাশতা এবং চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল স্বপ্রকাশ এবং চিদ্রূপ—সুতরাং কালাতীত।

তারপর "স্বঃ"-শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাম"—ইত্যাদি ১০।৪৭।৬০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী "স্বর্যোষিতাম্-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ-লোকগণশিরোমণিবৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাম্।" তিনি "স্বঃ"-শব্দের অর্থ করিলেন—দিব্যসুখভোগাস্পদ বৈকুণ্ঠ বা ভগবদ্ধাম। এই ভগবদ্ধাম বা ব্রহ্মলোক হইল দিব্যসুখভোগাস্পদ—দিব্যসুখ বলিতে কালাতীত নিত্য চিন্ময় সুখকেই বুঝায়। মূল গায়ত্রীতে যাঁহাকে "সবিতুঃ দেবস্য" বলা হইয়াছে, সেই দেবের ধাম দিব্যসুখময়ই হইবে। এইরূপে দেখা গেল স্বঃ"-শব্দে চিন্ময়-সুখস্বরূপত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল চিন্ময়সুখস্বরূপ।

অথবা, স্বঃ-শব্দে দিব্যসুখময় ব্রহ্মধাম, ভূঃ-শব্দে তাহার নিত্যত্ব এবং ভুবঃ-শব্দে তাহার স্বপ্রকাশত্ব এবং চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে—এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—গায়ত্রী-শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-অংশে দিবসুখস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ এবং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মলোক সূচিত হইতেছে।

সর্ব্বশেষ "ওম্"-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর অর্থে—ব্যাহৃতি এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীর অর্থে—যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই "ওম্" বা প্রণব এবং প্রণবেরই বিভূতি।

গায়ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থ বিবৃত হইল। এই অর্থ হইতে দেখা যায়, প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। "ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ"-অংশের ব্যাখ্যার উপক্রমে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,

প্রণবের অর্থে বীজাকারে সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্বের কথাও আছে। গায়ত্রীতেও এসকল কথা একটু স্ফুটতর ভাবে বিদ্যমান, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে।

গায়ত্রীতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। (ক) প্রণবে যাহা কেবল "ইদম্ বা এতৎ" এবং "ভূতম্ ভবৎ—ভবিষ্যৎ" ইত্যাদি বাক্যে ইঙ্গিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকই প্রণবার্থের ইদম্-শব্দের বাচ্য।

(খ) প্রণবের অর্থে যাহা কেবল "যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্"-বাক্যে ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর শিরোভাগে তাহাই একটু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম—এই পদসমূহে। প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ, পরম-আস্বাদ্য পরম-আস্বাদক, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব—অজর, অপহতপাপ্মা ইত্যাদি এবং স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে—সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব।

(গ) প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বেশ্বর এবং অন্তর্য্যামী বলিয়া এবং জগতের যোনি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আমাদের—জগতিস্থ জীবের—বুদ্ধির প্রেরক, আমাদের কর্ম্মবিষয়া বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবিষয়া বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ আমাদের পুরুষার্থ-বিষয়ক প্রয়াসে আমাদের বুদ্ধির বা ইচ্ছার প্রবর্ত্তক।

গায়াত্রীতে অভিধেয়তত্ত্ব। (ঘ) প্রণবের অর্থে উপাসনার বা ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রণবের কোন্ বৈশিষ্ট্যের বা ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীতে তাহা বলা হইয়াছে—তাঁহার ভর্গের বা তেজের (স্বরূপশক্তির) ধ্যান করিতে হইবে; যেহেতু, এই তেজ সকলের উপাস্য সকলের জ্ঞেয়, সম্যক্‌রূপে সকলের ভজনীয়। কেন এই তেজ সকলের সম্যক্‌রূপে ভজনীয়, তাহাও বলা হইয়াছে—এই তেজ স্বয়ংজ্যোতি এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহাদ্বারা মায়া এবং মায়ার কার্য্য ভর্জ্জিত বা নির্বীর্য্য হয়—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়।

(ঙ) সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বকারণকারণ, রসস্বরূপ প্রণব বা ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের কথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিস্থানীয় ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক—প্রণবের অভিব্যক্তি হইলেও—সুতরাং অপরব্রহ্ম হইলেও—অবিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভাব হইতে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষের পক্ষে ধ্যেয় নয়; তাঁহার পক্ষে প্রণবের তেজই ধ্যেয়। যাঁহারা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্তির—অর্থাৎ ভূর্ভুবাদিলোকের অনিত্য সুখভোগ প্রাপ্তির—আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঐসমস্ত সুখভোগের কামনা চিত্তে পোষণ করিয়া প্রণবের তেজের ধ্যান করিলে তাহা পাইতে পারেন। যাঁহারা অবিদ্যা হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কামনা করিবেন, ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার তেজের ধ্যানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। প্রণবার্থে কঠোপনিষদের "যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ"—এই বাক্য হইতেই সাধকের ইচ্ছানুরূপ ফল-প্রাপ্তির কথা আসিতেছে।

গায়ত্রীতে প্রয়োজনতত্ত্ব। (চ) গায়ত্রীর অর্থ হইতে জানা যায়, অবিদ্যার এবং অবিদ্যার প্রভাবের সম্যক্ অপসারণই ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের মুখ্য ফল। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই অবিদ্যার প্রভাবেই জগতিস্থ জীব কালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আছে। সুতরাং অবিদ্যা অপসারিত হইলেই জীব কালের প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারিবে, পরিদৃশ্যমান জগতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে; তখনই তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, তখনই জীব "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হইতে পারিবে।

(ছ) ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধটী যখন নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য, যে আবরণে তাহা আবৃত হইয়া আছে, তাহা (অর্থাৎ অবিদ্যা) অপসারিত হইলে সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইতে পারে, সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই জীব "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হইতে পারে। ইহাই উপাসনার ফল বা প্রয়োজনতত্ত্ব।

এইরূপে দেখা গেল, প্রণবে যাহা বলা হইয়াছে, গায়ত্রীতে তাহাই স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রণবকে বীজ মনে করিলে গায়ত্রীকে তাহার অঙ্কুর মনে করা যায়; বস্তুতঃ বেদ-উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্রই

প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থপ্রকাশক। বীজরূপ প্রণবই গায়ত্রীতে অঙ্কুরিত হইয়া বেদ-উপনিষদাদিরূপ বিরাট মহীরুহে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

গীতায় প্রণবের অর্থ-বিকাশ। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥—সমস্ত উপনিষদ্-রাশি গাভীসদৃশ; পার্থ বৎসসদৃশ; আর গোপরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাভীদোহনকারী। বৎসরূপ অর্জ্জুনের উপলক্ষ্যে তিনি গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। নির্ম্মল বুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই দুগ্ধের ভোক্তা।" এই উক্তি হইতে জানা যায়—সমস্ত উপনিষদের সার হইল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সুতরাং গীতার উক্তি হইল উপনিষদেরই উক্তি। গীতায় প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে; দেখা যাউক।

(ক) গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, সমস্তের আদি অজ, শাশ্বত, বিভু। শ্রীকৃষ্ণোক্তি যথা। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনোক্তি, যথা। "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥" প্রণবের অর্থেও বলা হইয়াছে—প্রণবই ব্রহ্ম।

(খ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের যোনি,—উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। গীতা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই জগতের যোনি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭।৬॥ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্॥ ৭।১০॥ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥১০।৮॥"

(গ) প্রণবের অর্থে ইঙ্গিতে জানা গিয়াছিল, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান; গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই জগতের অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭।৭॥" বিশ্বরূপে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছেনও।

(ঘ) জগতের অধিষ্ঠানভূত হইয়াও জগতের সহিত যে প্রণবের বা ব্রহ্মের স্পর্শ নাই, প্রণবের অর্থে প্রচ্ছন্নভাবে তাহা জানা গিয়াছে। গীতা স্পষ্ট কথায় বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও স্পর্শহীন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২॥—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে নাই।"

এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(ঙ) প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে যাহা পরিস্ফুট হয় নাই, পরব্রহ্মের রূপ-গুণ-লীলাদি সম্বন্ধে সেইরূপ কথাও গীতায় জানা যায়। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ ৪।৯॥"-ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনের নিকট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব (দিব্যজন্ম) আছে, তাঁহার লীলা (কর্ম্ম) আছে। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি জগতে অবতীর্ণ হন। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৭-৮॥" তাঁহার যে অনন্ত রূপ আছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহাও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে কোনও কোনও রূপ দেখাইয়াছেনও। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ। ১১।৫॥"

(চ) প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে। অন্তর্য্যামী বলিয়া গায়ত্রীতে তাঁহাকে বুদ্ধির প্রবর্ত্তক এবং ধ্যেয় বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে গীতার উক্তি বেশ সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১৫॥—অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে আমিই প্রবিষ্ট হইয়া আছি। আমা হইতেই তাহাদের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের

স্মৃতি জন্মে, আমা হইতেই তাহাদের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান জন্মে এবং আমা হইতেই তাহাদের স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব হয়। আমিই সকল বেদের বেদ্য। বেদান্তের প্রবর্ত্তকও আমি, বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তাও আমি।"

অন্যত্রও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ ১৮৬১॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—ঈশ্বর (প্রণব-রূপ সর্ব্বেশ্বর) অন্তর্য্যামিরূপে প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন—বিবিধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।" শ্রুতিও এরূপ বলিয়া থাকেন। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬।১১॥ য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক। ৩।৭।৩॥"

ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি-বিষয়ে বুদ্ধির প্রবর্ত্তকও তিনি। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা। ১০।১০॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন—যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভাবে আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইতে পারেন।"

এইরূপে গীতাতে প্রণবের যে অর্থ বিকশিত হইয়াছে, তদনুসারে জানা যায় —শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এবং **শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব।**

গীতায় অভিধেয়তত্ত্ব। (ছ) প্রণবের অর্থে প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানার উপদেশ এবং তদনুকূল সাধনের উপদেশও আছে। গায়ত্রীর অর্থেও তাঁহার তেজের ধ্যানের কথা দৃষ্ট হয়। সেই ধ্যানের তাৎপর্য্য কি, কোন্ উপায়ে পরব্রহ্মকে জানা যায়, গীতা অতি স্পষ্ট ভাবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ১৮।৫৫॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমি স্বরূপতঃ যেরূপ (সর্ব্বব্যাপী) এবং স্বরূপতঃ আমি যাহা (সচ্চিদানন্দ), ভক্তিদ্বারাই তাহা সম্যক্‌রূপে জানা যায়।" আরও তিনি বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪॥—অনন্যভক্তিদ্বারাই আমার এই তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।"

গায়ত্রীর অর্থে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, গীতার বাক্য হইতে জানা গেল, তাহা হইবে ভক্তিমূলক ধ্যান। ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিতে পারে), ভক্তিদ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ হইতে পারে এবং ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাতে প্রবেশ লাভ (অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি) হইতে পারে। এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্বই গীতায় প্রতিপন্ন হইল।

গীতায় প্রয়োজনতত্ত্ব। (জ) উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন—প্রণবের অর্থে তাহা জানা গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাপ্তব্য বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা প্রণবের বা গায়ত্রী অর্থে জানা যায় নাই; কেবল পরব্রহ্মের এবং অপর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি—ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্বন্ধে গীতায় স্পষ্টতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদিসুখভোগ লাভ হইতে পারে; কিন্তু এই স্বর্গসুখ যে অনিত্য, তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে। ইহা অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগের কথা, ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির (ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়ার) কথাও গীতায় বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কথাই গীতার শেষ কথা (১৮।৬৫)। এবং ইহা যে সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (১৮।৬৪)। ইহাতে বুঝা যায়, সেবাপ্রাপ্তিই চরম-তম কাম্যবস্তু। ইহাই চরম-তম প্রয়োজন।

মন্তব্য। (ঝ) গীতা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(ঞ) প্রণবের অর্থে সাধনের উপদেশ আছে। কেন সাধনের প্রয়োজন হইল, তাহা বলা হয় নাই। তাহা প্রচ্ছন্ন আছে। গায়ত্রীর ভর্গ-শব্দের অর্থে সায়নাচার্য্য একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন—অবিদ্যাকে অপসারিত করাইবার জন্যই ব্রহ্মের তেজের ধ্যান করিতে হয়। এই অবিদ্যার বা মায়ার কথা গায়ত্রীতেও স্পষ্ট নহে। গীতায় একটু স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ৭।১৩ ॥ —শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন, মায়ার ত্রিবিধ গুণময় ভাবই (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই) জগৎকে (অর্থাৎ জগদ্‌বাসী জীবগণকে) মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মায়িক-গুণসমূহের অতীত অব্যয় (নির্ব্বিকার) আমাকে মুগ্ধজীব জানিতে পারে না।" জীব মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে (সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধকেও) ভুলিয়া আছে। তাই, এই ভুল দূর করার জন্য সাধনের প্রয়োজন হয়।

(ট) মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারে, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও স্ফুরিত হইতে পারে। কিরূপে, অর্থাৎ কিরূপ সাধনে, মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪ ॥—এই গুণময়ী মায়া আমার শক্তি; তাই জীবের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া। যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, কেবলমাত্র তাহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।" তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে—ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করা। পূর্ব্বোল্লিখিত "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। গায়ত্রীর ভাষ্যে "ভর্গ"-শব্দের অর্থে সায়নাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, গীতার উল্লিখিত "দৈবীহ্যেষা"-ইত্যাদি শ্লোকে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। মায়া যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহাও জানা গেল।

(ঠ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং এই পরিদৃশ্যমান জগতের অতীতও অন্য যাহা কিছু আছে, যাহা ত্রিকালাতীত—তাহাও ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। উপরোক্ত (ঞ)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত (৭।১৩) গীতা-শ্লোকের অন্তর্গত "এভ্যঃ পরমব্যয়ম্"-বাক্যে যেই কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গায়ত্রীর শিরঃ-অংশে "আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম"—এই শব্দসমূহেও এই কালাতীত ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে; তবে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গীতার শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও এইরূপ স্পষ্টোক্তি দৃষ্ট হয়।

(ড) ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া জীবের সহিত তাঁহার একটা নিত্য সম্বন্ধের ইঙ্গিত প্রণবের অর্থে পাওয়া যায়। প্রণবের অর্থে এবং গায়ত্রীতে উপাসনার উপদেশেও সেই সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সম্বন্ধটী কিরূপ, প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে তাহা জানা যায় না। গীতাতে তাহা জানা যায়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো"-ইত্যাদি (৭।৫)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—জীবভূতা-শক্তি বা জীবশক্তি এবং এই শক্তি তাঁহার মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা। আবার "মমৈবাংশো জীবভূতো"-ইত্যাদি (১৫।৭)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ তাঁহার অংশ। আবার "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।"-ইত্যাদি (২।২৪)-শ্লোক হইতে জানা যায়, জীব স্বরূপতঃ জড়-বিরোধী—চিন্ময় বস্তু। এজন্যই জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

(ঢ) জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ হওয়ায় ইহাও জানা যাইতেছে যে, জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। কারণ, শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম এবং অংশীর সেবা করাই অংশেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণসেবাকে "সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য" বলা হইয়াছে।

(ণ) প্রণবের অর্থে যে "ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং গায়ত্রীর শিরোভাগে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"-অংশে যাহার স্বরূপের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, গীতাতেও "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১ ॥" এবং "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬ ॥—যেস্থানে গেলে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।"—এই বাক্যদ্বয়ে তাহারই কথা দৃষ্ট হয়।

(ত) প্রণবের অর্থে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে। সবিশেষ হইলে তাঁহার শক্তিও থাকিবে। গায়ত্রীর "ভর্গ"-শব্দে এই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তিরই আরও এক বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গীতার "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। ১৪।২৭॥"-বাক্যে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তিনি ব্রহ্মের আশ্রয়। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥ ৩।১।৩॥"—এই শ্রুতিবাক্যে "কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষকে"—প্রণবের অর্থে যাঁহাকে "সর্ব্বেশ্বর"-বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "ব্রহ্মের যোনি" বা "ব্রহ্মের মূল" বলা হইয়াছে। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় পরব্রহ্ম এক হইয়াও বহু রূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। গীতায় পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে যে-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মও এই পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ—একথাই যেন প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির অস্তিত্ব হইতেও জানা যায়—ব্রহ্ম বা প্রণব সবিশেষ।

(থ) গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দুইটী শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল—জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তাৎপর্য্যার্থে স্বরূপ-শক্তির উল্লেখও দৃষ্ট হয়! শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-জন্ম-কর্ম্মাদি, বিশ্বরূপ-প্রকটনাদি, মায়াদূরীকরণ-সামর্থ্যাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা গেল, যে অর্থ প্রণবে বীজরূপে এবং গায়ত্রীতে অঙ্কুররূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই গীতাতে পরিপুষ্ট অঙ্কুররূপে—শাখাপত্রাদিসমবেতরূপে—অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থ বিকাশ। সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বে—কিরূপে সৃষ্টি করা হইবে—এবিষয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার সুদীর্ঘকাল অতীত হইল; তথাপি তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। তখন, তপস্যা করার জন্য এক আকাশবাণী তাঁহাকে আদেশ দিলে, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া দেবপরিমিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সপার্ষদ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদির উদয় হইল, তিনি ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। ভগবান্ স্বীয় করে তাঁহার করস্পর্শ করিয়া, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানাইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ব্রহ্মা চারিটী বিষয় জানিতে চাহিলেন, যথা (১) আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ কীদৃশ, "(২) আপনার মায়া কি বস্তু, (৩) মায়ার সহযোগে আপনার লীলাতত্ত্ব কিরূপ এবং (৪) কি উপায় অবলম্বন করিলে এসমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং মায়াভিভূতও হইতে হইবে না।" ভগবান্ প্রীত হইয়া চারিটী শ্লোকে কয়েকটী তত্ত্বকথা ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন—"এই উপদেশগুলির কথা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে কল্প-বিকল্পেও তোমার আর মোহ জন্মিবে না।" ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট এই চারিটী শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলে। এই চারিটী শ্লোক ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র নারদকে একটু বিস্তৃতভাবে উপদেশ করেন (শ্রীভা, ২।৭।৪২ এবং ২।৭।৪৩) এবং নারদ আবার সরস্বতী-নদীতীরে স্বীয় আশ্রমে ধ্যাননিমগ্ন ব্যাসদেবের নিকটে তাহা কীর্ত্তন করেন (শ্রীভা, ২।৭।৪৪)। শুনিয়া ব্যাসদেব মনে করিলেন—"এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ। শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ॥ ২।২৫।৮১॥"

বিভিন্ন উপনিষদের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—বেদান্ত-সূত্রে তিনি যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্যও তাহাই। এই চতুঃশ্লোকীকে বিবৃত করিয়া তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত করিলেন। "অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত॥ ২।২৫।৮৪)।" শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ। "অতএব ভাগবত – সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥ ২।২৫.১০৮॥" শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীরও ভাষ্যসদৃশ। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে তাই গরুড়পুরাণ বলেন "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥—শ্রীমদভাগবতগ্রন্থ স্বয়ংভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত। ইহাতে দ্বাদশটী স্কন্ধ এবং শত শত (তিনশত

পঁয়ত্রিশটী) অধ্যায় আছে। ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থসদৃশ, ইহাতে সমগ্র মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমগ্র বেদার্থ-দ্বারা ইহার কলেবর বার্দ্ধিত এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা সামবেদসদৃশ।" শ্রীমদভাগবতের মধ্যেই স্বয়ং সূতগোস্বামী বলিয়াছেন—এই শ্রীমদভাগবত "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১।৩।৪২॥ সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥ ১২।১৩।১৫ ॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত যখন গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং চতুঃশ্লোকীর বিবৃতিস্বরূপ, তখন চতুঃশ্লোকীই হইবে গায়ত্রীর—সুতরাং প্রণবেরও—সংক্ষিপ্ত অর্থস্বরূপ। চতুঃশ্লোকীতে যে প্রণবের অর্থ একটু বিস্তৃত ভাবেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইবে।

প্রণব ও গায়ত্রীর ন্যায় চতুঃশ্লোকীতেও সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, ছয়টী শ্লোকে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রমথ দুইটী শ্লোক উপক্রমণিকাস্থানীয়। পরবর্ত্তী চারিটীকেই চতুঃশ্লোকী বলা হয়। আমরা প্রথমে উপক্রমণিকা-স্থানীয় শ্লোক দুইটীরই উল্লেখ করিব।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ শ্রীভা, ২।৯।৩০ ॥"

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! (জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হইল সাধারণ জ্ঞান, জড়াতীত নির্ব্বিশেষ-সচ্চিদানন্দ-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) জ্ঞান, অন্তর্য্যামি-পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্যতর জ্ঞান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাময় সবিশেষ চতুর্ভুজরূপে যিনি তোমাকে উপদেশ দিতেছেন, সেই) আমার সম্বন্ধীয় পরম গুহ্য (গুহ্যতম) জ্ঞানের কথা, মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের বিজ্ঞানের (বা অনুভবের) কথা, মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভের যে রহস্য (অর্থাৎ প্রেমভক্তি, যাহা সহজে ভগবান্ কাহাকেও দেন না, সুতরাং যাহা পরম গোপনীয় অর্থাৎ রহস্যময়-বস্তু) আছে, তাহার কথা এবং মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের যে অঙ্গ (অর্থাৎ প্রেমভক্তি উন্মেষিত হওয়ার অনুকূল সাধন) আছে তাহার কথাও (আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না বলিয়া আমিই) তোমাকে কথায় বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত গ্রহণ কর।"

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ শ্রীভা, ২।৯।৩১ ॥"

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আরও বলিলেন—"ব্রহ্মন্! আমি যে স্বরূপ-বিশিষ্ট (অর্থাৎ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট), আমি যে লক্ষণবিশিষ্ট, আমি শ্যাম-চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদি যে সকল রূপবিশিষ্ট, আমি যাদৃশ-রূপগুণ-লীলাবিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে সে সমস্তের যথার্থ অনুভব তোমার হউক।"

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া কিম্বা অপরের মুখে শুনিয়া তত্ত্বাদিসম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইল পরোক্ষ জ্ঞান বা আক্ষরিক জ্ঞান। এই জ্ঞান মস্তিষ্কেই থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এই জ্ঞানের অনুভব যখন জন্মে, তখনই তাহাকে বলে বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানের মূল্য বিশেষ কিছু নাই; তাহা আমাদের চিত্তের উপরে বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। লোকের সাক্ষাতে আমরা কোনও অন্যায় কাজ করি না; কারণ, লোকসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান—ইহা জানিয়াও (এবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) আমরা অপর লোকের অলক্ষিতভাবে অন্যায় কাজ করি, অসঙ্গত চিন্তা মনে পোষণ করি। ভগবান্ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান নাই বলিয়াই আমরা অনুভব করিতে পারি না যে, আমাদের গুপ্ত কাজ বা চিন্তাও তিনি জানিতে পারেন। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু ভগবৎ-কৃপা (অথবা ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষের কৃপা) ব্যতীত জন্মিতে পারে না। তাই পরম-করুণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"তত্ত্বের কথা আমি তোমাকে কথায় বলিয়া যাইব; তুমিও শুনিবে, শুনিয়া হয়তো মনে করিয়াও রাখিবে। কিন্তু আমার কথিত বিষয়ের অনুভব

না জন্মিলে, তাহাতে তোমার বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। আমার কৃপা ব্যতীত তুমি নিজে নিজে অনুভবও করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আমার কৃপায় আমার কথিত তত্ত্বসম্বন্ধে তোমার বিজ্ঞান বা অনুভব—অপরোক্ষ জ্ঞান—জন্মুক!"

এই শ্লোক দুইটীতে—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্বেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি (ভগবান্), আমার চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদিরূপ; আমার গুণ, আমার লীলা—এসমস্তই সম্বন্ধতত্ত্ব। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইল সম্বন্ধ-তত্ত্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞান। আমাকে (ভগবান্‌কে) জানিবার—অনুভব করিবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেমই (যাহাকে উল্লিখিত শ্লোকে রহস্য বলা হইয়াছে, সেই রহস্যই) হইল প্রয়োজন-তত্ত্ব। আর এই প্রেম-প্রাপ্তির জন্য যে সাধন করিতে হয়, সেই সাধনই (শ্লোকে যাহাকে তদঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহাই) অভিধেয়-তত্ত্ব।

ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি হইল তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। শক্তি ও শক্তিমান্‌কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া ভগবানের শক্তি এবং শক্তির বিলাসাদিও (অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও) তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপাতিরিক্ত নহে। রূপগুণাদি স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ভেদবোধক বিশেষত্ব। বিশেষত্বের জ্ঞানেই স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা। তাই, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকে কেবল স্বরূপের জ্ঞানের কথা (মে জ্ঞানং) বলিয়াও দ্বিতীয় শ্লোকের "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।"-বাক্যে রূপগুণাদির কথা বলা হইয়াছে। রূপগুণাদির জ্ঞানও সম্বন্ধজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার প্রার্থিত বিষয়গুলি পরবর্ত্তী চতুঃশ্লোকীতে জানাইতেছেন। চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ শ্রীভা ২।৯।৩২॥"

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে) আমিই ছিলাম; অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান এবং যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহারাও আমা হইতে পৃথক্ ছিল না। সৃষ্টির পরেও (পশ্চাৎ) আমিই আছি। এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, তাহাও আমিই। প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই।"

এই শ্লোক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—অগ্রে অহম্ এব আসম্—আগে আমিই ছিলাম। আগে-শব্দের তাৎপর্য্য এই—সৃষ্টির এবং সৃষ্টির সূচনারও আগে। ভগবান যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টির সূচনা (তাহার পরে মায়ার প্রতি দৃষ্টি, তারপর প্রকৃতির বিক্ষোভাদি)। এই সূচনার অর্থাৎ ভগবানের মনে সৃষ্টিবাসনা জন্মিবারও পূর্ব্বে, যখন মহাপ্রলয় চলিতেছিল, সেই সময়টাই আগে-শব্দে সূচিত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন—মহাপ্রলয়ের সময়েও আমিই—হে ব্রহ্মন্! যে আমি তোমাকে কৃপা করিয়াছি, তোমার করস্পর্শ করিয়া বর-প্রার্থনার আদেশ করিয়াছি, তুমি যে-আমার ধাম বৈকুণ্ঠের দর্শন পাইয়াছ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-আদি যে-আমার পরিকর-বর্গের দর্শন পাইয়াছ, অশেষ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ যে-আমি তোমাকে তত্ত্বোপদেশ করিতেছি, সেই আমিই, মহাপ্রলয় যখন চলিতেছিল, তখন—ছিলাম।

কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে রাজা একাকী আসেন নাই, তাঁহার পরিকরবর্গও আসিয়াছেন, ইহাই বুঝায়. (যথা রাজাসৌ গচ্ছতি ইত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ॥ বেদান্তসূত্র। ১।১।১-সূত্রের শঙ্করভাষ্য।) অথচ পরিকরবর্গের উল্লেখ সাধারণতঃ থাকে না। তদ্রূপ, এস্থলে "আমি ছিলাম" বলাতেও "আমার পরিকরবর্গও ছিলেন" তাহাই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মাও ভগবানের ধাম এবং পরিকরবর্গ দর্শন করিয়াছেন—যদিও ব্রহ্মার এই দর্শন-সময়ে তাঁহার ব্যাষ্টিসৃষ্টির আরম্ভও হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পরিকরবর্গও মহাপ্রলয়ে থাকিয়া থাকিলে "এব—অহম এব"—আমিই ছিলাম বলা হইল কেন? "এব"-শব্দের সার্থকতা কি?

চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাদি তখন ছিল না—ইহাই এব-শব্দের ব্যঞ্জনা। সপরিকর আমিই ছিলাম—ইহাই তাৎপর্য্য। কাশীখণ্ডের ধ্রুবচরিত হইতে জানা যায়—মহাপ্রলয়েও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের স্বরূপচ্যুত হন না, তখনও তাঁহারা ভগবৎ-সেবকরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। "ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥" সাধনসিদ্ধ জীবদের সম্বন্ধেই একথা। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে কথাই উঠিতে পারে না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের যে পরিকর আছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ বেদান্ত সূত্রেই পাওয়া যায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম ॥ ২।১।৩৩ ॥-"সূত্রে ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলার কথা জানা যায়। লীলা বা খেলা একাকী হয় না। লীলার সঙ্গী চাই। লীলাসঙ্গীরাই পরিকর। গোপালতাপনী শ্রুতিতে বহু লীলাপরিকরের নাম দৃষ্ট হয়; তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখান হইয়াছে। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" —ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্ট-বাক্যেও পরিকর-শিরোমণি শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

পরিকরগণের অস্তিত্বে লীলার অস্তিত্বও সূচিত হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-আদিরূপ লীলা থাকে না বটে; কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত ভগবানের অন্তরঙ্গলীলা চলিতেই থাকে। রাজা এখন কোনও কাজ করিতেছেন না বলিলে যেমন তিনি রাজসম্বন্ধি কোনও কাজ করিতেছেন না—ইহাই বুঝায়; কিন্তু তিনি শয়ন-ভোজনাদি অন্তঃপুর-করণীয় কার্য্যাদিও করিতেছেন না, ইহা যেমন বুঝায় না—তদ্রূপ।

লীলার অস্তিত্বে আরও একটী তথ্য সূচিত হইতেছে। একোঽপি সন্ যো বহুধাবিভাতি"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক বিগ্রহেই নানা রূপ ধারণ করেন। এই নানা রূপ হইল রসস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই অনন্তরূপে পরিকরবর্গের সহিত তিনি অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদন করেন। শ্লোকস্থ অহম্—আমি—শব্দে এই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও—নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণাদি অনন্ত রূপকেও—এবং তাঁহাদের পরিকরবর্গকেও বুঝাইতেছে; যেহেতু, ভগবান এক বিগ্রহেই বহু।

তাহা হইলে বুঝা গেল—শ্রীভগবান তাঁহার অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, প্রত্যেক স্বরূপের ধাম, লীলা এবং লীলাপরিকর —এই সমস্তই শ্লোকস্থ "আমি" শব্দের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রলয়েও এই সমস্ত বিদ্যমান ছিল।

মহাপ্রলয়ে ভগবান যে সবিশেষরূপেই বিদ্যমান ছিলেন, তাহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে। বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।—মহাপ্রলয়ে বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণই) ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ।—এক নারায়ণই ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না ঈশানও ছিলেন না। ক্রমসন্দর্ভধৃত শ্রুতিবাক্য। ঐতরেয় শ্রুতিও বলেন—আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।—অগ্রে—মহাপ্রলয়ে—এই পুরুষাকার (সবিশেষ) আত্মাই ছিলেন। ঐতরেয়-শ্রুতির এই উক্তি মহাপ্রলয় সময় সম্বন্ধে—প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বসময় সম্বন্ধে। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের পরেই গর্ভোদশায়ী আদি পুরুষের প্রকাশ। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে তিনি গর্ভোদশায়ী আদি নহেন; তাঁহাদেরও অতীত তাঁহাদেরও মূলীভূত কারণ শ্রীভগবানই এই শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য।

উপক্রম শ্লোকদ্বয়ে "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" এবং "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ।"—বাক্যদ্বয়ে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকের "অহমেবাসমেবাগ্রে" বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। প্রণবের এক অংশের অর্থ —পরব্রহ্ম; গায়ত্রীর শিরোভাগেও পরব্রহ্মের কথা এবং ব্রহ্মলোকের কথাও বলা হইয়াছে। চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকের অহমেবাসমেবাগ্রে অংশেও সেই পরব্রহ্মের তাঁহার ধাম পরিকরাদির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বেশ্বর অন্তর্য্যামী ইত্যাদি বলাতে এবং গায়ত্রীতেও তাঁহাকে সবিতা বলাতে এবং তাঁহার ভর্গ বা তেজ বা শক্তির কথা বলাতে—প্রণবের বা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। গীতাতেও পরব্রহ্মের সবিশেষত্বের প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীতেও তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদও খণ্ডিত হইতেছে।

নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। অন্যৎ যৎ সৎ অসৎ পরম্ ন। যৎ সৎ অসৎ অন্যৎ ন, পরং অন্যৎ ন। সৎ—স্থুল; পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডাদি। অসৎ—সূক্ষ্ম; ব্রহ্মাণ্ডাদির সূক্ষ্ম অবস্থা—স্থুলত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা, মহত্তত্ত্বাদি। অন্যৎ—অন্য। অন্য যে স্থুল বা সূক্ষ্ম জগৎ, তাহাও পৃথক্ ভাবে ছিল না। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেই স্থুল জগৎ সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদিতে এবং সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং এই সমস্ত সহ প্রকৃতি ভগবনের স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকেন। যতকাল মহাপ্রলয় চলিতে থাকে, ততকালই এই সমস্ত কারণার্ণবশায়ীতে লীন থাকে, তাহাদের পৃথক কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। একথাই ভগবান্ বলিতেছেন—"হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থুল পরিদৃশ্যমানরূপেও ছিলনা, সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদিরূপেও ছিলনা, তাহাদের কারণ প্রকৃতিতেও লীন অবস্থায় ছিলনা। প্রকৃতিসহ তৎসমস্ত আমাতেই (আমার স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতেই) লীন ছিল, তাদের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

পরং অন্যৎ ন—পরং—স্থুল ও সূক্ষ্ম জগতের পর বা অতীত। স্থুল ও সূক্ষ্ম জগৎ হইল জড়; তাহাদের অতীত হইল জড়াতীত; চিৎ; চিন্মাত্র-সত্তা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। কেহ কেহ বলেন—জড় জগতের অভাবে মহাপ্রলয়ে জড় জগতের স্থলে সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন। তদুত্তরেই যেন ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরং ন অন্যৎ; সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আমা হইতে অন্য বা পৃথক নহেন; তাহা আমারই প্রকাশ-বিশেষ। গীতার "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্।"-বাক্যেরই ইহা তাৎপর্য্য;

পশ্চাদ্‌হম্। পশ্চাৎ (পরেও—সৃষ্টির পরেও) অহম্ (আমি)। ব্রহ্মন্! প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেও আমিই থাকি। যখন সৃষ্টি করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়, তখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করি; ক্রমে মহত্তত্ত্বাদির এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং তাহারও পরে অনন্তকোটি ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমি অবস্থান করি এবং আমা পার্ষদদের সঙ্গে লীলা-বিলাসিরূপেও আমার নিত্য চিন্ময়ধামে তখনও (মহাপ্রলয়ে যেমন ছিলাম, তেমনি) আমি অবস্থান করি।"

এপর্য্যন্ত প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া গেল। সৃষ্ট জগৎ ত্রিকালের অধীন। তাহার বাহিরেও যে কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় প্রণবের অর্থে পাওয়া গিয়াছে, উল্লিখিত "পশ্চাদহম্"-বাক্যে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও আছেন, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কালাতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামেওআছেন।

মহাপ্রলয়ে সপরিকর ভগবান ব্যতীত অপর কেহ যখন ছিলেন না এবং তাহার পরেই যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও ভগবানই। ইহা গায়ত্রীর "সবিতা-শব্দের এবং প্রণবের "সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"-বাক্যেরই তাৎপর্য্য।

যদেতচ্চ। যদেতৎ বিশ্বং তদপি অহমেব মদনন্যত্বাৎ মামকমেব (ক্রমসন্দর্ভ)। সকলের পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও আমিই; কারণ, আমি ব্যতীত যখন অন্য কিছুই নাই, তখন এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও আমা হইতে পৃথক্ নহে; আমিই (অর্থাৎ আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই) ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছি; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমারই। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম -এই শ্রুতিবাক্যেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্মের পরিণামই, ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই—যেমন তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। শক্তি শক্তিমান হইতে অভিন্ন; ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার পরিণতি হইল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। সুতরাং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান হইতে অভিন্ন। কিন্তু তরঙ্গ যেমন সমুদ্র নয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান নহেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন নয়, অথচ সমুদ্র তরঙ্গ হইতে ভিন্ন; সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্ন নয়, অথচ কিরণ হইতে সূর্য্য ভিন্ন; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ভগবান হইতে ভিন্ন নয়, অথচ ভগবান ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন। "তদেবং ভেদেহপি লব্ধে যদুত্তরত্র বহূনাং জন্মনামিত্যাদৌ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীতায়াং) জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যত ইত্যত্র প্রতিপাদ্যে যদভেদ ইব শ্রূয়তে তৎখলু সূর্য্যতদ

রথ্যাদিবৎ বাসুদেবাৎ সর্ব্বং ন ভিন্ন সর্ব্বস্মাৎ বাসুদেবো ভিন্ন ইত্যেব সঙ্গচ্ছতে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।১।১৪ শ্লোক-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী।" ভগবান হইতে জগৎ অভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে, ভগবান্ হইতেই জগতের উৎপত্তি, ভগবানের সত্তাতেই জগতের সত্তা। আর জগৎ হইতে ভগবান ভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে—জগৎ হইল জড়বস্তু এবং ভগবান হইলেন চিদ্‌বস্তু। এস্থলে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্-অভেদবাদ নিরাকৃত হইল।

পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতির কারণও যে ভগবান, তাহাও "যদেতচ্চ"-বাক্যে সূচিত হইল।

প্রণবের অর্থে এবং গীতায় ব্যাহৃতিতে অপরব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। "যদেতচ্চ"-বাক্যেও তাহাই জানা গেল॥

যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্। মহাপ্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই। সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে, তাই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস আছে॥ প্রলয়ে এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানে (ভগবানের প্রকাশবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতে) লীন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তখন না থাকাতে একমাত্র ভগবানই তখন অবশিষ্ট থাকেন। তাহাই এস্থলে বলা হইল। জগতের ধ্বংসের বা লয়ের কারণও যে ভগবান, তাহাও এস্থলে সূচিত হইল।

প্রণবের অর্থে জানা গিয়াছিল, পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ ব্রহ্ম। এই শ্লোকে, "যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যম্"-বাক্যেও তাহাই জানা গেল।

চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম-শ্লোকটীতে পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং এই শ্লোকটী হইল প্রণব ও গায়ত্রী কথিত সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরিচায়ক। প্রণবে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলাতে তাঁহার শক্তির ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রীতে "ভর্গ"-শব্দে তাঁহার শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতাতে সেই শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকটীতে তদধিক বিশেষ পরিচয় মিলিয়াছে—পরব্রহ্ম ভগবানের লীলা, ধাম, পরিকরাদির উল্লেখ। প্রণব ও গায়ত্রীর ন্যায় এই চতুঃশ্লোকীও জানাইতেছে—ভগবান ব্যতীত অন্য কোনও পৃথক বস্তুই কোথাও নাই, তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল, জগতের সঙ্গে তাঁহার একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাই তিনিই সম্বন্ধতত্ত্ব।

"যাবানহং যথাভাবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে যে যে বিষয়ে অনুভূতি লাভের জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে কৃপা করিলেন, এই শ্লোকে সেই সেই বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে যাহা বলা হইল, তাহাতে জানা গেল—ভগবান দেশ-কালাদির অতীত, সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া তিনি এবং তাঁহার ধাম-পরিকর-লীলা-স্বরূপাদি নিত্য বিরাজিত। ইহাদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকস্থ "যাবান্—যৎপরিমাণক"-অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। "নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্-ইত্যাদি বাক্যে, স্থূল-সূক্ষ্মজগৎ এবং তাহার মূল প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—এই তত্ত্বকথায় তাঁহার "যথাভাবত্ব—যল্লক্ষণত্ব"-প্রকাশ করা হইয়াছে। আর তিনি অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত—এই সূচনাদ্বারা তাঁহার রূপের কথা, ব্রহ্মাণ্ডাদি সকলের আশ্রয়ত্ব-সূচনাদ্বারা তাঁহার অনন্ত গুণের কথা, এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির উল্লেখে তাঁহার বহিরঙ্গা লীলার কথা এবং তদুপলক্ষণে—বিশেষতঃ তাঁহার ধাম-পরিকরাদির সূচনায় অন্তরঙ্গা লীলার কথাদ্বারা তাঁহার অনন্ত কর্ম্ম বা লীলার কথা—এইরূপে "যদ্রূপগুণ কর্ম্মকঃ-অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে ভগবানের স্থূল রূপ (অপর ব্রহ্ম) এবং সূক্ষ্মরূপের (পরব্রহ্মের) রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও এই শ্লোকে জানান হইল।

জগৎ-সৃষ্টিরূপ বহিরঙ্গালীলা সম্পাদিত হয় ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আনুকূল্যে এবং অন্তরঙ্গা লীলা সম্পাদিত হয় তাঁহার অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষ যোগমায়ার আনুকূল্যে; এইরূপে, মায়ার (বহিরঙ্গা মায়ার এবং যোগমায়ার) সহযোগে ভগবানের লীলা কিরূপ—তাহাও ব্রহ্মাকে জানান হইল।

এই শ্লোকে অন্বয়ীমুখেই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে তাহা বলা হইতেছে। সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাই বলা হইতেছে—পূর্ব্বশ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে।

বাস্তবিক, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই উভয় রূপে না বুঝাইলে কোনও বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধিতে ভ্রম হইতে পারে। আকাশে উদিত সূর্য্যকে দেখাইয়া, জগতে বিকীর্ণ তাহার আলো দেখাইয়া অন্বয়ী মুখে সূর্য্যের পরিচয় কাহারও নিকটে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকেও দেখিতে সূর্য্যের মত মনে হয়। তাহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে—ইহাই সূর্য্য, তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিমাত্রই প্রকাশ পাইবে। তাই আকাশে সূর্য্য দেখাইবার (অর্থাৎ অন্বয়ীমুখে সূর্য্যের পরিচয় দেওয়ার) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ইহাও জানাইতে হইবে যে, জলে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু সূর্য্য নয় (ইহাই ব্যতিরেকী মুখে সূর্য্যের পরিচয়)। ইহা যদি জানান যায়, তাহা হইলেই জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া কাহারও সূর্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এজন্যই ভগবান্ "অহমেবাসমেবাগ্রে"-শ্লোকে অন্বয়ীমুখে ভগবানের বা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে আবার ব্যতিরেকী-মুখে তাহার পরিচয় দিতেছেন। ব্রহ্ম কি বস্তু—ইহাই অন্বয়ীমুখে পরিচয়। আর ব্রহ্ম কি নহেন—ইহাই ব্যতিরেকী মুখে পরিচয়।

ব্যতিরেকীমুখে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকটী এই।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ শ্রীভা, ২।৯।৩৩॥"

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"পরমার্থবস্তু-আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার।"

ভগবান্ মায়ার দুইটী লক্ষণ বলিলেন—(১) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত, তদ্বিদ্যাৎ আত্মনঃ মায়াম্—অর্থাৎ (পরমার্থং) ঋতে (বিনা—পরমার্থভূত আমার প্রতীতি না হইলে) যৎ প্রতীয়েত (যাহার প্রতীতি হয়), তাহাই আমার মায়া এবং (২) ন প্রতীয়েত চ আত্মনি, তদ্বিদ্যাৎ আত্মনঃ মায়াম্—(যাহা) আত্মনি (নিজেতে—নিজে নিজে, আমার আশ্রয় ব্যতীত) ন প্রতীয়েত (প্রতীতি জন্মাইতে পারে না), তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। আমরা দ্বিতীয় লক্ষণটীর আলোচনা প্রথমে করিব।

ন প্রতীয়েত আত্মনি। ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, ভগবানের সম্বন্ধহীনভাবে যাহা নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা মায়া।

শ্রুতি হইতে জানা যায়, ভগবান্ যখন প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন। গীতার "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদান হইতেছে গুণ (উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়); মায়াতে তিনটী গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তাই মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। মহাপ্রলয়ে এই তিনটী গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। ভগবান্ মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহাতেই মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইল, মায়া বিক্ষুব্ধা হইল; তাহারই ফলে মায়া ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, তন্মাত্রাদিতে পরিণতি লাভ করিল এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি হইল। শক্তি-সঞ্চারের পরে ভগবানের (ভগবানের স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীর) দেহে লীন জীবাত্মা-সমূহকেও তিনি মায়াতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে জীবসমূহও তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মফলসহ আসিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহাদের কর্ম্মফল অনুযায়ী দেহ পাইল এবং কর্ম্মফল-ভোগের অনুকূল

দ্রব্যাদিরও সৃষ্টি হইল। এই সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইল মায়ার গুণের কাজ। গুণের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকারিণী মায়ার এই বৃত্তিকে বলে গুণমায়া। এইরূপে মায়া যে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা অন্যনিরপেক্ষভাবে নহে, কেবল নিজের প্রভাবে নহে। সৃষ্টির জন্য ভগবানের ইচ্ছা হওয়াতেই এবং তিনি দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে শক্তিসঞ্চার করাতেই মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভগবানের শক্তির সহায়তা ব্যতীতই যদি জগদ্রূপে নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ার থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে—যখন ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তখনও—মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। তাহা করে নাই, পারে নাই বলিয়াই করে নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবানের শক্তিব্যতীত মায়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। "ন প্রতীয়েত আত্মনি"—বাক্যে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে একথাই বলিয়াছেন।

সৃষ্টির পরে জীব যখন ভোগায়তন দেহ লইয়া জগতে আসিল, তখন মায়ার আর একটী নূতন কাজের সূচনা হইল। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীব এই মায়িক জগতে আসে। তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য মায়া দুইটী কাজ করে—জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মায়। মায়া যে শক্তিতে জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখে, তাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি এবং যে শক্তিতে জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মায় এবং ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মায়, তাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। মায়ার যে বৃত্তিতে এই দুই শক্তি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে জীবমায়া—এই জীবমায়ার প্রভাব কেবল জীবের উপরে। দৃষ্টিদ্বারা ভগবান্ মায়াতে যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই গুণমায়াকে জগৎ-সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়াছে এবং তাহাই আবার জীবমায়াকে জীবমোহনের শক্তি দিয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে গুণমায়াও জগৎ-সৃষ্টি করিতে পারিতনা, জীবমায়াও জীবকে মুগ্ধ করিতে পারিত না—অর্থাৎ গুণমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, জীবমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। মায়ার এই উভয়প্রকার আত্মবিকাশের মূলেই রহিয়াছে ঈশ্বরের শক্তি। "ন প্রতীয়েত আত্মনি"-বাক্যে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে, ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে মায়া কেবল নিজের প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত আত্মপ্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ার থাকিলে মহাপ্রলয়েও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। ইহাই মায়ার একটী লক্ষণ।

এক্ষণে দ্বিতীয় লক্ষণটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক।

অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত—পরমার্থভূত ঈশ্বরের প্রতীতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়। প্রতীতি বলিতে উন্মুখতা, অনুভব বুঝায়। প্রতীতি—প্রতি+ই+ক্তি। ই-ধাতু গমনে। প্রতীতি—আভিমুখ্যে গমন; উন্মুখতা। ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান যাঁহার স্ফুরিত হইয়াছে, ভগবানে বাস্তব-উন্মুখতা তাঁহারই। বাস্তব-উন্মুখতা যাঁহার আছে, ভগবদনুভবও তাঁহারই। তাই প্রতীতি-শব্দে ভগবদনুভবই সূচিত হইতেছে। ভগবদনুভব যে স্থলে নাই, সে স্থলেই মায়ার অনুভব। ইহাই "অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

যাঁহাদের ভগবদনুভব জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্মফল থাকেনা। সুতরাং কর্ম্মফল ভোগের জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানও তাঁহাদিগকে মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন না। গুণমায়াকেও তাই তাঁহাদের জন্য ভোগায়তন দেহ সৃষ্টি করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও তাঁহাদিগকে মোহিত করার সুযোগ উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের পক্ষে মায়ার অনুভবের—মায়ার প্রভাব অনুভবের—সম্ভাবনা নাই; তাঁহাদের সম্বন্ধে মায়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

কিন্তু যে সমস্ত জীব ভগবদনুভব-শূন্য (অর্থং ঋতে), তাঁহাদের কর্ম্মফল আছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্ম্মফল ভোগের জন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকেই মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের জন্য গুণমায়াকে ভোগায়তন দেহের এবং তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুরও সৃষ্টি করিতে হয় এবং সেই দেহে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য জীবমায়াকেও তাঁহাদের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মাইতে হয়—অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে

মায়াকে তাহার উভয় বৃত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ভোগায়তন দেহে মায়িক ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া তাঁহারাই মায়ার অনুভব (প্রতীতি) লাভ করেন। ইহাই "অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত"-বাক্যের তাৎপর্য্য। ভগবদনুভবহীন জীবের নিকটেই মায়া আত্মবিকাশ করিতে পারে, ভগবদনুভবযুক্ত জীবের নিকটে পারে না—ইহাও মায়ার একটী লক্ষণ।

উক্ত আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার একটী বিষয় আছে। ভগবান্ যে সমস্ত জীবকে (জীবাত্মাকে) মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন, সে সমস্ত কর্ম্মফল-ভোগলিপ্সু জীবের জন্যই গুণমায়াকে ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিতে হয় এবং জীবমায়াও সে সমস্ত জীবকেই মোহিত করে। ভগবানের জন্য কোনও ভোগায়তন দেহই গুণমায়াকে সৃষ্টি করিতে হয় না; সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও ভগবান্‌কে মোহিত করার প্রশ্নও উঠে না। পূর্ব্বশ্লোকেই বলা হইয়াছে, ভগবান মহাপ্রলয়েও স্বীয় নিত্য চিন্ময় দেহে বিরাজিত, সৃষ্টির পরেও সেই দেহেই বিরাজিত। সৃষ্টির সূচনায় যখন তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখনও তিনি তাঁহার নিত্য দেহেই বিরাজিত; সুতরাং তাঁহার জন্য দেহসৃষ্টির কোনও প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বশ্লোকে ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, মহাপ্রলয়েও ভগবান স্বীয় নিত্য পরিকরদের সহিত লীলাবিলাস করিয়া লীলারস আস্বাদন করিতেছেন, সৃষ্টির পরেও তাহাই করিতেছেন (পশ্চাদহম্)। লীলারসই রসস্বরূপ ভগবানের একমাত্র উপভোগ্য বস্তু। বিশেষতঃ, জীবের ন্যায় ভগবানের কোনও কর্ম্মফলও নাই। তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার লীলা; তাঁহার এই লীলারূপ কর্ম্ম তাঁহার কোনও পূর্ব্বকর্ম্ম হইতেও উদ্ভূত নয়; আনন্দস্বরূপের আনন্দোচ্ছ্বাসেই তাঁহার লীলারূপ কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি; জীবের ন্যায় তাঁহার কোনও কর্ম্মফল না থাকাতে এবং কর্ম্মফল অনুযায়ী কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনও তাঁহার না থাকাতে গুণমায়াকে তাঁহার জন্য কোনও ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিও করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও তাঁহাকে মোহিত করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ভগবানের অনুভব লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের উপরেই যখন মায়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তখন ভগবানের উপর যে তাহার কোনও প্রভাবই থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ মায়ার অতীত; ভগবানের বহির্দ্দেশেই মায়ার আত্মপ্রকাশ।

যাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বরের দেহ মায়িক সত্ত্বগুণময়, তাঁহাদের উক্তির যে কোনও মূল্যই নাই, তাহাও ইহাদ্বারা সূচিত হইল।

যাহা হউক, মায়ার উল্লিখিত লক্ষণ দুইটী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আলোচ্য শ্লোকে দুইটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে—যথাভাসঃ, যথা তমঃ। যথাভাসঃ = যথা + আভাসঃ।

যথা আভাসঃ—যেমন আভাস। আভাস—উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি। যেমন—আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস। সূর্য্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য্য হইতে দূরে প্রকাশমান-সূর্য্যের বহির্ভাগেই অবস্থিত থাকে; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে। তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি স্থানের বহির্ভাগে থাকে। (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান—পরব্যোমাদি চিন্ময় ধাম; আর মায়ার অভিব্যক্তি স্থান—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়া কিরণ-জাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, সূর্য্য কিরণ-জাল বিস্তার না করিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় না (যেমন রাত্রিতে, কি মেঘাচ্ছন্ন দিবসে); তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার আত্মপ্রকাশ; আর যখন তিনি এই শক্তি বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে), তখন মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। প্রতিচ্ছবির যেমন স্বতঃপ্রকাশ নাই, মায়ারও তেমনি স্বতঃপ্রকাশ নাই। "ন প্রতীয়েত আত্মনি।"

আভাসের দৃষ্টান্তে বিশেষ করিয়া জীবমায়াকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিচ্ছবিটী উজ্জল চাকচিক্যময়। অপলক দৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ঐ প্রতিচ্ছবিতে নীল, পীত, লোহিতাদি নানা বর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, যেন ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া (বর্ণশাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে নীল-পীতাদি বিবিধ বর্ণ-রেখা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয়; তদ্রূপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহির্মুখ জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায় এবং সত্বাদি গুণসাম্যরূপা গুণমায়া—কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্বাদিগুণও—নানাবিধ ভোগ্যবস্তুরূপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। জীবমায়া এসমস্ত ভোগ্যবস্তুতে জীবের মমত্ববুদ্ধি জন্মায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, পরন্তু আকাশস্থ সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রূপ, জীবমায়ার শক্তি—যদ্দ্বারা বহির্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক ভোগ্যবস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও—জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত।

তারপর **যথা তমঃ**—অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগে, আলোক হইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়; যে স্থানে আলোক, সে স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না; তদ্রূপ মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ নাই (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক), সে স্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃদ্বারা। চক্ষুঃ হইল জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি; জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, তাঁহার শক্তিব্যতীত, মায়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। "যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্র এব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতে ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮॥" ইহা গেল শ্লোকস্থ "ন প্রতীয়েত চাত্মনি"-অংশের দৃষ্টান্ত।

অন্ধকারের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে যেন গুণমায়াকেই বুঝাইতেছে। শ্লোকস্থ তমঃ-শব্দে পূর্ব্বকথিত প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় (বর্ণশাবল্যময়) অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গুণমায়া এই বর্ণশাবল্যময় অবস্থার অনুরূপ। এই অন্ধকার আকাশস্থ সূর্য্যে নাই, সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই ইহার অবস্থিতি। তদ্রূপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানে নাই, তাহার বহির্দ্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন প্রতিচ্ছবি জন্মে না—সুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণশাবল্যময় অন্ধকারেরও প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান তাঁহার শক্তিবিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতেই বুঝা গেল, শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত—শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত—গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্বতঃ-পরিণাম-প্রাপ্তির সামর্থ্য গুণমায়ার নাই।

আভাস এবং তমঃ-এর দৃষ্টান্তের আর একটা ব্যঞ্জনা এই যে, প্রতিচ্ছবি বা তদন্তর্গত অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সূর্য্যকে দেখিতে হইলে যেমন প্রতিচ্ছবি হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিতে হয়, তদ্রূপ মায়ানিবিষ্ট হইয়া থাকিলে—অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি থাকিলেও—কেহ ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে না; দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া গেলেই তাঁহার অনুভূতি

সম্ভব। প্রতিচ্ছবি সূর্য্য নয়; তদ্রূপ মায়াও—মায়া হইতে জাত এই ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত ভোগ্যবস্তু-আদিও—পরমার্থভূত বস্তু নয়॥ এইরূপেই এই শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞাপন।

এই শ্লোকে আরও কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান্ যে মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, সেই মায়া মিথ্যা বস্তু নহে, ভ্রান্তিবিলসিত কোনও একটা বস্তু নহে। যেহেতু, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের পক্ষে ভ্রান্তি সম্ভব নয়। মায়া সত্য। ভগবান্ সত্য, তাঁহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহার শক্তিও সত্য। মায়া ও ভগবানের শক্তির যোগে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সত্য; তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতিও একথা বলেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তাঁহার প্রবেশ যেমন মিথ্যা নয়, যাহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। মিথ্যাজ্ঞান ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবেরই হইতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ভগবানের হইতে পারে না। আবার, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেই ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি এবং ব্যষ্টি-জীবের মোহনের জন্যই জীবমায়ার প্রকাশ—ব্যষ্টিজীব-সৃষ্টির পরে। যখন ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি হয় নাই, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তখন জীবমায়ার কার্য্যও আরম্ভ হয় নাই—বিষয়ের অভাবে। তখন কেবল গুণমায়ারই অভিব্যক্তি, গুণমায়াতে মোহিনী শক্তির বিকাশ নাই। জীবমায়া গুণাতীত ভগবানকে মোহিত করিতে পারেনা বলিয়া তখন জীবমায়ারও বিকাশ নাই। সুতরাং তখন কোনও ভ্রান্তির অবকাশই থাকিতে পারে না। যে জগৎ সত্যসত্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জগতও সত্য—তবে মায়িক বলিয়া অনিত্য। সুতরাং যাঁহারা বলেন— জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের উক্তির কোনও মূল্যই থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ গুণমায়ার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, জীব যে ভোগায়তন দেহ পায়, তাহা গুণমায়াসম্ভূত, সুতরাং জড়। আর জীব হইল স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু—দেহ হইতে ভিন্নজাতীয় বস্তু। সুতরাং জীবের ভোগায়তন দেহ তাহার আত্মা হইতে পারেনা। কিন্তু জীবমায়ার প্রভাবে জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। জীবমায়া মিথ্যা না হইলেও জীবমায়া-জনিত দেহে-আত্মবুদ্ধি মিথ্যা—বিবর্ত্ত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্ত্তের স্থান।

যাহা হউক, চতুঃশ্লোকীর প্রথম দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকীমুখে, প্রকাশ করা হইল। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব। তাই এই দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাও বিশেষভাবে বিবৃত হইল।

উক্ত দৃষ্টান্তে সূর্য্যকে ভগবান্ বা ব্রহ্মের সঙ্গে এবং সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্বকে মায়ার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, মায়িক জগৎও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সূর্য্যের ন্যায় কোনও পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব, সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু; ব্রহ্মের কোনও প্রতিবিম্ব হইতে পারেনা। ইহাদ্বারা প্রতিবিম্ববাদও নিরস্ত হইল। সূর্য্য ও প্রতিচ্ছবির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—কেবলমাত্র মায়ার পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ দুইটীকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে।

জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং নিজের স্বরূপের জ্ঞানও—হারাইয়াছে, ইহা প্রণবের অর্থ হইতে বুঝা যায়; কিন্তু কেন হারাইয়াছে, তাহা প্রণবের অর্থ হইতে জানা যায় না। গায়ত্রীর "ভর্গ"-শব্দের ব্যঞ্জনায় মায়াকে অপসারিত করার কথা জানা যায়; তাহাতে অনুমানমাত্র হয় যে, মায়াই বোধ হয় সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতু। গীতা হইতে জানা যায়, মায়াই জীবকে সংসারে ঘুরাইতেছে। এই শ্লোক হইতে পরিষ্কারভাবে জানা গেল—জীবমায়াই আমাদের স্বরূপের জ্ঞানকে—সুতরাং ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞানকেও—ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি জন্মাইয়া সংসারে ঘুরাইতেছে। এইরূপে প্রণবোক্ত উপাসনার হেতু এবং সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতুও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে জানা গেল। তাই এই শ্লোকটীও প্রণবের অর্থ-প্রকাশক।

এক্ষণে চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা করা যাইতেছে। তৃতীয় শ্লোকটী এই।

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ শ্রীভা, ২।৯।৩৪॥"

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"(আকাশাদি) মহাভূতসকল যেমন দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত।"

পূর্ব্ববর্ত্তী "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে"-ইত্যাদি শ্লোকে যে রহস্যের উল্লেখ আছে, সেই রহস্যের (পরম গুহ্যতম বস্তুর) কথাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ)—এই পাঁচটী মহাভূত। জীবের দেহ এই পাঁচটী মহাভূতে গঠিত। এই পাঁচটী মহাভূত দেহরূপেও জীবের মধ্যে আছে, পৃথক্ পৃথক ভাবেও জীবের দেহে বর্ত্তমান। আবার, দেহের বাহিরেও ইহারা সর্ব্বত্র আছে। এইরূপে এই পাঁচটী মহাভূত জীবের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। তদ্রূপ ভগবান্ও অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন, আবার বাহিরে তাঁহার পরব্যোমাদি ধামেও আছেন। এইরূপে ভগবান্ও সকল জীবের ভিতরে এবং বাহিরেও বিদ্যমান। কিন্তু একথা বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এই কথার মধ্যে রহস্য কিছু নাই; ইহা অতি সাধারণ কথা। একটু বিশেষ রকমে "ভিতরে ও বাহিরে" ভগবানের থাকার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহাই রহস্য। এই রহস্য নিহিত রহিয়াছে "তেষু নতেষু অহম্"-বাক্যে। নতেষু অর্থ—প্রণতেষু; যাঁহারা ভগবচ্চরণে প্রণত, সমস্ত ত্যাগ করিয়া—গীতার কথায় বলিতে গেলে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—যাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-সেবাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে 'নত' বলা হইয়াছে। "তেষু নতেষু—সেই প্রণত-জনগণের মধ্যে"-এই বাক্যের "তেষু"-শব্দের একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। ব্রহ্মার নিকটে রহস্যটী প্রকাশ করিবার উপক্রমেই যেন শ্রীভগবানের মনে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদের কথা উদিত হইল; তিনি যেন মানস-নেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিতেই পাইলেন। তাই যেন তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিলেন—"তেষু নতেষু—আমার পরম-প্রিয়তম সেই ভক্তদের মধ্যে।" যাঁহাদের কথা তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, তেষু-শব্দেই, ভগবানের পক্ষে তাঁহাদের পরম-প্রিয়তমত্ব সূচিত হইতেছে। ভগবানের নিকটে এইরূপ প্রিয়তম হওয়া কেবলমাত্র প্রেমিক ভক্তদের—ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন ব্যতীত অন্য কিছু যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের—পক্ষেই সম্ভব। "তেষু নতেষু"—বাক্যাংশে এইরূপ প্রেমবান্ ভক্তদের কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চভূত যেমন প্রাণিমাত্রের ভিতরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান, শ্রীভগবানও এইরূপ প্রেমিক-ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান। ইঁহাদের ভিতরে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে তো আছেনই, আর ও এক বিশেষরূপে আছেন—তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি স্বয়ংরূপেও তাঁহাদের মধ্যে আছেন। তাই শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে বলিয়াছেন—"সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।—ভক্তই আমার প্রিয়। আমিও ভক্তদের প্রিয়। সাধুভক্তগণ (স্বসুখ-বাসনার এবং স্বদুঃখনিবৃত্তি-বাসনার গন্ধলেশও যাঁহাদের মধ্যে নাই, আমার প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই যাঁহাদর মধ্যে নাই, তাঁহারাই সাধুভক্ত; তাঁহারা) তাঁহাদের হৃদয়ে আমাকে—যেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি, সেই আমাকেই—আমার অন্তর্য্যামি-স্বরূপকে নহে—স্বয়ং আমাকেই তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছেন। আমি পরম-স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহাদের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অধীন। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥" এইরূপেই ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তদের ভিতরে—হৃদয়ে—অবস্থান করেন। আর তাঁহাদের বাহিরে—ভগবান্ তাঁহার স্বীয় ধামে তো থাকেনই, তদ্ব্যতীত—ভক্ত যখন তাঁহার দর্শন পাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ভক্তের সাক্ষাতেও স্বীয় পরম-মধুর-রূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভক্তের ভিতরে এবং বাহিরে তিনি কি ভাবে থাকেন, তাহার সংবাদটীই এই শ্লোকের রহস্য। পরম-কৃপালু শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে সেই রহস্যতত্ত্বটীই প্রকাশ করিলেন।

এই শ্লোকে ভগবান্ প্রেমভক্তির রহস্যের কথাই ব্যক্ত করিলেন। ভগবৎ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত যে ভক্ত তাঁহার সেবা করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই ভক্তের বশীভূত হন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ শ্রুতি ॥"—একথাই ব্রহ্মাকে জানাইলেন।

গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যে জানা গিয়াছে, জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস; সুতরাং ভগবৎ-সেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রেমব্যতীত সেবা হইতে পারে না। তাই প্রেমই যে জীবের প্রয়োজন, এই শ্লোকে ভগবান তাহাই জানাইলেন।

প্রণবের অর্থ হইতে জানা গিয়াছে, প্রণবের উপাসনায় যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাওয়া যায়। "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান" হওয়ার কথাও প্রণবার্থে জানা গিয়াছে। অন্য সমস্ত অপেক্ষা "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান' হওয়াই যে পরম-কাম্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "ব্রহ্মলোকে—ভগবানের ধামে—মহীয়ান" হওয়া যায় কেবল মাত্র প্রেমের সহিত ভগবানের সেবাদ্বারা; যেহেতু এরূপ সেবাদ্বারাই ভগবানকে বশীভূত করা যায়। সুতরাং "যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন"—প্রণবার্থের অন্তর্গত এই "ইচ্ছার" মহীয়ান বিকাশও প্রেমপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই। সুতরাং প্রণবে যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার চরম-তম বিকাশ প্রেমে। প্রণবোক্ত-প্রয়োজন-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্যই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূরিত হইলেই ভগবৎ-সেবার জন্য বলবতী লালসা জন্মে; তখন ভগবানই কৃপা করিয়া ভক্তকে প্রেম দেন এবং স্বচরণ-সেবা দিয়া কৃতার্থ করেন। গীতার উক্তি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত"-ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা গিয়াছে—মায়া দ্বারা কবলিত হওয়াতেই জীব সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া আছে। কি উপায়ে সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে, প্রেমলাভ হইতে পারে এবং মায়ার প্রভাবও অপসারিত হইতে পারে, তাহাই চতুঃশ্লোকীর শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শেষ শ্লোকটীই এখন আলোচিত হইতেছে।

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ শ্রীভা, ২।৯।৩৫ ॥"

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিলেন—যিনি আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) এমন বস্তুটীর কথাই জিজ্ঞাসা করেন, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী মুখে শাস্ত্রে যাহার উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং যাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্ভব হয়।"

এই শ্লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থে ভগবানের যথার্থ-অনুভব-লাভেচ্ছু বুঝায়। "তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যথার্থমনুভবিতু-মিচ্ছুনা—ক্রমসন্দর্ভঃ :" ভগবানের যথার্থ-অনুভব-প্রাপ্তির উপায়টীই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার বস্তু—মুখ্য জিজ্ঞাস্য।

এই শ্লোক বলিতেছেন—ভগবানের যথার্থ-অনুভবপ্রাপ্তির জন্য এমন একটা উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সকলের পক্ষে সকলস্থানে সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় হইবে। নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে পারে, সকল লোক সাধনের সুযোগও না পাইতে পারে। সকলের পক্ষে কোনও উপায়ের এইভাবে নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টী অবলম্বন করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিনা; অর্থাৎ এই উপায়টী অবলম্বন না করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

তৃতীয়তঃ, উপায়টী অন্যনিরপেক্ষ কিনা। অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে এই উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা। যদি অন্য বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচার্য্যের তারতম্যানুসারে, অভীষ্টলাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। "সর্ব্বত্র" এবং "সর্ব্বদা" শব্দদ্বয়েই অন্যনিরপেক্ষতা সূচিত হইতেছে।

যদি উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি ও ব্যতিরেক-বিধি থাকে এবং যদি তাহা অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু থাকেনা। তথাপি কিন্তু এই উপায়টী সকল লোক সকল স্থানে সকল সময়ে অবলম্বন করিতে পারিবে কিনা, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। যদি দেশ কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেও উপায়টী সকল লোকের, সকল সময়ের এবং সকল স্থানের অবলম্বনীয় নিশ্চিত উপায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও দেখিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, উপায়টীর সার্ব্বত্রিকতা আছে কিনা। অর্থাৎ উপায়টী সর্ব্বত্র অবলম্বনীয় কিনা। সর্ব্বত্র বলিতে—সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। অবস্থা—দশা; বাল্য-যৌবনাদি, শুচি-অশুচি-আদি।

পঞ্চমতঃ, উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টী যে কোনও সময়ে অবলম্বন করা যায় কিনা। সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত পাঁচটী লক্ষণ যে উপায়টীর থাকিবে, দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ, এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্ ॥"

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটী লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টী কি ? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—মোটামুটি-ভাবে এই চারিটী উপায়ের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথার্থ-ভগবদনুভব-প্রাপ্তির পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটীই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় কিনা, অথবা কোন্‌টী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—এই উপায়-সম্বন্ধে উক্ত পাঁচটী লক্ষণ আছে কিনা। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটী লক্ষণের কোনও একটীর অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্যই অনিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং উপায়টীরও নিশ্চিততা প্রতিপন্ন হইবে না। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটী লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তাহার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বটে ; কিন্তু তাহার সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব আছে কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। এই দুইটী লক্ষণ না থাকিলেও উপায়টীকে সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই তিনটী উপায়ের প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই অন্বয়-বিধি আছে ; কিন্তু ব্যতিরেক-বিধি একটীর সম্বন্ধেও নাই। বিশেষতঃ, এই তিনটী পন্থার একটীও অন্য-নিরপেক্ষ নহে ; প্রত্যেকটীই ভক্তির অপেক্ষা রাখে (অভিধেয়তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের কোনওটীর সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই (আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৬শ শ্লোকের টীকায় বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কাজেই এই তিনটী উপায় ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিশ্চিত উপায় হইলেও দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে নিশ্চিত উপায় নয়। বিশেষতঃ, এসমস্ত উপায়ে ভগবানের যে অনুভব লাভ হয়, তাহাকেও যথার্থ-অনুভব বলা চলে না। কর্ম্মমার্গ কোনও পরমার্থ-বস্তুই দান করিতে পারে না, ভগবদনুভব তো দূরের কথা। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ভক্তির সাহচর্য্যে অনুভূত হইলে যথাক্রমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য এবং পরমাত্মার সহিত সংযোগ দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাবও—স্ফুরিত হইতে পারে না। সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবা করিয়া জীব ভগবানের যথার্থ অনুভব—তিনি যে আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, সমস্ত আনন্দবৈচিত্রী ও রসবৈচিত্রী যে তাঁহাতে বর্ত্তমান, এসমস্তের অনুভব—লাভ করিতে পারে। জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ, পূর্ব্বশ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে যে প্রেমের কথা বলা হইয়াছে, যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের সাধনে তাহা দুর্ল্লভ।

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ—ইহাদের কোনওটীই দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা নহে।

ভক্তিসম্বন্ধে অন্বয়বিধি এবং ব্যতিরেকী বিধি—উভয়ই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভক্তি পরম-স্বতন্ত্রা বলিয়া অন্য-নিরপেক্ষও। "ভক্তিরেব এনং নয়তি। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী মাঠর-শ্রুতিঃ॥" ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা এবং সনাতনত্বও আছে। যে কোনও লোক যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী। (বিস্তৃত আলোচনা ও শাস্ত্রপ্রমাণাদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৫শ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। যথার্থ-ভগবদনুভবের পক্ষে যে প্রেম অপরিহার্য্য, একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনেই তাহা সুলভ। সুতরাং যথার্থ ভগবদনুভবের পক্ষে দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে ভক্তিমার্গের সাধনই সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" ইত্যাদি শ্লোকে "তদঙ্গঞ্চ"-পদে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। এই শ্লোকে দেখান হইল—সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

প্রণবের অর্থে যে উপাসনার কথা এবং গায়ত্রীতে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীর এই শেষ শ্লোকে দেখান হইল—তাহার পর্য্যবসান সাধন-ভক্তিতে।

এইরূপে দেখান হইল —চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থ বিবৃত করিয়া বলা হইয়াছে এবং প্রণব বা গায়ত্রীতে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এই চতুঃশ্লোকীতে তাহাদেরও বিশ্লেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—"অহমেবাসমেবাগ্রে"-ইত্যাদিশ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং "ঋতেঽর্থং যৎ"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে সম্বন্ধতত্ত্বের, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয়তত্ত্বের এবং "যথা মহান্তি ভূতানি"—ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রণবরূপ বীজ চতুঃশ্লোকীতেই শাখাপত্রপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে চারিটী বস্তু জানিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীতে ভগবান তাহাও জানাইলেন। "অহমেবা-সমেবাগ্রে'—'ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ এবং মায়ার সহযোগে তাঁহার লীলাতত্ত্ব, "ঋতেঽর্থম্" ইত্যাদি শ্লোকে মায়ার স্বরূপ এবং "যথা মহান্তি ভূতানি"-ইত্যাদি এবং "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার উপায়ের কথা জানান হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থ বিকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে চতুঃশ্লোকীরই বিবৃতি। সুতরাং প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে যতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তদপেক্ষাও অধিকরূপে উজ্জ্বলতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বে গরুড়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত প্রণবেরও ভাষ্যস্বরূপ ; যেহেতু, "প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়॥ ২।২৫।৭৮॥" বস্তুতঃ, শ্রীমদভাগবতের আরম্ভই গায়ত্রীর অর্থ-প্রকাশে। "গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ। সত্যংপরং - সম্বন্ধ, ধীমহি—সাধন-প্রয়োজন॥ ২।২৫।১০৯॥ শ্রীমদভাগবতের প্রথম শ্লোকটী আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম শ্লোকটী এই।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য। শ্লোকটীর মোটামুটি অর্থ এই :—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বরাট্, যিনি ব্রহ্মাতে বেদ বিস্তার করিয়াছেন,

যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা (স্বরূপশক্তি দ্বারা) সর্ব্বদা মায়াকে নিরস্ত করিতেছেন, যিনি পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সেই সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

এই শ্লোকে যে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা দেখান হইতেছে।

গায়ত্রী-মন্ত্রটী এই। তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা, সেই সবিতা দেবের সর্ব্ব-বরণীয়-ভর্গকে (তেজকে) ধ্যান করি।

গায়ত্রীর "সবিতুঃ"-(সবিতার, জগৎ-প্রসবিতার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, শ্লোকস্থ "জন্মাদ্যস্য যতঃ' (যাহা হইতে জগতের জন্মাদি, যিনি জগতের প্রসবিতা)-বাক্যে।

গায়ত্রীর "দেবস্য"-(যিনি দেবতা—লীলাপরায়ণ, তাঁহার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ-"স্বরাট-শব্দে। স্বরাট্ অর্থ—স্বৈঃ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে (ক্রমসন্দর্ভঃ); যিনি স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাপরায়ণ।

গায়ত্রীর "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক"-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ "তেনে ব্রহ্ম (বেদ) হৃদা য আদিকবয়ে—যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন"—এই বাক্যে; যিনি সমষ্টিজীব-স্বরূপ ব্রহ্মারও বুদ্ধি-প্রেরক।

গায়ত্রীর "বরেণ্যং—বরণীয়, সকলের ভজনীয়"-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ "পরম্"-শব্দে। পরম্ মন্ত্রে বরেণ্য-শব্দেনাত্রচ গ্রন্থে পরশব্দেন পারমৈশ্বর্য্যন্ততা দর্শিতত্বাৎ (ক্রমসন্দর্ভঃ)। গায়ত্রীর বরেণ্য-শব্দ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পর-শব্দ ব্রহ্মের ভর্গের বা তেজের পারমৈশ্বর্য্যতা পর্য্যন্ত সূচনা করিতেছে। (বরেণ্য-শব্দ গায়ত্রীর ভর্গের বিশেষণ)। ব্রহ্মের ভর্গ বা তেজ—শক্তি—ব্রহ্মের পারমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছে, ইহাই গায়ত্রীর বরেণ্য এবং শ্লোকস্থ পর-শব্দের তাৎপর্য্য। সুতরাং বরেণ্য ও পর—উভয়ের তাৎপর্য্যই এক।

গায়ত্রীর "ভর্গঃ—অবিদ্যাকে অপসারিত করিতে পারে, (ব্রহ্মের) এইরূপ শক্তি বা তেজ"-শব্দের তাৎপর্য্য শ্লোকস্থ "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্—যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন"—এই বাক্যে প্রকাশিতহইয়াছে।

গায়ত্রীর "ভর্গঃ ধীমহি—ব্রহ্মের সেই তেজের—সেই অবিদ্যা-ধ্বংসকর-তেজঃসমন্বিত ব্রহ্মের—ধ্যান করি"-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ "সত্যং ধীমহি—সেই সত্যস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম-বাক্যে শ্রুতি যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন এবং যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা মায়াকে নিরস্ত করেন, সেইসত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করি" এই বাক্যে।

এইরূপে দেখা গেল, গায়ত্রীর যাহা তাৎপর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও তাহাই তাৎপর্য্য। গায়ত্রীতে যেমন সম্বন্ধ-তত্ত্ব (সবিতা), অভিধেয়তত্ত্ব (ধীমহি) এবং প্রয়োজনতত্ত্বের (মায়ানিরসনের) কথা আছে, এই শ্লোকেও তাহা আছে। "সত্যম্"-শব্দে সম্বন্ধতত্ত্বের স্বরূপলক্ষণ এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-বাক্যে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ "ধীমহি"-শব্দে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এজন্যই বলা হইয়াছে—"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

প্রথমতঃ **সম্বন্ধতত্ত্বের** কথা। প্রণবে সম্বন্ধতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। অপর-ব্রহ্মও তাঁহার বিকাশ।

অপর-ব্রহ্মের পরিচয়:—প্রণবে ইদম্ বা এতৎ; গায়ত্রীতে ব্যাহৃতিতে, ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক; চতুঃশ্লোকীতে স্থূল, সূক্ষ্মজগৎ, প্রধান। সদসৎপরম্। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্দ্দশভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল,—এই সপ্তপাতাল (শ্রীভা, ২।১।২৬।২৮)। চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ইহাতেই প্রণবের অপর-ব্রহ্ম-রূপের বিকাশের পূর্ণতা।

পরব্রহ্মের পরিচয়:—প্রণবে সর্ব্বব্যাপক, কালাতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, জগৎ-কারণ; সবিশেষ। গায়ত্রীতে—জগৎ-কারণ, বুদ্ধির প্রেরক, মায়া-নিরসনকারী-তেজঃসম্পন্ন, অন্তর্য্যামী। গায়ত্রী

শিরোভাগে আপঃ (সর্ব্বব্যাপক), জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ), রসঃ (পরম-আস্বাদ্য এবং পরম-আস্বাদক), অমৃতম্ (মায়ানির্ম্মুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব) এবং ব্রহ্ম (স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে, শক্তিকার্য্যের বৈচিত্রীতে—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব)। গীতায়—শ্রীকৃষ্ণ প্রণব, পরব্রহ্ম, অবতারী, মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহার প্রকাশবিশেষ—বিশ্বরূপ, অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম। চতুঃশ্লোকীতে শ্যাম-চতুর্ভুজাদি-রূপবিশিষ্ট, স্বপরিকরসঙ্গে স্বীয় নিত্যধামে নিত্যলীলায় বিলাসবান্, মায়ার নিয়ন্তা, ভক্তবশ্য, প্রেমবশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল, অবতারী। গায়ত্রীর শিরোভাগস্থ রসঃ-স্বরূপের বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে পরম-মধুর, আত্মবিস্মাপনরূপ (শ্রীভা, ৩।২।১২), সাক্ষান্মন্মথমন্মথ (শ্রীভা, ১০।৩২।২)। শ্রীকৃষ্ণ রস-আস্বাদকরূপে স্বীয়পরিকরবর্গের সঙ্গে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি নানারসোদ্গারিণী লীলায় বিলাসবান্—লীলারসের এবং ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্বাদনার্থ (শ্রীভা, দশম স্কন্ধ)। ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ও মাধুর্য্যাত্মিকা উভয় প্রকার লীলায় বিলাসবান—বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত-মাধুর্য্যাত্মিকা এবং ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মকা লীলা। প্রেমবশ্যতার পরাকাষ্ঠা—বাৎসল্যপ্রেমের বশে যশোদামাতার হাতে বন্ধনপর্য্যন্ত স্বীকার, কান্তাপ্রেমের বশে গোপসুন্দরীদিগের নিকটে অপরিশোধ্যঋণে ঋণিত্ব স্বীকার (শ্রীভা, ১০।৩২।২২)।

পরব্রহ্মের শক্তির পরিচয়ঃ—প্রণবে প্রচ্ছন্ন, জগৎ-কর্তৃত্বে এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতে শক্তির অস্তিত্বের ইঙ্গিত। গায়ত্রীতে ভর্গ-শব্দে শক্তির উল্লেখ। গীতায় জীবশক্তির ও মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ; তাৎপর্য্যে স্বরূপশক্তির উল্লেখ। মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। চতুঃশ্লোকীতে মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির উল্লেখ; তাহার জীবমোহিনী শক্তি, ভগবানের বহির্ভাগে অবস্থিতি। স্বরূপশক্তি ও লীলা-শক্তির (যোগমায়ার) এবং জীবশক্তির উল্লেখ।

পরব্রহ্মের ধামাদিরূপে বিকাশ। প্রণবে ব্রহ্মলোক। গায়ত্রীর শিরোভাগে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ-শব্দাদিতে ধামের-নিত্যত্ব, সর্ব্বসুখময়ত্ব, চিন্ময়ত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, ও স্বপ্রকাশত্বের উল্লেখ। গীতায় পরম-ধামের উল্লেখ। চতুঃশ্লোকীতে বৈকুণ্ঠাদির তাৎপর্য্যে উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ, বৃন্দাবনাদির উল্লেখ।

পরিকরাদিরূপে পরব্রহ্মের বিকাশ। প্রণবে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন। গায়ত্রীতে "দেবস্য"-শব্দে ইঙ্গিত। গীতায় "দিব্যং কর্ম্ম"-(৪।৯)-শব্দে ইঙ্গিত। চতুঃশ্লোকীতে "অহমেবাসমেবাগ্রে"-ইত্যাদি শ্লোকে ইঙ্গিত। শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ, যশোদা, গোপী, উদ্ধবাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ।

শক্তি, ধাম, পরিকরাদি পরব্রহ্মেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।

অভিধেয় তত্ত্বঃ—প্রণবে ধ্যান। গায়ত্রীতে ধ্যান। গীতায় কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—ভক্তির সর্ব্বগুহ্যতমত্ব, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। চতুঃশ্লোকীতে সাধনভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধন-ভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ।

প্রয়োজনতত্ত্বঃ—প্রণবে ব্রহ্মকে জানা; যাহা ইচ্ছা, তাহার প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া। গায়ত্রীতে মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিত; গায়ত্রী-শিরোভাগে ভূর্ভুবঃস্বঃ এর উল্লেখে চিদ্রূপ নিত্যসর্ব্বসুখময় ধাম প্রাপ্তির ইঙ্গিত। গীতায় ব্রহ্মসাযুজ্য, পরমাত্মার সহিত যোগ এবং সেব্যরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির উল্লেখ, ভগবৎ-প্রাপ্তির পরমগুহ্যতমত্বের—সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কাম্যত্বের উল্লেখ। চতুঃশ্লোকীতে ভগবানের যথার্থ অনুভবলাভ এবং তাহার উপায়রূপে প্রেমের উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগ-জ্ঞানাদির লভ্য অপেক্ষা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং তাহার উপায়ভূত প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রেমের অসাধারণ-ভগবদ্বশীকরণী-শক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থবিকাশের বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না, কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করা হইল।

প্রণবরূপ বীজ শ্রীমদ্ভাগবতে শাখাপত্রপুষ্পশোভিত বিরাট ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গায়ত্রীর শিরোভাগে রস-শব্দে (শ্রুতিপ্রোক্ত রসো বৈ সঃ) পরব্রহ্মের পরম আস্বাদ্যত্বের এবং পরম-আস্বাদকত্বের

যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তাহার বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি যে ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র অনুসন্ধেয় রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-নিঃস্যন্দিনী লীলাতরঙ্গিণীর রসধারায় পরিনিষিক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতও এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পরমাস্বাদ্য রসভাণ্ডাররূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ শ্রীভা, ১।১।৩॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রণবের অর্থবিকাশ। প্রণবের এবং গায়ত্রীর যে অর্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিকশিত হইয়াছে, তাহার কোনও কোনও অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উজ্জ্বলতর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে। মাত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিশেষত্বগুলিই উল্লিখিত হইবে।

অভিধেয় তত্ত্ব। সাধন-ভক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। উভয় প্রকারেই অনুষ্ঠানের অঙ্গগুলি প্রায় একই—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। পার্থক্য কেবল সাধন-প্রবর্ত্তক মনোভাবে। যাঁহারা শাস্ত্রের আদেশেই কেবল-কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে বৈধীভক্তি (শাস্ত্রবিধি-দ্বারা প্রণোদিত সাধনভক্তি)। আর যাঁহারা শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল প্রাণের টানে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে রাগানুগাভক্তি। বৈধীভক্তি হইল ভজনের-নিমিত্ত-শাস্ত্রবিধির অনুগত - শাস্ত্রে ভজনের আদেশ আছে বলিয়াই ভজনে প্রবৃত্তি। ভজন না করিলে পরকালে দুঃখভোগ হইতে পারে—এই ভয়ে ভজনে প্রবৃত্তি। আর রাগানুগা হইল রাগ বা আসক্তি বা লোভের অনুগত; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য লোভবশতঃই ভজনে প্রবৃত্তি; ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বৈধীর ভজন বিধি-স্ফূর্ত্ত।

বৈধীভজনে সাধারণতঃ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, তাঁহার মাহাত্ম্যের জ্ঞান, প্রাধান্য লাভ করে। সিদ্ধি কাল পর্য্যন্তও যদি এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমেই সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবা পাইয়া থাকেন। ইহাতে ভগবানের যথার্থ অনুভব লাভ হয়না। কারণ, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণে ঐশ্বর্য্যের বিকাশই সর্ব্বাতিশায়ী; তাই ভক্তের পক্ষে মন-প্রাণ-ঢালা সেবার অবকাশ নাই। মনপ্রাণঢালা সেবা ব্যতীত ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই; শুদ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদনেই যথার্থ অনুভব।

রাগানুগাতে মাধুর্য্যের জ্ঞানই প্রধান। কারণ, মাধুর্য্যের আকর্ষণেই লোভ জন্মায়, এই লোভই ভজনের প্রবর্ত্তক। তাই রাগানুগার ভজনে সাধক শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া তাঁহার যথার্থ অনুভব লাভ করিতে পারে। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত সাধকেরও ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ জন্মিতে পারে। এই লোভ জন্মিলে তখন হইতে তাঁহার ভজনও রাগানুগার ভজনই হইবে।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শক্তি। স্বরূপ-শক্তি তিনরূপে প্রকাশ পায়—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯)। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সৎ-অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী (সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি, আধার-শক্তি), চিৎ-অংশের শক্তির নাম সম্বিৎ (জ্ঞানসম্বন্ধিনী শক্তি) এবং আনন্দাংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী (আনন্দদায়িকা শক্তি)। সন্ধিনী অপেক্ষা সম্বিতের, সম্বিৎ অপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ। শক্তির অভিব্যক্তি দুইরূপে—অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে। মূর্ত্তরূপে হয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (কেনোপনিষদে মায়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহের কথা শুনা যায়)।

ভগবানের ধাম, লীলাপরিকর এবং লীলার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—সমস্তই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ।

ঋক্-পরিশিষ্ট-প্রোক্ত শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী (রাধাতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তি এবং প্রেমও হ্লাদিনীরই বৃত্তিবিশেষ তাই পরম আস্বাদ্য। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে স্তরে, তাহার নাম মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীরাধাতেই এই মাদন বিদ্যমান। তিনি মহাভাবেরই মূর্ত্তরূপ—মহাভাব-স্বরূপা। তিনি সমস্ত ভগবৎ-কান্তাগণের অংশিনী।

স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের আত্মপর্য্যন্তবিস্মাপন-রূপধর সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার॥ সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥ পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর॥ লক্ষীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১০৬-১৪॥"

উদ্ধৃত পয়ারসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে "মন্মথ-মদন" এবং "অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলা হইয়াছে। এই দুইটী নামের একটু তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা আবশ্যক।

মন্মথ-মদন-শব্দে মদনমোহন বুঝায়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশকে বুঝায়, যাহাতে অপ্রাকৃত মদনপর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ রূপের বিকাশ হয় একমাত্র তখন, যখন তিনি শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন তিনি থাকেন, তখন তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার স্বমুখের উক্তি এই—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥" পরিকর-ভক্তের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে। এইরূপই "মন্মথ-মদন"-শব্দের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথও বলা হইয়াছে। যাহার মোহিনীশক্তির এক কণিকার আভাস লাভ করিয়া প্রাকৃত মদন সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করেন, তিনি হইলেন অপ্রাকৃত মন্মথ। চক্ষুর চক্ষুর ন্যায়, যিনি মন্মথেরও মন্মথ—যিনি অপ্রাকৃত মন্মথেরও মূল, তিনি মন্মথ-মন্মথ। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ—স্বয়ং মন্মথ-মন্মথ; যাহার মোহিনী-শক্তির এক অংশ মাত্র অপ্রাকৃত মন্মথের মোহিনী শক্তি, তিনিই স্বয়ং মন্মথ-মন্মথ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষিণী শক্তির সর্ব্বাতিশায়িতা প্রকাশ পাইতেছে।

আর "অপ্রাকৃত নবীন মদন"-বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ। স্বীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যে সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সকলের চিত্তে সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-বাসনার উদ্দামতা জন্মাইয়া, সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন বলিয়া তিনি "মদন"। তাঁহার যে মাধুর্য্য এই উন্মত্ততার হেতু, তাহা প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান বলিয়া তিনি নবীন-মদন। তিনি এবং তাঁহার মাধুর্য্য অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু বলিয়া তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদন।

বাসনার (বা কামনার) উদ্দামতা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মাইতে পারেন, তাঁহাকে কামদেবও (কামের—কামনার—বাসনার দেবতা বা নিয়ন্তা) বলা যায়। এইভাবে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নবীন কামদেবও বলা যাইতে পারে। তিনি প্রাকৃত কামদেব নহেন; যেহেতু প্রাকৃত কামদেবের ন্যায় তিনি প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর জন্য বাসনা জন্মান না তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়া বরং প্রাকৃত-ভোগবাসনা তিনি দূরীভূতই করেন।

সকল দেবতারই বীজ এবং গায়ত্রী থাকে। বীজ এবং গায়ত্রী দেবতার নামেই অভিহিত হয় এবং তাহাতে দেবতার স্বরূপই প্রকাশিত হয়। এই অপ্রাকৃত কামদেবেরও তাঁহার স্বরূপব্যঞ্জক বীজ এবং গায়ত্রী আছে—কামবীজ ও কামগায়ত্রী। তাই বলা হইয়াছে—বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে তাঁর

উপাসন ॥" প্রাকৃত কামদেবকে "ফুল-শর" বলে, "পঞ্চশর-ও বলে। তাঁর যেন পাঁচটী ফুলের শর (বান) আছে, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার শিকারকে বিদ্ধ করেন অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-বাসনায় বিচলিত করেন। পঞ্চশর বলার সার্থকতা এই যে, প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী বস্তুর ভোগের জন্য বাসনা জাগাইয়া জীবকে তিনি জর্জ্জরিত করেন ; এক একটী বস্তুর জন্য বাসনাই তাঁহার এক একটী শর। তাঁহার বাণ ফুলের আকারে—লোভনীয় বস্তুর আকারে—আসে, ভীতি উৎপাদন করে না। "অপ্রাকৃত নবীন মদন"-শ্রীকৃষ্ণেরও পাঁচটী শর আছে—স্বীয় অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আস্বাদনের বলবতী বাসনারূপ শর। এই বাসনাও পরম-লোভনীয় বস্তুর জন্য লোভনীয় বাসনারূপেই আসে। তাই এই পাঁচটী বাসনাকেও "অপ্রাকৃত নবীন মদনের" পাঁচটী পুষ্পবাণ বলা যায় এবং তাঁহার এইরূপ পুষ্পবাণ আছে বলিয়া তাঁহাকেও 'পুষ্পবাণ" বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদির পরম-লোভনীয়তার এবং মহা-আকর্ষিণী শক্তির পরিচয় দেওয়ার ভাষা নাই। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথায় সামান্য একটু দিগদর্শন এস্থলে দেওয়া হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পাঁচটী বস্তুর আকর্ষণে তাঁহার পাঁচটী ইন্দ্রিয় প্রবলবেগে আকৃষ্ট হওয়াতে তাহার একটী মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যসমূহে তাহাই তিনি বর্ণন করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস, যার মাধুর্য্য কহন না যায়। দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায়॥ সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ. সভে কহে হরে পরধন॥ এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে, এক মন কোন দিকে যায়। এক কালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, এই দুঃখ সহনে না যায়॥ ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ. ইহা সভার কাহাঁ দোষ, কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ॥ রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে; মোর দেহে না রহে জীবন॥ কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু এক বিন্দু জগৎ ডুবায়॥...কৃষ্ণের বচনমাধুরী; নানারস নর্ম্মধারী, তার অন্যায় কহন না যায়।...কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন। —কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর, নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।—কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন। ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূলধন॥ এত কহি গৌরহরি, দু'জনের কণ্ঠধরি, কহে শুন স্বরূপ-রামরায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥ ৩।১৫।১৩-২২॥"

এক্ষণে কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উল্লেখ করা হইতেছে। "তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাদি"-পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রী যেমন প্রণবসহ জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ কামবীজসহ জপের বিধি।

কামবীজ—ক্লীম্। শ্রুতি বলেন, কামবীজ ও প্রণব একই বস্তু। "ক্লীমোঙ্কারস্যৈক্যত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ গো. তা, উ, তা ৫৭॥" কামবীজ এবং প্রণব এক হইলেও কামগায়ত্রীর সঙ্গে প্রণবের যোগ না করিয়া কামবীজ যোগ করার হেতু বোধ হয় এই যে, কামবীজে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা আছে। "সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ অপ্রাকৃত নবীন মদনের" উপাসনায়—তাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজই-প্রশস্ততর। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।৩-শ্লোকের অন্তর্গত "জগৌ-কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥"—বাক্যাংশের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যম্। যতো বামদৃক্‌সম্বন্ধি যত্তৎসহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতম্। কীদৃশং মনোহরং মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে। স চ তদাকারত্বেন লবকঃ তং হরতীতি আকর্ষতীতি তৎ সম্বলিতমিত্যর্থঃ।" চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্লেষেণ কলং ককার-লকারম্। বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়াসহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনসঃ আকর্ষকত্বাৎ স্ব-স্বরূপভূত-মহামন্মথ-মন্ত্রমিত্যর্থঃ।" উদ্ধৃত শ্লোকাংশের যথাশ্রুত অর্থ এই—রাসারম্ভে গোপীমণ্ডলীকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বেণুসহযোগে "বামনয়নাদিগের মনোহর কল-গান করিয়াছিলেন।" টীকাকারগণ বলিতেছেন—ইহা যথাশ্রুত অর্থ হইলেও শ্লেষার্থে উক্তবাক্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। সেই রহস্যটী হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ

স্বীয় বেণুযোগে স্বীয়-স্বরূপভূত-মহা-মন্মথত্ব-সূচক কামবীজই গান করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত বাক্যাংশে কিরূপে কামবীজ বুঝাইতে পারে, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। কামবীজে (ক্লীম্ বা ক্লীঁ-এ) এ কয়টী অক্ষর আছে—ক, ল, ঈ (স্বরবর্ণের চতুর্থ অক্ষর) এবং ঁ (স্বরবর্ণের পঞ্চদশ অক্ষর)। শ্লোকস্থ "কল"-শব্দে ক এবং ল-এই দুইটী অক্ষর আছে। বামদৃক্-শব্দে চতুর্থ স্বরবর্ণ (ঈ) বুঝায়। মনোহরং-শব্দের অন্তর্গত মনঃ-শব্দে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে বুঝায়। দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ চন্দ্রবিন্দুর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনঃ-শব্দে চন্দ্রবিন্দুকে বুঝায়। তাহাকে (চন্দ্রবিন্দুকে) হরণ বা আকর্ষণ করিয়া নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে যে "কলং", সেই "মনোহরং কলম্"। এইরূপে ক, ল, ঈ এবং ঁ—এই কয়টী অক্ষরের যোগে কামবীজ হইল। গোপীদিগের আকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়াই গোপীগণ—যিনি যেই অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই, বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়া—উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই কামবীজের সর্ব্বাকর্ষকত্ব—সর্ব্বচিত্ত-মোহনত্ব সূচিত হইতেছে। ইহাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজের বৈশিষ্ট্য। প্রণবের মধ্যে যাহা অত্যন্ত গূঢ়ভাবে আছে, কামবীজে তাহা অনাবৃত—প্রকাশ্য—ভাবে আছে।

কামগায়ত্রীটী এই—"কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

এই গায়ত্রীতে—প্রথমতঃ, যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া, সেই বাসনাকে উদ্দাম করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন, সেই অপ্রাকৃত কামদেব রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানার কথা (প্রণবোক্ত-"ব্রহ্মকে জানার" কথা), দ্বিতীয়তঃ, যিনি তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচটী পরম-লোভনীয় এবং মহা আকর্ষিণী শক্তিযুক্ত বস্তুর আস্বাদন-বাসনাজনিত পরম-উৎকণ্ঠার তীব্র যন্ত্রণায়—চিত্তকে জর্জ্জরিত করিতে সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত-কন্দর্প রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের ধ্যানের কথ এবং তৃতীয়তঃ, তাদৃশ পরম-রমণীয়, পরম-চিত্তাকর্ষক রসস্বরূপ-পরব্রহ্মকর্ত্তৃক মনের বা বুদ্ধির প্রেরণের কথা দৃষ্ট হয়। প্রণবের সহিত অভিন্ন কামবীজের সহিত সংযুক্ত থাকাতেই কামগায়ত্রীর অন্তর্ভুক্ত "কামদেব" "পুষ্পবাণ" এবং "অনঙ্গ"-শব্দত্রয়ে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

প্রণবে, গায়ত্রীতে, গীতায়, চতুঃশ্লোকীতে এবং শ্রীমদভাগবতেও ব্রহ্মের দুইটী রূপের কথা জানা যায়—অপর এবং পর। পর রূপের এক রকম বিকাশই অপর-রূপ। প্রণবের অর্থালোচনায় এবং আরও পরিষ্কাররূপে চতুঃশ্লোকীতে আমরা দেখিয়াছি, অপর-রূপ পররূপের একরকম অভিব্যক্তি হইলেও অপর-রূপের সঙ্গে পর-রূপের স্পর্শ নাই। জীবের সহিত পর-রূপেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অপর-রূপের নহে। প্রণব এবং শ্রুতি যে ব্রহ্মকে জানার কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মও পরব্রহ্মই—অপর-ব্রহ্ম নহেন; কারণ, অপর-ব্রহ্ম কালাধীন এবং পর-ব্রহ্ম কালাতীত। জীবের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত এই কালাতীত পরব্রহ্মের ইঙ্গিত গায়ত্রীর শিরোভাগে "আপো-জ্যোতিরিত্যাদি"-বাক্যে পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় শ্রুতিতে—"আনন্দং ব্রহ্ম", "রসো বৈ সঃ"-ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বপ্রথমে এই "রস-স্বরূপের" বিশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

গায়ত্রীতে পর-ব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের ইঙ্গিতমাত্র আছে শিরোভাগে। কিন্তু শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর অঙ্গীভূত নহে। মহাব্যাহৃতিসহ সপ্রণব গায়ত্রীরই জপের ব্যবস্থা।

জপ্য-গায়ত্রীতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহার উদ্দেশ্য যে মায়ানিবৃত্তি, সায়নাচার্য্যকৃত "ভর্গ-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা জানা যায়। গায়ত্রীস্থ "সবিতু"-শব্দও সাধকের চিত্তকে ব্রহ্মের অপর-রূপের দিকেই যেন একটু টানিয়া নিতে চায়; তাহাতে বুঝা যায়, এই "সবিতু"-শব্দটীও মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। অবশ্য "দেবস্য"-শব্দের' একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে; কিন্তু তাহা এত গূঢ় যে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্রীপাদ সায়নও এই ব্যঞ্জনাকে রহস্যময়ই রাখিয়া গিয়াছেন। রহস্য উদ্ঘাটিত না হইলে গায়ত্রী হইতে

মায়া-নিবৃত্তির বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবের মায়ানিবৃত্তি পরব্রহ্মকে জানার পথে একটী ব্যাপারমাত্র হইলেও, তাহাই পরব্রহ্মকে জানা নয়। পরব্রহ্মকে জানার উপদেশ প্রণবে ইঙ্গিতে এবং শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইলেও গায়ত্রীতে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন বলিয়া, গায়ত্রী যে কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়ক, তাহাও সকলের চক্ষুতে ধরা পড়ে না; সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর সূর্য্যবিষয়ক এবং কর্ম্ম-বিষয়ক অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মকে জানাই যখন শ্রুতির আদেশ, তখন এই সূর্য্যাদিবিষয়ক অর্থ যে নিতান্ত বাহিরের কথা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর কেবল মায়ানিবৃত্তিকেও একরকমের বাহিরের কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না; কারণ, ব্রহ্মকে জানার তাৎপর্য্য যদি পরব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে মায়ানিবৃত্তিমাত্রে ব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতি জন্মে না।

ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা দুই ভাবে হইতে পারে—কর্ত্তব্যবুদ্ধিবশতঃ এবং লোভবশতঃ। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত প্রয়াস অপেক্ষা লোভ-প্রবর্ত্তিত প্রয়াসের মূল্য অনেক বেশী এবং লোভ-প্রবর্ত্তিত প্রয়াসই পরব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতির অনুকূল। কিন্তু পর-ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটী যদি সাধকের মনশ্চক্ষুর সাক্ষাতে ধরা যায়, তাহা হইলেই তাহাতে লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা। "আনন্দং ব্রহ্ম", "রসো বৈ সঃ-"ইত্যাদি বাক্যে সেই লোভনীয় রূপটীর কথা শ্রুতিতে থাকিলেও তাহার প্রতি প্রত্যহ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদি তাহা নিত্য-জপ্য গায়ত্রীতে স্পষ্টভাবে থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ গায়ত্রী-জপের সময়েও সেই দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু গায়ত্রীতে তাহা নাই। গায়ত্রীর শিরোভাগে গূঢ়ভাবে তাহা থাকিলেও শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর বহির্ভূত। সুতরাং জপ্য-গায়ত্রী রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লোভ জন্মাইবার পক্ষে ততটা অনুকূল নয়; এবং গায়ত্রীর সূর্য্যাদি-পর-অর্থে বরং তাহা প্রতিকূলই।

কামগায়ত্রীতে কিন্তু রস-স্বরূপ ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কামগায়ত্রীতে এই রূপটী অনাবৃত, স্পষ্ট। অতি অল্প কথায় এবং অন্যরূপ অর্থ করার সম্ভাবনারহিত ভাবে কামগায়ত্রী সেই পরম-লোভনীয় রূপটীর পরিচয় দিয়েছেন, তাঁহাকেই জানিবার কথা বলিয়াছেন, জানিবার জন্য তাঁহারই ধ্যানের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার এই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপের প্রতি তিনি যেন আমাদের মনকে—বুদ্ধিকে—প্রেরণ করেন, আকর্ষণ করেন, এইরূপ প্রার্থনার ইঙ্গিতও দিয়াছেন।

কামবীজ যেমন প্রণবেরই রসাত্মক রূপ, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ "তৎ সবিতু র্বরেণ্যং"-ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ। কামগায়ত্রীতে যেমন পঁচিশটী অক্ষর (কামগায়ত্রীর "য়"-অক্ষরটীকে অর্দ্ধাক্ষররূপে গণনা করা হয়; তাহার হেতু ২।২১।১০৪-টীকায় দ্রষ্টব্য। এই "য়"কে পূর্ণ অক্ষর ধরিলে কামগায়ত্রীতেও পঁচিশটী অক্ষরই হয়), "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং"-ইত্যাদি গায়ত্রীতেও পঁচিশটী অক্ষর। গায়ত্রী যেমন প্রণবসহযোগে জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ প্রণবাভিন্ন কামবীজ-সংযোগ জপ করিতে হয়। রূপ এবং পরিমাণ উভয়েরই এক; পার্থক্য কেবল এই যে, গায়ত্রীতে রসস্বরূপটী প্রচ্ছন্ন—আবৃত; আর কামগায়ত্রীতে তাহা অনাবৃত।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রলাপ-বাক্যে কামগায়ত্রীতে অভিব্যক্ত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রূপটী জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রলাপ-বাক্যগুলি এই। "কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর যার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥ সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ, সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি। ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥ করনখ চাঁদের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান। পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান॥ নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়। ভ্রূ-ধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান, নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥ এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত। কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক

করে আপ্যায়িত॥ বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদঘূর্ণন, মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন। লাবণ্যকেলি-সদন, জননেত্র-রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ-বদন॥ যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখদর্শন মিলে, দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে। দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥ না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমেষ-আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥ যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন, বিধি হঞা হেন অবিচার। মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥ ২।২১।১০৪-১৩॥"

ইহাই কামগায়ত্রী-প্রকাশিত "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদনের" পরম-মধুর স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা পরম-মধুরতর এক স্বরূপও রস-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম এই মন্মথ-মন্মথ নবীন-মদনের আছে। গোদাবরী-তীরে সেই রূপ এবং কামগায়ত্রী-কথিত এই নবীন-মদনের রূপ দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করার সৌভাগ্য রায়রামানন্দের হইয়াছিল।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"-বাক্যে মহাভারত যাহার কয়েকটী বাহিরের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥"—ব্যাসদেবের প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যাঁহার করুণার কথা উপপুরাণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"-বাক্যে যাহার সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"—বাক্যে যাহার উপাস্যত্ব এবং উপাসনার বিধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"-বাক্যে মুণ্ডক শ্রুতিও যাহার অসাধারণ প্রেমদাতৃত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকটে রায়রামানন্দ করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্বঅঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ ২।৮।২২০—২৪॥" (ইহাই রামানন্দ-দৃষ্ট কামগায়ত্রী-কথিত স্বরূপ)।

নৃসিংহদেবের নিকটে মহাভাগবত-প্রবর প্রহ্লাদ যাহাকে "ছন্নঃ কলৌ", বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের বেশে প্রচ্ছন্ন চতুর-চূড়ামণি সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনের প্রয়াসে রামানন্দকে বলিলেন—রামানন্দ, আমি সন্ন্যাসীই, অপর কেহ নই; তবে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহার হেতু—রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়-প্রেম "রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়-প্রেম হয়। যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ ২।৮।২২৮॥" কিন্তু প্রেমাঞ্জনবিচ্ছুরিত-দৃষ্টি ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্মগোপনের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়া থাকে। এস্থলেও তাহাই হইল। "রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করহ চুরি॥ রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন। আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার॥" ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বেশী চতুর। প্রভু ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন আর কি করিবেন—"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। ২।৮।২২৯—৩৩॥"

আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহর অশেষ-রসামৃতবারিধি শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপা অখণ্ড-রস-বল্লভা শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রূপে রায়-রামানন্দকে প্রভু দর্শন দিলেন। ইহাই প্রভুর স্বরূপ। এই স্বরূপে আছে—সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রসিক-শেখর-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য, আর

আছে পুর্ণতম ভগবান "অপ্রাকৃত নবীন-মদনেরও" চিত্ত-চাঞ্চল্যজনক শ্রীরাধার মাধুর্য্য এবং হুড়াহুড়ি করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উভয়ের সম্মিলিত মাধুর্য্য। তাই, অত্যল্পকাল পুর্ব্বেই শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যাম-সুন্দর বংশীবদন কমল-লোচনের মদন-মোহন রূপের মাধুর্য্য দর্শন করিয়াও যিনি স্বীয় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই পরম-গম্ভীর রায়-রামানন্দ এই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের আধিক্যে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥ ২।৮।২৩৪॥ তখন—প্রভু তারে হস্ত স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন॥"

প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা যেন প্রগাঢ় অনুরাগতাপে স্বীয় দেহকে গলাইয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা রসরাজের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শ্যাম অঙ্গকে গৌর করিয়া দিয়াছেন। যেন ঘনীভূত বিজলী ঢাকা নব-জলধর। ঘনবিজলীর আবরণের ভিতর দিয়াও যেন নবজলধরের স্নিগ্ধ শ্যামলচ্ছটা অনুভূত হইতেছে। এ যেন এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় রূপ। কৃপা করিয়া রামানন্দের নিকটে প্রভু এই রূপের পরিচয়ও দিলেন। তাঁর তত্ত্ব তিনিই জানেন। তিনি না জানাইলে কে-ই বা তাঁহাকে জানিতে পারেন? প্রভু বলিলেন—মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে। অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥ গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ ২।৮।২৩৭ ৩৯॥ এই অদ্ভুত রূপেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের পুর্ণতম অভিব্যক্তি; এই রূপেতেই প্রণবার্থের চরমতম বিকাশ। এই চরমতম বিকাশই নদীয়াবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর
(তত্ত্বাংশ)

শ্রীকৃষ্ণরূপে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং ভগবানের লীলা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রসিকশেখর স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংরূপে, অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং অসংখ্য পরিকররূপেও লীলারস আস্বাদন করিতেছেন।

স্বয়ংরূপেও তিনি আবার দুই প্রকাশে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন—ব্রজে বা বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং নবদ্বীপে শচীনন্দনরূপে। এই উভয় ধামই নিত্য এবং উভয় লীলাও নিত্য।

স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীল রামানন্দরায় বলিয়াছেন—"নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥২।৮।১১১॥" অখিল-রসামৃত-বারিধি স্বয়ং ভগবান্ অনন্ত-রসের আশ্রয় এবং বিষয়ও বটেন। কিন্তু তাঁহার একই প্রকাশে বিষয়ত্বের এবং আশ্রয়ত্বের বিকাশ সমান নয়; রসবৈচিত্রীর পরিপুষ্টি সাধনার্থই এই পার্থক্য। প্রেমের চরম-তম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতে বর্ত্তমান; শ্রীরাধা এই প্রেমের একমাত্র আশ্রয়। আর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের কেবলমাত্র বিষয়; আশ্রয় নহেন। মাদনাখ্য-মহাভাব সম্বন্ধে একথা ব্রজেন্দ্রনন্দন নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥১।৪।১১৩॥" ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল, স্বয়ংভগবানের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে বিষয়ত্বের প্রাধান্য। আর তাঁহার শচীনন্দন-স্বরূপে আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য, এই স্বরূপে তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য-ভাবের আশ্রয়ও বটেন।

রসের আস্বাদন বিষয়-রূপেও হইতে পারে এবং আশ্রয়রূপেও হইতে পারে। উভয়রূপের আস্বাদনেই লীলারসাস্বাদনের পূর্ণতা—সুতরাং রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতা। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজে যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার বিষয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। আর শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে তিনি যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার আশ্রয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা—এই উভয়-লীলার সমবায়েই স্বয়ংভগবানের লীলার পূর্ণতা এবং উভয়-ধামের লীলারসাস্বাদনেই রসাস্বাদনেরও পূর্ণতা এবং তাঁহার রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লীলা দুই রকমের—প্রকট এবং অপ্রকট। রসিক-শেখর স্বয়ংভগবান্—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপেও প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই লীলা করিয়া থাকেন এবং শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপেও প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। কৃপা করিয়া তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনই জগতের জীবের পক্ষে তাঁহার লীলাতত্ত্বাদি কিছু কিছু জানিবার সুযোগ হয়।

স্বয়ংভগবানের লীলা-প্রকটনের সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার। অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার ॥ ১।৩।৩॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"—ইত্যাদি ১০।৮।১৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার একদিনের অন্তর্গত কোনও এক দ্বাপরেই তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন এবং যেই দ্বাপরে তিনি ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করেন। গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রকটিত হইয়াছিল এবং এই কলিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহার নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

উভয়লীলার বৈশিষ্ট্য। প্রকটলীলায় প্রদর্শিত। এই উভয় লীলার প্রকটনের হেতু বিচার করিলেই একলীলা হইতে অপর লীলার বৈশিষ্ট্য কি এবং উভয় লীলার মধ্যেই সম্বন্ধই বা কি, তাহা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ

প্রকট-লীলাই অপ্রকট-লীলার প্রমাণ। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইলেন, বলি-মহারাজের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীবামনদেব অবতীর্ণ হইলেন এবং রাক্ষসকুলের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। অপ্রকটে তাঁহারা না থাকিলে কোথা হইতে আসিলেন ? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গত দ্বাপরে এই এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই কলিতেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন। অপ্রকট ধাম হইতেই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের অপ্রকট-লীলার পরিচয় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতুসম্বন্ধে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের দুইটী প্রধান গুণকে অবলম্বন করিয়াই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার লীলাপ্রকটনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম-করুণ। রসিক-শেখর বলিয়া অনন্ত-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। অপ্রকট ব্রজে তিনি নিত্যকিশোর; নিত্যকিশোররূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহার প্রায় সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনই তিনি অপ্রকটে করিয়া থাকেন ; কিন্তু বাল্যে বা পৌগণ্ডে এসমস্ত রসের যে সকল বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, অপ্রকটে নিত্যকিশোরত্ব বশতঃ বাল্য-পৌগণ্ড নাই বলিয়া সে সমস্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। প্রকটে জন্মলীলার ব্যপদেশে তিনি নরশিশুর ন্যায় অবতীর্ণ হন, ক্রমশঃ বাল্য-পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া কৈশোরে উপনীত হন। সুতরাং বাল্য-পৌগণ্ডের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের যে সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটে সম্ভব নয়, সে সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনও প্রকটে সম্ভব। এ সমস্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদন এবং এসমস্ত রসবৈচিত্রীর উৎসারিণী লীলায় তাঁহার পরিকর-ভক্তবর্গের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন। প্রকট-লীলাতে আবার মধুর ভাবের পরকীয়া-ভাবাত্মিকা বৈচিত্রীও তিনি আস্বাদন করেন, যাহা অপ্রকটে সম্ভব নয় প্রকট ব্রজলীলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে, তিনি রসিক-শেখর বলিয়া ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনই হইল তাঁহার লীলাপ্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকটেও তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলার পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ, নন্দ-যশোদাদি পিতৃবর্গ এবং শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গকে সঙ্গে লইয়াই অবতীর্ণ হন (প্রকট ব্রজলীলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা ১।৪।১৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

তারপর তাঁহার করুণা। মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের করুণার পূর্ণ প্রকাশ—তাহাদের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নয়, মোক্ষদান দ্বারা তাহাদের জন্ম-মৃত্যুর বিরতি সম্পাদনেও নয়, পরন্তু, ভগবানের যে মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" তাঁহার যে "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনি আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥"—সেই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভের যোগ্যতা বিধানে। এই যোগ্যতা লাভ হইতে পারে—রাগানুগা মার্গের ভজনে। এই রাগানুগা মার্গের ভজন প্রবর্ত্তন হইল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক মুখ্য কারণ। তিনি প্রকট ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরিকরবৃন্দের সহিত এমন সমস্ত লীলা করিলেন, সে সমস্ত লীলার কথা শুনিয়া, সে সমস্ত লীলার ব্যপদেশে ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য প্রবাহিত আনন্দ-রস-ধারার কথা শুনিয়া, সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব পূর্ব্বক মায়াবদ্ধ জীব তাঁহার ভজনের জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে। এই পরম লোভনীয় বস্তুটী প্রকটিত করিয়া, কি ভাবে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত"—ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার (রাগানুগা ভক্তির) উপদেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন।

আর রস-নির্য্যাস আস্বাদন-বিষয়ে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস অশেষ-বিশেষে আস্বাদন করিলেন। শ্রীরাধিকাদি তদীয় কান্তাবর্গের পরিবেশিত, অপূর্ব্ব আস্বাদন চমৎকারিতাময় রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের নিকটে তিনি অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী

হইয়া রহিলেন বলিয়া মুখেই স্বীকার করিলেন—"ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি"-বাক্যে (শ্রীভা, ১০।৩২।২২)।

কিন্তু তথাপি রসিক-শেখরের রসাস্বাদন-বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করিল না; পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে আর একটী অপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনের জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা জাগিয়া উঠিল। সেই বাসনাটী হইতেছে—তাঁহার স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর মাধুর্য্যের আধার বা আশ্রয়; এই মাধুর্য্য আস্বাদন করেন তাঁহার পরিকর-ভক্তবৃন্দ। মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও হইল আবার কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম; যে ভক্তের মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তিনি তত বেশী মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন। তাঁহার নিখিল পরিকরবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—মাদনাখ্য-মহাভাব—বর্ত্তমান। সুতরাং শ্রীরাধাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থা।

আবার শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের অধিকারী হইলেও একমাত্র ভক্তের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে। যাঁহার মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের উচ্ছলনও তত বেশী। শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের উচ্ছলনও সর্ব্বাতিশায়ী। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তাঁহার মাধুর্য্য কিভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥" শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার প্রেম—উভয়েই যেন পরস্পর জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কেহই যেন কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে চাহেনা। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান মাধুর্য্যময় যে শ্রীকৃষ্ণরূপ, তাহাই মদন-মোহনরূপ, একমাত্র শ্রীরাধার সাহচার্য্যেই এই রূপের বিকাশ এবং একমাত্র শ্রীরাধাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ-প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন।

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে স্বসুখ-বাসনার ছায়া পর্য্যন্তও নাই। তাঁহাদের প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়। সুতরাং কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-বাসনার প্রবর্ত্তক নয়। তথাপি, মাধুর্য্যের আস্বাদন এবং তজ্জনিত সুখ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—আগুনের কাছে গেলে তাপ অনুভবের ইচ্ছা না থাকিলেও যেমন তাপ অনুভূত হয়, তদ্রূপ। তাঁহাদের এই সুখেও কিন্তু কৃষ্ণসুখেরই পুষ্টি সাধিত হয়। কিরূপে? তাহাই বলা হইতেছে। "গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাঢ়ে, যার নাহিক সমতা॥ 'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥, গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥ এই মত পরস্পর করে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥ কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে। তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। ১।৪।১৬১-৬৬॥"

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত সুখও শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার এই সর্ব্বাতিশায়ী সুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ আনন্দ জন্মে বটে, কিন্তু এই মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত সুখ শ্রীরাধার বদনে-নয়নে এবং সর্ব্বাঙ্গে যে এক অনির্ব্বচনীয় উল্লাস-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিতে পারেন—তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইতেছেন, তাহার তুলনায়—শ্রীরাধিকাদির প্রেমসেবাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা যেন অতি তুচ্ছ। তাই স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। শ্রীরাধার অঙ্গে আনন্দ-তরঙ্গ-লহরী যতই তিনি দেখেন, ততই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা যেন বলবতী হইতে থাকে, তিনি যেন আর লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না।

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটী বাসনা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠে—যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা তাঁহার এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, সেই প্রেম-বস্তুটী কিরূপ? এই

প্রেমের মহিমা কিরূপ? আর এই প্রেমের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, সেই সুখই বা কিরূপ?

এই তিনটী বাসনা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণই থাকে; ব্রজে ইহার একটী বাসনাও তাঁহার পূর্ণ হওয়ার উপায় নাই। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ হইলেই, অপর দুইটী আনুষঙ্গিক বাসনাও আনুষঙ্গিক ভাবেই পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই মুখ্য বাসনাটী পূর্ণ হওয়ার উপায় নাই ব্রজে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করার একমাত্র উপায় প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব। এই প্রেম ব্রজে একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই বিকশিত, অন্য কাহারও মধ্যে নাই—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥" তাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য।

এই মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহার নিজের মাধুর্য্যের আস্বাদনও সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়-মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা তো অপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার রসিক-শেখরত্বের বিকাশও অপূর্ণই থাকিয়া যায় এবং হ্লাদিনী-স্বরূপিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার বিকাশও অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির ধর্ম্মই হইল কৃষ্ণকে সুখ দেওয়া এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সুখ দেওয়া। সেই হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ, হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন শ্রীরাধা। তাই—"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে॥ ১।৪।৭৫॥" স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে বাসনা জন্মিয়াছে, সেই বাসনা পূরণের একমাত্র উপায়—মাদনাখ্য-মহাভাব—ব্রজে শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূরণের জন্য এবং তাহার ব্যপদেশে সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, দিয়া স্বীয় রাধিকা-নামকে সার্থক করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ। ১।৪।৮৩॥" তাই তিনি তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাব শক্তিমান কৃষ্ণকে দিতে পারিলেন। কৃষ্ণও তাহা নিতে পারিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরিকরবর্গেরও বিগ্রহ হইতেছে ভাবময় বিগ্রহ, ভাবেরই বিগ্রহ; তাঁহাদের ভাবে এবং বিগ্রহে পার্থক্য কিছুই নাই—উভয়ই শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস। উভয়েই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত। তাই শ্রীরাধার ভাব দিতে হইলে তাঁহার বিগ্রহও শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয়। শ্রীরাধাই উভয়ই দিলেন, শ্রীকৃষ্ণও নিলেন। শ্রীরাধার স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিলেন এবং স্বীয় চিত্তদ্বারা শ্যামসুন্দরের চিত্তকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় প্রীতিরসে শ্যামসুন্দরের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিষিক্তিত পরিনিষিক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভাবরূপা রাধা করিয়া দিলেন। এইরূপে দেখা গেল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে আশ্রয়-স্বরূপত্বের প্রাধান্য।

এই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। অপ্রকট-লীলায় তিনি অনাদিকাল হইতেই এই রূপে অপ্রকট নবদ্বীপে স্বমাধুর্য্য-আস্বাদন-লীলারসে বিলসিত। প্রকট-লীলার ব্যপদেশে তাঁহার এই রূপের রহস্যটীমাত্র প্রকাশিত হইল। গত দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলা অন্তর্দ্ধান করান। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা প্রকটিত করেন। ব্রজলীলায় স্বয়ং ভগবানের রসাস্বাদন-বাসনা যেটুকু অপূর্ণ থাকে, নবদ্বীপ-লীলায় যে তাহা পূর্ণতা লাভ করে, তাহাই জগতের জীবকে জানাইবার এবং দেখাইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলা-প্রকটন।

প্রকট ব্রজলীলার অপূর্ণ বাসনা হইতেই গৌরলীলা প্রকটনের সূচনা হইল। ব্রজলীলার অন্তর্দ্ধানের পরে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অপূর্ণ বাসনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন—"রাধিকার ভাবকান্তি

অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তাঁর বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ ১।৪।২২২—২৩॥”

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দুইটী উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার ব্রজলীলা প্রকট করিয়াছিলেন—রসনির্য্যাস-আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। রসনির্য্যাস আস্বাদন বিষয়ে যেটুকু অপূর্ণতা ছিল, রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা পূর্ণ করার জন্য নবদ্বীপ-লীলার প্রকটন। এই হইল একটী হেতু।

নবদ্বীপ-লীলা প্রকটনের আর একটী হেতুও আছে—তাহা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অপর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপূর্ণতা-পূরণ। রাগানুগা-ভক্তির প্রচারও ব্রজলীলার একটী উদ্দেশ্য ছিল। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেবল দুইটী কাজ করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি লীলাবিলাস প্রকটিত করিলেন—যাহার কথা শুনিয়া লোকের ভজন-বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে। “অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥” শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পায় নাই, তাঁহার লীলা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া লোকের ভজনে লোভ জন্মিতে পারে—এই সম্ভাবনা মাত্র। তিনি কৃপা করিয়া এই সম্ভাবনাটীর সুযোগ দিয়া গেলেন, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবকে লোভের বস্তুটী সাক্ষাদ্‌ভাবে দেখাইয়া যান নাই। এই অংশে ব্রজলীলায় তাঁহার রাগভক্তি-প্রচারের অপূর্ণতা রহিয়াছে।

তারপর ভজন-সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কেবল উপদেশ মাত্র দিয়া গিয়াছেন—“মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।” কিন্তু ভজনের কোনও আদর্শ তিনি দেখাইয়া যান নাই। এদিক দিয়াও অপূর্ণতা রহিয়াছে।

নবদ্বীপ-লীলায় এই অপূর্ণতা পূরণের সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। তিনি স্থির করিলেন—“আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। ১।৩।১৮-৯॥ তিনি ভজনের আদর্শ কলির জীবকে দেখাইবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন।

কেবল ইহাই নহে। যেবস্তুটি লাভের জন্য ভজনের উপদেশ এবং ভজনের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন, সেই প্রেমভক্তি-বস্তুটীই কলির জীবকে দেওয়ার সঙ্কল্পও তাঁহার গৌরলীলায় ছিল। “যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥ ১।৩।২০-২১॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১।৩।১৭॥”

এক্ষণে দেখা গেল, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাপ্রকটনের মূলে ছিল এই কয়টী বিষয়:—শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় মাধুর্য্য এবং ব্রজলীলারসের আস্বাদন এবং তদুপলক্ষ্যে স্বীয় তিনটী অপূর্ণ বাসনার পরিপূরণ। নিজে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন এবং তদুদ্দেশ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচার আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান। বস্তুতঃ, যে বস্তুটী দেখিলে ভজনের জন্য জীবের লোভ জন্মিতে পারে গৌরলীলায় সেই বস্তুটীও তিনি জগতের জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, “এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়॥ ১।৩।২২॥”

শাস্ত্রপ্রমাণ। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-সম্বন্ধে যে এত কথা বলা হইল, প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। প্রমাণ যথেষ্ট আছে, ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

প্রথমে পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণই দেখান হইতেছে।

(ক) গত দ্বাপরের প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষ্যে গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছিলেন—“আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৩-১৫॥ গর্গাচার্য্যের এই উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ। “হে নন্দমহারাজ! গুণকর্ম্মানুসারে তোমার এই পুত্রটীর অনেক রূপ এবং অনেক নামও আছে। পূর্ব্বে কোন সময়ে ইনি বসুদেবের পুত্ররূপেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই অভিজ্ঞ লোকগণ ইঁহাকে বাসুদেবও বলেন।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। ইনি সত্যযুগে শুক্ল এবং ত্রেতাযুগে রক্ত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও এক কলিতে ইনি পীতবর্ণও হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই দ্বাপরে (ইঁহার সমস্ত রূপকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া) ইনি কৃষ্ণতা (আকর্ষকত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এস্থলে যে পীতবর্ণ-স্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ।

এই শ্লোকের অর্থবিচার করিলে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্; অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই বিগ্রহে অবস্থিত। ইনি "একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ ॥ ২।৯।১৪১ ॥" শ্রুতির "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।"—বাক্যেও একথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে ইনিই পীতবর্ণ (গৌরবর্ণ) ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইঁহার এই গৌরবর্ণ-স্বরূপেও ইনি স্বয়ংভগবান্—যুগাবতারাদি অন্য কেহ নহেন। "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকটী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৬ষ্ঠ শ্লোকে) আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোকের গৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে বিস্তৃত অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য।

(খ) পূর্ব্বোল্লিখিত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোকে যে গৌর-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩২ ॥" শ্লোকে তাঁহার সম্বন্ধেই একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকে বর্ত্তমান কলির (গত যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগের) উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের কথাই যে বলা হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইতেই জানা যায়। এই শ্লোকে বলা হইল—বর্ত্তমান কলিযুগের যিনি উপাস্য, তাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (অর্থাৎ পীত); কিন্তু ভিতরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণের নাম-রূপ গুণ লীলাদিই বর্ণন করেন। এইরূপে তিনি হইলেন—অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর। তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গ এবং তাঁহার পার্ষদাদিও তাঁহার অস্ত্রস্থানীয়; এই যুগে তিনি অন্য কোনওরূপ অস্ত্রধারণ করেন না। সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণের দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়।

পরম-ভাগবতোত্তম প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতিতে বলিয়াছেন, এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন তিনি হইবেন প্রচ্ছন্ন—"ছন্নঃ কলৌ।"—অর্থাৎ তাঁহার নিজস্ব বর্ণটী অন্যবর্ণদ্বারা সম্যকরূপে আচ্ছাদিত থাকিবে। ইহাতেই বুঝা যায়, এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণটী দেখা যাইবে না, দেখা যাইবে তাঁহার আচ্ছাদক বর্ণটী—তাঁহার কান্তি। তাই পূর্ব্বোদ্ধৃত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে তাঁহার কান্তির (ত্বিষা অকৃষ্ণম্) কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, "ছন্নঃ কলৌ" এই প্রহ্লাদোক্তি এবং "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরংপদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্ ॥ শ্রী, ভা, ৩।২।১২ ॥"—এই উদ্ধবোক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকের আলোচনা করিলে জানা যায়, হেম-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সর্ব্ব অঙ্গদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সম্যক্ রূপে আচ্ছাদিত হইয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিতে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই শ্লোকটী (১০ম শ্লোক) আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোকের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকায় অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য।

(গ) শ্রীকৃষ্ণই যে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়া বর্ত্তমান কলির উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে জানা গেল। উপপুরাণের একটী শ্লোকও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে (১৫শ শ্লোক)। এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—হে ব্যাসদেব! আমিই (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই) কোনও কোনও কলিতে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পাপহত লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্।" শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে এই শ্লোকের "কোনও কোনও কলি—ক্বচিৎ কলৌ"-বাক্যে, যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিকেই বুঝায়।

(ঘ) উপপুরাণে কোনও কোনও কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে সন্ন্যাসরূপের কথা জানা যায়, মহাভারতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে দৃষ্ট হয়—"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥ —যিনি সন্ন্যাসী, যিনি শম, যিনি শান্ত, যিনি নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ।" এসমস্ত হইল ভগবানের নাম।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমের" অনুরূপ উক্তিও মহাভারতের উল্লিখিত সহস্রনাম-স্তোত্রে দৃষ্ট হয়। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২ ॥ —'কৃষ্ণ' এই উত্তমবর্ণদ্বয় বর্ণনকারী (শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণবর্ণম্), স্বর্ণবর্ণ (শ্রীমদ্ভাগবতের ত্বিষাকৃষ্ণম্), উত্তমাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ-ধারণকারী।" এসমস্তও ভগবানের নাম।

(ঙ) মুণ্ডকোপনিষদে পরব্রহ্মের এক রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩ ॥—দর্শক যখন কোনও সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মেরও যোনি বা প্রতিষ্ঠা-স্থানীয় (ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম—গীতা) সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার সংসার-বন্ধনের হেতুভূত পাপপুণ্য সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সমস্ত মায়িক উপাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া তিনি বিদ্বান্ (প্রেমবান্) হয়েন এবং প্রেমদাতৃত্ব বিষয়ে সেই রুক্মবর্ণ পুরুষের সহিত পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকেন।" এই শ্রুতিবাক্যেও গৌর স্বরূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যিনি এই কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাতে উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তিসমূহ যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

বর্ত্তমান কলির অবতার কে? শচীনন্দন। বর্ত্তমান কলিযুগের উপাস্য অবতারের প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন। প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২।২০।২৮৪-৮৬ ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া "রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি। প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি ॥ অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি, নীচ নীচাচার। কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ॥ প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি। কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ। আমাসভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥ অবতার নাহি কহে, 'আমি অবতার'। মুনি সব জানি করে লক্ষণবিচার ॥ ২।২০।২৯০-৯৪ ॥"

প্রভু সনাতনগোস্বামীর প্রশ্নের উত্তর সোজাভাবে দিলেন না। "অবতার নাহি কহে—আমি অবতার ॥" বলিলেন—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া অবতার নির্ণয় করেন। শাস্ত্রের বাক্যই প্রামাণ্য।

বিজ্ঞ-শব্দে বিজ্ঞানসম্পন্ন—অনুভব-সম্পন্ন ভক্তকেই বুঝায়। যাহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, তিনিই বিজ্ঞ। অনুভবশীল ভক্তের নিকটে ভগবান্ আত্মগোপন করিতে পারেন না। প্রেমবলে তিনি সমস্ত জানিতে পারেন। এইরূপ প্রেমিক অনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির অবতারকেও চিনিয়া ফেলিয়াছেন; শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ মিলাইয়া—সেই অবতারটীকে—তাঁহারা জগতের নিকটে চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব-সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥" শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥" শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ। জয়তি কণকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥ বৃ, ভা, ১।১।৩॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২॥" শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিয়া গিয়াছেন—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি র্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥" আর নিজের অনুভবের সহিত ইঁহাদেরই অনুভব মিলাইয়া রসিক ভকত-কুলমুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি। রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি ॥ নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ১।৪।২৬-২৭ ॥"

এস্থলে কেবল দু'চার জনের কথাই বলা হইল। কাহারও আদেশ, উপদেশ, প্ররোচনা বা পীড়াপীড়ি ব্যতীতই—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে, তাহার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন মাত্রেই তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন—অগ্নির প্রভাব না জানা সত্ত্বেও তাহার নিকটে গেলে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয়, তদ্রূপ।

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে যিনি শচীর দুলালরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রম লীলা প্রকাশের পরে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রকাশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা প্রকটিত করিয়াছেন সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যাইয়া, নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য, ঝারিখণ্ড, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের ছলে যিনি অসংখ্য জীবকে নাম প্রেম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এবং এইভাবে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া প্রকটলীলার শেষ আঠার বৎসর শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নীলাচলে গম্ভীরায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহার্ত্তিতে আকুল হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন—সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কলির উপাস্যস্বরূপ।

শচীনন্দনই যে কলির অবতার, তাহার প্রমাণ? যিনি ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র-কথিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, তাহার প্রমাণ কি? অসাধারণ ভক্তি-সম্পদ-বিশিষ্ট কোনও পরম ভাগ্যবান ভক্ত জীবও তো ইনি হইতে পারেন? ইনি যে জীব নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান,ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

(ক) মানুষের দেহ নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার দেহও সাড়ে তিন হাত (শ্রীভা, ১০।১৪।১১)। কিন্তু স্বয়ংভগবানের বিগ্রহ হয় "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল"—নিজ হাতের চারিহাত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহও তাঁহার নিজ হাতের চারিহাত লম্বা ছিল। "দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল চৈতন্য গুণধাম ॥ ১।৩।৩৩-৩৪ ॥"-শ্রুতি হইতে জানা যায়—স্বয়ং ভগবানের রোগ নাই, জরা নাই, তিনি নিত্যকিশোর (অর্থাৎ তাঁহার গুম্ফ-শ্মশ্রু আদির উদ্‌গম হয় না), তাঁহার মৃত্যু নাই (অর্থাৎ অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার দেহাবশেষ থাকে না)। শ্রীকৃষ্ণেরও এ-সকল লক্ষণ ছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও ছিল। তাঁহার কোনও রোগের বা গুম্ফ-শ্মশ্রুর কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না, তাঁহার কোনও সেবিত বিগ্রহেও গুম্ফাদি দৃষ্ট হয় না। শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইয়া তিনি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কোনও দেহাবশেষ ছিল না।

(খ) সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর দেহে যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার তিনি পূর্ব্বে তো কখনও দেখেনই নাই, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরের (শ্রীরাধার) মধ্যেই এজাতীয় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব, মানুষের কথা তো দূরে, অপর কোনও ভগবৎ-পরিকরের মধ্যেও সম্ভব নয়। "এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয় ॥ অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার। মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার ॥ ২।৬।১০—১২ ॥" অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌমের প্রতি তখনও প্রভুর পূর্ণ কৃপা হয় নাই; তাই তিনি তখনও প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, প্রভুর দেহে যে শ্রীরাধার ভাব-সুলভ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছিল, সার্ব্বভৌম তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

(গ) যান-বাহনযোগে বা পদব্রজে না আসিয়া হঠাৎ কোনও স্থানে যে ভগবান লোক লোচনের গোচরীভূত হন, ইহাকে আবির্ভাব বলে; যেমন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিভুবস্তু ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব নয়। ইহা কায়ব্যূহ নহে; যোগসিদ্ধ মানুষ কায়ব্যূহ প্রকাশ করিতে পারেন; যেমন সৌভরী ঋষি করিয়াছিলেন। কায়ব্যূহে একই জীবাত্মা বিভিন্ন কায়ব্যূহে প্রভাব বিস্তার করে; তাই সকল কায়ব্যূহেরই ক্রিয়া একই রকম হয়। কিন্তু আবির্ভাব এরকম নয়। প্রত্যেক আবির্ভাব-রূপেরই স্বতন্ত্র ব্যবহার। বিভুবস্তু ভগবান্ সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন; কৃপা করিয়া যখন যেখানে কাহাকেও দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেখানেই তাঁহাকে দর্শন দিতে পারেন। এইভাবে দর্শন দেওয়াকে আবির্ভাব বলে। রাঘবের গৃহে, শচীদেবীর গৃহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে, সেন-শিবানন্দের গৃহে এবং আরও বহুস্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আবির্ভাবে দর্শন দিয়াছিলেন; অথচ তখন তিনি নীলাচলে অবস্থিত। তিনি যে বিভু—সর্ব্বব্যাপক ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

এসমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, প্রভু জীবতত্ত্ব ছিলেন না; তিনি ছিলেন বিভুতত্ত্ব। আর সার্ব্বভৌমের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তিনি রাধাভাবাবিষ্ট ছিলেন।

(ঘ) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে কীর্ত্তন-সময়ে প্রভু অঙ্গদ-বালার আকারে চন্দন-পঙ্ক ধারণ করিতেন। তাঁহার বর্ণও ছিল তপ্ত-স্বর্ণের ন্যায়। মহাভারতোক্ত বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীবিষ্ণুর যে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতেও সেই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল।

(ঙ) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই কলিতে পাপহত লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত উপপুরাণোক্ত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুইটি বিশেষ লক্ষণ—যাহা অপর কোন ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হয়না, তাহা—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

(চ) স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ।" শ্রুতির "একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।" স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্ব-স্ব-পূর্ণতম মহিমায় বিরাজিত থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একথাই বলিয়াছেন। "পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার-তাতে আসি মিলে ॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১।৪।৯-১১ ॥" লঘু-ভাগবতামৃতে ইহার শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। লীলায় এই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের সানুদেশে ব্রহ্মাকে তিনি অনন্ত নারায়ণরূপ দেখাইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে স্বীয় বিগ্রহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার নিমাই-পণ্ডিত-বিগ্রহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ দেখাইয়া উল্লিখিত তত্ত্বটি প্রত্যক্ষভাবে লোকনয়নের গোচরীভূত করাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ, ভা, মধ্য ১০), মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ (চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬) শিব (চৈ, ভা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে এবং সন্ন্যাসের পূর্ব্বেও শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ষড়্ভুজরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। এসমস্ত রূপ দেখার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, দর্শন-সময়ে তাঁহারা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তৎ-স্থলে তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের রূপই দেখিয়াছিলেন। রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। ইহা স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণে।

(ছ) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আর একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে প্রেমদাতৃত্ব। ভগবানের অনন্ত স্বরূপ আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কেবল

মানুষকে নয়, লতাগুল্মাদিকে পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রেম দান করিতে সমর্থ। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা,॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগাই-মাধাই হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ব্রজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত তিনি প্রেম দিয়াছেন। তাঁহার দর্শনেই তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের দেহে অশ্রু-কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইয়াছে, ব্যাঘ্র-মৃগ এক সঙ্গে গলাগলি হইয়া নৃত্য করিয়াছে। কত কোল-ভীল সাঁওতাল কত বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। নীলাচলেই শিবানন্দ-সেনের কুকুর প্রভুপ্রদত্ত নারিকেল শাস খাইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে।

প্রেমদান-বিষয়ে সন্ন্যাসের পরে প্রভু আরও এক অদ্ভূত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-নাম; অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে গলদশ্রু-ধারা; অঙ্গে পুলক-কদম্ব, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, যেন অভ্যাসবশে স্খলিত চরণে চলিয়া যাইতেছেন—প্রেমঘন-বিগ্রহ, সর্ব্বদিকে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যে পথিক তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, প্রেমের বন্যা তাঁহাকেও যেন স্পর্শ করিয়াছে কেবল স্পর্শ নয়—তাঁহার দেহের মনের সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও প্রভুর নিজেরই ন্যায় প্রেমোন্মত্ত করিয়া দিয়াছে, তিনিও তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও চীৎকার করেন—ঠিক যেন উন্মত্ত। কেবল ইহাই নয়, কেবল দর্শনের প্রভাবেই প্রভু তাঁহার মধ্যে এমনই এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিলেন যে, অপর যে কেহ তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে। এইরূপে দেখা গিয়াছে—যিনি এইভাবে এই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় তিনিও প্রেমদান-বিষয়ে যেন প্রভুর পরম সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুণ্ডক-শ্রুতি বোধ হয় প্রভুর এই অদ্ভূত প্রেমদানের কথাই বলিয়াছেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩।১।৩॥"

এস্থলে যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হইল, এসমস্ত লক্ষণ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই; সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকিতে পারেনা।

রসরাজ-মহাভাব। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, রায়-রামানন্দকে প্রভু কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেনও। ব্যাপারটী এই।

রায়রামানন্দের মুখে প্রভু যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে একদিন প্রভুর সাক্ষাতে রামানন্দ এক অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন এবং প্রভুকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। "এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখো কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ ২।৮।২২০-২৪॥"

প্রভুর সন্ন্যাসি-রূপের স্থলেই রামানন্দরায় দেখিলেন—শ্যামসুন্দর বংশীবদন নানাভাবে-চঞ্চল কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে, আর তাঁহার সম্মুখে দেখিলেন কাঞ্চন-পুত্তলিকাতুল্যা শ্রীরাধাকে, শ্রীরাধার নবগোরচনা গৌর অঙ্গ হইতে গৌরবর্ণ কিরণচ্ছটা সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই গৌর-কিরণচ্ছটাতে বংশীবদনের শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়িয়া যেন গৌর হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রামানন্দ বিস্মিত হইলেন, প্রভুকে এই অপূর্ব্ব রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ছন্নঃ কলৌ"—প্রভু কিন্তু সব সময়েই আত্মগোপন করিতে চাহেন; প্রেমিক ভক্তের নিকটে ধরা পড়িয়াও যেন সহজে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। রসিয়া প্রভুর ইহাও এক রঙ্গ। প্রভু রামরায়কে বলিলেন—না রামানন্দ। তুমি যাহা দেখিতেছ, তোমার গাঢ়-প্রেমের স্বভাবেই তোমাকে তাহা দেখাইতেছে! রাধাকৃষ্ণে তোমার

প্রগাঢ় প্রীতি ; তাই তুমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করনা কেন, রাধাকৃষ্ণই দেখ। আমি কিন্তু যে-ই সন্ন্যাসী, এখনও সেই সন্ন্যাসীই। "প্রভু কহে, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥ মহাভাগবৎ দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। যাহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ ১।৮।২২৫-২৮॥"

মহাভাগবতোত্তম প্রেমিক ভক্ত রায়-রামানন্দের নিকটে প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রেমবলে রামানন্দ প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি প্রভু, ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥ রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥ ২।৮।২২৯-৩২॥"

কি উদ্দেশ্যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, রামানন্দ তাহা ঠিকমতই জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন, শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত যে শ্যামরূপ তিনি দেখিয়াছেন, তাহাই বুঝি প্রভুর স্বরূপ। তাই তিনি বলিলেন "রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।" প্রভুর প্রকৃত স্বরূপের দর্শন রামানন্দ তখনও পান নাই, তদনুরূপ কৃপাও বোধ হয় প্রভু তখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তিমাত্র গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তিটুকু দেখাইবার জন্যই বোধ হয় প্রভু ভঙ্গী করিয়া রামানন্দের সাক্ষাতে—শ্যামসুন্দর এবং শ্রীরাধিকারূপে প্রথমে আত্মপ্রকট করিলেন।

যাহা হউক, রামরায়ের উক্তি শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। হাসির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—"রামানন্দ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমার স্বরূপ নয়। আচ্ছা, আমার স্বরূপ কি, তাহা দেখ।' তখন—"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ ২।৮।২৩৩॥ কৃপা করিয়া রামানন্দরায়কে প্রভু যে রূপটী দেখাইলেন, তাহাই প্রভুর স্বরূপ। তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু, রামানন্দ পূর্ব্বে কখনও তাহা দেখেন নাই, বুঝিবা ধ্যানেও কখনও এই রূপ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে উদ্ভাসিত হয় নাই। যাহা দেখিলেন, তাহা সন্ন্যাসি-রূপ নহে, সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতা নবগোরচনা-গৌরী শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামসুন্দর রূপও নহে। ইহা তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব্ব, অতি আশ্চর্য্য রূপ। ইহা—রসরাজ ও মহাভাব—এই দু'য়ের অপূর্ব্ব মিলনে—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, এই দু'য়ের মিলনে—এক অতি অনির্ব্বচনীয় রূপ। এই রূপে, শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-শ্যাম রূপ শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিদ্বারামাত্র প্রচ্ছন্ন নহে—শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত। নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমভরে গলিয়া, নন্দনন্দনের প্রতি শ্যাম অঙ্গে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অথচ মহাভাবময়ীর দেহরূপ গৌর আবরণের ভিতর দিয়া রসরাজের শ্যাম তনুও যেন লক্ষিত হইতেছে। স্নিগ্ধকান্তি নবজলধর যেন শারদ জ্যোৎস্নায় ছানা সৌদামিনী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নব জলধরের স্নিগ্ধ শ্যাম কান্তিচ্ছটাও অনুভূত হইতেছে—রসরাজ এবং মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন—যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে। এই অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় রূপটী যেন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপেরই—যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপেরই চরম-পরিণতি। মহাভাবের দ্বারা নিবিড়তমরূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গার-রসরাজের এই অনির্ব্বচনীয় রূপটী একমাত্র অনুভবেরই বিষয়।

যাহা হউক, এই অপূর্ব্ব-রূপটী "দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিত। ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিত॥ ২।৮।২৩৪॥" তখন "প্রভু তারে হস্ত স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥ ২।৮।২৩৫॥"—যখন রায়ের আনন্দ-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল দেখিলেন—যেই সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী।

তখন রামনন্দকে "আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥ মোর তত্ত্ব-লীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥ ২৮।২৩৬-৩৭॥" এই অপূর্ব্ব রূপের রহস্যটীও তিনি রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করিলেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন।

গোপেন্দ্র-স্থত বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অন্য জন ॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ ১৮।২৩৮ ॥—রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌর নহে; আমার প্রতি অঙ্গে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি গৌর অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাকে গৌর দেখায়। তিনিও ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহাকেও কখনও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব দ্বারা আমার নিজের দেহ মনকে বিভাবিত করিয়াই আমি নিজের মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিতেছি।" ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ; শ্রীরাধার গৌর অঙ্গ দ্বারা সর্ববাঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা প্রকটিত করিলেন, কি ভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন, এক্ষণে তাহারই দিগদর্শন দেওয়া হইতেছে।

রসাস্বাদন। প্রথমে তাঁহার রসাস্বাদনের কথারই ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলারস এবং সেই লীলার ব্যপদেশে উৎসারিত স্বীয় মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিয়াছেন। যে লীলারস ব্রজে তিনি বিষয়রূপে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই নবদ্বীপ আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিলেন।

ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণপ্রীতি প্রকাশের এবং আস্বাদনের দ্বার ছিল—নৃত্য, গীত আলিঙ্গন, চুম্বনাদি। আর নবদ্বীপে সেই প্রীতিকাশের এবং আস্বাদনের দ্বার হইয়াছে—সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য, ইষ্টগোষ্ঠি, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, ব্রজস্মৃতির উদ্দীপক বিষয়াদি। ব্রজের রাসলীলাতে যে রসের উৎস প্রসারিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনেও তাহারই বিকাশ। এই রসতরঙ্গের কোমল অথচ প্রবল স্পর্শেই শ্রীবাসের হৃদয় হইতে বৃন্দাবন মাধুর্য্য, গোপীকুল চিত্তোন্মাদকারী বংশীবাদন, রাসোৎসব, ছয়ঋতু বনবিহার, জলকেলি আদি লীলারস মন্দাকিনী উৎসারিত হইয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তকে পরিষিঞ্চিত করিয়াছিল।

দর্শনের দ্বার দিয়া ব্রজরস আস্বাদনের বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয় নীলাচলে। সন্ন্যাসের রুক্ষ আবরণে স্বীয় প্রেমরস-ঘন বিগ্রহকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও নীলাচলে প্রভুর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। প্রেমরসের অজস্র ধারায় তাঁহার রুক্ষ যতি বেশকেও পরিনিষিক্ত হইয়া রুক্ষতা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। প্রভু চব্বিশ বৎসর নীলাচলে ছিলেন; তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে নীলাচলের বাহিরেও তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; এই বহিরবস্থিতির কাল চারিবৎসরের বেশী হইবে না। বাকী বিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ মাধুর্য্য পান করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের প্রভাবে যে সকল ব্রজলীলা প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত লীলারসও আস্বাদন করিয়াছেন। প্রভু সাধারণতঃ শ্রীজগন্নাথকে জগন্নাথরূপে দেখিতেন না; তিনি দেখিতেন—শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর বংশীবদনই দাঁড়াইয়া আছেন, আর দেখিতেন "নানাভাবে চঞ্চল তাঁর কমল-নয়ন।" শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এই রূপের মাধুর্য্যই পান করিতেন—তৃষিত চাতকের মত।

প্রভু প্রায় প্রতিদিনই জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিতেন। তখন প্রভু বোধ হয় ব্রজের কুঞ্জভঙ্গ-লীলার রসেই নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি দেখিতেন—রত্নমন্দিরে জগন্নাথকে নয়—ব্রজের নিভৃত নিকুঞ্জে প্রীতিপরায়ণা সখীবৃন্দের সযত্ন সজ্জিত নির্বৃন্ত-কুসুমাস্তীর্ণ সুকোমল শয্যায় শয়ান নিদ্রালস-নিমীলিত-নয়ন রসিক-শেখর নাগর-রাজকে। ভাবাবেশে প্রভুর আত্মস্মৃতি নাই। শ্রীরাধারই ন্যায় তখন তিনিই যেন "উঠহে নাগর-বর, আলিস পরিহর, ঘুমেতে না হও অচেতন"—বলিয়া "পদ চাপি বঁধুরে" জাগাইতেন। আসন্ন বিরহের ভাবে কত আর্ত্তি কত দৈন্য প্রকাশ করিতেন। অশ্রুধারায় বসন ভিজিয়া ভূমিতলে স্রোত বহিয়া যাইত। "গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, সে আনন্দের কি কহিব বলে। গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে, সে খাল ভরিল অশ্রুজলে। ৩।২।৪৭॥"

আর যখন শ্রীমন্দিরে প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপ দর্শন পাইতেন, অথবা রথযাত্রা-সময়ে রথের উপরে

তাঁহার দর্শন পাইতেন, তখন রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিতেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন। "যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ, তবে জানে—আইলাঙ কুরুক্ষেত্র। সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন, জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ২।২।৪৬ ॥" তখন কত আর্ত্তিভরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেন—"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন-চরণ। ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী ঘোড়া রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে-সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ ॥ আমা লৈয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥ ২।১৩।১২০—২৫ ॥ অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন', মনে বনে এক করি জানি। তাহাঁ তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি ॥ ২।১৩।১৩০ ॥"

নদী দেখিলে প্রভুর মনে হয়—এই-ই যমুনা; সরোবর দেখিলে মনে হয়—এই শ্যামকুণ্ড—রাধাকুণ্ড; বন দেখিলে মনে হয়—এই-ই শ্রীবৃন্দাবন; পর্ব্বত দেখিলে মনে হয়—এই-ই গোবর্দ্ধন। কেবল মনে হওয়া নয়; শ্রীরাধা এই সকল স্থলে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদন করিতেন, প্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া—নদীতে বা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, যেন প্রিয়সখীদের সঙ্গে লইয়া প্রাণ-বঁধুয়ার সহিত জলকেলি করার জন্য। পর্ব্বতের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতেন—গোবর্দ্ধন-গিরি-কন্দরে মদন-মোহনের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য; কণ্টকের আঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইত, রুধির-ধারায় গৌর অঙ্গ রঞ্জিত হইয়া যাইত—প্রভু অনুসন্ধান-শূন্য।

জ্যোৎস্নাবতী রজনী। প্রভু সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন। পথে এক পুষ্পোদ্যান; বৃন্দাবন মনে করিয়া প্রভু তাহাতে প্রবেশ করিয়া প্রেমাবেশে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে যেরূপ আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠার সহিত গোপীগণ প্রতি তরুলতার নিকটে কৃষ্ণের সন্ধান করিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে। একে একে নানা বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—"আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার। তীর্থবাসী সভে—কর পর উপকার ॥ কৃষ্ণ—তোমার ইহাঁ আইলা—পাইলা দর্শন। কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥"—উত্তর পান না। ভাবেন—"এসব পুরুষ জাতি—কৃষ্ণের সখার সমান। এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ॥" তখন তুলসী-আদি স্ত্রী-জাতীয় লতাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুলসী মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে! তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে? তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ ॥" উত্তর পান না; ভাবেন—"এ তো কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥" তারপর মৃগীদিগকে পুষ্প-ফলভারাবনত বৃক্ষাদিকেও ঐরূপ আর্ত্তির সহিত কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাধাপ্রেমের কি অদ্ভুত রীতি! বৃক্ষ, লতা, মৃগী—এসব যে কোনও কথার জবাব দিতে পারিবে না, সেই খেয়াল প্রভুর নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? তাঁহার সমস্ত দেহ-মন,প্রাণ—সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—কৃষ্ণেতে কেন্দ্রীভূত; অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ কোথায়? যাহা হউক, বুকফাটা আর্ত্তির সহিত বিলাপ করিতে করিতে প্রভু কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিয়া বনে ফিরিতেছেন। অজ্ঞাতসারেই সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রভু মনে করিলেন—এই-ই যমুনা; তখন—"দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে ॥ কোটিমন্মথ-মোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্র-মন ॥ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।" সঙ্গিগণ অতিযত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইলেন। অর্দ্ধবাহ্য দশা। সেই দশাতেই প্রলাপোক্তিতে সমস্ত প্রকাশ।

প্রভুর নীলাচল-লীলার শেষ বার বৎসর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে। নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ ॥ রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা লব। ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ ২।২।৩-৬ ॥" রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত আর্ত্তি তাঁহার অসংখ্য প্রলাপোক্তিতে উদ্গীরিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বিরহও একটী রস; ইহাও আস্বাদ্য। বিরহে "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত। এই প্রেমার আস্বাদন,

তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥ সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥ ২।২।৪৪-৪৫॥”

কখনও বা “চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥ ২।২।৭৬॥”

এইরূপে নানাভাবে প্রভু ব্রজের লীলারস মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ব্রজের রসাস্বাদন বাসনার অপূর্ণতা নবদ্বীপ লীলায় পূর্ণ করিলেন।

রাধা প্রেম মহিমা। রাধাপ্রেমের মহিমা জানিবার জন্যও ব্রজে নন্দ নন্দনের দুর্দ্দমনীয় লালসা জন্মিয়াছিল। নবদ্বীপ লীলায় তাঁহার সেই বাসনা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

ব্রজে শ্রীরাধা একসময়ে আক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—“মরিয়া হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।” শ্রীরাধার মরা অবশ্য হয় নাই, নন্দ নন্দন হওয়াও হয় নাই; কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রেম যে নন্দ নন্দনকে ‘রাধা’ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি অদ্ভূত প্রভাব রাধাপ্রেমের। সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ংভগবানের পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দিল! আর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ভাবকে কোন্ গভীরতম প্রদেশে চাপিয়া রাখিয়া নিজেই তাঁহার সমস্ত দেহ মন প্রাণের উপরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উপরে—নিজের সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিল! এই অধিকারের বলেই রাধাপ্রেম সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্‌কে আপন ভোলা করিয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে নিজের দ্বারা নিজের মুখ ঘষাইয়া ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া দিল !!!

প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের সকলকে যিনি নাচাইতেছেন—কাহাকেও বা বহিরঙ্গা মায়া পাশে, কাহাকেও বা অন্তরঙ্গা যোগমায়া পাশে আবদ্ধ করিয়া নাচাইতেছেন—রাধাপ্রেম তাঁহাকেই এবার নাচাইতেছেন, বাজিকরের পুতুলের মত। “গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন, নানা রীতে সতত নাচায়। নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥ ॥২।২।৬৫॥” আগুন অপরকেই পোড়ায়, নিজকে পোড়ায় না। কিন্তু রাধাপ্রেম অপরকে নাচায়, নিজেকেও নাচায়। “কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁয়॥ ৩।১৮।১৭॥ টীকা দ্রষ্টব্য॥

কোনও কোনও সময়ে শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণ বিরহের রাগে রঞ্জিত, মিলনের জন্য উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত। কখনও বা প্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট। প্রভুর হৃদয়স্থিত এই প্রেম, সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে পাওয়ার আশাতেই, বহির্ব্বিকাশের চেষ্টার উদ্দামতায়, বাধাস্বরূপ প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেন তাহার পথ হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভিতর হইতে ঠেলিয়া দলিয়া মথিয়া এমন এক অদ্ভূত কাণ্ড করিয়া ফেলে যে, প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গগ্রন্থি এক বিতস্তি পরিমাণ শিথিল হইয়া যায়, তাহাতে প্রভুর দেহ প্রায় সাত আট হাত লম্বা হইয়া পড়ে। আবার ঐ প্রেমই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভিতরে পাওয়ার আশাতেই, যখন প্রবল বেগে হৃদয়েই কেন্দ্রীভূত হইতে চেষ্টা করে, তখন—প্রবল স্রোতের সঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড যেমন স্রোতের দিকেই আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই হৃদয়মুখ প্রেমের প্রবল আকর্ষণে—প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গও যেন হৃদয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইতে থাকে। তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যায়, প্রভুর দেহ কূর্ম্মাকার হইয়া পড়ে। “মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন॥ ২।২।৫৫॥” রাধাপ্রেমের এতাদৃশ প্রভাবকে বাধা দিতে বা সম্বরণ করিতে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও অসমর্থ।

রাধাপ্রেম নানা ভাবে প্রভুর উপরে তাহার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়াছে; প্রভুও তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

এইরূপে ব্রজের তিনটী অপূর্ণ বাসনা নবদ্বীপ লীলায় পূর্ণতা লাভ করিল।

রাগানুগাভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের রাগানুগা ভক্তি প্রচারের বাসনাও ব্রজলীলায় পূর্ণতা লাভ করে নাই; নবদ্বীপেই তাহারও পূর্ণতা। তাহাই দেখান হইতেছে।

(ক) ভজনের নিমিত্ত যাহাতে জীবের লোভ জন্মিতে পারে, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্তুটী জীবকে দেখাইয়া যান নাই ; সেই বস্তুটীর কথা যাহাতে জীব জানিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে তিনি সেই বস্তুটীর পরিদৃশ্যমান পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ, লীলারস আস্বাদনের আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনানন্দ—এই-ই হইল লোভের বস্তু। আনন্দ কিন্তু দেখিবার জিনিস নয়: বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে চিনিতে হয়। মুখের প্রফুল্লতা দেখিয়া যেমন অন্তরের সুখ চেনা যায়, তদ্রূপ। কৃষ্ণপ্রেমের যে কি আনন্দ এবং সেই আনন্দের যে কি প্রভাব, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দেহে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

প্রেমানন্দে হাসি, কান্না, নৃত্য, গীত—প্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ সর্ব্বদাই দেখাইয়াছেন। প্রেমানন্দের সাত্ত্বিক বিকার যে এক অদ্ভূত ব্যাপার, তাহা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এমন জলন্ত ভাবে আর কেহ দেখাইয়া যান নাই। নয়ন হইতে পিচকারীর ন্যায় অশ্রুধারা, কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলক, বৈবর্ণ্যে স্বর্ণোজ্জল কান্তি মল্লিকা-পুষ্পবৎ শুভ্র হইয়া যাওয়া, কম্পে দন্ত-সব হালিয়া যাওয়া—এসব আনন্দ বিকার দেখাইয়া পরম-লোভনীয় আনন্দ-' বস্তুটীর পরিচয় প্রভু দিয়া গিয়াছেন। "যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে॥ মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥"

(খ) "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গের ভজনের কেবল উপদেশ মাত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে তাহার অনুসরণে জীব ততটা প্রলুব্ধ হইতে পারে নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে ভজন করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারা ভজন করাইয়া ভজনের একটা পরমোজ্জল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারা দীক্ষাদি দেওয়াইয়া সেই আদর্শের সঙ্গে এবং স্বীয় পরিকরবৃন্দের সঙ্গেও পরবর্ত্তী কালের জীবের একটা সংযোগসূত্র প্রভু স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান কালের জীবও তাঁহার চরণ-সমীপে পৌছিবার সৌভাগ্য পাইতে পারে।

(গ) শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী কালের জীবের জন্য বিস্তৃত ভজন-প্রণালীর উপদেশও প্রভু কৃপা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পার্ষদবর্গের কৃপায় জীব তাহা এখন পাইয়াছে।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বাপরে তিনি ভজনের উপদেশ করিয়াছেন—ব্রজপ্রেম লাভ করার জন্য। কিন্তু ব্রজপ্রেম তিনি তখন জীবকে দেন নাই, প্রেমলাভের উপায়টীর কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন—কোনওরূপ বিচার না করিয়া—আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেমই দান করিয়া গিয়াছেন। করুণার অপূর্ব্ব বিকাশ। জীবের দিক্ বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এ অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি-সম্পত্তিটী দেওয়ার জন্যই যেন তিনি কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥"

এইরূপে দেখা গেল, যে দুইটী উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, কিন্তু সমুজ্জল পূর্ণতা—নবদ্বীপে।

প্রকট ও অপ্রকট। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকট-লীলা হইতেই অপ্রকটের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, প্রকট নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ।" অপ্রকট-নবদ্বীপেও তাহাই।

রাগমার্গের ভক্তিপ্রচার কেবল প্রকট-লীলারই ব্যাপার: অপ্রকট-লীলায় ভক্তি-প্রচারের অবকাশ নাই; কারণ, অপ্রকট-ধাম সাধন-ভূমিকা নহে, সেখানে মায়াবদ্ধ সাধক জীবেরও অভাব।

প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয় ব্রজ-লীলাতেই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যাদির আস্বাদন-বাসনা তিনটী অপূর্ণ থাকে এবং প্রকট ও অপ্রকট এই উভয় নবদ্বীপ-লীলাতেই তাঁহার এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

সুতরাং বিষয়ত্ব-প্রধানরূপে স্বয়ংভগবানের রসাস্বাদন-বাসনা থাকে অপূর্ণ এবং আশ্রয়ত্বপ্রাধান্যেই অপূর্ণরসাস্বাদন বাসনার পূর্ণতা।

ব্রজের প্রকটে এবং অপ্রকটে যেরূপ বৈলক্ষণ্য, নবদ্বীপের প্রকটে এবং অপ্রকটেও তদ্রূপই বৈলক্ষণ্য। ব্রজের অপ্রকট-লীলার বিস্তৃতি নবদ্বীপের অপ্রকটে এবং ব্রজের প্রকট-লীলার বিস্তৃতি নবদ্বীপের প্রকটে। নবদ্বীপ লীলা হইল ব্রজলীলার পরিশিষ্ট-স্থানীয়।

নবদ্বীপ-পরিকর। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই যেমন নবদ্বীপের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, তেমনি ব্রজের পরিকরবর্গই নবদ্বীপ-লীলার পরিকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে নন্দমহারাজ হইয়াছেন জগন্নাথমিশ্র। যশোদামাতা হইয়াছেন শচীমাতা; ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-রূপে প্রত্যেকে উভয় ধামেই আছেন।

ব্রজে যাঁহারা কান্তাভাবের পরিকর ছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপলীলায় পুরুষদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপ লীলার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের একাধিক পরিকরের ভাব নবদ্বীপে একই পরিকরে আছে; আবার ব্রজের একই পরিকরের ভাবও নবদ্বীপে একাধিক পরিকরে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধার ভাব গৌরেও আছে এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীতেও আছে। গদাধর পণ্ডিতে শ্রীরাধার ভাবও আছে, ললিতার ভাবও আছে।

ব্রজের বলদেবই নবদ্বীপের শ্রীনিত্যানন্দ: শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীরাধার ভগিনী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর ভাব আছে বলিয়াও কেহ কেহ বলেন।

ব্রজলীলা ব্যতীত অন্যলীলার পরিকরও নবদ্বীপলীলায় আছেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর যে অংশ গুণমায়াকে জগতের উপাদানযোগ্যতা দান করেন, (অর্থাৎ যে অংশ জগতের মুখ্য উপাদান), সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীঅদ্বৈতে ব্রজের এক মঞ্জরীর ভাব আছে বলিয়াও কেহ কেহ বলেন। আবার তাঁহাতে সদাশিবও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামের সেবক হনুমান। শ্রীবাসপণ্ডিত নারদ-স্বভাব। শ্রীলহরিদাসঠাকুরে প্রহ্লাদ। ইত্যাদি।

গৌর-করুণা। নবদ্বীপ-লীলাতেই ভগবৎ-করুণা-বিকাশের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ দুইদিক দিয়া—মাধুর্য্যে এবং উল্লাসে!

(ক) করুণার মাধুর্য্য। করুণা স্বতঃই মধুর—বিষয় এবং আশ্রয়, উভয়ের পক্ষেই মধুর। অন্যান্য অবতারে ভগবান অসুর-সংহার করিয়াছেন—অসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া। ইহাও অসুরের প্রতি তাঁহার করুণা; যেহেতু, হতারি-গতিদায়ক ভগবান নিহত অসুরকে মুক্তি দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাণবিনাশের ফলে যে অসুরের এই সৌভাগ্য লাভ হইল, দেহে প্রাণ থাকিতে অসুর তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনগণ তাহার প্রাণ বিনাশের পূর্ব্বে এবং পরেও এই করুণার কথা জানিতে পারে নাই, সুতরাং এই করুণার মাধুর্য্য তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই এবং প্রাণবিনাশের পূর্ব্বে অসুরও তাহা পারে নাই।

কিন্তু গৌর-অবতারে ভগবান কোনও অস্ত্রধারণ করেন নাই। অসুর-সংহার তিনি এই অবতারেও করিয়াছেন—কিন্তু প্রাণবিনাশের দ্বারা নহে। পরন্তু অসুরত্ব-বিনাশের দ্বারা। নাম-প্রেম বিতরণদ্বারা প্রভু যেই মুহূর্ত্তে অসুরের কুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তির মূল মায়াকে দূরীভূত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই অসুর হইয়া গেলেন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাভাগবত। অসুরের প্রতি এই করুণার মাধুর্য্য কেবল যে অসুরই আস্বাদন করিলেন, তাহাই নহে; সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর জন-সাধারণও করুণার এই মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইয়া গেলেন। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার।" গৌর-করুণার এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আপামর-সাধারণকে তাঁহার চরণের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

(খ) **করুণার উল্লাস।** গৌর-অবতারেই ভগবৎ-করুণার সর্ব্বাতিশায়ী উল্লাস বা বিকাশ। তাহার প্রমাণ এই যে—অনাসঙ্গ-সাধনে যাহা কিছুতেই পাওয়া যায় না, সাসঙ্গ-সাধনেও যাহা সহজে পাওয়া যায় না—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া যায় না, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনেও যাহা পাওয়া যায় না—এতাদৃশ সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু যোগ্যতা-অযোগ্যতাদি সম্বন্ধে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

গৌর-করুণার আর এক অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয় প্রভুর নাম-বিতরণের ব্যাপারে। নাম চারিযুগেই প্রচলিত। ঋগ্‌বেদে এবং শ্রুতিতেও নাম-মাহাত্ম্যের কথা এবং নাম-নামীর অভেদের কথা দৃষ্ট হয় [১।১৭।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য]। অন্যান্য যুগেও যুগাবতারাদি দ্বারা জীবের মধ্যে নাম বিতরিত হইয়াছে। কিন্তু এই কলিযুগব্যতীত অন্য কোনও সময়েই স্বয়ংভগবান নিজে নাম কীর্ত্তন করিয়া নিজে আস্বাদন করিয়া বিতরণ করেন নাই। প্রেমঘন-বিগ্রহ, মাধুর্য্য-ঘনবিগ্রহ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ এই নাম, স্বভাবতঃ পরম মধুর হইলেও, একটা অপূর্ব্ব অতিরিক্ত মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছে। ক্ষীরের পিষ্টক স্বভাবতঃই মধুর; তার ভিতরে যদি অমৃতের পুর দেওয়া যায়, তাহার মাধুর্য্যের চমৎকারিতা অনেক বর্দ্ধিত হয়। পরম-মধুর নামের মধ্যে প্রেমামৃতের পুর দিয়া প্রভু এই নামের মাধুর্য্য-চমৎকারিতা সর্ব্বাতিশায়িরূপে বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা গৌর-করুণার এক অপূর্ব্ব উল্লাস।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নামের এই মাধুর্য্যের অনুভব পাইনা। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি মিশ্রীর মিষ্টত্বও অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু মিশ্রী খাইতে খাইতে যখন পিত্তদোষ কাটিয়া যায়, তখন সে আর মিশ্রী ছাড়িতে পারেনা। আমাদের চিত্তও বহির্ম্মুখতারূপ পিত্তদোষে দূষিত, ঔষধও নামই। নাম করিতে করিতে যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখনই বুঝা যাইবে, এই নাম—"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনম্।" এবং তখনই বুঝা যাইবে, দেবী পৌর্ণমাসী কেন বলিয়াছিলেন "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥ চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥"

উল্লাস শব্দের আর একটী অর্থ আছে—আনন্দের আতিশয্য জনিত উচ্ছ্বাস। লোক যখন তাহার অভীষ্টবস্তু আশাতিরিক্তরূপে পায়, তখনই তাহার উল্লাস জন্মে। ভগবৎ করুণাও গৌরের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত অভীষ্ট একটী বস্তু পাইয়াছে, তাই করুণার উল্লাস। ভগবৎ করুণা সর্ব্বদাই যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে—নির্ব্বিচারে জীবকে কৃতার্থ করার জন্য। করুণা কোনওরূপ বিচারের পক্ষপাতী নয়, ন্যায়পরায়ণতাই বিচারের পক্ষপাতী। যাহা হউক, ভগবৎ করুণার এইরূপ প্রভাব হইলেও তাহার একটা অপেক্ষা আছে—ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইলেই তিনি সেই ইঙ্গিতকে বাহন করিয়া জীবের দিকে ছুটিতে পারেন। নবদ্বীপ-লীলায় প্রভুর সঙ্কল্পই ছিল আপামর সাধারণকে কৃপা করা, ইহাই করুণার অভীষ্ট। কিন্তু প্রভুর সঙ্কল্পের ব্যাপকতা আরও অনেক বেশী,—আপামর সাধারণকে নির্ব্বিচারে চরম তম এবং পরম তম বস্তুটী দেওয়া, প্রেমভক্তি দেওয়া। ইহা ছিল বোধ হয় করুণার পক্ষে আশার অতিরিক্ত। প্রভুর এই বিরাট সঙ্কল্প—আপামর সাধারণকে প্রেমভক্তি দানের সঙ্কল্প—হইল এবার করুণার বাহন। এই সঙ্কল্পদ্বারা প্রভু যেন করুণাকে বলিলেন—করুণা, আমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে ছাড়িয়া দিলাম। যেখানে ইচ্ছা যাহার নিকটে ইচ্ছা—তুমি আমাকে বিনামূল্যেই বিলাইয়া দিতে পার। এবার তোমার অবাধ স্বাতন্ত্র্য। এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া করুণার যেন আনন্দের আর সীমা রহিল না। অন্যান্য লীলায় করুণা থাকে ভগবানের অধীন এবার ভগবান্ হইলেন করুণার অধীন। তাই দেখা গিয়াছে গৌরের অনুসন্ধান ব্যতীতও তাঁহার কৃপা জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন; যেমন গোপীনাথ পট্টনায়ককে। তাই বলা হয় "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥"

এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য পাইয়াই গৌর-করুণা প্রভুর প্রকটকালে প্রেমভক্তি দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালের জীবের কল্যাণার্থ রায়-রামানন্দ এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া রাধাভাবের নিবিড় আবেশময় প্রভুর দ্বারাও বিবিধ তত্ত্বকথা প্রকাশ করাইয়াছেন।

গৌরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য। "স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ। যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥ ১।১৩।১॥" এই শ্লোক হইতে জানা যায়, রথের সম্মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া—রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যত লোক শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এমন কি স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন? যাহা কখনও দেখা যায় নাই, কিম্বা যাহার কথাও কখনও শুনা যায় নাই, কি কল্পনাও করা যায় নাই, এমন কোনও ব্যাপার দেখিলেই লোকের বিস্ময় জন্মে। প্রভুর নৃত্যের মধ্যে এমন কি বস্তু ছিল, যাহা কেহ কখনও দেখেন নাই? পরবর্ত্তী বর্ণনায় প্রভুর এই নৃত্যসম্বন্ধে দুইটী বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডবনৃত্য (২।১৩।৭৭-৭৮) এবং তাঁহার সাত্ত্বিক বিকারের অদ্ভুত বিকাশ (২।১৩।৯৬-১০৬)। নৃত্যকালে অতিদ্রুত ভ্রমণে একটী স্বর্ণবর্ণ চক্রের প্রতীতি জন্মাইতেছেন, উদ্দণ্ডনৃত্যে সসাগরা মহী টলমল করিতেছে, কখনও অদ্ভুত লম্ফে বহুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন, কখনও বা আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন—ইহাতে সকল লোকেরই বিস্মিত হওয়া সম্ভব; কেননা, লোকসমাজে—ভক্তসমাজেও—এইরূপ নৃত্য কেহ কখনও দেখেন নাই। আবার, একই সময়ে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিকের অদ্ভুত বিকাশ—নয়ন হইতে পিচকারীর ন্যায় জলের ধারা অতি জোরে বাহির হইতেছে, তাহাতে আশে-পাশের সমস্ত লোক ভিজিয়া যাইতেছে (অশ্রু), সুগৌর দেহ কখনও রক্তের ন্যায় লাল—কখনও বা মল্লিকা-পুষ্পের মতন সাদা হইতেছে (বৈবর্ণ্য), গায়ের রোম খাড়া হইয়া গিয়াছে—গোড়া ফোঁড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে (পুলক), দাঁতগুলি থট্ থট্ করিয়া যেন পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে (কম্প), দেহের সমস্ত অংশ হইতে তীব্রবেগে ঘাম ছুটিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে রক্তও বাহির হইয়া আসিতেছে (প্রস্বেদ), স্পষ্ট করিয়া কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেন না—জগন্নাথ বলিতে যাইয়া কেবল জ-জ-গ-গই বলিতেছেন (স্বরভেদ), কখনও শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন—হস্ত পদাদি অচল (স্তম্ভ), আবার কখনও বা শ্বাস-প্রশ্বাসহীন ভাবে ভূমিতে পড়িয়া থাকেন (প্রলয়)—এমন সব অদ্ভুত বিকার। ইহাতেও সমস্ত লোক বিস্মিত হইতে পারেন; কারণ, এরূপ বিকার কেহ কখনও দেখেন নাই, দেখার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন নাই। প্রভু যখন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তখন বিস্মিত হইয়াছিলেন; প্রভুর দেহে তিনি তখন যে প্রেমবিকার দেখিয়াছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ সার্ব্বভৌম গ্রন্থে সে সমস্ত বিকারের কথা পড়িয়াছিলেন—কিন্তু কখনও কাহারও মধ্যে দেখেন নাই।

যাহা হউক, প্রভুর উদ্ভট নৃত্য এবং অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া তত্রত্য লোক সকলের ন্যায় শ্রীজগন্নাথেরও কি বিস্ময় জন্মিয়াছিল? তিনি কি প্রভুর স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই? না পারিয়া থাকিলে অবশ্যই তাঁহারও বিস্মিত হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব জানিতেন কিনা, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে একটা অনুমান করা চলে। শ্রীজগন্নাথ হইলেন দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। প্রকটলীলায় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দনই রাসাদিবিলাসের পরে ব্রজ হইতে মথুরা-দ্বারকায় গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকটলীলায় দ্বারকা-বিহারী ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেও তাঁহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় প্রেমমুগ্ধত্ব বা নিজের স্বরূপ জ্ঞানের প্রচ্ছন্নত্ব সম্যক্ ছিল না। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বও সম্যক্ রূপে প্রচ্ছন্ন ছিলনা বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব—শ্রীশ্রীগৌর যে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-শ্রীকৃষ্ণ, ইহাও তিনি—জানিতেন। ইহাই যদি হয়—তাহা হইলে প্রভুর দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি দ্বারকাবিহারী হইলেও প্রকটলীলায় দ্বারকায় অবস্থান কালেও ব্রজলীলার কথা তাঁহার মনে পড়িত এবং

স্বপ্নাদিতে রাধা-রাধা বলিয়া উঠিতেন বলিয়াও শুনা যায়। সুতরাং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার এবং রাসলীলার সর্ব্বাতিশায়ী নৃত্য-কৌশলও তাঁহার অপরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে মহাপ্রভুর নৃত্যপ্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে সমবেত জনগণের বিস্ময়ের কথাই লিখিয়াছেন, আর শ্রীজগন্নাথের "অপার-আনন্দের" কথাই লিখিয়াছেন—বিস্ময়ের কথা লিখেন নাই (২।১৩।৯৩)। কিন্তু প্রারম্ভ-শ্লোকে যে জগন্নাথের বিস্ময়ের কথা লিখিয়াছেন, তাহাও মিথ্যা নয়। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য এবং অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া জনগনের আনন্দ অপেক্ষা বিস্ময়ই জন্মিয়াছিল বেশী; তাঁহাদের এই বিস্ময় বোধ হয় অধিকক্ষণই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে বিস্ময়েরই আধিক্য ছিল বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের কেবল বিস্ময়ের কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত নৃত্যে ও সাত্ত্বিক বিকারে শ্রীজগন্নাথের বিস্ময়ের বিশেষ হেতু না থাকারই সম্ভাবনা—ইহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। নৃত্যের উদ্দণ্ডতা এবং প্রেমবিকারের অদ্ভুতত্ব ব্যতীত শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে অন্য কিছু একটা অদ্ভুত বস্তু দেখিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই জন্মিয়াছিল; কিন্তু বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দেরই ছিল অনেক আধিক্য; অদ্ভুত বস্তুর দর্শন জনিত বিস্ময়—কিন্তু তাহা ছিল ক্ষণস্থায়ী; সেই বস্তুর অনুভবজনিত আনন্দের প্রবল প্রবাহে বিস্ময় বহু দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল, আনন্দই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী জগন্নাথের বিস্ময়ের কথা না লিখিয়া আনন্দের কথাই লিখিয়াছেন; যাঁহার মধ্যে যে ভাবটি অধিকক্ষণ স্থায়িত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখেই প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের আনন্দ এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি এই আনন্দ আস্বাদনের লোভ যেন সম্বরণ করিতে পারেন নাই; তাই মাঝে মাঝে রথ থামাইয়াও অনিমেষ-নেত্রে প্রভুর নৃত্যদর্শন করিতেন (২।১৩।৯৪); আবার কখনও বা প্রভুকে সাক্ষাতে দেখিতে না পাইলে—সেই অদ্ভুত বস্তুটির দর্শনজনিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন বলিয়াই বোধ হয় ব্যাকুলতাবশতঃ রথ চালাইবার ইচ্ছা তাঁহার স্তম্ভিত হইয়া যাইত—রথ স্থির হইয়া থাকিত (২।১৩।১১৩); আবার গৌর যখন সাক্ষাতে আসিতেন, তখন সেই অদ্ভুত বস্তুটির আস্বাদন করিতে করিতেই যেন ধীরে ধীরে রথ চালাইতেন।

কিন্তু সেই অদ্ভুত বস্তুটি কি—যাহার দর্শনে জগন্নাথের বিস্ময় ও অত্যধিক আনন্দ জন্মিয়াছিল? কোনও পাত্রে যদি কোনও গরম জিনিস থাকে, সেই পাত্রের বহির্ভাগও উত্তপ্ত হয়; ভিতরের তাপ যত বেশী হইবে, বাহিরের তাপও তত বেশী হইবে; এই বাহিরের তাপ হইল—পাত্রের উপরে ভিতরের তাপের ক্রিয়া। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভিতরে ছিল পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রেম; শ্রীশ্রীজগন্নাথের বদনচন্দ্র দর্শনে তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল—উদ্দণ্ডনৃত্য এবং সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-বিকারাদি হইল প্রভুর দেহের উপরে—প্রেমের আশ্রয়ের উপরে প্রেমের ক্রিয়া। প্রেমের বিষয়ের উপরেও প্রেমের একটি বিশেষ ক্রিয়া আছে। পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইত; আবার এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেম এবং উল্লাসও বর্দ্ধিত হইত; আবার শ্রীরাধার এই বর্দ্ধিত প্রেমোল্লাস দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইত—প্রেম ও মাধুর্য্য পরস্পরে যেন হুড়াহুড়ি করিয়াই বর্দ্ধিত হইত, কেহই পশ্চাদ্পদ হইত না; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম, দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥" তখন শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্য দেখিয়া সর্ব্বমনোমোহন মদনও মুগ্ধ হইয়া যাইত। "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ॥" কিন্তু রাধাবিরহিত শ্রীকৃষ্ণেরও যে স্বাভাবিক মাধুর্য্য তাহাও—স্বস্য চ বিস্মাপনং—আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর—অপরকে তো বিস্মিত করিতই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। দ্বারকায় শ্রীরাধা ছিলেন না, সেখানেও মণিভিত্তিতে নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়াছিলেন, নিজের রূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য—শ্রীরাধা যেভাবে আস্বাদন করেন, সেইভাবে আস্বাদনের জন্য—লুব্ধ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে গলিয়া গলাগলি হইয়া একাসনে বসিয়া যখন রহস্যালাপ করিতেন, তখন তাঁহাদের সম্বর্দ্ধিত মাধুর্য্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ মাধুর্য্য তাঁহাদিগকে

অনুভব করাইবার উদ্দেশ্যে কোনও কৌতুকিনী কুঞ্জসেবিকা সম্ভবতঃ কোনও সময়ে তাঁহাদের সাক্ষাতে দর্পণ ধরিয়া থাকিবেন। সেই দর্পণে নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন। সেই অবস্থার ফলেই বোধ হয় জগদ্‌বাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীরাধার সান্নিধ্যের নিবিড়তা যত বেশী হইবে, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও তত বেশী স্ফুরিত হইবে। শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের সম্মিলিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে এই নিবিড়তা যত বেশী, তত বেশী ব্রজেও সম্ভব হয় নাই। ব্রজে শ্রীরাধার অভিলাষ হইয়াছিল—নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে। "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।" কিন্তু ব্রজে তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। নবদ্বীপ-লীলায় নবগোরোচনা-গৌরী যেন প্রেমে গলিয়া নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন দ্বারা আবৃত করিয়া, স্বীয় চিত্তের প্রেম-পরাকাষ্ঠা দ্বারা প্রাণবঁধুয়ার চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অনুরঞ্জিত ও পরিষিঞ্চিত করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর সাজাইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আছে, শ্রীরাধার মাধুর্য্য আছে, উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যবশতঃ হুড়াহুড়ি করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান উভয়ের সম্মিলিত মাধুর্য্যের অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতিশায়িত্ব আছে; এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের অনুভবজনিত যে আনন্দ, তাহাও নবদ্বীপ-লীলাতেই সর্ব্বাতিশায়ী, ব্রজেও বোধ হয় ইহা অপরিচিত ছিল। তাহার সাক্ষী ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ। তিনি প্রথমে সন্ন্যাসী গৌরকে দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার আনন্দও হইয়াছিল; কিন্তু সেই আনন্দে তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। তার পরে, সন্ন্যাসি-রূপের পরিবর্ত্তে দ্বিভুজ-মুরলীধর-নবকিশোর-নটবর শ্যামসুন্দরকে দেখিলেন, দেখিয়া আনন্দিতও হইলেন; কিন্তু সেই আনন্দেও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। তারপরে, সেই শ্যামসুন্দরের সাক্ষাতে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাতুল্য ভানুনন্দিনীকেও দেখিলেন এবং তাঁহার গৌরকান্তির ছটায় শ্যামসুন্দরের সমস্ত শ্যাম অঙ্গকে গৌরবর্ণ হইতে দেখিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর আনন্দ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। ইহার পরে প্রভু কৃপা করিয়া যখন রামরায়কে প্রভুর নিজ স্বরূপ—রসরাজ-মহাভাব দুয়ে একরূপ—দেখাইলেন, আনন্দাধিক্যে রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ২।৮।২৩৩-৩৪॥ এই রসরাজ-মহাভাবের মিলিত স্বরূপই গৌরের প্রকৃত স্বরূপ। রথাগ্রে নৃত্যকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বোধ হয় এই রূপেরই দর্শন পাইয়াছিলেন, দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; কারণ উহা ছিল—দ্বারকাবিহারী জগন্নাথের অপরিচিত। এক পরমাদ্ভুত-রূপ এবং এই রূপের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের অনুভবে তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দও জন্মিয়াছিল—যাহার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

রায়রামানন্দ ছিলেন ব্রজের বিশাখা সখী; যদ্দ্বারা মাধুর্য্যের পূর্ণতম অনুভব ও আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, শ্রীশ্রীপ্রেমের চরমতম পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব তাঁহার মধ্যে ছিল না; তথাপি তিনি রসরাজ-মহাভাব-দু'য়ে এক-রূপের মাধুর্য্য দেখিয়া আনন্দাধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর যিনি সেই মাদনাখ্য মহাভাবের পূর্ণতম ভাণ্ডারকেই নিজস্ব করিয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ভাবের পূর্ণতম উল্লাসের সময়ে তিনি যদি একবার স্ব-স্বরূপের রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইত, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ভাবাবেশে প্রভুর কূর্ম্মাকার-ধারণ, হস্তপদের গ্রন্থিসমূহের প্রত্যেকের বিতস্তি-পরিমাণ শৈথিল্য—স্বীয় মাধুর্য্য অনুভবেরই ফল কিনা—কে বলিবে?

নবদ্বীপ-লীলা

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার-সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছে, যে দুইটী উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহাদের সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন প্রবল বেগ ধারণ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা—রসিক-শেখরের একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র; পূর্ব্বার্দ্ধ ব্রজলীলা এবং উত্তরার্দ্ধ নবদ্বীপ-লীলা। ব্রজলীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপ-লীলা। নবদ্বীপ-লীলাকে ব্রজলীলার পরিশিষ্টও বলা যায়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-বাসনা সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে; সুতরাং তাঁহার রসিক-শেখরত্ব-বিকাশের আরম্ভও ব্রজে এবং তাহার পূর্ণতা নবদ্বীপে। ইহাও দেখা গিয়াছে—ব্রজলীলায় যে করুণা-বিকাশের আরম্ভ, নবদ্বীপলীলাতেই তাহার পূর্ণ-পরিণতি। সুতরাং করুণাময়ত্ব-বিকাশের আরম্ভও ব্রজে এবং তাহার পূর্ণতা নবদ্বীপে।

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ। ব্রজের রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজমিতাদি" বাক্যে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় ভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং তাঁহার গৌর-অঙ্গদ্বারা নিজের শ্যাম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই পূর্ণতম রসিক-শেখর; তাঁহাতেই পূর্ণতম কৃষ্ণত্বেরও অভিব্যক্তি,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যেও ব্রজ অপেক্ষা নবদ্বীপের একটু বিশেষত্ব আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় নাই; কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" এই রাই-কানু-মিলিত তনুই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। "সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি।" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন—রায়রামানন্দ-কথিত 'না সো রমণ না হাম রমণী" পদোক্ত প্রেমবিলাস বিবর্ত্তের চরম-পরিণতি বা মূর্ত্ত-বিগ্রহ। (প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।)

উভয় লীলাই তুল্যভাবে ভজনীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা এবং শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ও তাঁহার ব্রজলীলা তুল্যভাবে ভজনীয়। তাঁহাদের কাম্যও যুগপৎ উভয় লীলার সেবাপ্রাপ্তি; তাই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা রাধাকৃষ্ণ।" উভয় লীলার সমবায়েই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের কৃষ্ণত্বের, রসিক-শেখরত্বের, করুণাময়ত্বের, ভক্তবশ্যতার এবং বিলাস-বিদগ্ধত্বের পূর্ণতা; সুতরাং উভয় লীলার সেবাতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী সেবাবাসনারও পূর্ণ সার্থকতা।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা একই সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই মালার সৌন্দর্য্যের এবং উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে সূত্রে মালা গাঁথা হয়, তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মালাগুলি সমস্তই যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, মালা যেমন তখন আর গলায় ধারণের উপযুক্ত থাকে না; তদ্রূপ, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার সংযোগ-সূত্র ছিঁড়িয়া দিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; তখন উভয় লীলার সম্মিলিত আস্বাদন-যোগ্যতা হইতে জীব বঞ্চিত হইবে। নবদ্বীপলীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলাই হইল নবদ্বীপ-লীলার উপজীব্য বা পোষক; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই যেন নিস্তরঙ্গ হইয়া যায়। আবার নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দিলেও ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা যেন স্তিমিত হইয়া পড়ে। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে

ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হয়; আর তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ; আর নবদ্বীপলীলা কর্পূর মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাণ্ড (অমৃতদ্বারা প্রস্তুতভাণ্ড—যেমন মৃদ্‌ভাণ্ড)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি: তিনিই নবদ্বীপে ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মত রস-পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ব্রজলীলার মাধুর্য্য বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে। তাই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।" শ্রীলকবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২।২৫।২২৭ এজন্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন—উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয়, নবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলা উভয়েই তুল্যভাবে সেবনীয়; উভয় ধামই সাধকের সমভাবে কাম্য।

ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ লীলার সহিতই জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। কারণ, নবদ্বীপলীলাতেই জীব ভজনের আদর্শ পাইয়াছে এবং নবদ্বীপলীলার-পরিকরগণই দীক্ষাদিদ্বারা জীবের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গুরুপরম্পরাক্রমে সেই সম্বন্ধ আধুনিক জীবের মধ্যেও নামিয়া আসিয়াছে। এই সম্বন্ধ ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্ব্বপ্রথমেই সাধক তাঁহার গুরুবর্গের আদিরূপে কোনও গৌরপার্ষদের চরণে উপনীত হইতে পারেন; তাঁহার কৃপায় তাঁহারই সঙ্গে গৌরলীলায় নিবিষ্ট হইতে পারিলে ব্রজরস-নিবিষ্টচিত্ত গৌর-পরিকরগণের ভাবের তরঙ্গ সাধককে স্পর্শ করিতে পারে এবং তাঁহাদের কৃপায় তখন ব্রজলীলাও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তাঁরে স্ফুরে।" এইরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দীক্ষা-প্রণালী হইতেও দেখা যায়, নবদ্বীপ-লীলা হইতেই সাধকের ভজন আরম্ভ। বিধিও তাহাই, প্রথমে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন, তারপর সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন। লীলাস্মরণেও প্রথমে নবদ্বীপের সিদ্ধদেহে নবদ্বীপ-লীলার মানসিকী সেবা, তারপর ব্রজের সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার মানসিকী সেবা।

নাম মাহাত্ম্য

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি আদি সমস্ত শাস্ত্রেই নামের অসাধারণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। নামের মাহাত্ম্যের কথা জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, হেলাতেই হউক কি শ্রদ্ধার সহিতই হউক, নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক, কি না রাখিয়াই হউক, এমন কি নামীকে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যেও যদি হয় হউক—যে কোনও ভাবেই হউক, নামের সহিত জিহ্বার স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যাইতে পারে। যে কোনও প্রকারেই হউক, দেহের কোনও অংশের সহিত জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শ হইলেই যেমন সেই অংশ পুড়িয়া যাইবে, তদ্রূপ। ইহা নামের বস্তুগত শক্তি ; তাই স্বীয় ফল-প্রকাশ-বিষয়ে নামগ্রহণকারীর বুদ্ধি বা জ্ঞান, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

নামাভাস। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল টোটাগোপীনাথের অঙ্গনে। প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকেও মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য সেখানে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বান পাইয়া সনাতন আনন্দে আত্মহারা, তিনি দেহানুসন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সমুদ্রপথে তিনি গোপীনাথে গেলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, মধ্যাহ্ন-সময়। প্রখর সূর্য্যকিরণে পথের বালি তাতিয়া আগুনের মত হইয়াছে। সনাতনের পায়ে ফোস্কা হইল, কিন্তু বাহ্যস্মৃতিহীন বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই ; প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখন তিনি টের পাইলেন। পথের প্রতি লক্ষ্য ছিলনা বলিয়া পথের বালির উত্তাপ সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা উত্তাপের বস্তুগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ, নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেহ নাম উচ্চারণ করিলেও নাম তাঁহাকে কৃপা করিবেন—নামের বস্তুগত-শক্তিবশতঃ। তার সাক্ষী অজামিল। অজামিল পাপকার্য্যে সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন—এক দাসীর সঙ্গে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল নারায়ণ। বৃদ্ধকালে অন্তিম-সময়ে যমদূত আসিয়া উপস্থিত, ভয়ে বিহ্বল হইয়া তিনি শিশুটির নাম করিয়া চীৎকার দিতে লাগিলেন। নারায়ণ-নাম তাঁহার জিহ্বাকে স্পর্শ করিল—পথের বালির উত্তাপ যেমন শ্রীপাদ সনাতনের চরণস্পর্শ করিয়াছিল, তদ্রূপ। বাস্তবিক যিনি নারায়ণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি, তাঁহার প্রতি অজামিলের লক্ষ্য নাই—পথের তপ্ত বালির প্রতি যেমন শ্রীপাদ সনাতনের লক্ষ্য ছিল না, তদ্রূপ। তথাপি কিন্তু পুত্রের উপলক্ষ্যে উচ্চারিত নারায়ণ-নামও অজামিলের প্রতি কৃপা করিলেন, তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিলেন—সনাতনের অজ্ঞাতসারেও যেমন বালির উত্তাপ তাঁহার চরণে ফোস্কা জন্মাইল, তদ্রূপ। অজামিলের যে পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অজামিল বুঝিতে পারিলেন তখন, যখন তাঁহার সম্বন্ধে বিষ্ণুদূত ও যমদূতদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলিতেছিল—শ্রীপাদ সনাতন যেমন তাঁহার ফোস্কার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন তখনমাত্র, যখন প্রভু তাহা দেখাইয়া দিলেন। নামের বস্তুগত শক্তি, স্বরূপ-গত শক্তি—নামীর প্রতি অজামিলের লক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও,—তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অজামিলের ন্যায় নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নাম উচ্চারণ করাকে বলে নামাভাস। আভাসটা বাস্তবিক নামের নয়, নাম স্বীয় মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া ঠিক ভাবেই বিরাজিত,—পথিমধ্যস্থ উত্তপ্ত বালির ন্যায় বা প্রচ্ছন্ন জ্বলন্ত কয়লার ন্যায়। আভাস হইতেছে মাত্র লক্ষ্যের—নামীর দিকে লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য রহিয়াছে অন্য দিকে ; তাই আভাস। নাম যে স্বীয় মহিমায় বিরাজিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ফলের দ্বারা।

নাম স্বপ্রকাশ, পরমস্বতন্ত্র। কিন্তু নামের এই স্বরূপগত বা বস্তুগত শক্তির হেতু কি? আগুনের যেমন দাহিকা শক্তি, নামেরও তদ্রূপ সর্ববাভীষ্ট-পূরণী শক্তি, মুক্তি-দায়িনী শক্তি। কিন্তু কেন? বস্তুগত-শক্তির সম্বন্ধে কেন বলা চলে না ; কিন্তু নাম-সম্বন্ধে কেন বলিয়া যেন এক পদ অগ্রসর হওয়া যায় ; তারপর অগ্রগতি বন্ধ।

নাম এবং নামী এই দুই অভিন্ন ; ইহাও স্মৃতি-শ্রুতি সম্মত কথা। নামী—ভগবান্—যেমন চিদানন্দ-স্বরূপ, চৈতন্য রসবিগ্রহ ; নামও তদ্রূপ চিদানন্দস্বরূপ চৈতন্য-রসবিগ্রহ। চিদানন্দ বলিয়া নামীরই মতন নাম স্বপ্রকাশ এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে বা নিজের মহিমাকে প্রকাশ করিতে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—নাম-গ্রহণকারীর চিত্তের অবস্থা, মনের লক্ষ্য, এসমস্তের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। তাই কোনও রকমে একবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নামের স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যায়।

পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নামও পরম স্বতন্ত্র ; তাই স্বীয় ফল প্রকাশের ব্যাপারে নাম কোনও বিধি নিষেধের দেশ কাল পাত্রদশাদির অপেক্ষা রাখে না। "নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ, ভ, বি, ২০৪॥"

নাম সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ॥ ৩।২০।১৩-১৫॥" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন অনন্ত স্বরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার নামও অনন্ত স্বরূপে বিরাজিত। ভগবানের অনন্ত নাম ; যাঁহার যে নামে রুচি হয়, তিনি সেই নামই কীর্ত্তন করিতে পারেন। সকল নামেরই সমান শক্তি। একথা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন। "সর্ব্বার্থ শক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ। সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥ ১১।১৩৪॥ সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ॥ ১১।১৩৮॥—ভগবান্ দেবদের চক্রধারী সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ; অতএব স্বীয় অভিরুচি অনুসারে প্রত্যেকেরই তাঁহার যে নাম ইচ্ছা কীর্ত্তন করা উচিত। পরব্রহ্ম হরির এই নামসকল একার্থবোধক ; সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহার সকল নামই লোকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদান করিয়া থাকে।"

ভগবান্ যে তাঁহার সকল নামে সকল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহাও শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস হইতে জানা যায়। "দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্ব-মেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥ ১১।১৯৭॥" দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে এবং দেবতা সাধু সেবায় এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে যে সমস্ত শুভা পাপহারিণী শক্তি আছে, শ্রীহরি সে সমস্ত শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের নামসমূহে স্থাপন করিয়াছেন।"

বিশেষত্ব। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান-ফলদাতৃত্ব। ইহা হইল নামের সামান্য-মাহাত্ম্য (অর্থাৎ যে মাহাত্ম্য সমানভাবে সকল নামেরই আছে, তাহা)। কোনও কোনও নামের উল্লিখিত সামান্য মাহাত্ম্য তো আছেই, তদতিরিক্ত বিশেষ মাহাত্ম্যও কিছু আছে। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের সচ্চিদানন্দত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্বাদি যেমন সামান্য লক্ষণ, আবার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আধিক্য যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের বিশেষত্ব—তদ্রূপ। দুই পদ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, এক নাসা—এসমস্ত যেমন সকল মানুষের আছে ; সুতরাং ইহারা যেমন সকল মানুষেরই সামান্য লক্ষণ ; তদ্রূপ পুর্ব্বোল্লিখিত শক্তিসমূহও সকল নামেরই আছে, সুতরাং তাহারা হইল সকল নামের সামান্য মাহাত্ম্যসূচক। আবার মানুষের মধ্যে কাহারও কাহারও যেমন গৌরবর্ণাদি, সৌন্দর্য্যাদি, বিদ্যাবত্তাদি বিশেষ লক্ষণ আছে, তদ্রূপ ভগবানের কোনও কোনও নামেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ; তাই পদ্মপুরাণ বলেন—মহাভারতোক্ত বিষ্ণুর সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্র রামনাম উচ্চারণ করিলেও সেই ফল হয়। "রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৭২।৩৩৫॥ এস্থলে রাম নামের একটা বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন—বিষ্ণু সহস্রনাম তিনবার (অর্থাৎ রামনাম তিনবার) পাঠ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ

করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়) "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি। হ, ভ, বি, ১১।২৫৮-ধৃত॥" ইহাতে রামনাম অপেক্ষাও কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব সূচক শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎফলম্॥—শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি যে কোনও নামের—(গোপাল, বনমালী, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি যে কোনও নামের) একবার উচ্চারণ করিলেই (বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার উচ্চারণের ফল পাওয়া যায়)। শ্রীকৃষ্ণনামের এতাদৃশ বিশেষত্বের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি (৬।১৬।৪৪।) শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ বলা হইয়াছে। "শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেম্বপি। কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥ ১১।২৫৭॥—শ্রীশ্রীভগবানের নাম সকলের মাহাত্ম্য সমান হইলেও কৃষ্ণাবতারের (কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নামসমূহের) কোনওরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।"

এই শ্লোকেব টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিন্নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। নম্ন চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বেঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কঞ্চিদ্‌বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্ত্বয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারিত্বেঽপি সাক্ষাদ্‌ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্‌বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি অর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব। পূর্ব্বং বহুবিধকামোপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকাম-সিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নাম-বিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্ অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ॥"—এই টীকার স্থূল-তাৎপর্য্য এইরূপ। "সকল ভগবন্নামের সামান্য মাহাত্ম্যের কথা লিখিয়া কোনও কোনও নামের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা (পুর্ব্বোল্লিখিত রামনামের এবং কৃষ্ণনামের দৃষ্টান্তদ্বারা) দেখান হইতেছে। চিন্তামণির ন্যায় সকল নামের সমান শক্তি থাকিলেও কোনও কোনও নামের কিছু বিশেষত্বও আছে। রামনৃসিংহাদিও ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণও ভগবান, এই হিসাবে তাঁহাদের সমতা আছে. কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষত্বও আছে। শ্রীধরস্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন. বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের উত্তর খণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। যাহারা কামোপহতচিত্ত, তাহাদের বিবিধ বাসনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে নাম বিশেষের মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বফল-সিদ্ধির উপায় স্বরূপ নামবিশেষের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইতেছে।"

শ্রীপাদসনাতনের উক্তি হইতে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া রাম-নৃসিংহাদি অন্য ভগবৎ স্বরূপ হইতে যেমন তাঁহার একটা বিশেষত্ব আছে, অন্য ভগবৎ-স্বরূপের নাম হইতেও তেমনি তাঁহার নামেরও একটা বিশেষ মাহাত্ম্য থাকিবে। ইহাতে আরও মনে হয়, যে নাম বা যে নামসকল যে ভগবৎ-স্বরূপের বাচক, সেই নামের বা সেই নামসকলের মহিমাদি এবং মাধুর্য্যাদিও সেই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমাদির এবং সেই ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত মাধুর্য্যাদির অনুরূপই হইবে, এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে কোনও একস্বরূপের মধ্যে অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে, তাঁহার নামসমূহের মাহাত্ম্যাদির মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য থাকিবে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শক্তির, সমগ্র সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নাম-সমূহেরও সমস্ত বিষয়ে ফলদানের শক্তি থাকিবে এবং তাঁহার নামসমূহের মাধুর্য্যাদিও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-নামসমূহের-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত আলোচনা হইতে আরও বুঝা যায়, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদের নামেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রেমদানের ক্ষমতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামেরই (স্বয়ংভগবানের যে কোনও নামেরই) প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের চরমতম বৈশিষ্ট্য।

ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা উভয়ই স্বয়ংভগবানের লীলা বলিয়া এই দুই লীলাতে তাঁহার যে যে নাম প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্তই স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম। এই সমস্ত নামেরই প্রেমদান-শক্তিত্ব এবং সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য সর্ব্বজন-সম্মত। "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ॥ প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার। অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২—২৪॥ অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥ ১।৮।১৯॥" এই গেল নামের প্রেমদাতৃত্বের প্রমাণ। মাধুর্য্যের প্রমাণও বর্ত্তমান। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃপ্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্, নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ গৌরনাম, অমিয়ধাম, পীরিতি মূরতি গাঁথা॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বার্থদ। গীতা বলেন—স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রণব (৯:১৪)। শ্রুতি বলেন প্রণবকে (সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে বা তাঁহার নামকে) জানিতে পারিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন (কঠ ১।২।১৬) তাঁহাকে জানিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্। কঠ ১।২।১৭।"; পাতঞ্জল দর্শন বলেন "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭।" সুতরাং প্রণবের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই) নাম হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই পাইতে পারেন। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাবের সাধকের নিকটে "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ : ২।৯।১৪১॥ একোহপি সন্ যো বহুধাবিভাতি॥ শ্রুতি॥" তদ্রূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামও স্বীয় একই রূপে (একই শ্রীকৃষ্ণনামেই) বিভিন্ন ভাবের সাধকের বিভিন্ন অভীষ্ট উপস্থিত করিতে পারেন। তাই কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, এসকল বিভিন্ন পন্থার সাধকগণ যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ শ্রীভা, ২।১।১১॥"-শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টাক্ষরেই তাহা বলিয়াছেন (১।১৭।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) কিন্তু কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান মার্গের সাধনে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নামকীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে ; মুখ্য ফল হইতেছে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম। এই প্রেমও যে কৃষ্ণনামের কৃপাতেই পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তৃণাদপি সুনীচ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিত্তে অপরাধ থাকে, সে পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তন করিলেও প্রেম পাওয়া যায়না। যাহাতে অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তদনুকূলভাবে নামকীর্ত্তনের বিধান শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়া গিয়াছেন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (১।১৭।২৩—২৭ পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রভুর বেদান্তবিচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বিচার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ১০২
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৩
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৪
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১০৫
ব্রহ্মশব্দে মুখ্যঅর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১০৬
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্‌বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে "নিরাকার" ॥ ১০৭
চিদানন্দ তেঁহো, তাঁর স্থান পরিবার ॥ তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥ ১০৮
বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥ ১১০
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত-জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১০১
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতাবিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১১২
হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥ ১১৩
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৪
বস্তুত পরিণামবাদ—সেইত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি—' এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১১৬
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮
প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান। ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম ॥ ১২১
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। "তত্ত্বমসি"-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২২
প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন। মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ১২৩
সর্ব্ববেদ সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১২৪
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি ॥ ১২৫
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩১
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥ ১৩২
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৩৩
ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম। সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৩৪
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥ ১৩৮
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৩৯

মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বিচার প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মুখ্য বিষয়গুলি পুর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির অনুরূপই। অতিরিক্ত যাহা আছে, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। 'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥ ১৩৩
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়। সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৩৪
অপাদান-করণাধিকরণ—কারক তিন। ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ ১৩৫
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন। প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ ১৩৬
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন। অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৩৭
'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ। পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৪০
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'। মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ' ॥ ১৪১
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ ১৪২
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়। 'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥ ১৪৩
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ১৫৭
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বর-সনে করহ অভেদ ॥ ১৪৮
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়। জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয় ॥ ১৫৭

ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যসম্বন্ধেই সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর বিচার হইয়াছিল। উদ্ধৃত পয়ারসমূহে যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে সে সে বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইতেছে।

(ক) কোনও শব্দের বা বাক্যের অর্থ করিবার দুইটী প্রণালী আছে—মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি এবং লক্ষণা বা গৌণী-বৃত্তি। কোনও শব্দ বা বাক্য শুনা মাত্রই যে অর্থের প্রতীতি হয়, অথবা কোনও শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত যে অর্থ, তাহাই মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তির অর্থ। এই অর্থে অন্য কোনও যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। আর, যেস্থলে মুখ্যাবৃত্তির সঙ্গতি থাকে না, সে স্থলেই লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত, অন্যত্র নহে। লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির অর্থে যুক্তি বা অন্য প্রমাণের সাহায্য অপরিহার্য্য। (মুখ্যাবৃত্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১।৭।১০৩-পয়ারের এবং লক্ষণাবৃত্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ২।৭।১০৪-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত সূত্রে নিজের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সে সমস্ত সূত্রের এবং সে সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় নিজের মতের সমর্থনার্থ যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিবার সময়ে, মুখ্যাবৃত্তিমূলক অর্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মুখ্যার্থে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা-প্রণালী-সম্বন্ধেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রভু বলেন, শ্রুতি নিজেই নিজের প্রমাণ। শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যতা স্থাপনের জন্য অন্য কোনও যুক্তি বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অন্য যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিতে গেলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতারই হানি হয়। তাই শ্রুতিবাক্যের মুখ্যাবৃত্তির অর্থই গ্রহণীয়; লক্ষণাবৃত্তিতে শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিলে তাহার স্বতঃপ্রমাণতারই হানি হয়। শ্রুতিবাক্যের মুখ্যাবৃত্তির অর্থ আমাদের সাধারণ বুদ্ধির সাধারণবুদ্ধিপ্রসূত যুক্তির অনুমোদিত না হইলেও তাহাই যে স্বীকার করিতে হইবে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭"—এই বেদান্তসূত্রেই স্পষ্ট কথায় তাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতারও

হানি করিয়াছেন এবং শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত স্বাভাবিক অর্থকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। তাই তাঁহার ভাষ্যে বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে তিনি হন—সবিশেষ, সশক্তিক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ আছে। যে স্থলে স্বীয় অভিপ্রেত মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই, সে স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মের শক্তিই তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচ।"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যই বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে, শক্তির ক্রিয়াও আছে এবং এই সমস্ত শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী—আগন্তুক নহে—স্বাভাবিকী বলিয়া—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়, মৃগমদের গন্ধের ন্যায়—তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্যা।

ব্রহ্মের অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মায়াশক্তির বৈভব, অনন্তকোটি জীব তাঁহার তটস্থা-জীবশক্তির বিকাশ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-গুণাদি তাঁহার চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বৈভব।

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।"—এই বেদান্তসূত্র হইতেই জানা যায়, তিনি লীলাময় (সুতরাং সবিশেষ)। তাই তাঁহার লীলা আছে, লীলার পরিকর আছে, লীলার ধাম আছে। এই সমস্তই তাঁহার চিচ্ছক্তির বৈভব।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"-এই বেদান্তসূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অপাদান-করণ-অধিকরণ-কারকত্ব—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি (অপাদান), ব্রহ্মদ্বারা জগৎ বাঁচিয়া আছে (করণ) এবং অন্তিমে ব্রহ্মেই জগতের অবস্থান (অধিকরণ), এই তত্ত্ব—প্রতিপাদন করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব বা সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ (গুণাদিশূন্য) বলিয়াছেন, সত্য। ব্রহ্মে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিসম্ভূত কোনওরূপ প্রাকৃত গুণাদি (প্রাকৃত বিশেষত্ব) যে নাই, তাহা বলাই হইতেছে ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। কিন্তু চিচ্ছক্তিসম্ভূত বহু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহার আছে। তাহার দৃষ্টান্ত এই। শ্রুতি হইতেই জানা যায়, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন (সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তৈত্তিরীয়।২।৬॥) এবং মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন (তদ্ ঐক্ষত)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার মন আছে—নচেৎ ইচ্ছা করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার চক্ষু আছে—নচেৎ দৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তখনও তো প্রাকৃত মন এবং প্রাকৃত চক্ষুর সৃষ্টি হয় নাই; মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরেই প্রাকৃত সৃষ্টি। সুতরাং ব্রহ্মের মন ও নেত্র যে অপ্রাকৃত, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। আবার "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—ব্রহ্মের কর-চরণ নাই, কিন্তু তিনি চলিতে পারেন, ধরিতেও পারেন। চলিতে যখন পারেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার চরণ আছে এবং ধরিতে যখন পারেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কর আছে। অথচ বলা হইল, তাঁহার কর-চরণ নাই। ইহার সমাধান হইল এই যে—তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণ নাই; অপ্রাকৃত কর-চরণাদি আছে। এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে।

অপ্রাকৃত কর-চরণাদিদ্বারা ব্রহ্মের সাকারত্বও এবং তাঁহার আকারেরও অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তিনি চিদ্‌ঘন, জ্ঞানঘন, আনন্দঘনবিগ্রহ।" "আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ।" কিন্তু সাকার হইয়াও তিনি বিভু। (এসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

এসমস্ত প্রমাণবলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান॥ ১।৭।১০৬॥ ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ২।৬।১৩৮॥

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না। শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয় না। নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্যই তাঁহার পরম আগ্রহ। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে জীব-

ব্রহ্মের একত্বও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যেই তিনি "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় নিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রবন্ধে শঙ্কর-মত ও তাহার খণ্ডন দ্রষ্টব্য)। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ব্রহ্মের অসংখ্য "স্বাভাবিকী"—সুতরাং অবিচ্ছেদ্যা—শক্তি আছে, তাঁহার পরাশক্তি (স্বরূপশক্তি) আছে। শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতিবাক্যকে এবং "মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্-ইত্যাদি আরও অনেক শ্রুতিবাক্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের মুখ্যার্থ-সমর্থক এবং সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতিবাক্যকেই উপেক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তি যদি (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায়) আগন্তুক হইত, তাহা হইলেও ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তির বিচ্ছিন্ন হওয়ার—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক এবং নির্ব্বিশেষ হওয়ার—সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী,—তাপ যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব যেমন জলের স্বাভাবিকী শক্তি—তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্যা। ব্রহ্ম হইলেন শক্তিযুক্ত আনন্দ। বিশেষণকে বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্যের—দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়া কেবল অগ্নির, তদ্রূপ শক্তিকে বাদ দিয়া কেবল আনন্দের—একটা আলোচনা করা যায় বটে, কিন্তু সেই আলোচনা এবং আলোচনার বিষয়ীভূত স্বরূপগত-বিশেষণহীন বিশেষ্যও হইবে বাস্তব সত্তাহীন একটা কাল্পনিক ব্যাপারমাত্র। শক্তিহীন ব্রহ্মে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সামর্থ্যও থাকিতে পারেনা। ব্রহ্ম শব্দের অর্থে বৃংহতি এবং বৃংহয়তি এই দুইটী অংশ আছে। এই দুই অংশের অর্থগ্রহণেই ব্রহ্মের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে। শক্তি না মানিলে বৃংহয়তি অংশই বাদ দেওয়া হয়। তাতে ব্রহ্মের পূর্ণতারই হানি হয়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—কেবলমাত্র উপাসনার সুবিধার জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে স্থলবিশেষে সবিশেষ বলা হইয়াছে। সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য নাই, তাহারা ব্রহ্মের তত্ত্ববাচক নহে; তাহাদের মূল্য কেবল ব্যবহারিক। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্যই তিনি দেখান নাই; এরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য নাইও। ইহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত যুক্তি। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"-এই বেদান্তসূত্রকে উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার অত্যাগ্রহে তিনি সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে কাহারও ব্যক্তিগত যুক্তিই শ্রদ্ধেয় হইতে পারেনা।

(বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-৭ পয়ারের টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

(গ) শাস্ত্রে নারায়ণাদি সাকার ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এসমস্ত সাকার ঈশ্বরের বিগ্রহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে; মুখ্যার্থে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সবিশেষ, সাকার। তাঁহার বিগ্রহও চিদ্‌ঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার কর-চরণাদি সমস্তই চিন্ময়। "অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩।২।১৪ ॥"—এই বেদান্তসূত্রও বলেন—ব্রহ্মের বিগ্রহঁ এবং ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন (১।৭।১০৭ পয়ারের টীকায় আদিলীলার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় এই সূত্রের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। অথর্ব্বশিরঃ-শ্রুতিও বলেন—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥"

মায়া হইল ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি—অজ্ঞানরূপা জড়শক্তি। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত তাহার স্পর্শসম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের মায়িক বিগ্রহও থাকিতে পারে না। (১।৭।১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। এই উপাধি দূর হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন আর জীব-ব্রহ্মে কোনও ভেদই থাকে না।

শঙ্করাচার্য্যের এই মতও তাঁহার নিজস্ব-যুক্তি এবং শ্রুতির লক্ষণার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা শ্রুতির মুখ্যার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। মুখ্যার্থে জীব ব্রহ্মের শক্তি, অংশ—সুতরাং ব্রহ্মের নিত্যদাস। জীব ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১১২-১৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ঙ) সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥"—মুখ্যার্থে এই বেদান্তসূত্রও তাহাই সমর্থন করে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম। জগৎ মিথ্যা। প্রভু বলেন—জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। প্রভু বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন এবং বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা ১।৭।১৪-১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(চ) শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-কেই মহাবাক্য বলিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তত্ত্বমসির মহাবাক্যত্ব খণ্ডন করিয়া প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ১।৭।১২২-২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ছ) শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রুতির মুখ্যার্থে দেখাইয়াছেন—সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মত্বের রস-স্বরূপত্বের চরমতম বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা "সম্বন্ধতত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ১।২।১২৪ এবং ১।৭।১৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(জ) শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তাই অভিধেয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রমাণ করিয়াছেন—ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয়তত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা "অভিধেয়তত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ঝ) শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিকেই সাধ্যবস্তু বলিয়াছেন। তাই তাঁহার মতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের স্ফুরণই হইল সাধনের প্রয়োজন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণসেবার একমাত্র উপায় হইল প্রেম। তাই প্রেমই হইল প্রয়োজনতত্ত্ব। বিশেষ আলোচনা প্রয়োজনতত্ত্ব-প্রবন্ধে এবং ১।৭।১৩৬-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব হইল মায়া-কবলিত ব্রহ্ম; মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহাই তাঁহার-মুক্তি। কিন্তু মায়া যদি ব্রহ্মকে কবলিত করার সামর্থ্যই ধারণ করে, তাহা হইলে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, তখনও তো মায়া আবার তাহাকে কবলিত করিতে পারে। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত জীবতত্ত্বের মোক্ষের নিত্যত্ব—সুতরাং মোক্ষত্ব—সন্দেহের অতীত বলিয়া মনে হয় না।

মন্তব্য। মুখ্যাবৃত্তিতে শ্রুতির অর্থ করাই যে সঙ্গত, শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্যই তাহা জানিতেন এবং তাহা যে তিনি মনে মনে স্বীকারও করিতেন, তাঁহার ভাষ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াও মনে হয়। তিনি মুখ্যাবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিয়াছেন এবং এই অর্থ যে শ্রুতির অনুমোদিত, তাহাও দেখাইয়াছেন। বেদান্তসূত্রের এবং সূত্রসমর্থক শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থে,—ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রকৃতি-আদি যে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। বেদান্তের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"—সূত্রের ভাষ্যে তিনিও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। জীবতত্ত্ব-বিষয়ক সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মের অংশই জীব এবং জীবের পরিমাণ অণু। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥" এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মের লীলার কথা এবং আনন্দের প্রেরণায় লীলাস্ফুরণের কথাও স্বীকার করিয়াছেন। নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে তাঁহার—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—এই বাক্যে—তিনি যে মুক্ত-আত্মার পৃথক্ সত্তা, ব্রহ্মের ভগবত্তা, মুক্তপুরুষেরও ভগবদ্‌ভজনের জন্য লোভ এবং প্রেমের পরম-পুরুষার্থতা স্বীকার করিতেন, তাহাও বুঝা যায়। নৃসিংহতাপনীর উল্লিখিত বাক্য হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বকে তিনি পারমার্থিক বলিয়াই মনে করিতেন। নতুবা মুক্তপুরুষের পক্ষে ভগবদ্‌ভজনের কথা বলিতেন না।

তথাপি, কেন যে তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব, সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের ব্যবহারিকত্ব, জীবের ব্রহ্মত্ব, জগদ্ব্যাপারের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। আর, তাঁহার এসকল সিদ্ধান্তকে কেনই বা "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়, তাহাও বিবেচ্য। তাঁহার সম্বন্ধে এই উক্তি যে নিতান্ত সাম্প্রদায়িকতা হইতে প্রসূত নয়, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত রাহুল-সংকৃত্যায়ন তিব্বত হইতে বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপি আনিয়াছেন। একখানা গ্রন্থের নাম "যোগাচারভূমি।" অসঙ্গ-নামক বৌদ্ধদার্শনিক ইহার গ্রন্থকার। শ্রীপাদ শঙ্করের কয়েকশত বৎসর পুর্ব্বে ইহার আবির্ভাব। যাহা হউক, ১৩৪৩ বাঙ্গালা সনের ৩০শে কার্ত্তিকের ইংরেজী দৈনিক-পত্রিকা অমৃতবাজারে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর রাহুল-সংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্য "যোগাচারভূমি"-নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেনই বা শ্রীপাদ-শঙ্কর বৌদ্ধ-দার্শনিক গ্রন্থের সহায়তা নিলেন, তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

শ্রীপাদ শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকা হইতে তাহা জানা যায়। তিনি তাঁহার কারিকায়-বৌদ্ধমতই প্রকটিত করিয়াছেন—কেবল বৌদ্ধদের "শূন্য"-স্থলে "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বসাইয়াছেন। তিনি মনে করিতেন—বৌদ্ধমত শ্রুতি সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্কর মাণ্ডুক্যকারিকায় প্রকটিত তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রুতিবাক্যের সহায়তায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কারিকাপ্রোক্ত অভিমতগুলি শ্রুতিসম্মত। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে বহুস্থলে শ্রুতিবাক্যের বিকৃত অর্থ করিতে হইয়াছে। "শূন্য"-স্থলে "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" ব্যতীত মাণ্ডুক্যকারিকায় প্রকটিত অন্য সমস্ত মতই যে বৌদ্ধমত, গৌড়পাদ তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই। শ্রুতিবাক্যের স্বকপোল-কল্পিত অর্থের অন্তরালে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মতবাদকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়।

কিন্তু কেন তিনি এইরূপ করিলেন? তিনি যখন বৌদ্ধ ভাবাপন্ন গৌড়পাদের সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজেও যে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহারা বেদের প্রভাব হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বেদবাক্যের সহায়তায় তাঁহারা যে তাঁহাদের স্বীকৃত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও অনুমিত হয়। সম্ভবত: পারমার্থিক বিষয়ে বৌদ্ধমতের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত বেদাচারেরও অনুসরণ করিতেন। শ্রীপাদ শঙ্করও হয়তো এইরূপ কোনও ব্রাহ্মণবংশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়ও ছাড়িতে পারেন না, কুলপরম্পরা প্রাপ্ত বৌদ্ধমতও ছাড়িতে পারেন না। তাই বেদের আবরণে বৌদ্ধমত প্রচারের প্রয়াস।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং "শঙ্করেরই—মহাদেবেরই" অবতার। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত ভগবতীর নিকটে মহাদেবের উক্তি—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥" এই উক্তিই—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ভিত্তি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যরূপে মহাদেব এইরূপ করিলেন কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীপাদ শঙ্কর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ইহার নাহিক দোষ, ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ শ্রী চৈঃ চঃ ১।৭।১০৫॥" কি সেই ঈশ্বরাজ্ঞা? তাহাও পদ্মপুরাণ হইতেই জানা যায়। মহাদেবকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" ১।৭।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব ও অদ্বয়-তত্ত্ব

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক অভেদ ; যেমন শঙ্করাচার্য্য। কেহ বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ ; যেমন মধ্বাচার্য্য। গৌতম, কনাদ, জৈমিনী, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতিও ভেদবাদী। আবার, পৌরাণিক ও শৈবগণ এবং ভাস্করাচার্য্যও ভেদাভেদবাদী। (সর্ব্বসম্বাদিনী, ১৪৯ পৃঃ

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য জীব-ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই এবং মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে—তত্ত্বমসি-প্রভৃতি—শ্রুতিবাক্যের লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তিনি বলেন, ব্রহ্ম হইলেন অদ্বয়-তত্ত্ব ; অদ্বয়-তত্ত্ব হইলেন সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য তত্ত্ব। শক্তি স্বীকার করিলেই শক্তির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষা করা চলে না।

যাঁহারা বলেন—কিরূপেই বা ভেদ অস্বীকার করা যায় ? চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি. অনন্ত বৈচিত্রীময় জগৎ তাহাতে আবার অনন্তকোটি জীব এবং এসমস্ত ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন বলিয়া উপনিষদ্-বেদান্তাদিও ঘোষণা করিতেছেন। এসমস্ত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ভেদ কিরূপে অস্বীকার করা যায় ? তাঁহাদের প্রতি শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—যাহাকে তোমরা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলিতেছ, তাহা ভ্রান্তিমাত্র ; কেহ কেহ অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সাপ বলিয়া ভুল করে, বাস্তবিক সেখানে সাপ বলিয়া কোনও জিনিস নাই ; তদ্রূপ, যে জগৎ দেখিতেছ বলিয়া মনে করিতেছ, সেই জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই ; মায়ার প্রভাবে তোমরা ভুল দেখিতেছ। মায়ার প্রভাব ছুটিয়া গেলে দেখিবে, জগৎ বলিয়া কোনও বস্তুই নাই, আছে সেখানে কেবল ব্রহ্ম। আর যে জীবের কথা বলিতেছ, তাহাও ঐরূপই ভ্রান্তি। এই জীব-ভ্রান্তিও মায়ার প্রভাব-জনিত ; মায়ার প্রভাব যখন দুর হইবে, তখন প্রত্যেক জীবই বুঝিতে পারিবে, সে জীব নয়—ব্রহ্ম ; স্বরূপতঃ জীব বলিয়াও কোনও বস্তু নাই। আছেন একমাত্র ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম।

এইরূপে জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া, ইহাদিগকে প্রকৃত-প্রস্তাবে শূন্যত্বের পর্য্যায়ে সরাইয়া দিয়া শ্রীপাদশঙ্কর তাঁহার অদ্বৈততত্ত্ব বা অদ্বয়-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অদ্বয়-তত্ত্ব যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা বলা যায় না। যেহেতু, জীব ও জগৎকে শূন্যত্বের পর্য্যায়ে নেওয়ার জন্য তিনি যে মায়ার প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন, সেই মায়ার কোন সমাধান তিনি করিতে পারেন নাই। যদিও শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়াছেন—মায়া ব্রহ্মের শক্তি, শঙ্করাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন নাই ; করিতে গেলে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলাও চলে না এবং তিনি যে ভাবে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, সেইভাবে অদ্বয়ত্ব স্থাপন করাও চলে না, আবার মায়াকে স্বীকার না করিলেও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা চলে না। কিন্তু মায়া কি—তাহা তিনি বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—মায়া সৎও নয়, অসৎও নয় ; অর্থাৎ মায়া আছে একথাও বলা চলে না (বলিলে দ্বিতীয় তত্ত্ব একটী স্বীকার করিতে হয়, অথবা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিতে হয়), নাই—একথাও বলা চলে না (বলিলে মায়ার প্রভাবে জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মিথ্যা হইয়া যায়)। মায়া অনির্ব্বাচ্য—ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু যাহা বাচ্য, তাহা যেমন একটা বস্তু, যাহা অনির্ব্বাচ্য, তাহাও তেমনি একটা বস্তু। মায়াকে স্বীকার করিয়া তিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত একটি বস্তুই স্বীকার করিলেন। এই মায়াকে তিনি অজ্ঞান বলিয়াছেন ; আর ব্রহ্ম তো জ্ঞানস্বরূপ আছেনই ; সুতরাং মায়া হইল ব্রহ্মের বিজাতীয় বস্তু। ব্রহ্মাতিরিক্ত এই মায়াকে স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তিনি ব্রহ্মের একটা বিজাতীয়-ভেদই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-ভেদশূন্য অদ্বয়-তত্ত্ব আর হইতে পারেন না।

আবার, এই ভাবে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের অন্ততঃ দুইটী শক্তি স্বীকার করিতে হয়—অস্তিত্ব রক্ষার শক্তি এবং ব্রহ্মত্ব (অর্থাৎ সর্ব্ববৃহত্তা এবং সর্ব্বব্যাপকতা) রক্ষার শক্তি। অন্ততঃ অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি নাই—এমন কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় না; এমন কোনও বস্তুর সত্তাও থাকিতে পারে না। শক্তিহীন বস্তু হইবে—ভাব-বস্তু নয়; পরন্তু—অভাব-বস্তু, শূন্য। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিয়া শ্রীপাদশঙ্কর যে কেবল জীব ও জগৎকেই শূন্যের পর্য্যায়ে নিয়া গিয়াছেন, তাহাই নয়; ব্রহ্মকেও তিনি শূন্যের পর্য্যায়ে নিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এজন্যই বলা হয়—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলা যায় না। শক্তি স্বীকারপূর্ব্বক কিরূপে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা দেখাইয়াছেন। এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যাহা হউক, এই গেল ঐকান্তিক অভেদবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের কথা। ভেদবাদী শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বলেন—জীব এবং ব্রহ্ম হইল দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব, দুইটী পৃথক্ বস্তু। তবে ব্রহ্ম যেমন চিদ্বস্তু, জীবও তেমনি চিদ্বস্তু; এই হিসাবে জীব হইল ব্রহ্মের সমজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপনের জন্য মধ্বাচার্য্য ব্যস্ত নহেন; তাই ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ স্বীকারে তাঁহার আপত্তি নাই। জীব এবং ব্রহ্মের চিদংশে সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিয়া তিনি জীব-ব্রহ্মের অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করিয়াছেন।

যাহা হউক, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে—শঙ্করাচার্য্যের আত্যন্তিক অভেদও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না, এবং মধ্বাচার্য্যের আত্যন্তিক ভেদও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারাও অদ্বয়-বাদী। "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই (১।২।১১)-শ্লোকই তাঁহাদের উপজীব্য। এই শ্লোকে পরতত্ত্ব-বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তাঁহারাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলেন। "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্—তিনি তাঁর রূপ॥ ১।২।৫৩॥" কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বয়-তত্ত্ব এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের অদ্বয়-তত্ত্ব ঠিক একরূপ নহে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও এক রকমের অদ্বয়বাদী; তাঁহার মতকে বলা হয়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কিন্তু তাঁহার অদ্বয়বাদ এবং গৌড়ীয়দের অদ্বয়-বাদও ঠিক একরূপ নহে। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—চিৎ এবং অচিৎ নামে স্বরূপাতিরিক্ত দুইটী বস্তু আছে। চিৎ হইল জীব এবং অচিৎ হইল মায়া। রামানুজের মতে এই দুইটী হইল—স্বরূপের অতিরিক্ত, কিন্তু স্বরূপের আশ্রিত—দুইটী পৃথক্ বস্তু। তিনি বলেন—এই দুইটী বস্তুবিশিষ্ট যে স্বরূপ, তিনিই ঈশ্বর। যাহার শিখা আছে, তাহাকে শিখী বলা হয়—শিখী অর্থে শিখাবিশিষ্ট বস্তু। কিন্তু তাহার শিখা যদি কাটিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে তখন আর তাহাকে শিখী—বা শিখাবিশিষ্ট বস্তু—বলা চলে না। তদ্রূপ স্বরূপে যদি চিৎ ও অচিৎ না থাকে, স্বরূপ যদি চিদচিদ্-বিশিষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ঈশ্বর বলা চলিবে না; তিনি হইবেন তখন কেবল স্বরূপ। রামানুজ বলেন—এইরূপ কেবলমাত্র স্বরূপের কথা—চিদচিৎ-বিরহিত কেবল স্বরূপের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না; চিদচিদ্-বিশিষ্ট স্বরূপের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এবং এই চিদচিদ্-বিশিষ্ট স্বরূপই ঈশ্বর। তাঁহার সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বৈলক্ষণ্য হইল এই যে, রামানুজ বলেন—চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (মায়া) স্বরূপাশ্রিত দুইটী পৃথক্ বস্তু; আর গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলেন—চিৎ এবং অচিৎ হইল স্বরূপের শক্তি, সুতরাং স্বরূপাতিরিক্ত নয়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—ব্রহ্মের কেবলমাত্র আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর তাঁহার শক্তিসমূহ হইল আনন্দের বিশেষণ; এসমস্ত শক্তিরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট আনন্দই হইলেন ভগবান্। "আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ঃ বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবান্ ইতি আয়াতম্॥—উল্লিখিত শ্রী, ভা, ১।২।১১-শ্লোক টীকা।" বিশিষ্টত্বের তাৎপর্য্যের দিক দিয়া শ্রীপাদ রামানুজের সঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীর বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়ের পার্থক্য দৃষ্ট হয় মুখ্যতঃ এ কয়টী বিষয়ে। প্রথমতঃ রামানুজ বলেন—চিৎ এবং অচিৎ এই

দুইটী হইল পৃথক্ বস্তু। শ্রীজীবের মতে তাঁহারা উভয়েই যখন শক্তি, তখন তাঁহাদিগকে দুইটী পৃথক্ বস্তু বলা সঙ্গত হয় না; শক্তিরূপে তাঁহারা একই। কঙ্কণ এবং বলয়—উভয়েই স্বরূপতঃ স্বর্ণ বলিয়া একই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীজীবের মত অত্যন্ত ব্যাপক; সমস্ত শক্তিই তাঁহার মতে ব্রহ্মের বিশেষণ। আর রামানুজের মতে কেবল জীব এবং জগৎ হইল তাঁহার বিশেষণ। তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ রামানুজ শক্তি এবং শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন। "শ্রীরামানুজীয়াস্তু শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৭ পৃঃ।" কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শক্তি ও শক্তিমানের কেবল ভেদ স্বীকার করেন না। চতুর্থতঃ, রামানুজ ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করেন; তাঁহার মতে চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (মায়া) ব্রহ্মের স্বগতভেদ। শ্রীজীব ব্রহ্মের কোনওরূপ ভেদই স্বীকার করেন না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভেদবাদী নহেন, অভেদবাদীও নহেন। তাঁহারা হইলেন ভেদাভেদবাদী। কিন্তু তাঁহাদের ভেদাভেদবাদ গৌতম-কণাদাদির ভেদাভেদবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক।

ইতঃপূর্ব্বে জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেস্থলে ভেদাভেদের দুইটী হেতু দেখান হইয়াছে—প্রথমতঃ জীব হইল ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম হইলেন জীবের অংশী; অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান্ বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতে ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয়; এই পরস্পর-বিরোধী বাক্যসমূহের সমন্বয় স্থাপন করিতে হইলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অংশ ও অংশীর মধ্যে কেন ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং শ্রুতিতে জীবব্রহ্ম-সম্বন্ধে কেনই বা ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কোনও কারণ অনুসন্ধান করা হয় নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের ভেদাভেদবাদ যে ব্যাপকতম ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিকায় দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে—যে কারণে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, ঠিক সেই কারণেই শ্রুতিতে পরস্পর-বিরোধী ভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। উভয়ের হেতুই এক এবং অভিন্ন। তাই বৈষ্ণবদের ভেদাভেদবাদ অধিকতর ব্যাপক। বিশেষতঃ এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ কেবল জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেই নহে; পরন্তু ব্রহ্ম এবং অপর সমস্ত বস্তুর মধ্যেই অবস্থিত। তাই এই ভেদাভেদ-বাদটী ব্যাপকতম এবং ইহাদ্বারা সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইতে পারে। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণবদের এই ভেদাভেদবাদকে বলা হয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। এই তত্ত্বটীই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যত্বের উপরেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের এই শক্তি-স্বীকৃতি শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—স্বরূপ শক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। স্বরূপ শক্তির কথা পাওয়া যায় শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" এই উক্তির পরা শব্দই এই শক্তির চিৎ স্বরূপত্ব এবং স্বরূপে অবস্থিতত্ব সূচনা করিতেছে। মায়াশক্তির কথা পাওয়া যায় সর্ব্বোপনিষৎ সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪॥ দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ ৭।১৪॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১০॥" অন্য উপনিষদেও ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ।" জীবশক্তির কথা গীতাতে দৃষ্ট হয়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫॥" বিষ্ণুপুরাণে তিনটী প্রধান শক্তিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা-কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৬।৭।৬১॥"

এই সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিকী, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্যা; ব্রহ্মের মধ্যে বা ব্রহ্মের সংস্রবে নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগন্তুক নহে। বস্তুতঃ

সাময়িকভাবে যে শক্তি অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সেই বস্তুর শক্তিও বলা হয় না। অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের মধ্যে সাময়িকভাবে আগন্তুক দাহিকা-শক্তি থাকে; তাহাকে লৌহের দাহিকা-শক্তি বলা হয় না। দাহিকা-শক্তির আশ্রয় (বা শক্তিমান্) হইল অগ্নি; কারণ, অগ্নির সঙ্গেই তাহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্যত্বই শক্তিমানের শক্তির পরিচায়ক। ইহা কেবল ব্রহ্ম এবং তাহার শক্তি সম্বন্ধে নহে; যে কোনও বস্তুর সঙ্গেই তাহার শক্তির এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী দুইটী বস্তুর দৃষ্টান্তদ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের এই অবিচ্ছেদ্যত্বটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ। ১।৪।৮৪॥"—কস্তুরীর গন্ধকে যেমন কস্তুরী হইতে পৃথক করা যায় না, দাহিকা-শক্তি বা উত্তাপকে যেমন অগ্নি হইতে পৃথক করা যায় না, তদ্রূপ শক্তিকেও শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করা যায় না। শত চেষ্টাতেও অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা-শক্তিকে পৃথক করা যায় না। কোনও কোনও স্থলে অগ্নি-স্তম্ভনের কথা শুনা যায়; অগ্নিতে নাকি মহৌষধ-বিশেষ প্রক্ষিপ্ত করিলে অগ্নির ঔজ্জ্বল্যাদি সমস্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দাহিকা-শক্তি প্রকাশ পায় না; সেই আগুনে তখন হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় না। অগ্নির দাহিকা শক্তিটী মহৌষধের প্রভাবে যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং দাহিকা-শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, পৃথক্‌ভাবেই নষ্ট হইয়াছে—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হইবে না। মহৌষধের প্রভাবে দাহিকা শক্তিটী স্তম্ভিত হয়, প্রকাশ পাইতে পারে না, সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়া শক্তি এবং শক্তিমান্—এই উভয়ে মিলিয়াই এক বস্তু। বস্তুটী হইল বিশেষ্য, তার শক্তি হইল তার বিশেষণ। বিশেষ্য এবং বিশেষণ মিলিয়াই হইল বস্তুটী। ব্রহ্মের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। ব্রহ্ম হইলেন শক্তিমান্ আনন্দ। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই হইল বস্তু।

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন—বিশেষ্য এবং বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে যদি বিশেষ্য হইতে—অর্থাৎ শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে পৃথকই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্‌ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা প্রয়োজন কি? কেবল বস্তু বলিলেই তো চলিতে পারে? "বস্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্‌ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। বস্তেববাস্তু—কা তত্র শক্তির্নাম। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৬ পৃঃ।" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—"ইতি মতন্তু ন বেদান্তিনাং মতম্; সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদি দর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৬ পৃঃ॥—ইহা বেদান্তীদের মত নহে; মন্ত্রাদির প্রভাবে কোনও বস্তুর শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু বস্তুটী থাকে। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত হইলেও অগ্নি থাকে; সুতরাং শক্তির (যেমন অগ্নির বেলায় দাহিক-শক্তির) পৃথক নাম না থাকা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। অগ্নি-স্তম্ভনের ব্যাপারে দেখা গেল, শক্তির অনুভবের অভাব হইলেও শক্তিমানের অনুভব হয়; হাত না পুড়িলেও আগুন দেখা যায়। সুতরাং অগ্নি এবং তাহার দাহিকা-শক্তিকে পৃথক নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক, পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদই বর্ত্তমান, না কি অভেদই বর্ত্তমান।

কস্তুরীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। কস্তুরীর গন্ধকে যখন কস্তুরী হইতে পৃথক করা যায় না, তখন মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন কোনও ভেদ নাই। কিন্তু এই অভেদ-সিদ্ধান্ত করিতে গেলেও এক সমস্যা দেখা দেয়, যাহাতে অভেদ-সিদ্ধান্ত করা যায় না। ব্যাপারটী এই। যেখানে কস্তুরী দেখা যায় না, কস্তুরী হয়তো একটু সামান্য দূরদেশে অলক্ষিত ভাবে আছে, সেখানেও কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হয়। ঘরের মধ্যে এক সাজি সুগন্ধি মল্লিকা ফুল থাকিলে ঘরের বাহিরেও তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। এইরূপে, কস্তুরীর বহির্দ্দেশেও যখন কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হয়, তখন তাহারা একেবারে অভিন্ন, তাহা মনে করা চলে না।

আবার কস্তুরীর বহির্দ্দেশে গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া কস্তুরী এবং তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ আছে—ইহাও মনে করা যায় না ; এইরূপ মনে করিতে গেলেও আর এক সমস্যা উপস্থিত হয়। কস্তুরী এবং তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ আছে মনে করিতে গেলে, উভয়কে দুইটী পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করিতে হয়—যেমন জলের অম্লজান ও উদকজান। পৃথক মনে করিলে, জলের অম্লজান এবং উদকজানের মত. কস্তুরী এবং তাহার গন্ধকেও সগন্ধ-কস্তুরীর দুইটী উপাদান বলিয়া মনে করিতে হয়। উপাদান বলিয়া মনে করিলে, গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তাহাতে কস্তুরীর ওজন কমে না। সুতরাং কস্তুরী এবং তাহার গন্ধকে দুইটী পৃথক বস্তুও মনে করা যায় না, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে ভেদ-মননও সম্ভব নয়।

এইরূপে দেখা গেল, কস্তুরী এবং তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ-মনন যেমন দুষ্কর, আবার কেবল ভেদ মননও তেমনি দুষ্কর। অথচ, ভেদ আছে বলিয়াও যেমন মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও তেমনি মনে হয়।

এবিষয়ে শ্রীজীবও উক্তরূপ দুষ্করত্বের কথাই বলেন। তিনি বলেন—শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। তাই শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ এবং অভেদই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। "তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৬-৩৭পৃঃ।"

শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ চিন্তা করা কেন অসম্ভব, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন।

কেবল অভেদ মননে যে দোষ জন্মে, সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকের (৬৮৭ শ্লোকের) উক্তির আলোচনা করিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। এই শ্লোকে মৈত্রেয় পরাশরকে বলিয়াছেন—"গুরুদেব, আপনার নিকটে আমি ঈশ্বরের চতুর্ব্বিধ রূপের কথা অবগত হইলাম ; সেই চতুর্ব্বিধ রূপ হইতেছে এই—পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ এবং লীলামূর্ত্তি। ইত্যাদি।" এস্থলে চতুর্ব্বিধরূপে পরতত্ত্ব-বস্তুর স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। শক্তির প্রভাবেই পরতত্ত্ব-বস্তুর এই চতুর্ব্বিধ বৈচিত্র্য। শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন মনে করা হয়; তাহা হইলে উক্ত চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যেও আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত চতুর্ব্বিধ রূপ যে একার্থবোধক তাহাই মনে করিতে হইবে। তাহাই যদি মনে করিতে হয়, তাহাহইলে একার্থবোধক চারিটী শব্দ-প্রয়োগের কোনও সার্থকতা থাকেনা ; পুনরুক্তি-দোষ আসিয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে পুনরুক্তি-দোষ স্বীকার করা যায় না।

ইহার পরে তিনি শ্রুতিবাক্যেরও আলোচনা করিয়াছেন। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম ॥ বৃ, আ, ৩৯।২৮ ॥—ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দ।" বিজ্ঞান-শব্দে জড়-বিরোধিত্ব এবং আনন্দ-শব্দে দুঃখ-বিরোধিত্ব বুঝায়। শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মবস্তু হইলেন বিজ্ঞান (জড়বিরোধী—অজড়, চিন্ময়) এবং আনন্দ বা সুখ (দুঃখ-বিরোধী—তাঁহাতে দুঃখের ছায়াও নাই) এই দুইটী তাঁহার গুণ বা ধর্ম্ম—স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় উদ্ভূত। শক্তি ও শক্তিমানের আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে গেলে এই দুইটী শব্দের ব্যঞ্জনাতেও আত্যন্তিক অভেদ—অর্থাৎ এই দুইটী শব্দকেও সম্যকরূপে একার্থবোধক—মনে করিতে হয়। তাহাতে পুনরুক্তি-দোষ অনিবার্য্য। কিন্তু শ্রুতিতে এইরূপ পুনরুক্তি-দোষ স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানে অত্যন্ত অভেদ আছে মনে করিতে গেলে অপরিহার্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীজীব বলেন, কেবল ভেদ স্বীকার করিলেও অপরিহার্য্য দোষ দেখা দেয়। এস্থলেও তিনি পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যকের "বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম"-বাক্য নিয়া বিচার করিয়াছেন। এস্থলে বিজ্ঞান এবং আনন্দকে সম্যকরূপে অভিন্ন মনে করিলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার সম্যকরূপে ভিন্নার্থ-সূচক মনে করিলেও ব্রহ্মে স্বগত-ভেদ স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু তাহাও দোষের, যেহেতু ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্ববিধ ভেদরহিত

অদ্বয়তত্ত্ব। "কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দৌ একার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা? নাদ্যঃ—পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেব ইতি তাদৃশস্বগতভেদাপত্তিঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৮ পৃঃ॥"

শ্রীজীবগোস্বামী ভেদ এবং অভেদ সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। শেষকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ আছে মনে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা দেয়, আবার কেবল অভেদ মনে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা দেয়। তর্কের দ্বারাও নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, অভেদ সাধন করাও তেমনি দুষ্কর। এজন্য কেহ কেহ, ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতাপ্রযুক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন। "অপরেতু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্দ্ধার্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুম্ অশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯ পৃঃ॥"

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কেবল অভেদ-মনন করিতে গেলেও এক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। আবার কেবল ভেদ-মনন করিতে গেলেও এক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহারও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। তাই, বাধ্য হইয়া ভেদ এবং অভেদ এই উভয়ের যুগপৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির মূলে, সমস্যা-সমাধানের অসামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোনও যুক্তি নাই। এই অবস্থায় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা এবং সঙ্গত কিনা?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ॥ ১।৩।২॥—সমস্ত ভাববস্তুরই শক্তিসমূহ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর।" যে জ্ঞান কোনও যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই হইল অচিন্ত্য-জ্ঞান। ইহাকে অর্থাপত্তি-জ্ঞানও বলে। মিশ্রী মিষ্ট; কিন্তু কেন মিষ্ট? যবক্ষার তিক্ত; কিন্তু কেন তিক্ত? বিষ খাইলে মানুষ মরে, দুধ খাইলে মরে না; কিন্তু কেন? এসমস্ত কেনর কোনও উত্তর নাই, এসকল সমস্যার কোনও সমাধান নাই। কিন্তু উত্তর নাই বা সমাধান নাই বলিয়া—অর্থাৎ মিশ্রী কেন মিষ্ট, যবক্ষার কেন তিক্ত, বিষ খাইলে কেন মানুষ মরে, দুধ খাইলে কেন মরে না, কোনওরূপ যুক্তিতর্কদ্বারা এসমস্ত প্রমাণ করা যায় না বলিয়া—মিশ্রীর মিষ্টত্ব, যবক্ষারের তিক্তত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ, মিশ্রীর মিষ্টত্বের জ্ঞান, যবক্ষারের তিক্তত্বের জ্ঞান—এসমস্ত জ্ঞানকেই বলা হয়, অচিন্ত্য-জ্ঞান বা অর্থাপত্তিজ্ঞান। মিষ্টত্ব হইল মিশ্রীর শক্তি, তিক্তত্ব হইল যবক্ষারের শক্তি। তাই মিশ্রী আদির শক্তির জ্ঞান হইল অচিন্ত্য-জ্ঞান। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—সমস্ত বস্তুর শক্তির জ্ঞানই অচিন্ত্য—অচিন্ত্য-জ্ঞানের-অন্তর্ভুক্ত, অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর। আগুনের যে উত্তাপ আছে, কস্তুরীর যে গন্ধ আছে—আমরা ইহা কেবল জানিয়া রাখিতে পারি, প্রমাণ করিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানও বস্তুর এই জাতীয় শক্তির হেতু নির্ণয় করিতে পারে না, বস্তুর ধর্ম্ম বা শক্তি আবিস্কারমাত্র করিতে পারে; কোন্ বস্তু বিষরূপে মারাত্মক, তাহা বলিতে পারে; কিং কেন তাহা মারাত্মক, তাহা বলিতে পারে না। অম্লজান এবং উদকজান মিলিয়া জল হয়, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে; কিন্তু কেন হয় তাহা বলিতে পারে না। দুই ভাগ উদকজান এবং একভাগ অম্লজান মিশাইলে জল হয়; কিন্তু অম্লজান ও উদকজান সমপরিমাণে মিশিয়া জল উৎপাদন করিতে পারে না—বিজ্ঞান-তাহা বলিতে পারে; কিন্তু কেন এরূপ হয় বা হয় না; তাহা বলিতে পারে না; কিন্তু কারণ বলিতে পারে না বলিয়া—যাহা হয় বা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহাকে অস্বীকার করার উপায় নাই; বিজ্ঞান তাহা অস্বীকার করেও না। এইভাবে যাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহাই অচিন্ত্য-জ্ঞান।

শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপই অচিন্ত্য-ব্যাপার। ভেদ এবং অভেদ—এই উভয়ের যুগপৎ-বিদ্যমানতা দেখা যাইতেছে, সুতরাং স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; অথচ কোনওরূপ

যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাই শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধটী হইল অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ যে শ্রীজীবগোস্বামীরও নিজস্ব মত, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "স্বমতে তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯পৃঃ॥" "অচিন্ত্য"-শব্দে তিনি যে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের অচিন্ত্য শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ"-ইত্যাদি ১১।৩।৩৭-শ্লোকের টীকা হইতেই জানা যায়। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"লোকে সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈঃ চিন্তয়িতুম-শক্যাঃ কেবলম্ অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ। —অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুতেই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ভিন্নরূপে বা অভিন্নরূপে চিন্তা করার দুষ্করতাই অচিন্ত্যতা। ইহা কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচর।" সর্ব্বসম্বাদিনীতেও তিনি উক্ত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ, পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৫৯ পৃঃ॥" ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির মধ্যেও যে ঐরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহাই শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব এস্থলে বলিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত—উভয় রাজ্যেই ইহার ব্যাপ্তি আছে, উভয় রাজ্যের শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

জীব, মায়া, কাল, এবং কর্ম্ম এ সমস্ত হইতে ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তির যোগে জগতের সৃষ্টি। জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্ম—এসমস্তই ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং এই জগৎও ব্রহ্মের শক্তি।

জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে—জীব ব্রহ্মের শক্তি।

সমস্ত ভগবদ্ধাম হইল ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির বিলাস, সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি।

সমস্ত লীলাপরিকরও ব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তরূপ, তাই তাঁহারাও স্বরূপ শক্তি।

তাহা হইলে বুঝা গেল, এই পরিদৃশ্যমান্ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া জীব, ভগদ্ধাম এবং লীলা-পরিকরাদি সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এসমস্তের সঙ্গে—কেবলমাত্র জীবের সঙ্গে নহে, পরন্তু সমস্তের সঙ্গেই—ব্রহ্মের হইল অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

প্রশ্ন হইতে পারে, জগদাদি কি ব্রহ্মের কেবলই শক্তি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যত্ব থাকিল কোথায়? আর অবিচ্ছেদ্যত্ব না থাকিলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিরূপে?

উত্তরে বলা যায়, জগদাদি শক্তিমদ্ বিরহিত কেবল শক্তি নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। ১১।২২।৭॥"—ইত্যাদি শ্লোকপ্রমাণ বলে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শক্তি এবং শক্তিমান্—এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ স্বীকার করিয়াছেন! (পরমাত্মসন্দর্ভ। ৩৪)। তদনুসারে জানা যায়—ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি, এবং জীবশক্তি এই তিনটি শক্তির প্রত্যেকটির সঙ্গেই ব্রহ্মের পরস্পরানুপ্রবেশ আছে। তাই সর্ব্বত্রই শক্তি এবং শক্তিমান্ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত।

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ। শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫॥ এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।৩১॥" অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ॥ গীতা, ১০।৪২॥"-ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানা যায়। "এতদীশনমীশস্য

প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৯॥"-ইত্যাদি প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম মায়াদ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন।

জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে—জীবশক্তিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের অংশই জীব।

আর ব্রহ্মের আনন্দ এবং স্বরূপশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট বস্তুর বিকাশই অনন্ত ভগবদ্ধাম, লীলা-পরিকর, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ সিদ্ধলোক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং কারণার্ণব।

ভগবানের অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাদিও তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি—সুতরাং স্বরূপতঃ তৎসমস্তও শক্তি।

এইরূপে দেখাগেল, পরিদৃশ্যমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্ত বস্তুর সঙ্গেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। তাই বলা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের এই তত্ত্বটী অত্যন্ত ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক তত্ত্বের কথা আর কেহই বলেন নাই। এই তত্ত্বের আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সকল শ্রুতি-বাক্যের প্রতিই সমান মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা দেখান হয় নাই, জীব-জগদাদি সত্যবস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই, ব্রহ্মের শক্তি অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মকেও শূন্যত্বের পর্য্যায়ে নেওয়া হয় নাই, মায়ারও স্মৃতি-শ্রুতিবিহিত সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়, মুখ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যানে অবৈধ ভাবে লক্ষণার আশ্রয়ও নিতে হয় না।

জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যগুলির অতি সুন্দর সমন্বয়ও এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব হইতে পাওয়া যায়। জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া, ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যে ভেদদৃষ্টির প্রাধান্য এবং অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যে অভেদদৃষ্টির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। আর, জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলিয়া (জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) অংশ-অংশী জ্ঞানে জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ বলা হইয়াছে।

অদ্বয়-তত্ত্ব। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? শক্তি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করিতে হয়, ভেদ স্বীকার করিলেই আর অদ্বয়ত্ব থাকে না। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

প্রথমে বিবেচনা করা যাউক, ভেদ কাহাকে বলে। একটা শর্করা-পিণ্ডের উপরি অংশে কোনওস্থলে যদি একটা চিহ্ন দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই চিহ্নিত অংশকে সমগ্র পিণ্ড হইতে ভিন্ন বলা হয় না, যেহেতু, ইহা শর্করা-পিণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত এবং শর্করাপিণ্ডের অপেক্ষা রাখে—শর্করা-পিণ্ড আছে বলিয়াই চিহ্নিত-অংশের অস্তিত্ব, শর্করা-পিণ্ডটী না থাকিলে তাহার অস্তিত্ব থাকেনা। চিহ্নিত অংশটী অন্যনিরপেক্ষ নহে বলিয়া, ইহা শর্করা-পিণ্ডের অপেক্ষা রাখে বলিয়া শর্করা-পিণ্ড হইতে ভিন্ন নয়, ইহার সহিত শর্করা-পিণ্ডের ভেদ নাই। তদ্রূপ, বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির সহিতও বৃক্ষের ভেদ নাই; যেহেতু শাখা-পত্রাদি বৃক্ষের অপেক্ষা রাখে। এইরূপে দেখা গেল, যাহা কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে, তাহাকে সেই বস্তুর ভেদ বলা হয় না।

আবার একটী আমগাছ ও একখানা মটরগাড়ী; ইহাদের ভেদ সর্ব্বজন-বিদিত। ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ। গাড়ী না থাকিলেও গাছটী বাঁচিতে পারে, গাছটী না থাকিলেও গাড়ীখানা টিকিয়া থাকিতে পারে। এই দুইটী বস্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ভেদ।

এইরূপে দেখা গেল—যে দুইটী বস্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ, তাহাদের মধ্যেই ভেদ বর্ত্তমান, তাহাদের একটীকেই অপরটীর ভেদ বলা যায়। কিন্তু যে বস্তুটী অন্য একটী বস্তুর অপেক্ষা রাখে, তাহাকে সেই বস্তুর ভেদ বলা হয় না, ভেদ বলা যায়ও না।

তাহা হইলে, জগদাদি যত কিছু আছে, তাহারা যদি ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ হয়, নিজেদের অস্তিত্বাদি কোনও বিষয়েই যদি তাহারা ব্রহ্মের অপেক্ষা না রাখে—তাহা হইলেই তাহাদিগকে ব্রহ্মের ভেদ বলা চলে। যদি তাহারা

তাহাদের উৎপত্তি-স্থিতি-আদি-বিষয়ে ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্ম না থাকিলে তাহাদের উৎপত্তি-স্থিতি-আদি যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রহ্মের ভেদ বলা চলিবে না।

যাহা অন্য বস্তুর কোনও অপেক্ষা রাখে না, নিজের শক্তিতেই নিজের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা করিতে পারে, তাহাকেই অন্যনিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ বলে (আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে। তত্ত্বসন্দর্ভ-৫১-টীকায় বলদেববিদ্যাভূষণ)। ব্রহ্ম হইলেন স্বয়ংসিদ্ধ বা সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ বস্তু। ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও বস্তু যদি থাকে, যাহা নিজের উৎপত্তি-আদির জন্য ব্রহ্মের কোনও অপেক্ষা রাখে না, তবে তাহা হইবে স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু এবং তাহা হইবে ব্রহ্মের ভেদ।

ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। একই বৃক্ষজাতীয় দুইটী গাছ, যেমন আমগাছ এবং কাঁঠালগাছ; ইহারা একই বৃক্ষজাতীয়, সুতরাং সমজাতীয় বা সজাতীয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে, আমগাছ কাঁঠালগাছ নয়, কাঁঠালগাছও আমগাছ নয়। তাই ইহাদের মধ্যে সজাতীয় ভেদ বর্ত্তমান। এইরূপে মানুষ এবং স্বর্ণের মধ্যে বিজাতীয় ভেদ বর্ত্তমান।

শ্রীজীব বলেন—ব্রহ্মের স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদও নাই এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদও নাই। "অদ্বয়ঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ॥ তত্ত্বসন্দর্ভ। ৫১॥"

ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌বস্তু। জীবও চিদ্‌বস্তু; ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকর এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ—ইঁহারাও চিদ্‌বস্তু। সুতরাং মনে হইতে পারে, ইঁহারা ব্রহ্মের সজাতীয় (একই চিৎ-জাতীয়) ভেদ; কিন্তু ইঁহারা কেহই স্বয়ংসিদ্ধ নহেন; ইঁহারা নিজেদের অস্তিত্বাদির জন্য সকলেই ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন; ব্রহ্ম হইতেই ইঁহাদের উৎপত্তি, ব্রহ্মের অভাবে ইঁহাদের অস্তিত্বই অসম্ভব। যেহেতু, জীব হইল জীবশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ এবং ধাম-পরিকর-ভগবৎস্বরূপাদি হইল স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ। ইঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম হইলেন সজাতীয় ভেদশূন্য।

দুঃখসঙ্কুল জড় মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, চিদ্‌বিরোধী। সুতরাং মনে হইতে পারে, মায়িক ব্রহ্মাণ্ড চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ; কিন্তু তাহা নয়; যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নহে; ব্রহ্মাণ্ড হইল মায়াশক্তিযুত ব্রহ্মের পরিণতি। মায়া হইল ব্রহ্মেরই শক্তি। সুতরাং ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নাই।

"তৎস্বরূপবস্তন্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ। ন চাব্যক্তগতজাড্যদুঃখাদ্যাভৈর্বিজাতীয়ো ভেদঃ অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ। সর্ব্বসংবাদিনী ৫৬ পৃঃ।"

ব্রহ্মের স্বগতভেদও নাই। স্বগত অর্থ নিজের মধ্যে। স্বগত-ভেদ বলিতে আভ্যন্তরীণ ভেদ বুঝায়। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদানভেদে তাহার মধ্যেই স্বগত-ভেদ থাকিতে পারে। যেমন দালানের ইট, চুণ, লোহা, কাঠ ইত্যাদি, এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত ভেদ। আবার উপাদানের বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে। পরস্পরের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যানুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হইবে; শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভিন্ন অভিব্যক্তির হেতুও দালানের স্বগত ভেদ। ব্রহ্মে এরূপ কোনও ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌ঘন বা আনন্দঘন বস্তু। ব্রহ্মে চিৎ বা আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই; ব্রহ্মে একই চিদ্‌বস্তু বা আনন্দবস্তু একই ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত। উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ব্রহ্মের যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের জড়দেহ ক্ষিতি অপ, তেজ-আদি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত; এই পঞ্চভূতের পরিমাণও দেহের সর্ব্বত্র সমান নহে; চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী বলিয়া চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই; কর্ণে মরুতের ভাগ বেশী বলিয়া কর্ণের শ্রবণশক্তি আছে, কিন্তু দর্শনশক্তি নাই। ইত্যাদি। এসমস্ত হইল জীবদেহের স্বগতভেদ। চিদেকরূপ ব্রহ্মবস্তুতে বিভিন্ন

উপাদান নাই বলিয়া এ জাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে না। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি।—তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে।" ইহা তাঁহার স্বগতভেদহীনতার পরিচায়ক।

একটী চিনির পুতুল; তাহার হাত, পা, নাক, কান-ইত্যাদি আছে; সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে পুতুলটীর স্বগতভেদ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই একরূপ মিষ্টত্ব বিরাজিত, একই উপাদান; সুতরাং বস্তুতঃ স্বগত-ভেদ নাই॥ ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপাদনেই ভেদ বুঝাইতে পারে। পুতুলের সর্ব্বত্রই একই ক্রিয়া—মিষ্টত্ব। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মসংহিতাবাক্য হইতেও জানা যায়, ব্রহ্মেরও সর্ব্বত্রই ক্রিয়াসাম্য। সুতরাং স্বগতভেদ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। ইহা হইল ব্রহ্মের স্বগতভেদহীনতার একটা দিক। আরও বিবেচনার বিষয় আছে।

এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মের তো অনেক রূপের কথা শুনা যায়। তাঁহার যদি অনেক রূপ থাকে, তাহার স্বরূপভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে বেদান্তের "ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমেতদ্ বচনাৎ॥ ৩।২।১২॥"-সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম এইরূপ। "এতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্. অনন্তরম্ অবাহ্যম্ আত্মা সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনমিতি বৃহদারণ্যকে সর্ব্বেষাং রূপাণামৈক্যোক্তেরিত্যর্থঃ। —এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর. অবাহ্য, আত্মা, ব্যাপক এবং সর্ব্বানুভূতিস্বরূপ—বৃহদারণ্যক-শ্রুতির এই বাক্যে অনন্তপ্রকাশে (বহুরূপেও) ব্রহ্মের এক ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব বেদান্তের পরবর্ত্তী সূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "অপি চৈবমেকে॥ ৩।২।১৩॥"—এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—কোনও কোনও বেদশাখাধ্যায়ী বলেন, ব্রহ্ম অমাত্র এবং অনন্তমাত্র; তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অভিন্ন এবং অনন্তরূপ। অমাত্র অর্থ—স্বাংশভেদশূন্য; আর অনেকমাত্র অর্থ—অসংখ্য-স্বাংশবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অংশের ভেদ নাই, সংখ্যাও নাই। (কথাগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়; সমাধান এই)। স্মৃতি বলেন—একই পরমেশ্বর বিষ্ণু যে সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাহাতে সংশয় নাই। তিনি এক হইয়াও স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। (একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি—শ্রুতি)। বৈদূর্য্যমণি যেমন দ্রষ্টাভেদে বহু রূপে প্রতিভাত হয়, অভিনয়কারী নট যেমন অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াও নিজে একই স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ধ্যানভেদে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইলেও স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করেন না। (একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ॥ ২।৯।১৪১॥)।

উক্ত বেদান্তসূত্রের মর্ম্ম হইতে জানা গেল, ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াও তাঁহার একরূপতা ত্যাগ করেন না। বহুরূপেই তিনি একরূপ। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ (শ্রীভা)। ব্রহ্ম কখনও একরূপতা ত্যাগ করেন না বলিয়াই তাঁহাতে স্বগতভেদের অভাব সূচিত হইতেছে।

শ্রীজীব উক্ত আলোচনার উপসংহারে বলিয়াছেন—অন্যবস্তুর প্রবেশদ্বারা তাঁহার একরূপতা কখনও নষ্ট হয় না বলিয়া তাঁহাতে স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। স্বর্ণ যখন কুণ্ডলরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাতে স্বগত-ভেদ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পাবে; কিন্তু তাহাতে অন্য বস্তু প্রবেশ করে না বলিয়া, স্বর্ণ অবিকৃতভাবে স্বর্ণই থাকিয়া যায় বলিয়া স্বগত-ভেদ জন্মিয়াছে বলা যায় না। "তদেবং স্বগতভেদে সুপরিহার্য্যে স্বর্ণরত্নাদি-ঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তর প্রবেশেনৈব স প্রতিসেধ্যত ইতি স্থিতম্। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৫৬ পৃঃ।" এই দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, ব্রহ্মে কোনও সময়েই চিদ্ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর প্রবেশ অসম্ভব বলিয়াই ব্রহ্মকে তিনি স্বগত-ভেদশূন্য বলিতেছেন।

এ বিষয়ে একটু নিবেদন আছে। ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপের একত্ব রক্ষা করিয়াও যে সকল বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন, সে সমস্ত বিভিন্ন রূপকেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বলা হয়। এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের যে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, পরব্রহ্মই এ সমস্ত রূপে প্রতিভাত হন, অথবা স্বীয় বিগ্রহেই এ সমস্ত রূপ প্রকটিত করেন, একথা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন। "একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ॥" "একোঽপি সন্ যো

বহুধাবিভাতি ॥”—এই শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলেন এবং উপরি-উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র হইতেও তাহাই জানা যায়। তথাপি কিন্তু এসমস্ত রূপকে—স্বয়ংসিদ্ধ পৃথকরূপ মনে না করিলেও—অনেকে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক রূপ মনে করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিশ্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণরূপই মনে করেন নাই; তাই তাঁহার চির-পরিচিত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তিনি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। দেবকী-বসুদেব কংস-কারাগারে প্রথমে শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ এবং পরে দ্বিভুজ নরশিশুবৎ রূপ দেখিয়াছিলেন; এই দুই রূপকেও তাঁহারা একেরই দুইটি পৃথক রূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিমাই-পণ্ডিত-দেহেও নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মহেশ, আদি বিভিন্ন রূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারাও এসমস্ত রূপকে মহাপ্রভুরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এইরূপে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে যাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এসমস্ত রূপকে শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদই মনে করেন, কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদ মনে করেন না; তাই তাঁহারা ব্রহ্মের সজাতীয়-ভেদ নহেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আর যাঁহারা এসমস্ত রূপকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করেন না, এসমস্ত রূপ যে ব্রহ্মেরই বিভিন্ন বৈচিত্রী বা ধর্ম্ম তাহা বোধ হয় তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহা হইলে স্বগতভেদও অস্বীকার করা যায় না—যেমন বৃক্ষ ও তাহার পত্রাদি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—“বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম”-এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত “বিজ্ঞান” এবং “আনন্দ” শব্দ দুইটীকে ভিন্নার্থবোধক মনে করিলে, শ্রীজীবের মতে স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হয়। একই স্বরূপের বিভিন্ন রূপকেও তাহা হইলে স্বগত-ভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ব্রহ্মের অনন্ত-কল্যাণগুণ-সম্বন্ধেও একথাই বলা চলে। তাহা হইলে ইহার সমাধান কি? শ্রীজীব কেন তবে ব্রহ্মকে স্বগতভেদশূন্য বলিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আরও কয়েকটী বিষয় আলোচনা করা দরকার। সেই বিষয়গুলি এই।

শক্তি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করিতে হয়! ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক শক্তির কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; জীব এবং জগৎ-আদি বিবিধ ভেদের কথাও দৃষ্ট হয়। তথাপি শ্রুতি আবার “একমেবাদ্বিতীয়ম্”—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকে অদ্বয় বা ভেদরহিত বলিলেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে, জীব-জগৎ-আদি দৃশ্যমান ভেদ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্ম অদ্বয়-তত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত। ইহা কিরূপে হয়? “স্বয়ংসিদ্ধ”-শব্দ দ্বারা শ্রীজীব ইহার সমাধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্বয়ংসিদ্ধত্ব না থাকিলে যে কোনও বস্তুকে ভেদ বলা যায় না ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শ্রীজীব বলেন, জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক সজাতীয় ভেদ নহে; যেহেতু জীব স্বয়ংসিদ্ধ বা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে। এইরূপে জগৎও স্বয়ংসিদ্ধ বা ব্রহ্ম নিরপেক্ষ নহে বলিয়া ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ নহে। শ্রীজীব এই সব বস্তুর স্বয়ংসিদ্ধত্বের অভাব দেখাইয়া এইভাবে ব্রহ্মের সজাতীয়-ভেদরাহিত্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এখন স্বগত-ভেদ সম্বন্ধে। “একোঽপি সন্ যো বহুধাবিভাতি” এবং “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।”-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মের স্বগত-ভেদের কথা প্রকাশ করিয়াও কেন আবার তাঁহাকে অদ্বয়-তত্ত্ব বলিলেন? ইহাতেও বুঝা যায়, এরূপ স্বগতভেদ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্ম অদ্বয়-তত্ত্ব—ইহাই যেন শ্রুতির অভিপ্রায়। পূর্ব্বোল্লিখিত ৩।১।১২ এবং ৩।১।১৩ এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ের যে অর্থ দেখান হইয়াছে, তাহাতেও এতাদৃশ স্বগতভেদই প্রতিপন্ন হয়; অথচ শ্রীজীবও ব্রহ্মের স্বগতভেদহীনতা-প্রকরণে এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এইরূপ স্বগতভেদসত্ত্বেও যে ব্রহ্ম স্বগত ভেদহীন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত স্বর্ণরত্নাদিঘটিত (স্বর্ণরচিত বা রত্নরচিত) কুণ্ডলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। স্বর্ণ বা রত্ন কুণ্ডলাকারে যখন পরিণত হইয়াছে, তখন একটা ভেদ অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে; যেহেতু, কুণ্ডলের আকারাদি স্বর্ণের বা রত্নের পূর্ব্বাকার নহে। কিন্তু এই নূতন আকারে বা রূপে অন্য বস্তু প্রবেশ করে নাই, ইহাতে পূর্ব্বের স্বর্ণ বা রত্ন ব্যতীত অন্য কিছু নাই—অর্থাৎ স্বর্ণনিরপেক্ষ বা রত্ননিরপেক্ষ কোনও বস্তু কুণ্ডলে নাই। কুণ্ডলের নূতন আকার স্বর্ণের (বা রত্নের) উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ইহা স্বর্ণেরই (বা রত্নেরই) একটা রূপ; ইহা একমাত্র স্বর্ণেরই (বা রত্নেরই) অপেক্ষা রাখে, অন্য কোনও বস্তুর

অপেক্ষা রাখেনা এবং স্বর্ণের (বা রত্নের) অপেক্ষা না রাখিলেও ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কুণ্ডলের আকার স্বর্ণনিরপেক্ষ (বা রত্ননিরপেক্ষ) নয়, স্বয়ংসিদ্ধ নয় ; তাই কুণ্ডলাকারে স্বর্ণের (বা রত্নের) স্বগতভেদ স্বীকার্য্য নয়। তদ্রূপ ব্রহ্মের যে সকল বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ, কিম্বা তাঁহার যে সকল কল্যাণগুণাদি, তাহারা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া এবং তাহাদের বিকাশে ব্রহ্ম বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সহায়তা নাই বলিয়া—অর্থাৎ তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহে বলিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে ব্রহ্মের স্বগতভেদ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক স্বগতভেদ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"—এই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকেই এই অদ্বয়-তত্ত্বের তিনটী স্বগতভেদের কথা জানা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। কিন্তু ইহাদের কেহই সেই অদ্বয়-তত্ত্ব-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা স্বগতভেদ নহেন।

এইরূপে, আমাদের মনে হয়, সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদের ন্যায় স্বগতভেদের বিচারেও শ্রীজীবগোস্বামী স্বয়ংসিদ্ধত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তাহাতেই তিনি সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; অথচ কোনও শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাতেই তাঁহাকে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয় নাই, ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষাও প্রদর্শন করিতে হয় নাই।

তাহা হইলে শ্রীজীবের মতে—ব্রহ্ম হইলেন স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদশূন্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ-স্বগতভেদশূন্য। তাই ব্রহ্ম হইলেন অদ্বয়-তত্ত্ব।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত ত্রিবিধ ভেদহীনতা দেখাইয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার পন্থা অন্যরকম। তিনি ব্রহ্মের শক্তিই অস্বীকার করিয়াছেন ; শক্তি অস্বীকার করিলে কোনওরূপ ভেদের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু শক্তি অস্বীকারের জন্য তিনি শ্রুতিবাক্যসমূহের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই ; এজন্য তাঁহাকে ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া বহু শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, দৃশ্যমান্ জগদাদির মিথ্যাত্বও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য মুখ্যাবৃত্তির সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে অনেক শ্রুতিবাকের অর্থ করিতে হইয়াছে।

কেবল শ্রুতিবাক্য দ্বারা নয়, যুক্তিদ্বারাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন, ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। যে সমস্ত যুক্তিদ্বারা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে সমস্ত যুক্তিতেই যে তিনি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীব তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে তাহা দেখাইয়াছেন। একটীমাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে দেখান হইতেছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেও জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহার বিবর্ত্তবাদ বা ভ্রমবাদ। শ্রীজীব বলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত ভ্রমের পটভূমিকায় আছে রজ্জু বা শুক্তি, আর আছে অজ্ঞান। কিন্তু ভ্রমের কর্ত্তা কে? রজ্জুর বা শুক্তির শক্তির কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়া অজ্ঞান যদি কেবল নিজের শক্তিতেই ভ্রম জন্মাইতে পারিত, তাহা হইলে বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে যে কোনও বস্তুতেই যে কোনও বস্তুর ভ্রম জন্মাইতে পারিত—শুক্তিতেও সর্পের ভ্রম এবং রজ্জুতেও রজতের ভ্রম জন্মাইতে পারিত। কিন্তু তাহা পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়, এই ভ্রম পটভূমিকাস্থানীয়-বস্তু-নিরপেক্ষ নহে। বৃষ্টির জলে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম বীজ-নিরপেক্ষ নহে ; যে কোনও বীজ হইতেই যে কোনও গাছের অঙ্কুর জন্মে না—ধানের বীজ হইতেছে আমগাছের অঙ্কুর হয় না। প্রত্যেক বীজের মধ্যেই একটা বিশেষ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা বিশেষ বীজ হইতে বিশেষ-গাছেরই অঙ্কুর জন্মিতে পারে, অন্য গাছের অঙ্কুর জন্মিতে পারেনা। তদ্রূপ, রজ্জুর মধ্যেও এমন একটা শক্তি আছে, যাহা কেবল সর্পের ভ্রমই জন্মাইতে পারে, রজতের ভ্রম জন্মাইতে পারেনা, শুক্তির মধ্যেও একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহা কেবল রজতের ভ্রমই জন্মাইতে পারে। অজ্ঞান এই বিশেষ শক্তিবিকাশের হেতুমাত্রই হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মেও জগদ্-ভ্রান্তি জন্মাইবার

অনুকূল শক্তি আছে, নচেৎ ব্রহ্মের পটভূমিকায় অজ্ঞান জগতের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিত না। এইরূপে দেখা গেল, শুক্তি-রজ্জুর দৃষ্টান্তেও শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

বস্তুতঃ, ব্রহ্মকে আনন্দ বা আনন্দময় বলাতেই তাঁহার শক্তি স্বীকার করা হইতেছে। শক্তিহীন আনন্দের কোনও অর্থই নাই। আনন্দের সঙ্গেই সক্রিয়তা, গতিশীলতা, লোভনীয়তা অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। লৌকিক জগতেও দেখা যায় ছোট শিশু আনন্দের উচ্ছ্বাসে, হাসে, নাচে, গায়, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করে। আনন্দের পরিমাণ যত বেশী, আনন্দ-চঞ্চলতাও তত বেশী। প্রাকৃত জগতে বিশুদ্ধ আনন্দ নাই, আনন্দের আভাসমাত্র আছে; তাহারই এত প্রভাব। ব্রহ্মে, বিশুদ্ধ, পূর্ণ এবং চেতন আনন্দ; এই আনন্দের প্রভাবও অনির্ব্বচনীয়। এই আনন্দের প্রভাবেই ব্রহ্মের পরিপূর্ণ আনন্দ-চঞ্চলতা, অপরিসীম আনন্দের উচ্ছ্বাস। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্রে বেদান্তও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি আনন্দস্বরূপ বা আনন্দময়, তিনি কখনও নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সৎস্বরূপতা, চিদ্রূপতা এবং আনন্দরূপতা—সমস্তই উচ্ছ্বাসময়। তাঁহার সৎস্বরূপতা কেবল তাঁহার স্বীয় স্বরূপের সত্তাতেই সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার সত্তার অধিষ্ঠানে অন্য সমস্তের সত্তাতেই তাহার ব্যাপ্তি আছে। তাঁহার চিদ্রূপতাও কেবল তাঁহার স্বরূপেই—তাঁহার স্বীয় জ্ঞানের মধ্যেই-সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্বের আশ্রয়ে অন্যান্য সমস্তের জ্ঞানেই ইহার ব্যাপ্তি। তাঁহার আনন্দরূপতাও কেবল তাঁহার স্বীয় স্বরূপেই পর্য্যবসিত নয়, তাঁহার স্বরূপের আশ্রয়ে অন্য সমস্তের মধ্যেও ইহার ব্যাপ্তি। এইরূপেই সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিন্যাত্মিকা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সার্থকতা। ব্রহ্মের এই আনন্দচাঞ্চল্য তাঁহার অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে; ইহা তাঁহার পূর্ণতারই অভিব্যক্তি। দুগ্ধদ্বারা পরিপূর্ণ কটাহের দুগ্ধই উত্তাপে উচ্ছলিত হইয়া কটাহের বাহিরেও পড়িয়া যায়। ব্রহ্মের পরিপূর্ণ আনন্দই স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার স্বরূপের বহির্দ্দেশেও ব্যাপ্ত হয় এবং অন্য সকলের মধ্যেও অনুরূপ উচ্ছ্বাস জন্মায়। আনন্দের উচ্ছ্বাসেই ব্রহ্ম রসস্বরূপ, আনন্দের উচ্ছ্বাস না থাকিলে তাঁহার রসত্বও সিদ্ধ হইত না, লোভনীয়তাও থাকিত না, সুতরাং উপাস্যত্বও সিদ্ধ হইত না। যেখানে রস, সেখানেই বহু থাকিবে। আস্বাদ্য এবং আস্বাদক না থাকিলে রসত্বের সার্থকতা থাকে না এবং বহু না থাকিলে রসোচ্ছ্বাসেরও সার্থকতা থাকে না। আনন্দোচ্ছ্বাসের—রসোচ্ছ্বাসের—প্রেরণায় তিনি এক হইয়াও বহু এবং এই বহুর মধ্যেই তাঁহার সৎ-রূপতার, চিদ্রূপতার এবং আনন্দরূপতার উচ্ছ্বাসময়ী ব্যাপ্তি। একই আনন্দ-তত্ত্ব তাঁহার স্বরূপশক্তির প্রভাবে সর্ব্বাতিশায়ী উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে বহু ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোনও ভেদেই কিন্তু তত্ত্বান্তরের প্রবেশ নাই, তত্ত্বান্তর বলিয়াও কোথাও কিছু নাই। তাঁহার এক ভেদে অবশ্য তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসের ন্যূনতম অভিব্যক্তি—তাঁহার অব্যক্ত-শক্তিক রূপে, যাহাকে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। তাঁহার এই রূপকে আপেক্ষিকভাবে নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় বলা যায়। কিন্তু এইরূপেও তত্ত্বান্তরের প্রবেশ নাই। তাই বহুভেদেও তিনি এক, অভিন্ন, অদ্বয়-তত্ত্ব; তাহাই বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব দেখাইয়াছেন।

আচার

সদাচার ও অসদাচার। আচারের দুইটী অঙ্গ ; একটী গ্রহণাত্মক ও অপরটী বর্জ্জনাত্মক। কতকগুলি আচার গ্রহণ করিতে হয়, আর কতকগুলি আচার বর্জ্জন করিতে হয়। যেগুলি গ্রহণ করিতে হয়, সেগুলিকে সদাচার বা সু-আচার বলে ; আর যেগুলিকে বর্জ্জন করিতে হয়, সেগুলিকে অসদাচার বা কু-আচার বলে। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সু-আচার বা কু-আচার স্থির করা হয়। যে আচার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল, তাহা সু-আচার ; আর যাহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল, তাহা কু-আচার। তাই, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিভিন্নতাবশতঃ আচারেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসাই যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন কুপথ্য-ত্যাগ এবং সুপথ্য-গ্রহণ করিতে হয়। চিকিৎসা-সম্বন্ধে সুপথ্য-গ্রহণই সু-আচার। আবার সান্নিপাত-রোগে ডাবের জল কুপথ্য, কিন্তু ওলাওঠা রোগে তাহা সুপথ্য।

সামান্য সদাচার। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে - সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই কতকগুলি বিধি ও নিষেধ আছে। যেমন সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে, নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে ইত্যাদি বিধি; আর কখনও মিথ্যকথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরস্ত্রী-গমন করিবে না ইত্যাদি নিষেধ। এই সকল বিধি ও নিষেধ সাধারণ—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধকেরই পালনীয়। আবার যাহারা কোনও সাধনমার্গের অনুসরণ করে না, তাহাদের পক্ষেও এই সকল সাধারণ বিধি-নিষেধ পালনীয় ; কারণ, যিনি সাধন-ভজন করেন, তিনিও মানুষ, আর যিনি সাধন-ভজন করেন না, তিনিও মানুষ। ঐ সকল সাধারণ বিধি-নিষেধ মানুষের জন্য—যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বিধি-নিষেধ পালন করিতেই হইবে ; নচেৎ তাঁহাকে-সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হইবে।

বিশেষ সদাচার। আবার জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য কতকগুলি বিশেষ-বিধি ও বিশেষ-নিষেধ আছে ; সাধারণ বিধি-নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই এই বিধি-নিষেধগুলিও পালন করিতে হয়। যেমন, তুলসীর সম্মান করিবে—ইহা হিন্দুর বিশেষ-বিধি ; মুসলমান বা খৃষ্টানের শাস্ত্রে ইহা অবশ্য-পালনীয়-বিধি নহে। গোমাংস-ভক্ষণ হিন্দুর বিশেষ-নিষেধ। মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে।

বৈষ্ণবের পালনীয় সদাচার। কৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার। বৈষ্ণবকেও মনুষ্য-সমাজে বাসের উপযোগী সামান্য-সদাচার এবং তাঁহার সাধন-ভজনের অনুকূল বিশেষ-সদাচার বা বৈষ্ণবাচার পালন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাচার-পালন ভক্তি-পোষণের নিমিত্ত। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান এবং তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যই বিশেষ-সদাচার বা বৈষ্ণবাচার। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই সকল বিধির রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই সকল নিষেধের রাজা। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির অনুকূল আচরণগুলিই বৈষ্ণবের অবশ্য পালনীয় বিধি এবং শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির প্রতিকূল আচরণগুলিই তাঁহার অবশ্য বর্জ্জনীয় নিষেধ। শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই মুখ্য সদাচার। কৃষ্ণ-স্মৃতিহীন সদাচার প্রাণহীন-দেহের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি-প্রণয়ের উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে সামান্য-সদাচার এবং বৈষ্ণবাচার—উভয় বিষয়-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন ; তদনুসারে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উভয়বিধ সদাচারই উল্লিখিত হইয়াছে।

অসৎ-সঙ্গ। বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এই সব ত্যজি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥ মধ্য ২২।"

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিবে। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু বা অসৎ ; কৃষ্ণের অভক্ত বা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী আর এক অসাধু। ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আসক্তিও অসৎ-সঙ্গ—তাহাও ত্যাগ করিবে। অন্য সমস্ত

বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে জীবের মোহ ও সংসারবন্ধন জন্মে; যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ ব্যক্তিদিগের সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য - সমস্তই বিনষ্ট হয়।

স্ত্রীসঙ্গ-অর্থ। বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সঙ্গ-শব্দের অর্থ কি? সন্‌জ্ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন। সন্‌জ ধাতুর অর্থ আসক্তি; সুতরাং সঙ্গ-শব্দের অর্থও আসক্তি। স্ত্রীলোকে আসক্তি পরিত্যাজ্য এবং স্ত্রীলোকে আসক্ত লোকের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩১।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি * * *।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি সঙ্গমাসক্তিং * * * ন কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। টীকার "স্বীয়াস্বপি—স্বীয়াসু অপি" অংশের "অপি" শব্দের তৎপর্য্য এই যে, পরকীয়া স্ত্রীর সঙ্গ তো দূরের কথা, স্বকীয়া স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩১।৪০ শ্লোক হইতে বুঝা যায়, যিনি ভজন-সাধন করিতে ইচ্ছুক, স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। "যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যা চ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয়-নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি, সাপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্থ ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিমতী বা উন্মাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রী সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যাজ্যা ইতি ব্যঞ্জিতম্॥" উক্ত টীকানুযায়ী শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ:—স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়াবিশেষ; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্ত্রীলোকের সংস্রবে যাওয়াই সঙ্গত নয়। স্বামীকে বিরক্ত, নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপন পুর্ব্বক কেবল সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়া মনে করিবে—তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্ত্রীত্বাচ্ছাদিত নিজ মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদরোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে না—সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিবে।"

স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-সঙ্গ। কেবল পুরুষ-বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধেই এই উপদেশ নহে; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। উপরে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"মা! পুরুষ স্ত্রীসঙ্গবশতঃ অন্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সে-ও পুরুষতুল্য-আচরণকারিণী আমার মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই আমার মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ-সুখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যুতুল্য; তেমনি পতি, পুত্র, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জণীয়।"

স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষে এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকে আসক্তি বর্জ্জন বৈষ্ণবের একটী আচার। ভক্তমাল গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন, অনেক যে দুঃখতে মিলয়। দেহ গেহ পুত্রদার, বিষয়-বাসনা আর, সর্ব্ব-আশা যদি তেয়াগয়।" স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশের কঠোরতা এবং লঙ্ঘনে তাঁহার শাসনের তীব্রতা ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনেই অভিব্যক্ত।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগের কথাও বলা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—ইহকালের বা পরকালের সুখ-সম্পদ—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধক বস্তু; সুতরাং ইহা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-মূলক; ভুক্তি-বাসনা যে পর্য্যন্ত চিত্তে জাগরূক থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভক্তির উন্মেষ অসম্ভব। তাই বলা হইয়াছে, ভক্তিকামী

ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্মকেও ত্যাগ করিবেন ; কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগেরও একটা অধিকার-বিচার আছে। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা কর্ম্ম করিতে হইবে। নচেৎ সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ শ্রীভা ১১।২০।৯ ॥"

দুঃসঙ্গ। স্থূল কথা এই যে—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই যাহার উদ্দেশ্য, তাহা ত্যাগ করিবে ; যেহেতু, তাহা ভক্তি-বিরোধী। যাহা কৃষ্ণভক্তির বিরোধী, তাহা হৃদয়ে পোষণ করাই প্রকৃত দুঃসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। চৈঃ চঃ মধ্য ২৪ ॥" কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনার সঙ্গই দুঃসঙ্গ—তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

কৃষ্ণের আচরণ অনুকরণীয় নহে। আরও একটী কথা। বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্তের আচরণের অনুকরণই কর্ত্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে। "বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রানাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ১২ ॥" এই শ্লোকের টীকায় বিশেষ বিচার পূর্ব্বক শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভক্তদের মধ্যেও সিদ্ধ-ভক্তের আচরণ অনুকরণীয় নহে ; কারণ, তাঁহাদের আচরণ অনেক সময় আবেশাদি বশতঃ কৃষ্ণবৎ হয় ; সাধক-ভক্তের আচরণও অনুকরণীয় নহে ; কারণ, সাধকদের মধ্যেও অনেক দুরাচার থাকেন। ভক্তের যে সমস্ত আচরণ ভক্তি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, সেই সমস্ত আচরণই অনুকরণীয়। ১।৪।৪ শ্লোকের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচারেব স্বরূপ-লক্ষণ হইল সাধন-ভক্তির অঙ্গ ; ভক্তির উন্মেষণ তাহার তটস্থ-লক্ষণ। আর বর্জ্জনাত্মক বৈষ্ণবাচারের স্বরূপ-লক্ষণ হইল কৃষ্ণ-কামনা বা কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা ; আর ইহার তটস্থ লক্ষণ হইল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। কোন্‌টী সদাচার, আর কোন্‌টী অসদাচার—উক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে হইবে।

ভক্তিরস

রস। ভক্তিরস-শব্দের মধ্যে রস-শব্দের অর্থ আস্বাদ্য বস্তু—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। কিন্তু কেবল আস্বাদ্য বস্তু মাত্রকেই রসশাস্ত্রে রস বলা হয় না। কোনও একটী আস্বাদ্য-বস্তুও যদি অনুকূল অন্য কতকগুলি বস্তুর সংযোগে পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে আস্বাদ্য হইয়া উঠে এবং তখন তাহার আস্বাদনে যদি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে, তাহা হইলেই বলা হয়, উক্ত বস্তুটি অনুকূল-বস্তুগুলির যোগে রসরূপে পরিণত হইয়াছে।

চমৎকারিতা। চমৎকারিতা কাহাকে বলে? আমরা যদি অনেকগুলি সুন্দর বস্তু দেখি, তাহাদের মধ্যে কোনও একটী বস্তুর সৌন্দর্য্য যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অদৃষ্টপূর্ব্ব হয়, তাহা হইলে তাহার দর্শনজনিত আনন্দে চিত্তের এমনই একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা জন্মে, যাহার ফলে চক্ষুর্দ্বয় আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন বিস্ফারিত হইয়া উঠে; চিত্তের আনন্দজনিত যে অবস্থার দরুণ চক্ষুর এই স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই চমৎকারিতা বলা যায়। বস্তুতঃ আনন্দজনিত চিত্তের স্ফারতাই চক্ষুতে অভিব্যক্ত হয়। তাহা হইলে বুঝা গেল, কোনও এক অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় সুখের অনুভবে চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাই চমৎকারিতা।

কতকগুলি অনুকূল বস্তুর সংযোগে কোনও বস্তুর আস্বাদনে যদি এমন একটী আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে, যাহার ফলে সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হয়, অন্য সমস্ত ব্যাপারেই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যদি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাময় সুখকে রস বলে। "বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৫ ॥"

রসের সার। চমৎকারিতাই রসের সার—চমৎকারিতা না থাকিলে রস, রস বলিয়াই পরিগণিত হয় না। সর্ব্বত্রই চমৎকারিতা সাররূপে পরিগণিত হওয়ায় সকল রসই অদ্ভুত হইয়া থাকে। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতোরসঃ॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৭॥"

দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু—ইহার নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা হয়; তাহা হইলে তাহার স্বাদ্যাধিক্য জন্মে; তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধ্যাদি বশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়।

এইরূপে, অন্য বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ, ভক্তিও অন্যবস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

ভক্তি স্বতঃই আস্বাদ্য। কিরূপে রসে পরিণত হয়। ভক্তি স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং ভক্তির নিজেরও একটা স্বাদ আছে; আনন্দস্বরূপ বলিয়া ভক্তি নিজেই আনন্দদান করিতে পারে এবং জীব বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও – আনন্দ-স্বরূপা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ, জাতিতে ও স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি, এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকেই ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতির এবং স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যাভিচারী ভাব মিলিত হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই

কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে। "রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্। কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ-গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥—ভ, র, সি, ২।১।৬-৭।" অনুভব-পথ-গত কৃষ্ণাদি-বিভাবদ্বারা আনন্দরূপা রতি রস্যতা লাভ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী শ্লোকে বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। "অথাস্যাঃ কেশব-রতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।১।১-২॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দুইটী ঐ শ্লোকেরই অনুবাদতুল্য :—প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব রস হয়, মিলি এই চারি॥ মধ্য ২৩।" স্থূলার্থ এই যে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যাভিচারীভাব, এই চারিটী সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণভক্তি বা স্থায়ীভাব রসরূপে পরিণত হয়। এস্থলে পাঁচটী নূতন কথা পাওয়া গেল—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাব ; আর স্থায়ীভাব। প্রথমোক্তটী চারিটী বস্তুর মিলনে শেষোক্তটী রসে পরিণত হয়। কিন্তু এই পাঁচটী বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে বিষয়টী বুঝা যাইবে না ; তাই এস্থানে এই পাঁচটী বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বিভাব। "বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ। ভ, র, ২।১।৬।" যাহা দ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই রকম, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন ; আর ভক্তগণেই ঐ ভক্তি থাকে ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণই আশ্রয়ালম্বন। যাহা দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে উদ্দীপন-বিভাব ; আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ-ভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। এজন্য ঐ সকলকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। ময়ূর-পুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি হয়, তবে ময়ূর-পুচ্ছই উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব। যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে, উদ্ভাস্বরও বলে। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥ ভ, র, সি, ২।২।১॥" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে নৃত্য, বিলুণ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি), গান, উচ্চরব, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কাদি—এসমস্তই অনুভাব কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে এই সমস্ত অনুভাব সকল সময়ে আপনা-আপনিই প্রকটিত হয় না ; ভক্ত ইচ্ছা করিলে এসমস্তকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারেন।

সাত্ত্বিকভাব। সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অথবা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এইসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব-সমূহকে সাত্ত্বিকভাব বলে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভাব-সমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে আপনা-আপনিই বাহিরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলে। "কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈ শ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবা স্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ভ, র, সি, ২।২।১-২॥" সাত্ত্বিকভাব আট রকমের—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে **স্তম্ভ** উৎপন্ন হয়। ইহা মনের একটী অবস্থা-বিশেষ ; ইহাদ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হয় এবং তাহার প্রভাবে বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারও স্তম্ভিত হয়। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হওয়ায় শূন্যতাদি প্রকাশ পায়। আর বাক্-পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হওয়ায় বাগ্‌রাহিত্যাদি প্রকাশ পায়। সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় দেহ যেন জড়তা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, মনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়।

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি জনিত শরীরের আর্দ্রতাকে **স্বেদ** (ঘর্ম্ম) বলে।

আশ্চর্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ভয়াদি বশতঃ দেহের রোম সকল উন্নত হইয়া উঠিলে তাহাকে **রোমাঞ্চ** বলে।

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে **স্বরভেদ** হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে; গদ্‌গদ্‌ বাক্য হয়।

ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে **কম্প** বা বেপথু বলে।

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণ-বিকারের নাম **বৈবর্ণ্য**। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি জন্মিয়া থাকে।

হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি বশতঃ নেত্রে যে জলোদ্‌গম হয়, তাহাকে **অশ্রু** বলে। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। সকল প্রকারের অশ্রুতেই চক্ষুর ক্ষোভ (চাঞ্চল্য), রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে। নাসিকাস্রাবও ইহার অঙ্গ-বিশেষ।

স্তম্ভ ও প্রলয়ের পার্থক্য। সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম **প্রলয়** বা মূর্চ্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চেষ্টাশূন্যতাদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের এবং জ্ঞানশূন্যতা দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়; স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিকভাবেও এই দুই রকমের ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারই স্তম্ভিত হয়। স্তম্ভে ও প্রলয়ে পার্থক্য কেবল মনের ব্যাপারে। স্তম্ভে মনের ব্যাপার স্তম্ভিত হয় না; কিন্তু প্রলয়ে মন বিষয়ালম্বনে লীন হইয়া যায় বলিয়া মনের ব্যাপারও থাকে না।

সাত্ত্বিকের ক্রিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের উপর। অষ্টসাত্ত্বিকের বিবরণে যে হর্ষ, ভয়, ক্রোধ বিষাদাদির কথা বলা হইল, তৎসমুদয় যদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাব ব্যতীত অন্য কোনও ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তজ্জনিত অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক-ভাব বলা হইবে না। সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাবই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়ের উপরে ক্রিয়া করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্তম্ভে ও প্রলয়ে অন্তরিন্দ্রিয় স্তম্ভিত হইলে তাহার ফলে বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও স্তম্ভিত হয়; অশ্রুতে মন প্রেমার্দ্রীভূত হইলে চক্ষুও আর্দ্র হয়; কম্পে প্রেম-প্রভাবে মন কম্পিত হইলে সেই কম্পন স্থূলরূপে দেহেও পরিস্ফুট হয়; এইরূপ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধেই।

অনুভাব ও অষ্টসাত্ত্বিকে পার্থক্য। তাহার হেতু। অষ্টসাত্ত্বিকভাব যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহারাও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবের বহির্বিকাশ মাত্র। অনুভাবও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবের বহির্বিকাশ মাত্র। সুতরাং অষ্টসাত্ত্বিককে অনুভাবও বলা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা না বলিয়া একটা বিশেষ পার্থক্য জ্ঞাপনের নিমিত্তই অনুভাব ও অষ্ট-সাত্ত্বিককে পৃথক্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পার্থক্যটী এই—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাব দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে বাহিরে যে সমস্ত বিকার প্রকাশ পায়, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বিকার আছে, যাহারা ভক্তের ইচ্ছাব্যতীতই স্বতঃই স্ফুরিত হয়; ভক্ত ইচ্ছা করিলেও এই সমস্ত বিকারকে গোপন করিতে পারেন না; এই বিকারগুলিকে বলা হইয়াছে সাত্ত্বিক-ভাব—স্তম্ভাদি। আর এমন কতকগুলি বিকার আছে, যাহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়—যেমন নৃত্যাদি; ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদির ইচ্ছাকে দমন করিতে পারেন, (নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ স্তম্ভাদীনান্তু স্বতএব প্রবৃত্তিঃ—শ্রীজীবগোস্বামী)। ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারার এবং স্তম্ভাদিকে দমন করিতে না পারার হেতু এই যে,—অনুভাবাখ্য বিকার-সমূহ ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয়কে যে ভাবে বিক্ষুব্ধ করে, বহিরিন্দ্রিয়কে তত প্রচুররূপে বিক্ষুব্ধ করে না; ভাবের প্রভাবে মন যেরূপ নৃত্য করিতে থাকে, দেহ সেরূপ করে না; দেহের নৃত্য-প্রয়াস মৃদু; তাই ভক্ত ইচ্ছা করিলে দেহকে নৃত্য না করাইয়াও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু অষ্টসাত্ত্বিক অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়—এই উভয়-বিধ ইন্দ্রিয়ের উপরই স্বীয় প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিস্তার করিয়া থাকে—মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহকে কম্পিত, আর্দ্র ইত্যাদি করিয়া থাকে; ভক্ত নিজের চেষ্টায় এই ভাবের বিক্রমকে সাধারণতঃ পরাভূত করিতে পারেন না (অতঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতো র্বহিরন্তশ্চ স্ফুটমুচ্চৈ র্বিক্ষোভ-বিধায়িত্বাদিত্যুদ্ভাস্বরেষু তু ন তাদৃশম্—শ্রীজীবগোস্বামী। উদ্ভাস্বর—অনুভাব)।

অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব এতদুভয়ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবের বহির্ব্বিকার বলিয়া সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে; তাই কখনও কখনও সাত্ত্বিক-ভাবকে সাত্ত্বিক-অনুভাব এবং অনুভাবাখ্য বিকারগুলিকে উদ্ভাস্বর-অনুভাব বলা হয়।

ব্যভিচারী ভাব। বি-পূর্ব্বক অভি-পূর্ব্বক চর্-ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় যোগে "ব্যভিচারী" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বি-অর্থ—বিশেষরূপে ; অভি অর্থ—আভিমুখ্যে ; চর-ধাতুর অর্থ—গতি, সঞ্চরণ। তাহা হইলে ব্যভিচারী শব্দের অর্থ হইল—(স্থায়িভাবের) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে যে। যে ভাব স্থায়িভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাকে ব্যভিচারি ভাব বলে। "বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। ভ, র, সি, ২।৩।১।" ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবকে সঞ্চারি-ভাবও বলে। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপিতে॥ ভ, র, সি, ২;৩।১।" বাক্য, ভ্রূ-নেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাবসমূহ দ্বারা ব্যভিচারি-ভাবসমূহ প্রকাশিত হয়।

ব্যভিচারি-ভাব তেত্রিশটী :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

স্থায়িভাব। কৃষ্ণরতিই স্থায়িভাব। "সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে বীজ, ইক্ষু রস, গুড়, খণ্ড সার। শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥ এ সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়িভাব। মধ্য। ১৯।" ইক্ষুরস পুনঃ পুনঃ পাকে গাঢ়তা লাভ করিয়া যেমন যথাক্রমে গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা, মিশ্রি ও উত্তম মিশ্রিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে যথাক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। একই কৃষ্ণরতির এই বিভিন্ন অবস্থারূপ প্রেম-স্নেহাদিকেই কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব বলে ; সুতরাং স্থায়িভাবও স্বরূপতঃ কৃষ্ণরতিই। "স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।২॥" প্রেম-স্নেহাদি স্থায়িভাবই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত মিলিত হইলে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ মধ্য ২৩॥ তাহা হইলে বুঝা গেল—বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া যে বস্তুটী যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহাই সেই রসের স্থায়ী ভাব, তাহা সেই রসে নিত্য-বিরাজমান এবং তাহাই সেই রসের ভিত্তি বা মূল উপাদান।

শান্তাদি-রতি-ভেদ। একই দীপের আলোকরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলে যেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বহির্গত হয় তদ্রূপ একই কৃষ্ণরতি বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনের গুণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এইরূপে ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর। বাৎসল্যরতি মধুররতি—এ পঞ্চবিভেদ। মধ্য ১৯। শান্তভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে শান্তরতি, দাস্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে দাস্যরতি। সখ্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে সখ্যরতি ; বাৎসল্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে বাৎসল্য রতি এবং মধুরভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে মধুর-রতি বা কান্তারতি।

পঞ্চ মুখ্যা রতি। শান্তাদি পাঁচটি রতিকেই মুখ্যা রতি বলে। মুখ্যা রতি স্বার্থা ও পরার্থাভেদে দুই রকমের ; অবিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা যাহা আপনাকে স্পষ্টরূপে পোষণ করে এবং বিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা যাহার গ্লানি উপস্থিত হয় তাহাকে স্বার্থা রতি বলে ; আর যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে প্রকটিত করে তাহাকে পরার্থা রতি বলে।

সপ্তগৌণীরতি। পাঁচটী মুখ্যারতি ব্যতীত সাতটী গৌণী রতিও আছে—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা বা নিন্দা। ইহারা স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষময়ী স্বার্থারতি নহে ; ইহারা সঙ্কোচময়ী পরার্থা রতি দ্বারা প্রকাশিত হয় ; এবং সঙ্কোচময়ী পরার্থা রতি যখন হাস্যকে প্রকাশ করে, তখন সেই হাস্যোত্তরা পরার্থা-রতিকেই হাস্যরতি বলা হয়। এইরূপে বিস্ময়োত্তরা পরার্থাকে বিস্ময়-রতি বলে, ইত্যাদি। কৃষ্ণসম্বন্ধিনী চেষ্টাদ্বারাই হাস্যাদির উদ্ভব না হইলে রস হইবে না। এই সাতটী সাময়িকী রতি, ইহাদের ধারাবাহিক স্থায়িত্ব নাই।

শান্তাদি-রতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে :—

শান্তরতি। শান্ত-রতির গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণবিনা অন্য কামনা ত্যাগ; কিন্তু শান্ত-ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি নাই; শ্রীকৃষ্ণে তাহার কেবল পরমাত্মা-জ্ঞান। শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দাস্যরতি। দাস্যরতির গুণ সেবা; দাস্য-ভক্তের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সেবা আছে। দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরববুদ্ধি আছে; "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার কৃপার পাত্র"—ইহাই দাস্যভক্তের ভাব। দাস্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সখ্যরতি। সখ্য-রতির গুণ সম্ভ্রমশূন্যতা বা গৌরবশূন্যতা; শ্রীকৃষ্ণের সখারাই এই রতির পাত্র; শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান সখাদের নাই; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমানই মনে করেন; এইরূপ তুল্যতা-জ্ঞানের হেতু—শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য। এই রসে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা আছে; শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহেতু তাঁহার প্রীতির জন্য সেবা আছে; তবে এই সেবা দাস্যরসের সেবার মত গৌরব-বুদ্ধিতে নহে, পরন্তু মমতাধিক্যবশতঃ তুল্যতা-বুদ্ধিতে, কোনও সখা বনে কোনও একটী ফল মুখে দিয়া যখন দেখেন, ফলটী অতি মিষ্ট, তখনই তিনি তাহা সখা শ্রীকৃষ্ণকে না দিয়া থাকিতে পারেন না; তাই তিনি অতি প্রীতির সহিত ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই সখা-কানাইয়ের মুখে দিয়া বলেন—"ভাই কানাই, এই ফলটী খা, অতি মিষ্ট"। দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি থাকিলে উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে বড় প্রীত হন; তিনি বলিয়াছেন, "যে আমাকে ছোট মনে করে, অন্ততঃ সমান মনে করে, কখনও বড় মনে করে না, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন।" সখ্যরতি বিশ্বাসভাবময়। সুবলাদি-সখাবর্গ এই রতির আশ্রয়। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান প্রণয় রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বাৎসল্য রতি। বাৎসল্য-রতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের বা আশীর্ব্বাদের পাত্র মনে করেন। যেমন নন্দ-যশোদাদি। প্রীতি ও মমতার আধিক্যবশতঃই এইরূপ ভাব। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসন-আদিও করিয়া থাকেন। সখ্যরতি হইতে বাৎসল্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরতিতে প্রীতিতে বিশ্বাস থাকা চাই—অর্থাৎ "আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান সমান ভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেছি, তাঁহার কাঁধে চড়িতেছি—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, কখনও অসন্তুষ্ট হন না"—এইরূপ বিশ্বাস সখাদের আছে; ইহাই বিশ্বাস-ভাবময়ী সখ্যরতি। যখনই এই বিশ্বাসের অভাব হইবে, তখনই সখ্যরতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাৎসল্য রতিতে, এইরূপ ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইবেন, কি রুষ্ট হইবেন, এই বিচারই মনে স্থান পায় না। "শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য ইহা করা দরকার, তাই আমাকে ইহা করিতে হইবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্টই হউক বা রুষ্টই হউক। কৃষ্ণ ত অবোধ বালক, সে তাহার ভাল মন্দ কি বুঝে? কিসে তাহার ভাল হইবে, কিসে তাহার মন্দ হইবে, আমি তাহা বুঝি—আমি তাহা জানি। যাতে তাহার ভাল হইবে, আমি তাহা করিবই।" ইহাই বাৎসল্য-রতির ভাব। এই রসে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্যজ্ঞান এবং আপনাকে লালক জ্ঞান। বাৎসল্য-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মধুর-রতি। অঙ্গ-সঙ্গ-দানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতি-সম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গই এই রতির আশ্রয়। মধুর-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

হাস্য। বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা। কৃষ্ণ-সম্বন্ধি চেষ্টা-জনিত হাস্য, স্বয়ং সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়।

অদ্ভুত। অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে, তাহাকে বিস্ময় বলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অলৌকিক-বিষয়াদি জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে, বিস্ময়রতি বলিয়া কথিত হয়।

বীর। যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেইরূপ যুদ্ধাদি কার্য্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি যুদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ, শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহরতি বলিয়া কথিত হয়। উৎসাহ-রতিই বীর-রতি।

শোক। ইষ্টবিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি শোক, শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে শোক-রতি বলিয়া কথিত হয়।

ক্রোধ। প্রাতিকূল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি প্রাতিকূল্যাদি-জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণ রতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়।

জুগুপ্সা। অহৃদ্য বস্তুর অনুভব-জনিত চিত্ত-নিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে।

ভয়। পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়রতি বলে।

পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণ রস। উক্ত পাঁচটী মুখ্য রতি বিভাবাদি যোগে পাঁচটী রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য-রস এবং মধুর-রস বা কান্তারস। এই পাঁচটীকে মুখ্য ভক্তিরস বলে। শান্তাদি রতিই শান্তাদি-রসের স্থায়ীভাব।

আবার হাস্যাদি সাতটী গৌণী রতিও বিভাবাদি-যোগে সাতটী রসে পরিণত হয়—হাস্যরস, অদ্ভুতরস (বিস্ময়-জাত), বীররস (উৎসাহ-জাত), করুণরস (শোকরতি-জাত), রৌদ্ররস (ক্রোধরতি-জাত), বীভৎস-রস (জুগুপ্সারতি-জাত), ভয়ানক রস (ভয়রতি-জাত)। শান্তাদি পঞ্চবিধ-ভক্তের চিত্তেই এই সাতটী রস কোনও কারণ উপস্থিত হইলে, যথাযোগ্যভাবে আগন্তুকরূপে উপস্থিত হয়, কারণের অন্তর্ধান হইলে আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু শান্তাদি-মুখ্যরসগুলি সর্ব্বদাই ভক্তের মনে বিদ্যমান থাকে। "পঞ্চরস-স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে ॥ মধ্য ১৯ ॥"

কোন্ রতির সহিত কোন্ বিভাবাদি মিলিত হইলে কোন্ রস উৎপন্ন হয়, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

শান্তরস। শান্তরসে শান্তরতি স্থায়িভাব। নবযোগেন্দ্রাদি এবং সনকাদি আশ্রয়-আলম্বন, চতুর্ভুজ স্বরূপ বিষয়ালম্বন। মহোপনিষদাদি-শ্রবণ, নির্জ্জনস্থান-সেবন, চিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, জ্ঞান-শক্তির প্রধানতা, বিশ্বরূপদর্শন, জ্ঞানি-ভক্তের সংসর্গাদি—উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি-নিক্ষেপ, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, হরিদ্বেষীর প্রতিও দ্বেষরাহিত্য, সংসার-ধ্বংস ও জীবন্মুক্তি আদির প্রতি আদর, নির্ম্মমতা, মৌনতাদি—অনুভাব; প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি—সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মৃতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্কাদি—সঞ্চারিভাব।

দাস্যরস। দাস্যরসে দাস্যরতি স্থায়িভাব। ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি আশ্রয় আলম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন; মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সস্মিত দৃষ্টি, গুণোৎকর্ষ-শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ, অঙ্গ সৌরভাদি—উদ্দীপন। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য চিন্তা, স্মৃতি শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি—এসমস্ত ব্যভিচারি ভাব। ভগবদাজ্ঞার প্রতিপালন, ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষ্যা শূন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতাদি—অনুভাব।

সখ্যরস। সখ্যরসে সখ্যরতি স্থায়িভাব। সুবল মধুমঙ্গলাদি আশ্রয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। হরিসম্বন্ধীয় বয়স, রূপ, বেণু, শঙ্খাদি—উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, স্কন্ধারোহণ, স্কন্ধে বহন, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া, একত্র শয়ন উপবেশনাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি-সাত্ত্বিক ভাব। উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারি ভাব।

বাৎসল্যরস। বাৎসল্যরসে বাৎসল্য রতি স্থায়িভাব। শ্রীনন্দ যশোদাদি আশ্রয়ালম্বন; প্রভাবশূন্য এবং অনুগ্রহ পাত্ররূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, বাল্যচাঞ্চল্য, মধুরবাক্য মন্দহাস্য,

ক্রীড়া প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, হিতোপদেশাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি আটটী এবং স্তন-দুগ্ধস্রাব একটী—এই নয়টী বাৎসল্যের সাত্ত্বিক ভাব। অপস্মার এবং দাস্যরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব।

মধুর রস। মধুর-রসে মধুর-রতি বা কান্তারতি স্থায়িভাব। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ আশ্রয়ালম্বন; অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় এবং লীলারস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মুরলী রবাদি উদ্দীপন। নয়নপ্রান্তে নিরীক্ষণ, হাস্যাদি—অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতা ব্যতীত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব।

বাৎসল্য রসের দৃষ্টান্ত। সমস্ত রসের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই। বিভাব অনুভাবাদির যোগে কৃষ্ণরতি কিরূপে আনন্দ-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, বাৎসল্যরসের একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যশোদামাতার বাৎসল্যরতি। তাঁহার অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের জননী, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র, লাল্য এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভরশীল, তাঁহার কৃপার পাত্র। এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াই যশোদা মাতা একটা আনন্দ পায়েন—ইহা বাৎসল্য রতির স্বরূপগত আনন্দ। মনে করুন, যশোদা মাতা একদিন বসিয়া বসিয়া তাঁহার গোপালের জন্য নবনীত সাজাইয়া রাখিতেছেন, আর গোপালের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় দূরে কৃষ্ণের মুখের "মা মা" শব্দ শুনিতে পাইলেন, সেই দিকে নয়ন ফিরাইতেই দেখিলেন --কৃষ্ণ তাঁহারই দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছেন। অমনি মাতার বাৎসল্য সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল (মা মাশব্দ এবং চঞ্চল চরণে দ্রুত ধাবন এস্থলে উদ্দীপন), তাঁহার স্তন-যুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল (সাত্ত্বিক ভাব); মা উঠিয়া গিয়া দুই বাহুতে গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে বসাইলেন, তাঁহার মুখে চুম্বনাদি করিলেন এবং স্তন্যপান করাইতে করাইতে গোপালের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন (অনুভাব), মায়ের নেত্রে অশ্রু, অঙ্গে রোমাঞ্চাদি (সাত্ত্বিক ভাব) দেখা দিল, আনন্দের আবেশে তাঁহার দেহ যেন জড়িমাগ্রস্ত হইতে লাগিল।

এস্থলে আশ্রয়ালম্বন যশোদা মাতার হৃদয়স্থিত বাৎসল্য রতি গোপালের "মা মা" শব্দ এবং তাঁহারই দিকে দ্রুত ধাবনাদি উদ্দীপন প্রভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল; গোপালকে কোলে লওয়াতে (বিষয়ালম্বনের যোগ হওয়ায়) তরঙ্গায়িত বাৎসল্য সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিল, সেই প্রবল তরঙ্গ তাড়নে মাতা গোপালকে চুম্বন ও লালনাদি করিতে লাগিলেন (অনুভাবের যোগ হইল). যতই চুম্বনাদি করেন, তরঙ্গের বেগ যেন ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহার প্রভাবে মাতার নয়নে আনন্দাশ্রু, দেহে রোমাঞ্চাদি (সাত্ত্বিক ভাব) প্রকাশিত হইল, আনন্দ চমৎকারিতার প্রাবল্যে মাতার দেহ যেন অবশ হইয়া পড়িল (জড়তা নামক ব্যভিচারি ভাবের যোগ)। এইরূপে কেবল বাৎসল্য রতির স্বরূপানন্দ উপভোগে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উদ্দীপনাদির যোগে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ আনন্দ এবং আনন্দাস্বাদন চমৎকারিতা যশোদা মাতা অনুভব করিতে লাগিলেন; ইহাতেই বাৎসল্য রতির রসত্ব প্রতিপাদিত হইল।

হাস্য রসের দৃষ্টান্ত। গৌণ রসেরও একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে—হাস্য রসের। একদা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযুক্ত জীর্ণ শীর্ণাকৃতি এক মুনি নন্দালয়ে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; বালক কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া যশোদা মাতাকে বলিলেন—"মা, আমি ঐ জীর্ণ শীর্ণাকৃতি লোকটীর নিকটে যাব না; গেলে লোকটী আমাকে তাহার ঝোলার ভিতরে পুরিয়া রাখিবে।" এইরূপ বলিয়া শিশু কৃষ্ণ চকিত নয়নে একবার মুনির দিকে, একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। দেখিয়া মুনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না—হাসিয়া ফেলিলেন। এস্থলে মুনি এবং কৃষ্ণ হইলেন আলম্বন; মুনির বেশ ভূষা, কৃষ্ণের বাক্য ও আচরণাদি—উদ্দীপন। কৃষ্ণের আচরণ দর্শনে হর্ষ—ব্যভিচারী ভাব। এই সমস্তের সমবায়ে মুনির কৃষ্ণরতি তরঙ্গায়িত হইয়াও স্বয়ং সঙ্কুচিত থাকিয়া হাস্যকে প্রকাশ করিল। হাসোত্তরা কৃষ্ণরতিও মুনিকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ চমৎকারিতা আস্বাদন করাইয়াছিল।

সমস্ত রসেরই আবার অনেক বৈচিত্রী আছে; যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, প্রীতি-সন্দর্ভ, অলঙ্কার-কৌস্তভ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিবেন।

ভক্তই ভক্তিরসের আস্বাদক। যাহা হউক, ভক্তিরসের আস্বাদন-বিষয়ে যোগ্যতা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥ মধ্য।২৩॥" ভক্তিরস ভক্তগণেরই আস্বাদনীয়, অভক্ত ইহার আস্বাদন গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহাদের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাব-ভাবিত-স্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ। ভ, র, সি, ২।১।১৪২॥" কৃষ্ণভক্ত দুই রকমের—সাধক ও সিদ্ধ। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু বলেন—"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহাদিগকে সাধক ভক্ত বলে। শ্রীবিল্বমঙ্গলতুল্য ভক্ত-সকলই সাধক ভক্ত।২।১।১৪৪॥ আর যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত। ১।২।১৪৬॥"

আস্বাদকের আলম্বনত্ব দরকার। উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা গেল—যাঁহারা অন্ততঃ পক্ষে জাতরতি, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষরূপা কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্য যাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলা যায়; তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষরূপ ভক্তিরস আস্বাদনে সমর্থ। আর যাঁহাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ মলিনতা আছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের (সুতরাং ভক্তির) আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে নাই, তাঁহাদিগের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব অসম্ভব; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে ভক্তিরস আস্বাদিত হইতে পারে না। ইহার হেতুও আছে; যিনি ভক্তিরস আস্বাদন করিবেন, তাঁহার আলম্বনত্ব থাকা চাই—তাঁহাকে কৃষ্ণরতির আশ্রয়-আলম্বন হইতে হইবে; অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে ভক্তি-জিনিসটী থাকা চাই; তাহা না থাকিলে তিনি কি আস্বাদন করিবেন? কিন্তু যিনি অন্ততঃ জাতরতি নহেন, তাঁহার আলম্বনত্ব হইতে পারে না, সুতরাং রসাস্বাদনেও তাঁহার যোগ্যতা থাকিতে পারে না! অধিকন্তু, প্রাকৃত-চিত্তে অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তের চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময় হইয়া যায়, তখনই চিন্ময়-ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব হয়। অভক্তের চিত্ত তদ্রূপ হয় না বলিয়া তাহার পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন (২।১।৪)—"ভক্তিনির্ধূতদোষানাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥ জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥ ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলাম্। রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥ কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥—ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদের দোষ বিদূরিত হইয়াছে; সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য) এবং (শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য বলিয়া সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন, সুতরাং) উজ্জ্বল; যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে অথবা ভক্তিসম্পদযুক্ত ভক্তে অনুরক্ত এবং রসজ্ঞ-ভক্তসঙ্গে-রঙ্গী, শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পত্তিই যাঁহাদের জীবনীভূত, যাঁহারা কেবল প্রেমান্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করেন; এইরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা) সমুজ্জ্বলা আনন্দরূপা যে রতি বিরাজিতা আছে, সেই রতি অনুভব-পথগত-কৃষ্ণাদি-বিভাব-সমূহের দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

কাহার কাহার চিত্তে ভক্তিরসটী আস্বাদনীয় হইতে পারে, তাহা বলিতে গিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—'ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং……ভক্তানাং হৃদি…—ভক্তের হৃদয়েই ভক্তিরসটী আস্বাদনীয়। কিরূপ ভক্তের? ভক্তি-নির্ধূত-দোষাণাং—সাধন-ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, এরূপ ভক্তের হৃদয়ই আনন্দাস্বাদনের যোগ্য। মলিনতা দূর হইলে চিত্তটীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাও বলিয়াছেন—প্রসন্নোজ্জ্বল-চেতসাম্'—চিত্ত প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল হইবে। টীকাকার-শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নির্ধূতদোষত্বাদেব

প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাবির্ভাব-যোগ্যত্বং ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্নত্বম্।'—সাধন-ভক্তির প্রভাবে অনর্থাদি সমস্ত দোষ নিঃশেষরূপে দূরীভূত হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হইবে; প্রসন্ন হইলেই ঐ চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষের আবির্ভাব সম্ভব হইবে। আর শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষের আবির্ভাব হইলেই চিত্ত উজ্জ্বল হইবে। ইহাই টীকার মর্ম্ম। বিষয়টী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন থাকে কখন? যখন কোনও বিষয়ে তৃপ্তির অভাব থাকে, তখনই চিত্ত অপ্রসন্ন থাকে। তৃপ্তির অভাবের মূল হইল বাসনার অপূরণ।

সুখ-বাসনার তৃপ্তির জন্য সংসারে আমরা মায়িক আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াই; কিন্তু মায়িক আনন্দে আমাদের আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না; কারণ, মায়িক বস্তুই স্বরূপতঃ অনিত্য, আর জীবের আনন্দাকাঙ্খা নিত্য; এই নিত্য আকাঙ্খাটীও নিত্য কেবলানন্দের নিমিত্তই। চিত্তে মায়িক উপাধির আবরণ রহিয়াছে বলিয়া মায়িক আনন্দব্যতীত অন্য আনন্দের অনুসন্ধানও জীব সাধারণতঃ করিতে চায় না। তাই যতক্ষণ মায়িক আবরণ থাকিবে, ততক্ষণ মায়িক আনন্দের জন্য অনুসন্ধান থাকিবে, সুতরাং ততক্ষণই চিত্তে অপ্রসন্নতা থাকিবে। আর যে মুহূর্ত্তেই অপ্রসন্নতার মূল-হেতু ঐ মায়িক আবরণ দূরীভূত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই চিত্তে প্রসন্নতার আবির্ভাব হইবে; কারণ, জীব চিদ্বস্তু বলিয়া প্রসন্নতা তাহার চিত্তের স্বরূপগত-ধর্ম্ম। এইরূপে চিত্তের মলিনতা নিঃশেষরূপে দূরীভূত হইলে এবং তাহার ফলে প্রসন্নতার আবির্ভাবে চিত্ত যখন স্বরূপে স্থিত হইবে, তখনই তাহাতে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষের আবির্ভাব সম্ভব হইবে; মেঘ সরিয়া গেলেই সূর্য্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। হ্লাদিনী-শক্তির সহিত জীবের যখন স্বরূপতঃ অনুকূল সম্বন্ধ আছে, তখন উভয়ের মিলনের অন্তরায়-স্বরূপ বিজাতীয় মায়িক মলিনতাটি দূরীভূত হইলেই উভয়ের যোগ হইবে।

আস্বাদক ও আস্বাদ্য বস্তুর সংযোগ না হইলে আস্বাদন হয় না, জিহ্বার সহিত মধুর সংযোগ না হইলে মধুর মধুরত্ব অনুভূত হইতে পারে না; সুতরাং মধুরত্ব অনুভবের নিমিত্ত জিহ্বার স্বরূপ-অবস্থায় অবস্থিতি প্রয়োজন—অন্য বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকিলে সংযোগ সম্ভব হইবে না, সুতরাং আস্বাদনও হইবে না। মলিনতা দূর হইয়া গেলে চিত্তরূপ দর্পণ যখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে—হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ (শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ) রূপ সূর্য্যের কিরণে তখনই ঐ বিমল (প্রসন্ন) চিত্ত উদ্ভাসিত (উজ্জ্বল) হইবে, জীব তখনই ভক্তিরস-আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিবে।

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে "শ্রীভাগবতরক্তানাং……অনুতিষ্ঠতাম্।" পর্য্যন্ত শ্লোক-সমূহে চিত্তের এই অবস্থা লাভের উপযোগী সাধনের কথাই বলা হইয়াছে।

ভক্তিরস আস্বাদনের সহায়তা কিসের দ্বারা হইতে পারে, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন।—"সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটি সংস্কার-যুগলধারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কার-যুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়! কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটি কি? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে।

ভক্তিরসটী আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্ম-সন্নিভাঃ॥—ধর্ম্মদত্ত।"

এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তি-বাসনা অপরিহার্য্য; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিক ভক্তি-বাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য, কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তি-বাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে; এজন্যই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী উভয়বিধ ভক্তি-বাসনাকেই ভক্তিরস আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ২।১।৩॥" ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ৪৪-৪৭ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্ম

ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। আদি ৪র্থ॥" আবার ব্রজগোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। আদি ৪র্থ॥" ব্রজলীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্য-প্রকরণে জীব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ আদি ৪র্থ॥" অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ মধ্য ২২শ॥" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়;—'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ ১১।১১।৩ ॥"

এইরূপে নানাস্থানে ধর্ম্মত্যাগের আদেশ এবং অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মত্যাগের প্রশংসার কথা দৃষ্ট হয়। আবার "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা। ২।৪০॥"-ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকার উপদেশও দৃষ্ট হয়। সুতরাং ধর্ম্মত্যাগের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশই বা কেন দেওয়া হইল, অধিকন্তু পরিত্যজ্য এবং অবলম্বনীয় ধর্ম্মের মধ্যেও কোনওরূপ পার্থক্য আছে কিনা—তাহা নির্ণয় করার বাসনা স্বভাবতঃই চিত্তে উদিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম কাকে বলে। সাধ্যধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, সর্ব্বাগ্রে তাহা জানা দরকার। ধৃ+মন্=ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়-যোগে ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা ধরা; আর মন্ প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োজিত হয়, করণ-বাচ্যেও হয়। মন্-প্রত্যয় যখন কর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ হইবে "ধারণ করে যে—ধারণ করিয়া রাখে যে।" আবার করণবাচ্যে মন্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ হইবে—"ধারণ করা যায় যদ্দ্বারা—ধারণ করিয়া রাখা হয় যদ্দ্বারা।" তাহা হইলে ধর্ম্ম-শব্দে ধারণের কর্ত্তা এবং ধারণের করণ বা সহায় দুইই বুঝায়। কিন্তু ধৃ-ধাতু সকর্ম্মক; ধারণের কর্ম্ম কে? কাহাকে ধারণ করা হয়? যার ধর্ম্ম, তাকে ধারণ করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তরল জল গরমই হউক বা ঠাণ্ডাই হউক, সকল অবস্থাতেই আগুন নিবাইতে সমর্থ। এই অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব জলের একটী গুণ। জল যতক্ষণ স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে এই গুণটী থাকিবেই॥ এই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলের পরিচায়ক, জলের জলত্বের সাক্ষী; সুতরাং অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বই জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ করিয়া রাখে—জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে, তাই অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব হইল জলের ধর্ম্ম—কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। আবার জল বিকৃত হইয়া যখন বরফ বা বাষ্পে পরিণত হয়; তখন তাহার অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব থাকে না। শীতলত্বের প্রয়োগে বাষ্প যখন জমিয়া তরল জলে পরিণত হয়, কিম্বা উত্তাপের প্রয়োগে কঠিন বরফ গলিয়া যখন তরল জলে পরিণত হয়, তখন আবার তাহাতে অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব গুণ দৃষ্ট হয়; বিকৃত জল তখন স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহা হইলে, উত্তাপ বা শৈত্যই হইল বিকৃতি প্রাপ্ত জলকে স্বীয়-স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা করণ—এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত-অবস্থা হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয়; সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য-প্রয়োগই হইল করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম্ম বা জলত্বের সাধন। বস্তুতঃ বিকৃত-অবস্থায়ও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব তাহাতে থাকে—তবে তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র; শৈত্যাদি-প্রয়োগে তাহা প্রকটিত হয়; প্রকটীকরণের উপায়ই হইল সাধন। বরফ বা বাষ্প যদি সচেতন হইত, সুতরাং নিজেই নিজের উপরে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহা হইলে উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করাই হইত জলের করণ-ধর্ম্ম বা সাধন-ধর্ম্ম; আর জলত্ব বা অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব হইত তাহার চরম-লক্ষ্য—চরম অনুসন্ধেয়—সাধনের চরম বস্তু বা সাধ্যবস্তু—ইহাই হইত তাহার সাধ্যধর্ম্ম। জীব-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে

গেলে দেখা যায়—ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবকে স্বীয়-স্বরূপে (কৃষ্ণদাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই বা শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক যে কৃষ্ণপ্রীতিবাসনা, তাহাই হইল জীবের সাধ্যধর্ম্ম—কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। আর মায়াবদ্ধ জীবের—মায়ামলিনতাবশতঃ বিকৃত অবস্থাপন্ন জীবের—চিত্তে সেই বাসনা প্রকটিত করার নিমিত্ত—জীবের স্বরূপ-অবস্থা পরিস্ফুট করার নিমিত্ত—যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সমস্ত উপায়ই হইল—স্বরূপাবস্থায় উন্নীত হইয়া সেই অবস্থায় ধৃত থাকিবার উপায় বা সাধন-ধর্ম্ম—করণবাচ্যের অর্থে ধর্ম্ম। যোগমার্গ বা জ্ঞান-মার্গাদির শাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপানুরূপ সাধ্যধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম আছে। এইরূপে ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ দৃষ্ট হয়—একটী কর্ত্তৃবাচ্যাত্মক, অপরটী করণবাচ্যাত্মক; কর্ত্তৃবাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধ্য ধর্ম্ম—জীবের সাধনের লক্ষ্য; আর করণ-বাচ্যাত্মক অঙ্গ হইল সাধনধর্ম্ম—জীবের ভজনাঙ্গের বা সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহ।

সমাজ ধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, আচার। এ পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট—বা জীব-স্বরূপের অনুরূপ—ধর্ম্মের কথাই বলা হইল। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জিনিসকে ধর্ম্ম বলা হয়, যাহাদের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বা যাহারা জীবের স্বরূপের অনুরূপও নহে—পরন্তু, জীবের ভোগায়তন দেহের সহিতই যাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। আচারগুলিও আমাদের নিকট ধর্ম্ম; প্রত্যেক সমাজের রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার—সেই সমাজের লোকের পক্ষে ধর্ম্ম; যেমন গোবধ না করা হিন্দুর একটী আচার; ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম; কারণ, এই আচারটী তাহাকে হিন্দু-সমাজে ধারণ করিয়া রাখে; এই আচারের লঙ্ঘন করিলে কেহই আর হিন্দু-সমাজে স্থান পায় না। ইহা হিন্দুর একটী সমাজ-ধর্ম্ম। এইরূপে দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম। এই সমস্ত আচারাত্মক ধর্ম্মের সহিত দেহের বা দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুর—ব্যক্তিবিশেষের ব ব্যক্তি-সমূহের—সুখ-সুবিধাদিরই সম্বন্ধ। বেদধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের লক্ষ্যও ইহকালের বা পরকালের ভোগায়তন-দেহের সুখ সুবিধা বা দুঃখ-নিরাকরণ, জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই—ইহা জীবের স্বরূপানুরূপ ধর্ম্মও নহে।

আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম। এইরূপে মোটামোটি দুই শ্রেণীর ধর্ম্ম পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—যে সমস্ত ধর্ম্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ আছে, অথবা যে সমস্ত ধর্ম্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ—যে সমস্ত ধর্ম্মের সহিত স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই, অথবা যে সমস্ত ধর্ম্ম জীব-স্বরূপের অনুরূপ নহে। প্রথমোক্ত ধর্ম্মসমূহ জীবাত্মা, পরমাত্মা (বা ভগবান্) এবং তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে আত্ম-ধর্ম্ম বলা যায়। শেষোক্ত ধর্ম্মসমূহ অনাত্ম-দেহাদির সুখ-সুবিধাদির উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাহাদিগকে অনাত্ম-ধর্ম্ম বলা যায়। জীবাত্মা নিত্য, পরমাত্মা নিত্য, উভয়ের সম্বন্ধও নিত্য, সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মধর্ম্মও নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। দেহাদি অনাত্মবস্তু অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অনাত্ম-ধর্ম্মও অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল; তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদির, লোকাচার-দেশাচারাদির—স্থূলতঃ সমস্ত অনাত্ম-ধর্ম্মের বিধি-নিষেধাদির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৮৫। ১৮০॥"—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। এই তো গেল অনাত্ম-ধর্ম্মের কথা। আত্ম-ধর্ম্মের সাধনাঙ্গও অনাত্ম-দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট…কারণ; অনাত্মদেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই তাহা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-কালাদি-ভেদে দেহ-রক্ষার উপকরণ বিভিন্ন হয় বলিয়া এবং মনের অবস্থারও বিভিন্নতা জন্মে বলিয়া যুগে যুগে সাধন-ধর্ম্মেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন:—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥ ১২।৩।৫২॥" উক্ত ভাগবত-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলিয়াছেন:—"সত্যযুগে ধ্যান-ধর্ম্ম করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি। ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥ কৃষ্ণ-পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের

ধর্ম্ম। * * * * * * * আর তিনযুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয়। কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ মধ্য। ২০॥" শেষ-পয়ারার্দ্ধে "সেই ফল" পদে—সকল যুগেরই সাধ্য-সার বস্তু যে এক, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তাহাই বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার সাধন—এক এক যুগে এক এক রকম—সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা কৃষ্ণ-পদার্চ্চন, আর কলিতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অবস্থা বিশেষে অনাত্মধর্ম্মই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার। যাহা হউক, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম দেহ ধর্ম্মাদি অনাত্ম-ধর্ম্ম; ইহাদের তাৎপর্য্য কেবল দেহের সুখ; শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ আত্ম-ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই; বরং এই সমস্ত অনাত্ম-ধর্ম্ম আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময় বলিয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বিরোধী; তাই কৃষ্ণ-সুখৈক-সর্ব্বস্বা ব্রজদেবীগণ লোকধর্ম্মাদিমূলক অনাত্ম-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের লোক-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্মাদি কিছুই নাই; কারণ, তাঁহারা জীব নহেন—লোকধর্ম্মাদি জীবেরই ধর্ম্ম; তথাপি নরলীলার পরিপোষণার্থ ব্রজ-পরিকরগণ লোক-ধর্ম্মাদিকে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুরোধে তাহাদেরও উপেক্ষণীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদধর্ম্মাদি আত্মসুখতাৎপর্য্যময় অনাত্ম-ধর্ম্ম বলিয়াই সাধকদের পক্ষেও তাহাদের ত্যাগের বিধি শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনাত্মধর্ম্ম হইলেও বেদধর্ম্মাদি ত্যাগের পক্ষে একটা অধিকার-বিচার আছে; শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম—(অর্থাৎ যিনি যে অবস্থায় স্থিত, তাঁহাকে সেই অবস্থায় অনুরূপ কর্ম্ম) করিতে হইবে। শ্রীভা, ১১।২০।৯॥ কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকারী হইয়া নির্জ্জনে নির্ঝঞ্ঝাটে ভজনের নিমিত্ত যিনি লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন, তাঁহায় কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু কর্ম্মত্যাগর অধিকারী হইয়াও যাঁহারা লোক-সমাজে বাস করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনের অপ্রতিকূলভাবে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি বেদধর্ম্মের এবং লোক-ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়; ইহা না করিলে সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম প্রবেশ করিবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়; কারণ, সমাজ-ধর্ম্মাদি পালন না করিলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের অধিকার-বিচারে অসমর্থ অজ্ঞলোকগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সামাজিক রীতি-নীতির উপেক্ষা করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইবে, সমাজকেও কলুষিত করিয়া তুলিবে। শৃঙ্খলা ও সদাচার রক্ষিত না হইলে সমাজের অবস্থা সাধন-ভজনের অনুকূল থাকে না। তাই, কর্ম্মত্যাগের অধিকারী হইয়াও যাঁহারা লোক-সমাজে বাস করেন, ভজনের অনুকূলভাবে, তাঁহাদের পক্ষেও লোক-ধর্ম্মাদির প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করা উচিত—হাই সামান্য-সদাচার। বৈষ্ণবাচারের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য-সদাচারও বৈষ্ণবের পক্ষে পালনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রণয়নে উভয়বিধ সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যেও সামান্য সদাচারের মর্য্যাদা—অবস্থানুরূপ আচরণের আদর্শ—দেখিতে পাওয়া যায়। *

* পূর্ব্বে পাপ ও অপরাধের পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, অনাত্ম-ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণই পাপ এবং আত্ম-ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণই অপরাধ।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ

(ক) প্রভু কোন্ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কোন্ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও চরিতকারই তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর আবির্ভাবের এবং তিরোভাবের শকেরই উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু সন্ন্যাসের শকের উল্লেখ করেন নাই ; তবে তাঁহার উক্তিগুলির আলোচনা করিলে সন্ন্যাসের শক নির্ণীত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তিগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে। পঞ্চবিংশতিবর্ষে কৈলা যতিধর্ম্মে ॥ ১।৭।৩২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ১।১৩।৭
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ১।১৩।৮
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিলাস ॥ ১।১৩।৯
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১।১৩।১০
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে। লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥১।১৩।৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১।১৩।৩২
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। তাঁহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম ॥ ২।১।১০
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ২।১।১১
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান। তাঁহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম ॥ ২।১।১২
মাঘশুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ২।৭।৩

উদ্ধৃত বাক্যগুলির সারমর্ম্ম এই :—১৪০৭ শকে প্রভু আবির্ভূত হয়েন এবং ১৪৫৫ শকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। মাঘমাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চব্বিশ বৎসর গৃহাশ্রমে ছিলেন এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাস আশ্রমে ছিলেন। প্রভু প্রকটলীলা করিয়াছেন আটচল্লিশ বৎসর। প্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী চারি স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে যে চব্বিশ বৎসর ছিলেন, তাহাও তিন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—এস্থলে যে বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি ৩৬৫ দিনের পুর্ণ বৎসর? উত্তরে বলা যায়, ৩৬৫ দিনের পুর্ণ বৎসরের কথা কবিরাজ বলেন নাই। যে তারিখে প্রভুর আবির্ভাব, সেই তারিখেই যদি সন্ন্যাস এবং সেই তারিখেই যদি অন্তর্দ্ধান হইত, তাহা হইলেই গৃহস্থাশ্রমে পুর্ণ চব্বিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমে পুর্ণ চব্বিশ বৎসর হইত এবং প্রভুর প্রকটলীলা-কালও পুর্ণ আটচল্লিশ বৎসর হইত। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের মাস শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে—মাঘ মাস। প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে। আবির্ভাব যখন ফাল্গুনে এবং সন্ন্যাস যখন মাঘে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রভু পুর্ণ চব্বিশ বৎসর-গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন না। আর প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে গুণ্ডাবাড়ীতে (গুণ্ডিচামন্দিরে) "জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।" (শ্রীল মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ ২১০—১১ পৃঃ)। শ্রীল জয়ানন্দও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঐ তারিখের কথাই লিখিয়াছেন। অন্য কোনও চরিতকার প্রভুর তিরোভাব

সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। যাহা হউক, তিরোভাব যখন আষাঢ় মাসে, রথ-দ্বিতীয়ার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে, তখন সন্ন্যাসাশ্রমেও যে প্রভু পূর্ণ চব্বিশ বৎসর ছিলেন না, তাহাই বুঝা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—১৪৫৫ শকে প্রভুর তিরোভাব। ইহার সঙ্গে লোচনদাস ঠাকুরের উক্তি মিলাইলে জানা যায়, ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ী সপ্তমীতে রথযাত্রার পরেই প্রভু লীলা অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী যে চব্বিশ এবং আটচল্লিশ বৎসর লিখিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম গণনার (৩৬৫ দিনের) বৎসর নহে; মোটামোটী হিসাবের বৎসর। আবির্ভাব-তিরোভাবাদির শকাব্দ-সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাও জানা যায়—পূর্ণ সাতচল্লিশ বৎসরের পরে মাত্র চারি-পাঁচ মাস প্রভু প্রকট ছিলেন। কেবল শকাব্দার হিসাবে ইহাকেই কবিরাজগোস্বামী (১৪৫৫—১৪০৭=৪৮) আটচল্লিশ বৎসর বলিয়াছেন।

এই ভাবে কেবল শকাব্দাঙ্ক ধরিলে মনে হয়, প্রভু যে ১৪৩১ শকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যেন কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায়; কারণ, ১৪৩১, শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই শকাব্দাঙ্কের হিসাবে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমে (১৪৩১—১৪০৭=২৪) চব্বিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও (১৪৫৫—১৪৩১=২৪) চব্বিশ বৎসর হয়।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে কয়টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে প্রভুর সন্ন্যাসের শকাব্দাটীও সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণয় করা যায়। ইহা নির্ণয় করার উপাদান কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই পাওয়া যায়। সেই উপাদানেরই আলোচনা করা হইতেছে। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ২।১।৩
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল। প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্যগীত কৈল ॥ ২।১।৪
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন। বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ২।১।৫

যেই মাঘ মাসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৈশাখমাসের প্রথমভাগেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে প্রভু তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সার্ব্বভৌম বলিলেন—"দিন কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ ২।৭।৪৮ ॥" তাঁহার অনুরোধে "দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য সনে। চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে ॥ ২।৭।৫৩ ॥ প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা। ২।৭।৫৪॥" ইহা হইতেই জানা যায়, প্রভু বৈশাখ মাসেই, সেই শকাব্দার রথযাত্রার পূর্ব্বেই, দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের জন্য নীলাচল ত্যাগ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ২।১৬।৮৩ ॥" প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসেন! প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই যে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ হইতেই তাহা জানা যায়। প্রভু গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গেই রথযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন; ইহাই নীলাচলে প্রভুর প্রথম রথযাত্রা দর্শন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা যায়—যে-শকাব্দার বৈশাখমাসে প্রভু দক্ষিণযাত্রা করেন, সেই শকাব্দা এবং তাহার পরবর্ত্তী শকাব্দায়ও প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন; তাহারও পরবর্ত্তী শকাব্দার (অর্থাৎ দক্ষিণযাত্রার শকাব্দা হইতে তৃতীয় শকাব্দার) রথযাত্রার পূর্ব্বেই প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে দুই শকাব্দায় প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই দুই শকাব্দার দুই রথযাত্রা প্রভু দর্শন করেন নাই—সুতরাং গৌড়ীয় ভক্তগণও দর্শন করেন নাই। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রাতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথম প্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করেন। তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ২।১।৪৩ ॥" আর "প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ২।১।৪৪-৪৫ ॥" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আদেশে এবং নিজেদেরও অত্যাগ্রহে গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মাত্র বিশ বৎসর নীলাচলে গিয়াছিলেন। এই বিশ বার যাওয়ার পরেই প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায়,

রথযাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে গুণ্ডিচামন্দিরে প্রভু যখন অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, গৌরীদাস আদি গৌড়ীয় ভক্তগণ সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের ১৪৫৫ শকেই প্রভুর সঙ্গে গৌড়ীয় ভক্তদের শেষ রথযাত্রা দর্শন—ইহাই তাঁহাদের বিংশতিতম রথযাত্রা দর্শন।

উক্ত আলোচনা হইতে বাইশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া যায়—প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সময়ে দুইটী এবং দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, গৌড়ীয় ভক্তদের উপস্থিতিতে বিশটী। এতদ্ব্যতীত প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রভুরই আদেশে যে গৌড়ীয় ভক্তগণ দুই বৎসরের রথযাত্রায় নীলাচলে গমন করেন নাই; তাহাও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। প্রভু যেবার গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, সেইবার গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে প্রভু গৌড়দেশবাসী ভক্তদের বলিয়াছেন—"সভা সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন। এ বৎসর নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥ ২।১৬।২৪৫॥" সে-বার প্রভু গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন বিজয়া দশমীতে; পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। প্রভুর আদেশে প্রভুর গৌড়দেশ-ভ্রমণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন নাই। এই হইল একবার। আর একবার শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তসেনের যোগে প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম। প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥ ৩।২।৩৬
এক বৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর। প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর॥ ৩।২।৩৭
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বহু কৃপা কৈলা। মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা॥ ৩।২।৩৮
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা দিল গৌড়ে যাইতে। "ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে॥ ৩।২।৩৯
এ বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে। তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥" ৩।২।৪০
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল। শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল॥ ৩।২।৪৩
চলিতে ছিলা আচার্য্য গোসাঞি রহিলা স্থির হৈয়া॥ ৩।২।৪৪

এইবারও প্রভুর আদেশে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই।

এক্ষণে জানা গেল—প্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দুই বৎসরে দুই রথযাত্রায় এবং তাহার পরে প্রভুরই আদেশে আরও দুইটী রথযাত্রায়—মোট চারিটী রথযাত্রায়—গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই; আর বিশটী রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন। এইরূপে, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চব্বিশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া গেল।

দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে প্রতি রথযাত্রাতেই যে প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভু মাত্র দুইবার নীলাচলের বাহিরে গিয়াছিলেন—একবার গৌড়ে, আর একবার ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে। প্রভুর গৌড়ে অবস্থিতি-কালের মধ্যে যে কোনও রথযাত্রা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল-ত্যাগের এবং পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যেও যে রথযাত্রা হয় নাই, তাহাই দেখান হইতেছে। গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া প্রভু বনপথে বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নীলাচলবাসী ভক্তগণ বলিলেন—"এই আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস। এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস॥ ২।১৬।২৭৯॥" তখন—"সভার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা॥ ২।১৬।২৮২॥" বর্ষার শেষে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করেন; তারপর কাশীতে আসেন। কাশীতে দুইমাস শ্রীপাদ সনাতনকে শিক্ষা দিয়া তারপর রথযাত্রার পূর্ব্বেই প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর মধ্যলীলারও শেষ হয়। ইহা হইতে জানা গেল—বৃন্দাবন-ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে প্রভুর নীলাচলে অনুপস্থিতি-সময়েও রথযাত্রা হয় নাই। এবং ইহাও জানা গেল—দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে যে কয়টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক

রথযাত্রাতেই প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। আর, প্রভুর আদেশ ব্যতীত প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি-কালের কোনও রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নিজেরা ইচ্ছা করিয়া নীলাচলে যায়েন নাই—এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক। এইরূপ প্রতি রথযাত্রাতেই প্রভুর দর্শনের জন্য তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন।

এইরূপে অকাট্য প্রমাণবলে জানা গেল—**প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে মোট রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী।** এই চব্বিশটী রথযাত্রার মধ্যে সর্ব্বশেষটী যে প্রভুর অন্তর্দ্ধানের বৎসরেই (অর্থাৎ ১৪৫৫ শকেই) হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

চব্বিশটী রথযাত্রা চব্বিশটী বিভিন্ন শকেই হইয়াছিল; তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ রথযাত্রাটী যদি ১৪৫৫ শকে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমটী যে ১৪৩২ শকেই হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রথযাত্রা সাধারণতঃ আষাঢ় মাসেই হয়; আর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন মাঘ মাসে। ১৪৩২ শকের আষাঢ় মাসের রথযাত্রাই যখন প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রা, তখন প্রভু যে **১৪৩১ শকের মাঘ মাসেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন,** তাহা অকাট্য প্রমাণবলে এবং সন্দেহাতীত রূপেই নির্ণীত হইল। ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-গ্রহণ হওয়ায় শকাব্দাঙ্কের হিসাবে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের স্থিতিকালও (১৪৩১—১৪০৭=২৪) চব্বিশ বৎসর হয় সন্ন্যাসাশ্রমের স্থিতিকালও (১৪৫৫—১৪৩১=২৪) চব্বিশ বৎসর হয়; এসম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সহিতও কোনও বিরোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীর আরও কয়েকটী উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।১।১৩।১০॥" এবং "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ২।১।১১॥" এই উক্তিদ্বয়ে "চব্বিশ বৎসর শেষে" কথার তাৎপর্য্য কি? এই কথার দুইটী অর্থ হইতে পারে—(ক) চব্বিশ বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার পরে যে মাঘমাস আসিয়াছিল, সেই মাঘমাস এবং (খ) চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের শেষভাগের মাঘ মাস। এক্ষণে প্রথমে (ক) অর্থসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসেই প্রভুর বয়স চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল; তাহার পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইবে ১৪৩২ শকের মাঘ মাস; ১৪৩২ শকের মাঘেই যদি প্রভু সন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল চব্বিশ বৎসর এগার মাস; ইহাকে চব্বিশ না বলিয়া মোটামোটী হিসাবে পঁচিশ বলাই সঙ্গত। ইহাতে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের স্থিতিকাল হয় পঁচিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমের স্থিতিকাল হয় মোটামুটী তেইশ বৎসর। কিন্তু কবিরাজ চারিস্থলে বলিয়াছেন—গৃহস্থাশ্রমের সময় চব্বিশ বৎসর এবং তিনস্থলে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসাশ্রমের সময়ও চব্বিশ বৎসর। সুতরাং (ক)-অর্থে কবিরাজের উক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। আবার ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস-গ্রহণ স্বীকার করিলে সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে রথযাত্রার সংখ্যাও হইয়া পড়ে তেইশটী; কিন্তু অকাট্য প্রমাণবলে পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে—ঐ সময়ের মধ্যে রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী। সুতরাং (ক)-অর্থ বিচারসহ নহে।

এক্ষণে (খ)-অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাস—বয়সের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে যতগুলি মাঘ মাস ছিল, তাহাদের মধ্যে শেষ মাঘ মাস—বয়সের চতুর্ব্বিংশতি মাঘ মাস। ইহা হইবে ১৪৩১ শকের মাঘ মাস। এই অর্থ গ্রহণ করিলে কবিরাজের উক্তির সঙ্গেও বিরোধ ঘটে না এবং সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চব্বিশটী রথযাত্রাও ঠিক থাকে। সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

এক্ষণে আর একটী সমস্যা হইতেছে কবিরাজের অন্য একটী উক্তি সম্বন্ধে—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতিধর্ম্মে॥ ১।৭।৩২॥" এই উক্তির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়—প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতি বর্ষেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আরম্ভ হয়। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে (ফাল্গুনের তেইশ তারিখে); প্রভু যদি ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে বা চৈত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও উক্ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইত; যেহেতু, তাহাতে সন্ন্যাসের এবং অন্তর্দ্ধানের মধ্যে চব্বিশটী

রথযাত্রা পাওয়া যাইত এবং কবিরাজের অন্য উক্তির সঙ্গেও মোটামোটী সঙ্গতি থাকিত। কিন্তু প্রভু যে মাঘ মাসেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নাই। পঞ্চবিংশতি বর্ষের মাঘ মাস হইল ১৪৩২ শকের মাঘ মাস। কিন্তু ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত যে গ্রহণীয় হইতে পারে না, পূর্ব্ববর্ত্তী (ক)-অর্থের আলোচনা-প্রসঙ্গেই তাহা দেখান হইয়াছে।

সুতরাং "পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম্ম"-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তাৎপর্য্য-মূলক অর্থ গ্রহণ না করিলে সমস্ত উক্তির সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। তাৎপর্য্যমূলক অর্থ কি হইতে পারে দেখা যাউক। ১৪৩১ শকের মাঘে সন্ন্যাস গ্রহণ; তখনও প্রভুর বয়স প্রভুর বয়স চব্বিশ পূর্ণ হয় নাই, প্রায় একমাস কম হয়; তথাপি কবিরাজ-গোস্বামী গৃহস্থাশ্রমের অবস্থিতিকালকে চব্বিশ বৎসর বলিয়াছেন—তাৎপর্য্য, প্রায় চব্বিশ বৎসর। অনধিক একমাসের অল্পপরিমিত সময়কে উপেক্ষা করা হইয়াছে। তদ্রূপ "পঞ্চবিংশতি"-শব্দের তাৎপর্য্যও হইবে—প্রায় পঞ্চবিংশতি, পঞ্চবিংশতি বৎসর আরম্ভ হয় হয়—এমন সময়ে। ইহাই তাৎপর্য্যমূলক অর্থ। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে কবিরাজের অন্যান্য উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না, অকাট্য প্রমাণবলে লব্ধ রথযাত্রার সংখ্যার সহিতও সঙ্গতি থাকেনা।

উপরের আলোচনায় "যতিধর্ম্ম"-শব্দের "সন্ন্যাস-গ্রহণ"-অর্থই ধরা হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে—যতির ধর্ম্ম, বা সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত আচরণ। সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতেছে—সন্ন্যাসের (বা যতির) বেশ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশমাত্র; ইহাকেই সন্ন্যাসীর (যতির) একমাত্র ধর্ম্ম বলা সঙ্গত হয়না; সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই যতি-সংজ্ঞা লাভ হয়। তাহার পরে আশ্রমোচিত যে ধর্ম্মের পালন করিতে হয়, তাহাই বাস্তবিক যতিধর্ম্ম। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তি হইতে এই যতিধর্ম্মের দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। "সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া। নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥ ২।৩।১৭৪॥ মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥ ২।১।২২॥ ইত্যাদি" তাহা হইলে জানা গেল—নিজের জন্মস্থান ত্যাগ, তিন বেলা স্নান, ভূমিতে শয়নাদিই হইল যতিধর্ম্ম। প্রভু স্বীয় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যখন বাস করিতে লাগিলেন, তখনই এই যতিধর্ম্মের আচরণ আরম্ভ হইল। নীলাচলে বাস করার সময়ে বিষয়ীর সংশ্রব ত্যাগ আদি অন্যান্য যতিধর্ম্মের আদর্শও প্রভু স্থাপন করিয়াছেন। প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বাস্তবিকই প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতি বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল এবং তখনই যতির আচরণরূপ ধর্ম্মেরও আরম্ভ। কবিরাজগোস্বামী হয়তো ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্ম।" যতিধর্ম্ম-শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে "পঞ্চবিংশতি"-শব্দেরও যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কোনওরূপ অসঙ্গতিও থাকে না।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখ

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তিরই আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে জানা গেল—১৪৩১ শকের মাঘ মাসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঘ মাসের কোন্ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের উক্তি হইতে সন্ন্যাসের তারিখ নির্ণীত হইতে পারে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন:—

যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে। নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ-গোসাঞি। একথা কহিবে সবে পঞ্চজন-ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। তথা আছে কেশব-ভারতী শুদ্ধনাম॥
তার স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥

আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ ॥"
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে। কহিলেন প্রভু,ইহা কেহো নাহি জানে ॥
পঞ্চজন-স্থানে মাত্র এসব কথন। কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে। সর্ব্বদিন গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন। সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে। ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে ॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর। চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর ॥
সেদিন চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে। কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের স্থানে ॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সবেই চন্দন মালা লই দুই করে ॥

* * *

দণ্ড পরণাম হৈয়া পড়ে সর্ব্বজন। এক দৃষ্টে সবাই চাহেন শ্রীচরণ ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে প্রভু—"সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণবিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন ॥"

* * *

এই মত শুভদৃষ্টি করি সভাকারে। উপদেশ কহি, আজ্ঞা করে যাইবারে ॥

* * *

এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর। ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ-শুদ্ধি করি। চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

* * *

চারিদণ্ড রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া। উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া

* * *

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥

* * *

গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর। সেই দিন আইলেন কণ্টক নগর ॥
যাঁরে যাঁরে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করিছিলা। তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥

* * *

এই মত কৃষ্ণকথা আনন্দ-প্রসঙ্গে। বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে ॥
পোহাইল নিশা সর্ব্ব-ভুবনের পতি। আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য। করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য ॥

* * *

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব-জগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥

* * *

কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে ॥

তবে সর্ব্বলোকনাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
"সর্ব্ব-শিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র"—বেদে বলে। কেশব-ভারতীস্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে-"স্বপ্নে মোরে কোনো মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন॥
বুঝি দেখ তাহা তুমি—হয় কিবা নয়।" এই বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কয়॥

* * *

ভারতী বলেন—"এই মহামন্ত্র বর। কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিল মহামতি॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি। সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর। * * *
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল। * * *
তবে নাম থুইবারে কেশব-ভারতী। মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥

* * *

যত জগতের তুমি 'কৃষ্ণ বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥'

—চৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অধ্যায়।

ইহাই হইল প্রভুর গৃহত্যাগের দিনের পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ। এই বিবরণ হইতে জানা গেল—যেদিন প্রভু গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে তিনি শ্রীমন্-নিত্যানন্দের নিকটে নিভৃতে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং প্রকাশ করার পরে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া গৃহে আসিয়া প্রভু ভোজন করেন। সন্ধ্যা সময়ে গঙ্গা দর্শনে যায়েন। গঙ্গাতীরে অল্প সময়মাত্র থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। ক্রমে ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিত হয়েন। প্রভু যে সেইদিনই গৃহত্যাগ করিবেন, একথা তাঁহারা কেহই জানিতেন না। দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দের সহিত থাকিয়া, তাহার পরে আহার করিয়া প্রভু শয়ন করেন। রাত্রিশেষ চারি দণ্ড থাকিতে উঠিয়া প্রভু বাহির হয়েন এবং শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহত্যাগ করেন। গঙ্গা পার হইয়া পরের দিন কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর আশ্রমে উপনীত হয়েন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যাদিও সেই দিনই কাটোয়াতে আসেন। গৃহত্যাগের পরের দিন সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী রাত্রি প্রভু ভক্তদের সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে অতিবাহিত করেন। তাহার পরের দিন (অর্থাৎ গৃহত্যাগের তৃতীয়দিন) "সর্ব্বদিন অবশেষে (অর্থাৎ সন্ধ্যা সময়ে)" ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়; তাহার পরে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসেন। তাহার পর কেশব-ভারতীর কর্ণে প্রভু স্বীয় স্বপ্নপ্রাপ্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রকাশ করেন। ভারতীগোস্বামী সেই মন্ত্রেই প্রভুকে সন্ন্যাস দান করেন। কেশব-ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসোচিত অরুণ-বসন এবং দণ্ড-কমণ্ডলুও দান করেন এবং প্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম রাখেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়—গৃহত্যাগের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার অল্প কিছুকাল পরেই প্রভুর সন্ন্যাস-দীক্ষা হইয়াছিল।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উল্লিখিত বিবরণ হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তাহা এই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু বলিয়াছেন।

এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥

—চৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অধ্যায়।

"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" প্রভু কি গৃহত্যাগ করিবেন, না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, উল্লিখিত পয়ার হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না; কারণ, এই পয়ারের দুই রকম অন্বয় হইতে পারে। "সন্ন্যাস করিতে

এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে আমি নিশ্চয়ই চলিব"—এই এক রকম অন্বয় ; এই অন্বয়ে—"সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" গৃহত্যাগই সূচিত হয়। আবার "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে সন্ন্যাস করিতে আমি নিশ্চয়ই চলিব"—এই হইল আর এক রকম অন্বয় ; এই অন্বয়ে "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পই সূচিত হইতেছে। প্রভুর বাস্তব অভিপ্রায় কি, তাহা বিচারের দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই বিচার করা হইবে পরে। "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।" বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহাই আগে বিবেচিত হউক। সর্ব্বাগ্রে সংক্রমণ, উত্তরায়ণ ও দিবস শব্দগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহাই দেখা যাউক।

সংক্রমণ। মেষ, বৃষ ইত্যাদি বারটী রাশি আছে ; সূর্য্যদেব এক এক মাসে এক এক রাশিতে থাকেন। একটী রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে, তাহাকেই এক মাস বলে। সূর্য্যদেব বৈশাখ মাসে থাকেন মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকেন বৃষ রাশিতে ইত্যাদি। এক রাশি হইতে অপর রাশিতে যাওয়াকে বলে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি। সংক্রমণ-সময়েই পূর্ব্বমাসের শেষ এবং পরবর্ত্তী মাসের আরম্ভ হয়। যেদিন এই সংক্রমণ হয়, তাহাকে পূর্ব্ব মাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়, ইহাই প্রচলিত রীতি। এইরূপে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যবর্ত্তী যে সংক্রান্তি, তাহাকে বৈশাখ মাসের শেষ তারিখ বলা হয়, এবং তাহা বৈশাখ মাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্যবহারিক জগতে তাহাকে বৈশাখের সংক্রান্তিও বলা হয়।

উত্তরায়ণ। বৎসরে দুইটী অয়ন আছে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। বৎসরের মধ্যে সূর্য্যদেব বিষুব রেখার উত্তরে থাকেন ছয় মাস এবং দক্ষিণে থাকেন ছয় মাস। যে সময় ব্যাপিয়া তিনি বিষুব রেখার উত্তরে থাকেন, তাহাকে বলে উত্তরায়ণ ; আর যে সময় ব্যাপিয়া তিনি বিষুব রেখার দক্ষিণে থাকেন, সেই সময়কে বলে দক্ষিণায়ন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস হইল দক্ষিণায়ন।

শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে লিখিত আছে—'উত্তরায়ণম্ সূর্য্যস্য উত্তরদিগ্‌গমনকালঃ। স তু মাঘাদিষণ্মাসাত্মকঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ।" অয়ন-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গেও শব্দকল্পদ্রুম বলিয়াছেন—"মাঘাদি ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্। শ্রাবণাদি-ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্। ইত্যমরঃ।" এইরূপে দেখা গেল—আভিধানিক হেমচন্দ্র, অমর প্রভৃতির মতে এবং শব্দকল্প-দ্রুম-অভিধানের মতেও উত্তরায়ণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ॥৮।২।২৪ ॥"—এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্—ছয়মাসব্যাপী উত্তরায়ণ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্।', শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন—"উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ।"

এইরূপে দেখা গেল—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়কেই উত্তরায়ণ বলা হয়। ইহা সর্ব্বসম্মত। অন্যরূপ অর্থ কোথাও দৃষ্ট হয় না।

তারপর "দিবস"। দিবস-শব্দে সাধারণতঃ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহর সময়কে বুঝায়। দিবসের একটী প্রতিশব্দ হইতেছে—দিন। আবার ব্যাপক অর্থেও দিন-শব্দ ব্যবহৃত হয়। "বর্ষার দিনে," "শীতের দিনে", "গ্রীষ্মের দিনে", "দুর্ভিক্ষের দিনে", "অভাব-অনটনের দিনে"—ইত্যাদি স্থলেও 'দিন"-শব্দের ব্যাপক অর্থে "সময় বা কালই" ধরা হয়। এসকল স্থলে "দিন" বলিতে একটা অষ্ট-প্রহরব্যাপী দিনকে বুঝায় না।

আলোচ্য পয়ারে "উত্তরায়ণ দিবসে" একটা অষ্টপ্রহরব্যাপী দিনকে বুঝাইতে পারে না ; কারণ, "উত্তরায়ণ" বলিতে একটামাত্র দিনকে বুঝায় না, বুঝায় ছয়মাস-ব্যাপী একটা সময়কে। সুতরাং এস্থলে দিবস-শব্দেরও ব্যাপক অর্থ—"সময় বা কাল" গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ, অর্থ-সঙ্গতি থাকিবে না। সুতরাং 'উত্তরায়ণ দিবস" বলিতে 'উত্তরায়ণ সময়ই" বুঝিতে হইবে ; উত্তরায়ণ দিবস—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়। আর "উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যের অর্থ হইবে—"উত্তরায়ণের দিবসে (সময়ে)", মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়ের মধ্যে।

এই সংক্রমণ। "এই"-শব্দে উপস্থিতি বা সামীপ্য বুঝায়। এই সংক্রমণ—যে সংক্রমণ উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ অন্তই যে সংক্রমণ; অথবা, যে সংক্রমণ নিকটবর্ত্তী, সম্মুখে যে সংক্রমণটী আসিতেছে।

তাহা হইলে, "এই সংক্রমণ"-ইত্যাদি পয়ারের অর্থ হইল—উত্তরায়ণ সময়ের মধ্যে অন্তই যে সংক্রমণটী উপস্থিত (অথবা সম্মুখে যে সংক্রমণটী আসিতেছে), সেই সংক্রমণেই "নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।"

কিন্তু প্রভু কোন্ সংক্রমণটীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন? উত্তরায়ণ-কালের মধ্যে পাঁচটী সংক্রমণ আছে—মাঘ মাসের শেষ তারিখে, ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখে, চৈত্র মাসের শেষ তারিখে, বৈশাখ মাসের শেষ তারিখে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখে। এই পাঁচটী সংক্রমণের মধ্যে কোন্ সংক্রমণের কথা প্রভু বলিয়াছেন? পৌষ মাসের শেষ তারিখের কথা হইতে পারেনা; যেহেতু, পৌষ মাস উত্তরায়ণ সময়ের মধ্যে নহে; পহিলা মাঘ হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ।

উল্লিখিত পাঁচটী সংক্রমণের মধ্যে কোন্‌টী প্রভুর অভীষ্ট, তাহা নির্ণয় করিবার উপায়, শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে পাওয়া যায় না; কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়।

কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ২।১।৩॥" সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে প্রভু যখন ফাল্গুন মাসেই নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—ফাল্গুনের পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ তারিখে যে সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই) সংক্রমণের কথাই প্রভু বলিয়াছেন।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে—প্রভু কি মাঘমাসের শেষ তারিখে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন?

কবিরাজ গোস্বামী বলেন—মাঘ মাসেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঘ মাসের শেষ তারিখে রাত্রিশেষ চারিদণ্ড থাকিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া (ইহাই শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি) গেলে মাঘ মাসের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে—মাঘ-মাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণই করিয়াছেন; গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বে—পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় দিনের শেষ রাত্রিতে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যে দিন প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু বলিয়াছিলেন—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।" তাহা হইলে এই পয়ারটীর পরিষ্কার অর্থ হইবে এই—এই সম্মুখে মাঘমাসের শেষ তারিখে যে সংক্রামণটী (বা সংক্রান্তিটী) আসিতেছে, সেই সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই আমি অন্ত চলিব (গৃহত্যাগ করিব)।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তির এই আলোচনা হইতে জানা গেল—**মাঘমাসের শেষ তারিখেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন।**

মাঘ মাসের শেষ তারিখে কোন্ সময়ে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

কথং কথমপি সর্ব্বদিন অবশেষে। ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্ব্ব-লোকনাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥

তারপর প্রভু কেশব-ভারতীর কর্ণে স্বীয় স্বপ্নপ্রাপ্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রকাশ করেন এবং সেই মন্ত্রেই তিনি প্রভুকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন।

গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ন্যাস-স্থানে আসিয়া উপবেশন এবং কেশব-ভারতী কর্ত্তৃক সন্ন্যাস-মন্ত্র দান—এতদুভয়ের মধ্যে নৃত্য-কীর্ত্তনাদির বা অপর কোনও কার্য্যে সময় অতিবাহিত হওয়ার কোনও কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। সুতরাং সন্ধ্যার অল্প কিছুকাল পরেই যে সন্ন্যাস-গ্রহণ হইয়াছিল, পরিষ্কার ভাবেই তাহা জানা যায়।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির আলোচনা হইতে পূর্ব্বেই অকাট্য-যুক্তি বলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ১৪৩১ শকেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জানা যায়, ১৪৩১ শকের মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রমণ হইয়াছিল মাঘমাসের শেষ তারিখে—২৯শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যার অল্প কিছু কাল পরে। সুতরাং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা গেল—**১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখেই সন্ধ্যার অল্প কিছু কাল পরে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন।** ঠিক সংক্রমণের সময়েই সন্ন্যাসগ্রহণ হইয়াছিল কিনা, শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

জ্যোতিষের গণনা হইতে জানা যায়—**সেই দিন পূর্ণিমা তিথিও—সুতরাং শুক্লপক্ষও—ছিল**; সুতরাং কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সঙ্গেও সঙ্গতি থাকে।

গৃহত্যাগের পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসেই যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি যে ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পৌষমাসের শেষ তারিখে যে সংক্রমণ হয়, তাহাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যে প্রভু কি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির কথাই বলেন নাই ?

উত্তর। পৌষমাসের শেষ তারিখে সংক্রমণ-সময়ে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে প্রবেশ করেন বলিয়া ঐ তারিখে যে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (উত্তরায়ণে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি) বলা হয়, তাহা সত্যই ; কিন্তু পৌষমাসের শেষ তারিখকে "উত্তরায়ণ দিবস" বলেনা ; যেহেতু, উহা "উত্তরায়ণ-কালের" অন্তর্ভুক্ত নহে ; পহিলা মাঘ হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। উত্তরায়ণ-দিবস এবং উত্তরায়ণ-সংক্রমণ এক কথা নহে।

আবার "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণও" একার্থক নহে। এই দুইটীকে একার্থক মনে করিতে হইলে "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" শব্দটীকে দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতে হয়। দুই বা ততোধিক পৃথক্ বস্তুই দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ হয় ; যেমন চক্র ও দণ্ড, দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ হইলে হইবে চক্রদণ্ড। পূর্ব্বের শব্দটিকে পরে এবং পরের শব্দটীকে পূর্ব্বে বসাইলে সমাস-বদ্ধ পদটী হইবে—দণ্ডচক্র ; তাহাতে অর্থের কোনও পরিবর্ত্তন হইবেনা ; যেহেতু, এস্থলেও দণ্ড ও চক্র এই দুইটী পৃথক্ বস্তুর পৃথকত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। ঠিক এই ভাবে, সংক্রমণ এবং উত্তরায়ণ—এই দুইটী বাস্তবিকই পৃথক্ বস্তু ; এই দুইটী পৃথক্ বস্তুকে দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ করিলে "উত্তরায়ণ-সংক্রমণও" হইতে পারে "সংক্রমণ-উত্তরায়ণও (সংক্রমণোত্তরায়ণও)" হইতে পারে। এই অবস্থায় "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" একার্থকই হইবে—চক্রদণ্ড এবং দণ্ডচক্র, এই দুইটী শব্দের ন্যায়। কিন্তু তাহাতে সমগ্র বাক্যটীর কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইবে না। তাহাই আলোচনা দ্বারা দেখান হইতেছে। সমগ্র বাক্যটী হইতেছে—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে" ॥ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বাক্যটীর দুইটী অর্থ হইতে পারে—"সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে" গৃহত্যাগ, অথবা "সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" সন্ন্যাস গ্রহণ। "চক্রদণ্ড-ভূষিত" বলিলে যেমন "চক্রভূষিত এবং দণ্ডভূষিত" উভয়ই বুঝায়, তদ্রূপ "সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" বলিলেও "সংক্রমণ দিবসে" এবং "উত্তরায়ণ দিবসে" উভয়ই বুঝাইবে। তাহা হইলে,বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হইবে—"সংক্রমণ দিবসে" (অর্থাৎ মাসের শেষ তারিখে) এবং (অথবা নহে) "উত্তরায়ণ দিবসে" (অর্থাৎ পৌষমাসের শেষ তারিখের পরে)—এই উভয় দিবসে "আমি গৃহত্যাগ করিব", অথবা "সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।" একই গৃহত্যাগ অথবা একই-সন্ন্যাস-গ্রহণ হইবে দুইটী পৃথক্ দিনে। ইহার কোনও অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে না। এই রূপে দেখা গেল—সংক্রমণ ও উত্তরায়ণ—এই দুইটী পৃথক্ বস্তুকে দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ করিলে "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" একার্থক হইলেও তাহাতে সমগ্রবাক্যের কোনও অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং এই দুইটী বস্তুকে দ্বন্দ্ব-সমাসে আবদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না, এবং তজ্জন্য "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণও" একার্থবোধক হইতে পারে না।

বাস্তবিক, "উত্তরায়ণ-সংক্রমণ" পদটীর অর্থ হইতেছে—উত্তরায়ণে সংক্রমণ, তৎপুরুষ-সমাস বদ্ধ পদ। তৎপুরুষ সমাসে আবদ্ধ দুইটী শব্দের পূর্ব্বেরটীকে পরে এবং পরেরটীকে পূর্ব্বে বসাইলে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। কারণ, তাহাতে বিভক্তির বিপর্য্যয় হয়; বিভক্তির বিপর্য্যয় হইলে অর্থেরও বিপর্য্যয় হইবে। "নন্দনন্দন" একটী তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—নন্দের নন্দন; কিন্তু "নন্দন-নন্দ" অর্থ "নন্দের নন্দন" নয়। "গৃহপতি" একটী তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—গৃহের পতি; কিন্তু "পতিগৃহ" অর্থ "গৃহের পতি" নয়। "পুরুষোত্তম" একটী তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—পুরুষগণের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; উত্তম পুরুষগণের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম, তিনিই পুরুষোত্তম; কিন্তু "উত্তম পুরুষ" অর্থ তাহা নহে। এই রূপে, তৎপুরুষ-সমাসে আবদ্ধ "উত্তরায়ণ-সংক্রমণ" শব্দকে ভাঙ্গিয়া "সংক্রমণ-উত্তরায়ণ" করিলেও অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিবে, অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবেনা। সুতরাং "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" ইত্যাদি পয়ারে "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি" বা পৌষমাসের শেষ তারিখকে বুঝাইতে পারেনা।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে' ঐ পয়ারে পৌষমাসের শেষ তারিখকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সহিতই বিরোধ ঘটে। তাহার হেতু এই।

পয়ারটীতে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বুঝাইতেছে মনে করিলে মনে করিতে হয়- হয়তো ঐ দিনে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; আর না হয়, ঐ দিনে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পৌষ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা কবিরাজগোস্বামী বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন-"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।" সুতরাং উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়। আর যদি সেই দিন প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্ন্যাস-গ্রহণ হইবে তাহার পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে—অর্থাৎ দোসরা মাঘ; কিন্তু ১৪৩১ শকের দোসরা মাঘ ছিল কৃষ্ণপক্ষ।

এইরূপে দেখা গেল. "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" বাক্যে কোনও রকমেই "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বা পৌষ-মাসের শেষ তারিখ" বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবল শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিরই আলোচনা করিয়াছি এবং এই আলোচনার ফলেই জানা গিয়াছে যে, ১৪৩১ শকের মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রমণ-দিনেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে শ্রীল মুরারিগুপ্ত এবং শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর কি বলেন, তাহাও এক্ষণে দেখান হইতেছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গার্হস্থাশ্রমের নিত্যসঙ্গী, প্রভুর আদি চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥ ৩।২।১০॥

—সূর্য্যদেব যখন মকর-রাশি হইতে কুম্ভ-রাশিতে গমন করিতেছিলেন, তখন সেই সংক্রমণ-ক্ষণেই মহাত্মা কেশব-ভারতী শ্রীহরিকে (শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে) সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়াছিলেন। (সূর্য্যদেব মাঘমাসে থাকেন মকরে এবং ফাল্গুনমাসে থাকেন কুম্ভে)।

আর শ্রীল লোচনদাসঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥
মকর নেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥—মধ্যখণ্ড।

("নেউটে" স্থলে "সেউটে" এবং "নিয়ড়ে" পাঠান্তর এবং "যেই বেলে" স্থলে "হেন বেলে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়)"

শ্রীল লোচনদাসের উক্তি শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। উভয়েই বলিয়াছেন—মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রান্তি-দিনে সংক্রমণের সময়েই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি শ্রীল বৃন্দাবনদাসের এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিরই অনুরূপ। ইঁহারা লিখিয়াছেন, সংক্রমণ-সময়েই প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাহা পরিষ্কারভাবে না লিখিলেও তিনি লিখিয়াছেন, সন্ধ্যার অল্প পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা

হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সেদিন সংক্রমণও হইয়াছিল সন্ধ্যার অল্প পরে। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে মুরারিগুপ্তের বা লোচনদাসের কোনও বিরোধ নাই।

অতি আধুনিক বিরুদ্ধ বাদ

সম্প্রতি একটী অতি আধুনিক বিরুদ্ধবাদ আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক আনন্দ-বাজার পত্রিকার ইংরেজী ৭।৮।১৯৪৯ তারিখের পত্রিকায় একজন বিরুদ্ধবাদী এবং ইংরেজী ৬।১১।১৯৪৯ তারিখের পত্রিকায় আর একজন বিরুদ্ধবাদী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহাদের উক্তি এবং যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

(১) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির কথাই বলা হইয়াছে; "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" অর্থ যাহা, "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" অর্থও তাহাই।

মন্তব্য। এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, পূর্ব্বেই আমরা তাহা দেখাইয়াছি।

(২) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন এবং পহিলা মাঘ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্তব্য। শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রভুর গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের মধ্যে একটী রাত্রি ছিল; প্রভু কাটোয়াতে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে (পৌষমাসের শেষ তারিখে) রাত্রিশেষ চারিদণ্ড থাকিতে গৃহত্যাগ করিয়া পহিলা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোনও রাত্রি থাকে না। তাহাতে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রসে সন্ন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রি অতিবাহিত করার কথাও মিথ্যা হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"রাত্রির শেষ চারি দণ্ডকে আগামী দিনের অরুণোদয়-কাল বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উত্তরায়ণ-সংক্রমণ দিবসারম্ভে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সন্ন্যাস করিতে যাত্রা করিলেন।"—অর্থাৎ সংক্রান্তি দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করেন; সংক্রান্তি-দিনের সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী রাত্রিটী প্রভু কাটোয়াতে কৃষ্ণকথা-রসে অতিবাহিত করেন; তাহার পরের দিন পহিলা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি অনুসারে কোনও এক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বপর্য্যন্ত সময়কেই এক দিন বা এক দিবস বলিয়া গণ্য করিতে হয়; কিন্তু ইহা যে ঠিক নয়, এক সূর্য্যোদয় হইতে আর এক সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কেই যে এক দিন বা এক দিবস বলিয়া গণ্য করা হয়, যে কোনও পঞ্জিকার পাতা উল্টাইলেই যে কোনও ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইবেন। এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে দিন ধরিয়াই যে ত্র্যহস্পর্শাদির বিচার করা হয়, পঞ্জিকায় তাহাই দেখা যায়। একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা অনুসারে বাঙ্গালা ১৩৫৯ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ত্র্যহস্পর্শ। সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পরে নবমী আছে দং ১।১২, তারপর দশমী দং ৫৭।২৫ (শেষরাত্রি ঘ ৪।১৮ মিঃ) পর্য্যন্ত; তার পর একাদশী। পরের দিন ৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার সূর্য্যোদয় হইয়াছে ঘ ৫।১৯।৩৯ সে, সময়ে। তাহাতে দেখা গেল, সোমবারের সূর্য্যোদয়ের মাত্র ঘ ১।১।৩৯ (অর্থাৎ দং ২।৩৪।১০—চারিদণ্ড অপেক্ষা দং ১।২৫।৫০ কম সময়) পূর্ব্বে একাদশীর আরম্ভ। সোমবার সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে একাদশী ছিলনা, ছিল দশমী। আর ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবারে প্রাতঃকাল ঘ ৭।৩৪ এর পরেই নবমী আরম্ভ হয়; এই নবমী রবিবারের সূর্য্যোদয়ের পরেও দং ১।১২ পর্য্যন্ত ছিল। ইহাতে দেখা যায়, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবারের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সোমবারের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ডের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের দিনের মধ্যে) তিথি থাকে মাত্র দুইটি—নবমী ও দশমী, তিনটী তিথি থাকেনা। তাঁহাদের মত মানিয়া চলিলে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ত্র্যহস্পর্শ হয় না। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে দিন ধরিলেই তিনটী তিথি থাকে, ত্র্যহস্পর্শও হয়।

পূর্ব্ববিদ্ধা তিথির ব্রতাদি-বিচারেও সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কেই এক দিন ধরা হয়, বিরুদ্ধবাদীদের কল্পিত সময়কে দিন ধরা হয় না। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন—সংক্রান্তি-দিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রির (অর্থাৎ প্রচলিত রীতি অনুসারে সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনের রাত্রির) শেষ চারিদণ্ড থাকিতেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন—একথা বিচারসহ নহে এবং তাহাতে পহিলা মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণের উক্তিও বিচারসহ হইতে পারে না।

(৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি-সমূহের আলোচনা করিয়া ইংরেজী ৭।৮।১৯৯৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বিরুদ্ধবাদীরা লিখিয়াছিলেন—"শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যখন চব্বিশ বৎসর বয়স প্রায় অতিক্রম হয়, অর্থাৎ ২৩ বৎসর ১১ মাস পুর্ণ হইবার পর এবং ২৫ বৎসর বয়সের অব্যবহিত পুর্ব্ব সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।"

এই উক্তিদ্বারা তাঁহারা ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-গ্রহণই স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশ্য এস্থলেও তাঁহারা পহিলা মাঘই সন্ন্যাসের তারিখ বলিয়াছেন।

কিন্তু যখন পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মতে ১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ কৃষ্ণপক্ষ, তখন তাঁহারা আবার মত পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরেজী ৬।১১।১৯৪৯ তারিখের আনন্দবাজারে লিখিলেন—১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই; যেহেতু, ১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ শুক্লপক্ষ ছিলনা। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন —১৪৩২ শকের পহিলা মাঘ শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরে। তাঁহারা বলিয়াছেন—সেই দিন শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ড পর্য্যন্ত অমাবস্যা ছিল; ৫৫ দণ্ডের পরে শুক্লা প্রতিপদ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং ৫৫ দণ্ড বাদ দিয়া শুক্লপক্ষের আরম্ভে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্তব্য। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরের এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বের রথযাত্রার সংখ্যা সম্বন্ধীয় অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ করিয়া আমরা পুর্ব্বেই দেখাইয়াছি—১৪৩১ শক ব্যতীত অন্য কোনও শকে সন্ন্যাস গ্রহণ স্বীকার করিতে গেলে কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি থাকেনা; সুতরাং ১৪৩২ শকে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ বিচারসহ নহে।

শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরে সন্ন্যাস গ্রহণও বিচারসহ নহে; যেহেতু বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—সন্ধ্যার অল্প পরেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মত গ্রহণ করিলে বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়।

(৪) তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়াছেন :—১৪৩২ শকের পহিলা মাঘ সন্ধ্যাসময়ে প্রভু সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসেন এবং কেশবভারতীর কর্ণে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র প্রকাশ করেন। শুনিয়া কেশবভারতী বলিলেন—ইহাইতো মহামন্ত্রবর, কৃষ্ণের প্রসাদে তোমার কিছুই অগোচর নহে। তুমিই সেই কৃষ্ণ (এপর্য্যন্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তির সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির ঐক্য আছে। বিরুদ্ধবাদীরা ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসের পুর্ব্বের ঘটনা নহে, পরের ঘটনা। যাহা হউক, তাঁহারা বলিতেছেন)। প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কেশবভারতী প্রেমে মত্ত হইলেন। প্রভুও পরম সন্তোষে গুরুর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। (এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা নিম্নলিখিত পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

> সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য। দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥—চৈ, ভা, ৩।১।১০
> চারিবেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর। তার সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥—চৈ, ভা, ৩।১।১০
> এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥

তার পরে বিরুদ্ধবাদীরা লিখিয়াছেন :—ইহাতে "অনুমান" হয়, প্রভু সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমরসে মত্ত হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যেমন সর্ব্বদিন অবশেষ হইয়াছিল, প্রেমোন্মাদে নর্ত্তন-কীর্ত্তনে সন্ন্যাস-গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেও তেমনি "বোধহয়" সর্ব্বরাত্রি অবশেষ হইয়াছিল। রাত্রিশেষে ৫৫

দণ্ডের পরে প্রভু শ্রীকেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া "অনুমান" হয়। (অনুমান এবং বোধহয়-শব্দদুইটীকে আমরাই কোটেশন-চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছি)।

মন্তব্য। সন্ন্যাসের স্থানে প্রভুর উপবেশনের পরে এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে কোনও নৃত্যকীর্ত্তনের কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখেন নাই।

সন্ন্যাসের রাত্রিতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য-খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর ॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥
"বোল বোল" বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥"

† † †

কোন্ দিকে দণ্ডকমণ্ডলু বা পড়িলা। নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া। আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন। ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥
পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি। সুকৃতী ভারতী নাচে হরি হরি বলি ॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে। গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া। সর্ব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য। দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥
চারিবেদে ধ্যানে যাঁরে দেখিতে দুষ্কর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥

† † †

এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। চলিলেন গুরুস্থানে বিদায় মাগিয়া ॥—চৈ, ভা, অন্ত্য ১ম অধ্যায়

উদ্ধৃত বিবরণের শেষের দিকে মোটা অক্ষরে যে তিনটী পয়ার দৃষ্ট হইতেছে, বিরুদ্ধবাদীরা এই তিনটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এই তিনটী পয়ারে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃত্যকীর্ত্তনই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পয়ারগুলি যে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের উদ্ধৃত পয়ার তিনটীও যে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী নৃত্য-কীর্ত্তনের কথাই প্রকাশ করিতেছে, উপরে উদ্ধৃত পয়ারগুলি যিনি দেখিবেন, তিনি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

রাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা বিরুদ্ধবাদীদের, "অনুমান-মাত্র", তাঁহাদের 'বোধ হওয়া" মাত্র, একথা তাঁহারাই স্পষ্টকথায় বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমানের কোনও নির্ভরযোগ্য হেতু তাঁহারা দেখান নাই। ইহা বরং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির বিরোধীই।

(৫) বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত পদটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, মহাপ্রভু পহিলা মাঘ তারিখেই যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই পদটী হইতে জানা যায় :—

"ইহ পহিল মাঘ কি মাহ, সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ।"

মন্তব্য। এই পদের প্রথমার্দ্ধের অর্থ যদি পহিলা মাঘ ধরিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও সেই তারিখে প্রভুর গৃহত্যাগের কথাই পদটী হইতে জানা যায়, পহিলা মাঘে সন্ন্যাসের কথা জানা যায় না। পহিলা মাঘে—সব

ছাড়িয়া আমার (বিষ্ণুপ্রিয়ার) নাথ (মহাপ্রভু) চলিয়া গেলেন—একথাই পদটী বলিতেছে। সুতরাং এই পদটী কল্পিত পহিলা মাঘে সন্ন্যাস-গ্রহণের সমর্থক নহে।

বাস্তবিক, উল্লিখিত পদের প্রথমার্দ্ধের অর্থ মাঘ মাসের প্রথম তারিখ নহে। পদকর্ত্তা শচীনন্দন দাস তাঁহার বারমাসিয়া-বর্ণন মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসে শেষ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় মাঘমাসই প্রথম (পহিল) মাস; তাহাই উক্ত পয়ারার্দ্ধে বলা হইয়াছে। "ইহ (ইহাতে এই বারমাসিয়া বর্ণনায়) পহিলা (প্রথম হইল) মাঘ কি মাহ (মাঘ মাস)"—ইহাই অর্থ। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীতে শ্রীশচীনন্দন দাসের পরেই শ্রীভুবনদাস-বর্ণিত বার-মাসিয়ার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনিও মাঘ মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসে শেষ করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন,—

"পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর, দুঃখ সাগরে মুঝে ডালি।
রজনীক শেষ, সেজ সঞে ধায়ল, নদীয়া করি আঁধিয়ারি॥"

আবার, তিনি ফাল্গুনের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন এই ভাবে :—

দোসর ফাল্গুন, গুণ সঞে নিমগন, ফাগুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গিয়া, মৃদঙ্গ বাজাওত, গাওত কতহু তরঙ্গ॥

ফাল্গুনের বর্ণনায় পদকর্ত্তা শ্রীভুবনদাস দোলযাত্রায় ফাগু-খেলার এবং মৃদঙ্গ-সহকারে কীর্ত্তনের কথা বর্ণন করিয়াছেন। দোলযাত্রা হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ফাল্গুন মাসের দোসরা তারিখে কখনও ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের স্থিতি হয়, সেই নক্ষত্রের নাম অনুসারেই পূর্ণিমার নাম হয়, এবং তাহা যেই মাসের পূর্ণিমা, সেই মাসের নামও সেই নক্ষত্রের নাম অনুসারেই হইয়া থাকে। এই পূর্ণিমা কখনও মাসের দোসরা তারিখে হইতে পারে না। পঞ্জিকা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারেন—কোনও মাসের পূর্ণিমা সেই মাসের প্রথমাংশের পরেই হয়; কখনও কখনও বা পরবর্ত্তী মাসেও হইয়া থাকে; তাই কোনও বৎসরে চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হইয়া থাকে; সুতরাং দোলযাত্রা-বর্ণনাত্মক উল্লিখিত পদে পদকর্ত্তা যে "দোসর ফাল্গুন" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ দোসরা ফাল্গুন হইতে পারে না। "দোসর ফাল্গুন—দ্বিতীয় ফাল্গুন"—বাক্যে তিনি বলিয়াছেন—তাঁহার বর্ণনায় ফাল্গুন মাসই দ্বিতীয়—দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মাঘ মাসের বর্ণনার প্রারম্ভে তিনি যে বলিয়াছেন,—"পহিলহি মাঘ", তাহাদ্বারাও পদকর্ত্তা জানাইয়াছেন যে,—তাঁহার বর্ণনায় মাঘমাসই প্রথম স্থানে। মাঘের বর্ণনায় শ্রীভুবনদাস ইহাও বলিয়াছেন যে—নদীয়া আঁধার করিয়া প্রভু রজনীর শেষ ভাগে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারাও বুঝা যায়,—"পহিলহি মাঘ" অর্থ মাঘমাসের প্রথম তারিখ নহে; যেহেতু, মাঘ মাসের প্রথম তারিখে শেষ রাত্রিতে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা অপর কেহ বলেন নাই, বিরুদ্ধবাদীরাও বলেন না। বারমাসিয়ার মাঘমাসের বর্ণনায় শ্রীশচীনন্দন দাস ও শ্রীভুবনদাস এই উভয় পদকর্ত্তাই প্রভুর গৃহত্যাগের কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা উভয়েই বলিতেছেন—মাঘ মাসেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, পৌষমাসে (উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে) নহে।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—শ্রীশচীনন্দন দাসের "পহিল মাঘ কি মাহ" এবং শ্রীভুবনদাসের "পহিলহি মাঘ" পদাংশে মাঘ মাসের প্রথম তারিখ বুঝাইতেছেনা, বুঝাইতেছে—তাঁহাদের বর্ণনায় প্রথম মাস হইল মাঘ মাস এবং শ্রীভুবনদাসের "দোসর ফাল্গুন"-বাক্যেও দোসরা ফাল্গুন বুঝাইতেছেনা, বুঝাইতেছে—বারমাসিয়া বর্ণনায় ফাল্গুন হইতেছে দ্বিতীয় মাস।

এইরূপে দেখা গেল—বারমাসিয়ার পদ প্রাচীন গ্রন্থকারদের উক্তিরই সমর্থন করিতেছে, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির সমর্থন তো করিতেছেই না, বরং ইহা তাঁহাদের উক্তির প্রতিকূল।

(৬) বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন—"শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রেমছলে ভুলাইয়া ৫ই মাঘ তারিখে

শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন।" সম্ভবতঃ ঐতিহ্যিক প্রমাণ দেখাইবার জন্য তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন—"শ্রীধাম শান্তিপুরে সন্ন্যাসান্তে ভক্ত-সম্মেলন উৎসব প্রতিবর্ষে ৫ই মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত হইতেছে।"

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদীদের এই উক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যেই প্রতিবর্ষে উৎসব হয়। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে তাঁহার আবির্ভাব। শান্তিপুরের গোস্বামিপাদগণ মাঘী শুক্লা প্রতিপদে উৎসবের অধিবাস করিয়া সপ্তমীতে উদ্‌যাপন করেন। এই উৎসবের তারিখ পঞ্জিকাতেও প্রতি বর্ষে উল্লিখিত হয়। এই উৎসবের অধিবাস যে প্রতি বর্ষে ৫ই মাঘই হয়, তাহাও নহে। ১৩৫৪ সনের পঞ্জিকায় দেখা যায়—মাঘী শুক্লা প্রতিপদ পড়িয়াছিল ২৮শে মাঘ বুধবারে এবং সেই দিনই শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসবের মঙ্গলাধিবাস। সেই বৎসরের ৫ই মাঘ শান্তিপুরে কোনও উৎসবের কথা কোনও পঞ্জিকাতেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন—শান্তিপুরে প্রতিবর্ষে ৫ই মাঘ তারিখে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে ভক্তসম্মিলন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই।

তাঁহাদের উক্তির সমর্থক কোনও ঐতিহ্যিক প্রমাণ বর্ত্তমানে না থাকিলেও বিরুদ্ধবাদীরা যে ঐতিহ্যিক প্রমাণ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই মনে হইতেছে। একথা বলার হেতু এই। তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্প্রতি একটি পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে; এই পঞ্জিকাতে পহিলা মাঘ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিতেছেন এবং তাঁহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে কয়েকটী স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের স্মরণে অনুষ্ঠানাদির কথাও উল্লেখ করিতেছেন। কোনও কৌশলে অন্য কোনও পঞ্জিকার উপরে যদি তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য পত্রিকাতেও ভবিষ্যতে ঐরূপ কথা প্রচারিত হইতে পারে। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেছেন, এই উপায়েই তাঁহাদের সমর্থক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বহু বৎসর যাবৎ নিজেদের পঞ্জিকায় বা অন্য পঞ্জিকাতেও এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিলেও এবং কোনও স্থানে তদনুকূল অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে ঐতিহ্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করিবেন না, ঐতিহ্য-সৃষ্টির আধুনিক কৃত্রিম প্রয়াস বলিয়াই মনে করিবেন; যেহেতু, তাঁহাদের এইরূপ প্রচার-কার্য্যের মধ্যেই আধুনিকতা এবং কৃত্রিমতার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। একথা কেন বলা হইল, তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মাদি কখনও সৌর মাসের তারিখ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই, এখনও হইতেছে না; সমস্তই অনুষ্ঠিত হয় চান্দ্রমাস অনুসারে; তিথিকে চান্দ্রমাসের তারিখ মনে করা যায়; তিথি অনুসারেই সমস্ত ব্রতাদি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবও বিশেষ তিথিতেই (জন্মাষ্টমী বা রামনবমী তিথিতেই) উদ্‌যাপিত হয়; কোনও সৌর মাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে উদ্‌যাপিত হয় না। এমন কি, পরলোকগত পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধও প্রতি বৎসরে তাঁহাদের মৃত্যু-তিথিতেই অনুষ্ঠিত হয়, কখনও সৌরমাসানুসারে মৃত্যু-তারিখে অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমানেরাও চান্দ্রমাস অনুসারেই তাঁহাদের ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাই রমজান ব্রতের বা ইদজ্জোহা-ব্রতের প্রাক্‌কালে তাঁহাদিগকে চন্দ্রের সন্ধানে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথির উদ্‌যাপনও বৈশাখী পুর্ণিমাতেই হইয়া থাকে, কোনও সময়েই বৈশাখমাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে ইহার উদ্‌যাপন হয় না (১৩৬০ বঙ্গাব্দে এই তিথি পড়িয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসে)। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের তিরোভাবাদিও তাঁহাদের তিরোভাবের তিথিতেই উদ্‌যাপিত হয়। একমাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব-দিনের উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন, সৌর মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে—২৫শে ডিসেম্বরে। ইহারই অনুকরণে এক্ষণে আমাদের দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ঠাকুর হরনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুরুষ-দিগের আবির্ভাবাদিও সৌর মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে উদ্‌যাপিত হইতেছে। মনে হয় ইহা ইংরেজশাসনেরই ফল, ইংরেজ-সংস্কৃতিদ্বারা ভারতীয়দের পরাজয়ের চিহ্ন। আবার কেহ কেহ ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত যে না

আছেন, তাহাও নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ-আদি মহাপুরুষের আবির্ভাবাদি চান্দ্র মাসের তিথি অনুসারেই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সৌরমাস অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আদির আবির্ভাবাদির উদ্‌যাপন-রীতি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের অনুকূল নহে; ইহা আধুনিক এবং ইংরেজ-শাসনের শেষভাগে বা ইংরেজ-শাসনের অবসানের পরে ইংরেজ-সংস্কৃতির অনুকরণেই অবলম্বিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরাও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ বা বৈষ্ণব-আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ-সংস্কৃতির অনুকরণেই পহিলা মাঘে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রচার করিতেছেন। বহুকাল এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিলেও বিচারজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন—ইংরেজ-শাসনের শেষভাগে বা অবসানের পরেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে; ইহা প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকূল নহে, ঐতিহ্য-সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণের অনুগত বৈষ্ণব-সমাজে প্রভুর সন্ন্যাস-তিথির উদ্‌যাপন কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার হেতু এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব বা মথুরাগমন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু-আদির তিরোভাব বৈষ্ণবদের পক্ষে যে রূপ হৃদয়-বিদারক, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসও তাঁহাদের পক্ষে তদ্রূপ হৃদয়-বিদারক। তাই শ্রীকৃষ্ণাদির তিরোভাব-তিথি আদির উদ্‌যাপন যেমন তাঁহারা করেন না, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-তিথির উদ্‌যাপনও তেমনি তাঁহারা করেন না; যদি করিতেন, চান্দ্রমাস অনুসারে সন্ন্যাসের তিথিতেই করিতেন, সৌরমাস অনুসারে সন্ন্যাসের তারিখে করিতেন না। তাহার কারণ পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৭) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন –কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, "মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল। প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্য গীত কৈল॥ চৈ, চ॥" ইহার পরে তাঁহারা বলেন—"১লা মাঘ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ২রা, ৩রা, ৪ঠা মাঘ এই তিন দিন প্রেমে বিহ্বল হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন। * * শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রেমছলে ভুলাইয়া ৫ই মাঘ তারিখে শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু নিজগৃহে প্রভুর দশ দিন সেবা করেন। * * ৫ই মাঘ হইতে ১৪ই মাঘ এই দশদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীধাম শান্তিপুরে অবস্থান করেন। ১৫ই মাঘ তারিখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলের পথে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং আটিসারা, ছত্রভোগ, প্রয়াগঘাট, গঙ্গাঘাট, শ্রীগ্রাম, দানিঘাটি, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধ আদিবরাহ, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর, কমলপুর, আঠার নালা প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তন, নর্ত্তন, দেবদর্শন, ভোজন, বিশ্রাম করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করেন। ঐ সকল স্থানে এক এক দিনে গমন ও এক এক দিন মাত্র বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ধরিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত উক্ত স্থানসমূহে গমন, কীর্ত্তন, নর্ত্তন, দেবদর্শনও ভোজন-বিশ্রামে প্রভুর অন্ততঃ ২২ দিন অতীত হয়। অতএব প্রভু ৭ই ফাল্গুন নীলাচলে আগমন করেন * *। যদি ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিনে প্রভুর সন্ন্যাস ধরা হয়, তাহা হইলে ১লা, ২রা, ৩রা, ফাল্গুন রাঢ়দেশে ভ্রমণ, ৪ঠা ফাল্গুন হইতে ১৪ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীধাম শান্তিপুরে অবস্থিতি, ১৫ই ফাল্গুন হইতে ২২ দিন শ্রীনীলাচলের পথে গমন, সুতরাং ৭ই চৈত্রের পুর্ব্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন সম্ভব হয় না। ইহাতে শ্রচৈতন্যচরিতামৃতের পুর্ব্বোক্ত 'ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস', 'ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিলা' ইত্যাদি প্রমাণ-বচনের অন্যথা হইতেছে।"

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদিগণ মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পথে বাইশটী স্থানের উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক স্থানেই এক দিন করিয়া প্রভুর বিশ্রাম ধরিয়া শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাইতে প্রভুর বাইশ দিন সময় লাগিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই হিসাবে যে ত্রুটী আছে, তাহা দেখান হইতেছে।

প্রথমে বিরুদ্ধবাদীদের উল্লিখিত স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রয়াগ-ঘাট ও গঙ্গাঘাট। ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রভু "প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল

দেশে ॥ উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগঘাটে। নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥ * * ॥ সেই স্থানে আছে—তার 'গঙ্গাঘাট' নাম। তঁহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ॥ যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে। স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে ॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" সুতরাং প্রয়াগ-ঘাট পৃথক একটী স্থান নহে ; যে নদী দিয়া প্রভুর নৌকা গিয়াছিল, সেই নদীরই একটী ঘাট এবং তাহার নিকটে গঙ্গাঘাটও আর একটী ঘাট

শ্রীগ্রাম। এই গ্রামের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। গঙ্গাঘাটে স্নানান্তে মহেশ দর্শন করিয়া "এক দেবস্থানেতে থুইয়া সবাকারে। আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥" —এইরূপ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রভু যে গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেই গ্রামকেই বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীগ্রাম বলিতেছেন কি না জানিনা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও প্রয়াগ-ঘাট, গঙ্গাঘাট ও শ্রীগ্রাম এই তিন স্থানেই প্রভু যে তিন দিন গিয়া তিন দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রয়াগ-ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাঘাটে স্নান করিয়া প্রভু মহেশ দর্শন করেন, তার পরে ভিক্ষায় যায়েন। একটী দিনেরই ঘটনা।

দানী ঘাটী। ইহা একটী পথকর আদায়ের স্থান ; দেবদর্শন, নৃত্যগীতাদির স্থান নহে। এস্থানে প্রভু একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন বা ভিক্ষা করিয়াছিলেন—একথা শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই।

সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখাতে স্নান করিয়াই প্রভু চলিয়া যায়েন ; কতদূর যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন। "সুবর্ণরেখার জল পরম নির্মল। স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল ॥ স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি। চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥ রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র। সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥ কতদূরে গৌর-চন্দ্র বসিলেন গিয়া। নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা লাগিয়া ॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভুর দণ্ড রাখিয়া জগদানন্দ ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে যায়েন ; এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা হওয়ার পরে প্রভু একাকীই চলিয়া গেলেন, সেই স্থানে বিশ্রাম বা ভোজনের কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন না।

বাঁশদা। এস্থানে এক শাক্ত-সন্ন্যাসী তাঁহার মঠে "আনন্দ—মদ" সহযোগে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে আহ্বান করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে স্থানে প্রভু ভিক্ষা বা বিশ্রাম করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় না।

যাজপুর, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধ, আদিবরাহ—এই পাঁচটী স্থানে প্রভু পাঁচটী পৃথক্ দিনে গিয়াছেন এবং পাঁচদিন বিশ্রাম করিয়াছেন বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা পাঁচটী পৃথক স্থান নহে ; এক যাজপুরেরই অন্য চারিটী স্থান এবং প্রভু এক দিনেই এই কয়টী স্থান দর্শন করিয়াছেন। "কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণ-নগর ॥ যঁহি আদিবরাহের অদ্ভূত প্রকাশ। যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ববন্ধ নাশ ॥ মহাতীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী। * * */ নাভিগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান। যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ ॥ যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান। লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি সব নাম ॥ দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান। কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম ॥ প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি। স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি ॥ তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ-সম্ভাষে। বিস্তর করিলা নৃত্যগীত প্রেমরসে ॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" পরে প্রভু সকল সঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া একাকী পলাইয়া গেলেন। সঙ্গিগণ নানা দেবালয়ে প্রভুকে অন্বেষণ করিয়াও পাইলেন না। প্রভুর অপেক্ষায় সকলে সেই রাত্রি যাজপুরে রহিয়া গেলেন এবং "ভিক্ষা করি আনি সবে করিলা ভোজনে।" পরে "প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর গ্রাম। দেখিয়া যতেক যাজপুর পুণ্যস্থান ॥ সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া। আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া। আথে ব্যথে ভক্তগণ হরি হরি বলি। উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী। সবা সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি। চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।"

কটক ও সাক্ষিগোপাল। কটকেই তখন সাক্ষিগোপাল ছিলেন; কটক ও সাক্ষিগোপাল দুইটী পৃথক্ স্থান নহে; সাক্ষিগোপাল-দর্শনের জন্যই প্রভুর কটকে আসা। এই দুই স্থানে প্রভু এক দিনই ছিলেন, দুই দিন নয়।

ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর ও কমলপুর। কমল-পুরেই ভার্গীনদী এবং কপোতেশ্বর। "উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥ দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" "কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল। নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল; কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে॥ চৈ, চ, ২।৫।১৪০-৪১॥" এস্থানে প্রভু বিশ্রাম করেন নাই; কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে নীলাচলের দিকে চলিলেন; এস্থান হইতে নীলাচল মাত্র "তিন ক্রোশ পথ (২।৫।১৪৫)॥ যাহা হউক ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর ও কমলপুরকে তিনটী দূরবর্ত্তী পৃথক স্থান দেখাইয়া বিরুদ্ধবাদীরা এসকল স্থানে প্রভুর তিন দিন বিশ্রামের কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ প্রভু এক দিনও বিশ্রাম করেন নাই।

আঠার নালা। পুরীর সংলগ্ন স্থান। কমলপুর হইতেই প্রভু এস্থানে আসেন এবং বিশ্রাম না করিয়াই জগন্নাথ-মন্দিরে যায়েন; সেদিন প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীগণ ভিক্ষা করিয়াছিলেন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায়, বিরুদ্ধবাদীরা প্রয়াগ-ঘাট ও গঙ্গাঘাটে এক দিনের স্থলে দুই দিন, যাজপুর, আদিবরাহ, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধে এক দিনের স্থলে পাঁচ দিন, কটক ও সাক্ষিগোপালে এক দিনের স্থলে দুই দিন প্রভুর বিশ্রাম দেখাইতে চেষ্টা করিয়া প্রভুর নীলাচল-গমনের সময় মোট ছয় দিন বাড়াইয়াছেন; আবার দানীঘাটি, শ্রীগ্রাম, সুবর্ণরেখা, বাঁশদা, কমলপুর, ভার্গীনদী, কপোতেশ্বর এবং আঠার নালায় এক এক দিন বিশ্রাম দেখাইয়াও প্রভুর নীলাচল গমনের সময় মোট আট দিন বাড়াইয়াছেন; এইরূপে মোট চৌদ্দ দিন সময় বাড়াইয়া তাঁহারা নীলাচল-গমনের সময় নির্ণয় করিয়াছেন "অন্ততঃ বাইশ দিন"। এই বাইশ দিন হইতে অতিরিক্ত চৌদ্দ দিন বাদ দিলে বিরুদ্ধবাদীদের মতেই প্রভুর নীলাচল গমনের সময় দাঁড়ায় অন্ততঃ আট দিন। কিন্তু প্রভু যে কেবল আট দিনেই শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহা নহে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মাত্র এই আটটী স্থানে প্রভুর রাত্রিতে বিশ্রামের কথা বলিয়াছেন:— আটিসারা, ছত্রভোগ, গঙ্গাঘাট, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, কটক এবং ভুবনেশ্বর। আবার সুবর্ণরেখা এবং যাজপুরে প্রভুর উপস্থিতির পূর্ব্বে "কত দিনে উত্তরিলা" বলিয়াও শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন। "কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে।" 'কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণনগর॥" সুতরাং প্রভু উল্লিখিত আটটী স্থানেই মাত্র আটদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন; তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। আট দিনের বেশীই বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইতে প্রভুর বাস্তবিক কতদিন লাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে যাইতে শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর বার দিন সময় লাগিয়াছিল। তার মধ্যে প্রথম দিন তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে কেবল পূর্ব্ব দিকেই গিয়াছিলেন। সেই দিনের গমন তাঁহার নিষ্ফল হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে গেলে হয়তো তাঁহার এগার দিনই লাগিত। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি আবার প্রসিদ্ধ পথেও যান নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া উপ-পথে গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পথে গেলে হয়তো আরও কম সময় লাগিত। তথাপি এগার দিনই ধরা গেল। প্রভু গিয়াছেন শান্তিপুর হইতে। শান্তিপুর ও সপ্তগ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে নীলাচলের দূরত্ব প্রায় সমানই। মহাপ্রভুর পক্ষে আরও দুই একদিন বেশী লাগিয়াছিল মনে করিলেও ১২।১৩ দিন লাগিবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ তারিখে প্রভু কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ তারিখে শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন চরিতকারদের উক্তি

অনুসারে মাঘ মাসের শেষ তারিখেই প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং পহিলা ফাল্গুন প্রভাতে কাটোয়াত্যাগ স্বীকার করিয়াই আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি পৃথক্ ভাবেই আলোচিত হইবে।

কবিরাজের উক্তি। ১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে কাটোয়া ত্যাগ করিয়া প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিয়া তিন দিনের উপবাসের পরে প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া আহার করেন—৪ঠা ফাল্গুন। এই ৪ঠা ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভু দশ দিন শান্তিপুরে থাকেন—১৩ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত। ১৪ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে নীলাচলের দিকে রওনা হয়েন।

বৃন্দাবনদাসের উক্তি। তাঁহার উক্তি তিন রকম; পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

(ক) কাটোয়া ত্যাগ করিয়া প্রভু বক্রেশ্বর শিবের অভিমুখে চলিলেন। "দিন অবশেষে প্রভু ধন্য এক গ্রামে। রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥" পরের দিন বক্রেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিয়া কিছুদুর যাইয়া গঙ্গার দিকে ফিরিয়া যাত্রা করিয়া—"সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে।" এবং "নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে" বাস করিয়া পরের দিন শ্রীমন্নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া নিজে কুলিয়ায় গেলেন। কুলিয়া হইতে পরের দিন প্রভু শান্তিপুরে যায়েন। তাঁহার উপস্থিতির পরে সেই দিনই নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দও শান্তিপুরে আসিয়া উপনীত হয়েন। প্রভু "সুখে গোঙাইল রাত্রি ভক্তগণ সঙ্গে॥ পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য। বসিলেন চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব ভৃত্য॥ প্রভু বলে—আমি চলিলাম নীলাচলে।" সেই দিনই প্রভু নীলাচল যাত্রা করেন। বৃন্দাবনদাসের মতে প্রভু একদিন মাত্র শান্তিপুরে ছিলেন। শচীমাতার শান্তিপুরে গমনের কথা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—কাটোয়া-ত্যাগের দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাতীরে, তৃতীয় দিনে কুলিয়ায় এবং চতুর্থ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুনে) প্রভু শান্তিপুরে আসেন এবং ৫ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে নীলাচল যাত্রা করেন।

(খ) উল্লিখিত বিবরণ দেওয়ার আনুষঙ্গিকভাবে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে প্রভু যখন শিশুদের মুখে হরিধ্বনি শুনিলেন, তখন বলিলেন—"দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম। কাহারো মুখেতে না শুনিলাম হরিনাম॥" ইহাতে বুঝা যায়, গঙ্গাতীরে উপনীত হইতে প্রভুর প্রায় চারিদিন লাগিয়াছিল। যেই দিন শিশুদের মুখে হরিনাম শুনিয়া উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালেই প্রভু গঙ্গাতীরে পৌছেন; ইহা হইবে সম্ভবতঃ ৪ঠা ফাল্গুন। তাহা হইলে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন—৬ই ফাল্গুন এবং নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন—৭ই ফাল্গুন।

(গ) বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন, গঙ্গাতীর হইতে প্রেরিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ নবদ্বীপে "আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপবাস॥" এবং "যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস। সেই দিবস হইতে আইর উপবাস॥" রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং গৃহত্যাগের দিবসে শচামাতার উপবাসের হেতু নাই। পরের দিন হইতে যদি উপবাস আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বের দিনই তাঁহার দ্বাদশ উপবাস পূর্ণ হইয়াছে। যদিও এই উক্তির সহিত অন্য কোনও চরিতকারের, এমন কি স্বয়ং বৃন্দাবনদাসের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিরও সঙ্গতি নাই, তথাপি তর্কের অনুরোধে ইহাও স্বীকৃত হইতেছে। গৃহত্যাগের তৃতীয় দিনে মাঘ-মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস; সুতরাং উপবাসের দ্বাদশ-দিবসের মধ্যে দুই দিবস পড়িয়াছে মাঘ মাসে, আর দশ দিন ফাল্গুনে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ১১ই ফাল্গুন, ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুরে গিয়াছিলেন ১২ই ফাল্গুন এবং প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করেন ১৩ই ফাল্গুন।

বস্তুতঃ, গৃহত্যাগের পরে মাঘমাসে দুইদিন এবং ফাল্গুনে গঙ্গাতীর-পর্য্যন্ত আগমনে চারিদিন—মোট এই ছয় দিবসই বৃন্দাবনদাসের (খ) উক্তি অনুসারে শচীমাতার অনাহার হওয়ার কথা। প্রতিদিবসে মধ্যাহ্ন ও রাত্রিতে

এই দুই বেলায় দুই উপবাস ধরিয়াই ছয় দিনে দ্বাদশ উপবাসের কথা তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; এইরূপ অর্থ করিলে তাঁহার সমস্ত উক্তির সঙ্গতি থাকে; সুতরাং ইহাই সমীচীন অর্থ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অর্থ অনুসারে ৭ই ফাল্গুনেই প্রভুর নীলাচল-যাত্রা হয়।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—বৃন্দাবনদাসের মতে (ক)-আলোচনা অনুসারে ৫ই ফাল্গুনে, খ ও (গ) আলোচনা অনুসারে ৭ই ফাল্গুনে এবং (গ) আলোচনার যথাশ্রুত অর্থ অনুসারে ১৩ই ফাল্গুনে এবং কবিরাজের মতে ১৪ই ফাল্গুনে প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন। সর্ব্বপরবর্ত্তী ১৪ই ফাল্গুন ধরিয়াই বিচার করা যাউক।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসিয়া "ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।" দোলযাত্রা হয় ফাল্গুনী পুর্ণিমাতে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বৎসরে, অর্থাৎ ১৪৩১ শকে, মাঘী পুর্ণিমা হইয়াছিল, মাঘমাসের শেষ তারিখে সংক্রান্তিতে; সুতরাং ফাল্গুন মাসের ২৯শে তারিখের পূর্ব্বে ফাল্গুনী পুর্ণিমা বা দোলযাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু ২৭শে কি ২৮শে ফাল্গুন, নীলাচলে পৌঁছিয়া থাকিলেও অবাধে দোলযাত্রা দেখিতে পারিয়াছেন। শান্তিপুর হইতে ১৪ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া তের চৌদ্দ দিন পরে নীলাচলে উপনীত হইলে দোলযাত্রা দেখা অসম্ভব হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি—শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসিতে প্রভুর অনুমান ১২।১৩ দিন লাগিয়াছিল। আর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উক্তি অনুসারে দেখা গিয়াছে—প্রভু ৫ই, কি ৭ই ফাল্গুনে শান্তিপুর হইতে যাত্রা করেন; তাহার ২২।২৪ দিন পরেই দোলযাত্রা; সুতরাং দোলযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে প্রভুর উপস্থিতি কিছুতেই অসম্ভব হয় না।

(৮) অমৃতবাজার-পত্রিকা-কার্য্যালয় হইতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত"-নামে শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চার কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অপর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ দৃষ্ট হয় না। এই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত"-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত "ততঃ শুভে সংক্রমণে' '-ইত্যাদি শ্লোকটী আছে। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—এই গ্রন্থখানি প্রামাণিক নহে; সুতরাং "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকটীও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

মন্তব্য। এই গ্রন্থখানি প্রামাণিক কিনা, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করার ইচ্ছা আমাদের নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিকগণের কেহই এপর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকটী প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা হইলেও ক্ষতি কিছু নাই। যেহেতু, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতেই ইতঃপূর্ব্বে প্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ নির্ণয় করা হইয়াছে; তাহাতে "তত শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি-শ্লোকটীর কোনও সাহায্যই গ্রহণ করা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তির সঙ্গে যে ' তত শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তির সঙ্গতি আছে, তাহা জানাইবার জন্যই এই শ্লোকটী, তারিখ-নির্দ্ধারণের পরে, উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৯) শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকে বিরুদ্ধবাদীরা কৃত্রিম বলেন নাই বটে; তবে, এই গ্রন্থ হইতে মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেনকালে"-ইত্যাদি যে বাক্যটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—এই বাক্যটী শ্রীল লোচনদাসের লিখিত নহে। সুতরাং বাকটীও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

মন্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী (৮)-অনুচ্ছেদে "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বিরুদ্ধ-বাদীদের এই আপত্তি সম্বন্ধেও আমাদের তাহাই বক্তব্য।

(১০) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে পুর্ণিমা ছিল না; দৃগ্‌গণিতানুযায়ী গণনায় সে দিন ছিল কৃষ্ণাপ্রতিপদ।

মন্তব্য। আমাদের দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ দৃগগণিতানুযায়ী গণনার রীতি অপ্রচলিত। কিঞ্চিদধিক ষাইট বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে এবং তাহাতে দৃগগণিতানুযায়ী সূক্ষ্ম গণনা সন্নিবেশিত হইতেছে। সম্প্রতি ঐরূপ সূক্ষ্ম গণনা সম্বলিত আরও দু'একখানা পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। স্থূল-গণনার পঞ্জিকার সঙ্গে বিশুদ্ধসিদ্ধান্তাদি পঞ্জিকার তিথি আদির স্থিতিকালের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। ১৪৩১ শকে সূক্ষ্মগণনার রীতিপ্রচলিত ছিলনা। সুতরাং বিশুদ্ধসিদ্ধান্তাদি পঞ্জিকার সূক্ষ্ম গণনায় এবং অন্যান্য পঞ্জিকার স্থূল গণনায় ১৪৩১ শকেও তিথ্যাদির স্থিতিকালের কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের গণনাতেও দেখা যায় ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ-তারিখে কৃষ্ণাপ্রতিপদও ছিল এবং পূর্ণিমাও ছিল। পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণাপ্রতিপদ।

বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যও যে আমাদের সিদ্ধান্তেরই অনুকূল, তাহাও দেখান হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ (পূর্ব্বাশ্রমে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল) হইতেছেন গোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ডের সিদ্ধমহাত্মা পণ্ডিত-বাবাজী বলিয়া খ্যাত শ্রীল মনোহর দাস ববোজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং ভেকের শিষ্য। ২১।৮।১৯৪৯ ইং তারিখের একপত্রে মোহান্ত-মহারাজ আমাদিগকে জানাইয়াছেন :—

"ব্রজমণ্ডলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তিথির আরাধনা প্রচলন নাই। আমার মত অযোগ্যকে শ্রীগুরুমহারাজ মাঘী পূর্ণিমার দিনে বেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার শ্রীমুখে ঐ তিথিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইয়াছে—এইরূপই শুনিয়াছিলাম। ১লা মাঘ বলিয়া কোনও মতান্তর ব্রজে নাই।"

গোবর্দ্ধন হইতে জনৈক নিষ্কিঞ্চন পণ্ডিত-বাবাজী মহারাজ ১২।৮।১৯৪৯ ইং তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন :—

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকাল প্রামাণিক গ্রন্থানুযায়ী আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ধ্রুব সত্য। * *। এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও জাজ্জ্বল্য প্রমাণ নাই। ১লা মাঘ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনমুখী। তারপর সন্ন্যাসোৎসব উদ্‌যাপন ব্রজমণ্ডলে কোন কালে বা কোথাও হয় না, হয় নাই, হইতেও কেহ শুনে নাই। সন্ন্যাস-মূর্ত্তি ব্রজমণ্ডলে কাহারও আরাধ্য নয়; তাঁর ব্রতও উদ্‌যাপিত হয় না। এখানকার বনবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতেরা আপনার প্রমাণই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যাচার্য্য পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় ৪।১২।৪৯ ইং তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির ও যুক্তির অসারতা দেখাইয়া আমাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও ফাল্গুনের শেষে পুরীধামে গিয়া দোলযাত্রা দেখিতে কোনও বাধা নাই। তিন দিন রাঢ়দেশে এবং দশ দিন শান্তিপুরে—এই তের দিন বাদ দিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বাকী ১০।১২ দিনেও পুরীধামে পৌছিতে পারেন। ইহাতে কোনও অসঙ্গতি পাওয়া যাইতেছে না।" আরও লিখিয়াছেন—"১লা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণের দিন ১৪৩১ ও ১৪৩২ কোন শকাব্দাতই যে হইতে পারে না, ইহা একেবারে স্থির নিশ্চয়। যাঁহারা ঐ দিন উৎসব করেন, তাঁহারা যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের বশে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, একথা বলিলে কাহারও ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।"

উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই—বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি ও যুক্তির আলোচনায় দেখা গেল, (১) পহিলা মাঘেই যে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতে পারেন নাই; (২) বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি অনুসারে সন্ধ্যার অল্পপরেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন; বিরুদ্ধবাদীরা এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদেরই মতে ১৪৩১ এবং ১৪৩২ শকেরও পহিলা মাঘে সন্ধ্যার পরেও ছিল কৃষ্ণপক্ষ, শুক্ল পক্ষ ছিলনা; এই দুই শকের কোনও শকেই পহিলা মাঘ সন্ধ্যার অল্প পরে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহাদের মতেই অসিদ্ধ। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হইল যে,. বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি এবং যুক্তি

তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতেছে না। বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যও তাঁহাদের মতের অনুকূল নয়। শান্তিপুরের উৎসব সম্বন্ধে তাঁহারা যে ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ভিত্তিহীন। আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বৈষ্ণব-শাস্ত্রেরই উক্তি এবং তাহা বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যদ্বারাও সমর্থিত।*

সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।

---

* কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে প্রসঙ্গটী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল এবং বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির এবং যুক্তির সমালোচনা করা হইল। বিরুদ্ধবাদীদের চরণে দণ্ডবৎপ্রণিপাত জানাইয়া আমাদের ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শাস্ত্রসম্মত আলোচনা অবাঞ্ছনীয় নয়; শাস্ত্রের মর্য্যাদা সকলের উপরে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে সুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সেন মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা হইতেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আগে বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেনা, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক –তা তাদের সংখ্যা কয়েক শত, বা কয়েক সহস্র, বা কয়েক লক্ষ, এমন কি কয়েক কোটিও হইতে পারে, এমন কতকগুলি লোক—মাত্র যে ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মকেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে হয়; কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মই পৃথিবীর সমস্ত লোক কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় না। যাঁহারা একই নীতির একই আদর্শের বা একই ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ একটা সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। এইরূপে হিন্দু-সম্প্রদায়, মুসলমান-সম্প্রদায়, খৃষ্টীয়ান-সম্প্রদায়, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, জৈন-সম্প্রদায়, আবার হিন্দুদের মধ্যে শৈব-সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে; সুতরাং "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" কথাটার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাই থাকেনা; যেহেতু, যাহা সাম্প্রদায়িক নয়, এমন কোনও একটা ধর্ম্ম হইতে পার্থক্য সূচনার জন্যই "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"-কথাটার প্রয়োগ। উল্লিখিত অর্থ মানিতে গেলে সকল ধর্ম্মই যখন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, কোনও ধর্ম্মই যখন অসাম্প্রদায়িক থাকে না, তখন নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে, সম্প্রদায়-বিশেষের আচরিত বলিয়াই কোনও ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা সমীচীন নয়।

রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব বস্তুতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান। সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত সমান ভাবে আকৃষ্ট হয় না। লোকের রুচি এবং প্রকৃতি একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্ত সমধিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই উপাস্য-ভাবের এবং উপাসনা-প্রণালীর পার্থক্য থাকিবেই এবং বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপাসকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেনই; কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিকূলতা থাকিবে, তাহারও কোনও ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। যেখানে লক্ষ্যবস্তুর সহিত পরিচয়ের অভাব, সেই স্থানেই অজ্ঞতাবশতঃ মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ,—সেখানেই অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা—সেখানেই সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা যখন কোনও একটী সম্প্রদায়ে ব্যাপকতা লাভ করে, তখনই আমরা সেই সম্প্রদায়ের ভাবকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া থাকি।

সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা সমাজবিষয়কও হইতে পারে এবং ধর্ম্মবিষয়কও হইতে পারে। অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতাদি হইল সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা। "আমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজই কুলীন, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, পবিত্র আচার-সম্পন্ন; অপর সমাজ বা অপর কোনও কোনও সমাজ আমার সমাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হেয়"—সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণতাই সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার হেতু। আর "আমি যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহাই মুক্তির একমাত্র উপায়, আমার যাহা সাধন-প্রণালী, তাহাই একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা; অপরের সাধন-প্রণালী ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক, অপরে মুক্তির যে ধারণা পোষণ করে, তাহাও ভ্রান্ত"—ইত্যাদি রূপ যে সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহাই ধর্ম্মবিষক সাম্প্রদায়িকতার মূল। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই একটা গণ্ডীবদ্ধতার ভাব আছে—

"আমি যে গণ্ডীতে বা যে মণ্ডলীতে আছি, তাহাই সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট; অপরের গণ্ডী সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্ট"—এইরূপ একটা ভাব।

ধর্ম্মে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সাম্প্রদায়িকতা। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দুইটি দিক আছে, সামাজিক বা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সাম্প্রদায়িকতা দুই দিকেই থাকিতে পারে; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুইটা দিকই বিচার করিতে হইবে।

সামাজিক বা ব্যবহারিক দিকেরও আবার দুইটা শাখা আছে—বংশ বা জাতিবিচারমূলক ব্যবহার এবং পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার।

গোস্বামিগ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বংশ বা জাতিবিচারমূলক যে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামাজিক উদারতার আদর্শস্থানীয়। কাশীখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ ১০।৭৮॥"—ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, কি শূদ্রই হউন, কিম্বা অপর কোনও জাতিই হউন, যিনি বিষ্ণুভক্তিযুক্ত, তিনি সর্ব্বোত্তমোত্তম।" "শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ১০।৬৮॥—বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও ভক্তিহীন দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—ইত্যাদি নারদীয়-বচনও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত হইয়াছে। এই মর্ম্মের বহু প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবদ্ভক্তের বা বৈষ্ণবের কুলের বিচার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ করেন নাই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপোষণ বরং অপরাধজনক বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়া গিয়াছেন। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ১০।৮৬॥" জাতিকুল অপেক্ষা জীবের স্বরূপের প্রতিই—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। ২।২০।১০১।"—এই তথ্যের প্রতিই বৈষ্ণবগণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কেবল অপরের সম্বন্ধে নয়, নিজের সম্বন্ধেও জাতিকুলের সংস্কার যাহাতে চিত্ত হইতে দূরীভূত হইতে পারে, এবং স্বীয় স্বরূপের সংস্কারই যাহাতে চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও আচার্য্যগণ করিয়া গিয়াছেন। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ চৈঃ চঃ ধৃত পদ্যাবলীবচন।—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই; বাণপ্রস্থী নই, যতি নই—চারিবর্ণেরও কেহ আমি নই, চারি আশ্রমেরও কেহ আমি নই; আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।" নিজের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তারই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এইরূপে সকলেরই একই জীবত্বের সাধারণ ভূমিকায় অবস্থিতির জ্ঞানে পাছে কাহারও প্রতি ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞার ভাব কিম্বা আরও অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কোনও ভাব—আসিয়া পড়ে, তাই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,—এমন কোনও কাজ করিবে না, বা এমন কোনও ব্যবহার করিবে না বা কথা বলিবে না, এমন কোনও ব্যবহারের চিন্তাও মনে স্থান দিবে না, যাহাতে অপরের মনে কষ্ট হইতে পারে। "প্রাণিমাত্রে মনো বাক্যে উদ্বেগ না দিবে। ২।২২।৬৬।" সকলের অপেক্ষা সকল বিষয়ে উত্তম হইলেও নিজেকে অন্য সকল অপেক্ষা হীন মনে করিবে। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ২।২৩।১৪॥" কোনও রূপ হীন অভিমান যেন মনে স্থান না পায় "উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। চৈঃ চঃ ৩।২০।২০" আর, নিজে কাহারও নিকটে সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু অপরকে সম্মান করিবে। "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে ৩।৬।২৩৫॥" সকলের মধ্যেই পরমাত্মা রূপে ভগবান্ সর্ব্বদা বর্ত্তমান; সুতরাং সকলেই ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য—এরূপ মনে করিয়া, কেবল মানুষকে নয়, পরন্তু জীবমাত্রকেই সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০॥" এই উপদেশটী শ্রীলবৃন্দাবনঠাকুর আরও পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ চৈঃ ভা, অন্ত্য, ৩য় অধ্যায়।" গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের এই সামাজিক উদারতা, অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে দেখা যায়, মহাপ্রভু যখন মধ্যাহ্নে ভিক্ষা

করিতে বসিতেন, যবনকুলোদ্ভব শ্রীল হরিদাসঠাকুর নিকটে কোথাও উপস্থিত থাকিলে নিজের নিকটে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাকেও আহ্বান করিতেন; অবশ্য হরিদাসঠাকুর নিজের দৈন্যবশতঃ কৌশলে দূরে সরিয়া থাকিতেন; আবার এই হরিদাসকেই শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রাদ্ধপাত্র পর্য্যন্ত খাওয়াইয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন বৈষ্ণব জানিয়া এক অনাচরণীয় সনোড়িয়ার হাতেও তিনি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট উৎসবে হরিদাস ঠাকুরের এবং সুবর্ণবণিক-বংশোদ্ভব উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় এবং বৈষ্ণবগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভক্তমাত্রকেই সামাজিকতার অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন-মহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। ৩।১৬।৫৫।৫৬।" শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি।" এবং "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ।" শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, কালিদাস-নামক জনৈক কায়স্থ বংশীয় বৈষ্ণব ভূমিমালী জাতীয় ঝড়ুঠাকুরের পদধূলি এবং উচ্ছিষ্টও কৌশলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি মহাপ্রভুর নিকটে এমন একটী বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন, যাহা অপর কেহ পায় নাই। হরিদাস-ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে তাঁহার পার্ষদগণকে লইয়া তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন এবং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব করিয়াছিলেন। তীর্থস্থলাদিতে এখন পর্য্যন্ত যবন-কুলোদ্ভব বৈষ্ণবদের সমাধিও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"—পদকর্ত্তার এই উক্তিতেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের সামাজিক উদারতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

এক্ষণে পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার-বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মতে ভগবদ্‌ভজনে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। "শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥ ৩।৪।৬৩॥"

নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে, অর্চ্চন-মার্গে, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদিতেও জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল বৈষ্ণবের অধিকার আছে। শালগ্রাম-সেবার অধিকার হইতেও বৈষ্ণবশাস্ত্র কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই, এমন কি স্ত্রীলোককেও না। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম-বিলাসে ২৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্লোকস্থ "পরৈঃ" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—যথাবিধিদীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ, অর্থাৎ যথাবিধিদীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎ-পরায়ণ—দ্বিজ, স্ত্রী এবং শূদ্র ইঁহাদের সকলের দ্বারাই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবান্ পূজিত হইতে পারেন। এইরূপ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্র-প্রমাণরূপে স্কন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ ৫।২৪॥" টীকা হইতে জানা যায়, ইহা শ্রীনারদের উক্তি এবং এই শ্লোকোক্ত "সচ্ছূদ্রাণাং" শব্দের অর্থ—সতাং বৈষ্ণবাণাং শূদ্রাণাং—যাঁহারা বৈষ্ণব, এরূপ শূদ্রদের এবং "অন্যেষাং অর্থ—অসতাং শূদ্রাণাং—অবৈষ্ণব শূদ্রদের। তদনুসারে শ্লোকের অর্থ হইল এই:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৈষ্ণব-শূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে; কিন্তু কখনও অবৈষ্ণবশূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। টীকায় সনাতনগোস্বামী অন্যান্য পুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মধ্যদেশে, এই দেশে এবং দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণবদেরমধ্যে উক্তরূপ আচারও প্রচলিত আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে এখনও এই প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। তবে ইহা তত ব্যাপক নয়; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শালগ্রাম-চক্র সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যাত্মক বিগ্রহ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাব মাধুর্য্যময়; তাই তাঁহারা—সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নিতাইগৌর প্রভৃতির বিগ্রহ বা চিত্রপট পূজা করিয়া থাকেন। গোবর্দ্ধনশিলাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণকলেবর বলিয়াছেন; তাই তাঁহারা এই শিলারও পূজা করেন। কুলাচার অনুসারে

ব্রাহ্মণ শালগ্রামচক্রের পূজা করিয়া থাকেন—তা তিনি বৈষ্ণবই হউন, কি শৈব বা শাক্তই হউন। তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শালগ্রামপূজার প্রচলন বেশী। ব্রাহ্মণেতর বংশোদ্ভব কাহারও তদ্রূপ কুলাচার বিরল; তাই তাঁহাদের মধ্যে শালগ্রামের পূজার প্রচলনও কম।

হরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বহু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানাং একত্রৈব গণনা—বিপ্রদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের একত্রই গণনা।" "বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি—ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের সাম্যই সিদ্ধ হইতেছে।" যেহেতু "ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব—ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়।" তাই "ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধেরও শ্রীশালগ্রাম-পূজার কথা উক্ত হইয়াছে।" "শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ—শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবদের অধিকার দৃষ্ট হয়।" শ্রীমদ্ ভাগবতের "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে শ্বপচও সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের পক্ষে গুরু হওয়ার অধিকারও বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই গুরু হয়॥ চৈ, চ, ২।৮।১০০॥" ব্যবহারতঃও ইহা দৃষ্ট হয়। বৈদ্যবংশোদ্ভব শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, কায়স্থ-বংশোদ্ভব শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং সদ্‌গোপবংশোদ্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মন্ত্র-শিষ্যও ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—ভক্ত শ্বপচকেও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধিকার দিয়াছেন, ভক্তব্রাহ্মণের অনুরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। আর যাঁহারা ভক্ত নহেন. তাঁহাদিগকেও ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। বৈষ্ণবসমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা নাই; সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং সকলের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা।

এক্ষণে এই ধর্ম্মের পারমার্থিক দিকটার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পারমার্থিক দিক-সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্য।

কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব, দুর্গা, পরমাত্মা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের উপাস্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে এই সমস্ত উপাস্যের মধ্যে স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই; ইঁহারা সকলেই পরতত্ত্ব-বস্তুর—স্বয়ংভগবানের—বিভিন্ন স্বরূপ; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই; ভেদ আছে, মনে করিলে অপরাধ হয় বলিয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ চৈ, চ, ।২।৯।১৪০-৪১॥" পরতত্ত্ববস্তু একই বিগ্রহে বিভিন্ন স্বরূপে নিত্য বিরাজমান —বিভিন্ন সাধককে কৃতার্থ করার নিমিত্ত। সাকার যিনি, নিরাকারও তিনি; সবিশেষ যিনি, নির্ব্বিশেষও তিনি। তাঁহার নির্ব্বিশেষ-রূপ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার সবিশেষ সাকার রূপও তেমনি সচ্চিদানন্দময়; সুতরাং সকল স্বরূপই নিত্য, সকল স্বরূপেরই পারমার্থিক সত্যতা আছে।

বৈদূর্য্যমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অভিন্নতা দেখাইয়া থাকেন। একই বৈদূর্য্যমণি যেমন স্বরূপে একই বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও কোনও দিক হইতে নীল বর্ণ, কোনও দিক্ হইতে পীতবর্ণ ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ স্বরূপে অব্যাকৃত থাকিয়াও এক এক রকমের সাধকের নিকটে এক এক রকমে অনুভূত হন। "মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥" যে মণি একজনের নিকটে নীলবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই মণিই আর একজনের নিকটে পীতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাদের অবস্থানের পার্থক্যই এই বর্ণানুভূতি-পার্থক্যের হেতু। তদ্রূপ, এক সাধকের নিকটে যিনি শিবরূপে অনুভূত হন, আর এক সাধকের নিকটে তিনিই কৃষ্ণ বা রামরূপে অনুভূত হন;

উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভূতির পার্থক্য। নীলবর্ণ যে মণির, পীতবর্ণও সেই মণিরই। যিনি নীলবর্ণ মানেন, কিন্তু পীতবর্ণের নিন্দা করেন, তিনি ঐ মণিরই নিন্দা করেন। তদ্রূপ শিব যিনি, কৃষ্ণও তিনি; সুতরাং যিনি শিবকে মানেন, কিন্তু কৃষ্ণের অবজ্ঞা করেন, অথবা কৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু সদাশিবের অবজ্ঞা করেন, তিনি স্বরূপতঃ অবজ্ঞা করেন সেই তত্ত্বের—যে তত্ত্ব শিব, কৃষ্ণাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই যিনি এক ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা করেন, তিনি ভগবত্তত্ত্বেরই অবজ্ঞা করেন। কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি যিনি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্বের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন—তিনি ভগবৎ-বিদ্বেষী। এক অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে সমস্ত দেহেই তাহার ফল অনুভূত হয়। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদজ্ঞান পোষণ করেন না বলিয়াই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এরূপ মনে করিতে পারেন। তাই তাঁহারা শিব ও হরির নামগুণলীলাদির পার্থক্যজ্ঞানকে একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্॥ মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ। উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৪।৬৫। শ্রীহরি বলিয়াছেন, হরিপরায়ণ ব্যক্তিদের বৈকুণ্ঠগতি হয় সত্য; কিন্তু মহাদ্বেষী না হইলেই তাঁহাদের ঐ বিষ্ণুধামপ্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দাপূর্ব্বক নিরন্তর একান্তভাবে আমার অর্চনা করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। মদ্ভক্ত শিবদ্বেষী হইলে, অথবা শিবভক্ত মদ্দ্বেষী হইলে চন্দ্রসূর্য্যস্থিতিপর্য্যন্ত তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়।" শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে:—শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র। এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥ না-মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব। শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥" পুনরায়, শিবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তিঃ—"যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে। সে আমারে মাত্র যেন অনাদর করে॥" আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—"পূজয়ে গোবিন্দ যে না মানে শঙ্কর। এই পাপে অনেক যাইবে যমঘর॥" ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মত; এই মতে কোনও সম্প্রদায়ের উপাস্যের প্রতিই অবজ্ঞা বা কটাক্ষের অবকাশ নাই; সকল স্বরূপই সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র; কারণ, সকল স্বরূপই একই বস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্রী। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ইহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও শিব, নৃসিংহ, রাম, বিষ্ণু, ভগবতী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরূপের শ্রীমন্দিরে গিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন; সকল মন্দিরেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাবেশ অক্ষুন্ন ছিল; যে কোনও মন্দিরে যে কোনও স্বরূপের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত; কারণ, তিনি মনে করিতেন—এই শ্রীমূর্ত্তিও তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেরই একরূপ। শ্রীকৃষ্ণরূপে রসিকশেখর যে রস আস্বাদন করেন, শিবাদিরূপেও তিনি সেই রসেরই অপর এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন-স্বরূপে তাঁর নিত্য-অবস্থিতির আনুষঙ্গিক কারণই হইল বিভিন্ন ভাবের উপাসককে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর অভিপ্রায়। আর ইহার অন্তরঙ্গ কারণ হইল—রসিকশেখরের বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর এবং বিভিন্ন প্রকারের ভক্তের বিভিন্ন প্রেম-রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন। এই রসবৈচিত্রী আস্বাদনের ব্যপদেশেই আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-বৈচিত্রীময় বিভিন্ন উপাসককে তিনি কৃতার্থ করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ এরূপ উদার মত পোষণ করেন বলিয়াই লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থান এবং ভগবৎ-কথার আস্বাদন, রাম-উপাসক মুরারিগুপ্তের পক্ষে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তি এবং ব্রজভাবের উপাসক রূপ-সনাতনের ও রাম-উপাসক অনুপমের একত্রে পরমানন্দে ভজনানুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল।

কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অবশ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বীকার করেন না; কেননা, শ্রুতিস্মৃতিতে এইরূপ কোনও স্বরূপের উল্লেখ নাই। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য এই সম্প্রদায় স্বীকার করেন, যদিও এতাদৃশ সাযুজ্য এই সম্প্রদায়ের কাম্য নহে।

ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ধারণা অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই এই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সম্ভব।

তারপর উপাসনা সম্বন্ধে। কোনও সম্প্রদায়ের উপাসনা একেবারে নিরর্থক—এমন কথা গৌড়ীয় সম্প্রদায় কখনও বলেন নাই। লক্ষ্যভেদে উপাসনাভেদ, পরতত্ত্বের অনুভূতির ভেদ। "উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। ১।২।১৯॥ "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ২।২০।১৩৪॥" এসমস্ত উক্তিই বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর সার্থকতার প্রমাণ। যিনি যেভাবে ভগবান্‌কে বা পরতত্ত্ববস্তুকে পাইতে চাহেন, তাঁহার উপাসনাও তদনুরূপ হইবে, নিজ নিজ ভাবের অনুকূল উপাসনাই সাধকদের পক্ষে কর্ত্তব্য। "যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম। ২।৮।৬৫॥" এবিষয়ে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই।

তারপর লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন সাধকসম্প্রদায়ের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। এই লক্ষ্যকে মোটামোটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাঁচরকম মুক্তি এবং প্রাপ্তি। সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য—এই পাঁচ রকম মুক্তি। সাযুজ্যে সিদ্ধাবস্থায় সাধক উপাস্যের সহিত মিশিয়া, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সাধকের পৃথক সত্তা থাকিলেও সেব্য-সেবকত্বের ভাব থাকেনা বলিয়া ভক্ত সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না। সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তিতে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের পৃথক সত্তা থাকে, সুতরাং সেবার সুযোগ থাকে; কিন্তু এই চারি রকমের মুক্তির সেবা ঐশ্বর্য্যভাবময়। তাই শুদ্ধমাধুর্য্য-মার্গের গৌড়ীয়-ভক্তগণ এসমস্তও চাহেন না, তাঁরা চাহেন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা; তাহাদের লক্ষ্যকে বলে ভগবৎ-প্রাপ্তি। কিন্তু পঞ্চবিধা মুক্তি তাঁহাদের কাম্য না হইলেও এ সমস্ত মুক্তির পারমার্থিক সত্তা নাই, এসমস্ত মুক্তি অল্পকাল স্থায়ী—একথা কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলেন না। এসমস্ত মুক্তিতেও রসস্বরূপ ভগবানের রস-আস্বাদন করিয়া জীব "আনন্দী" হইতে পারে, তবে আস্বাদনের তারতম্য আছে, সকল ভাবে, সকল মুক্তিতে রসের সকল বৈচিত্রীর আস্বাদন হয় না। সকল রকমের আস্বাদন-চমৎকারিতারও অনুভব হয় না। "কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়। ২।৮।৬৪॥ আস্বাদনের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই মুক্তিরও বিভিন্নতা। শুদ্ধ-মাধুর্য্যভাবের প্রাপ্তিতেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে নানারকম পার্থক্য আছে।

বলা বাহুল্য, এ পার্থক্য কেবল ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনের চমৎকারিত্বে; মুক্ত কিন্তু সকলেই। যে কোনও রকমের মুক্তিতেই, কিম্বা যে কোনও রকমের ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই মায়াবন্ধন হইতে, সংসার হইতে, ত্রিতাপজ্বালা হইতে, জন্মমৃত্যু হইতে সাধক অনন্তকালের জন্য অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। সাধকের রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে—লক্ষ্যভেদ, উপাসনাভেদ; সকল লক্ষ্যেরই সাধারণ ভূমিকা মায়ামুক্তি। গৌড়ীয়-সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করেন না। মুক্তদের মধ্যে পরতত্ত্ব-বস্তুর সেবার এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের ভেদেই মুক্তির এবং প্রাপ্তির ভেদ।

লক্ষ্য বিষয়েও গৌড়ীয়দের মত অত্যন্ত উদার। স্বীয়-উপাস্য-স্বরূপে যাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক না হইলেও তিনি যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন হইতে পারেন, শ্রীলমুরারিগুপ্তই তাহার প্রমাণ। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হইয়াও মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর পার্ষদ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ভগবচ্চরণে যাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও যে কখনও তাঁহাকে শ্রীচরণসেবা হইতে বঞ্চিত করেন না, মুরারিগুপ্তকে উপলক্ষ্য করিয়া এই তথ্যটী প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এক রঙ্গ করিয়াছিলেন। এই রঙ্গটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। ব্যাপারটী এই। রথযাত্রার সময়ে যে সমস্ত গৌড়ীয়ভক্ত নীলাচলে যাইতেন, চাতুর্ম্মাস্যের পরে তাঁহাদের বিদায়ের কালে মহাপ্রভু প্রত্যেকেরই গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেন। একবার এই ভাবে—"মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন। তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে, শুনে ভক্তগণ॥ পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার। "পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার॥ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়। বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর। সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর॥ মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস। চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে

করে যেঁহো লীলা রাস॥ সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥' এইমত বার বার শুনিয়া বচন। আমার-গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর। তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর॥ এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তি রাত্রিকালে। রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে॥ 'কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ। আজি রাত্রে রাম! মোর করাহ মরণ॥, এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ॥ প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ। কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥ রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা। কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, মনে পাও ব্যথা॥ শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়। তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়॥ তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥ এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল। ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥ 'সাধু সাধু' গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন। আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥ এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়। প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥ তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে। তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥ সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম। ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥ ২।১৫।১৩৭-১৫৭॥"

কি উদ্দেশ্যে প্রভু মুরারিগুপ্তের সঙ্গে এই রঙ্গ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত পয়ারসমূহ হইতে তাহা পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায় যে, বিভিন্ন-ভাবের উপাস্য-সম্বন্ধেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মত অত্যন্ত উদার ছিল।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের হেয়তা-প্রতিপাদনই এই বিচার-বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিল না। যথার্থ তত্ত্ব-নির্ণয়ই ছিল ইহার লক্ষ্য। তত্ত্ব-নির্ণয়মূলক বিচার বিতর্কে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বেঙ্কট-ভট্টের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল; তাঁহার নিজের মত এবং উপাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রচারিত মত এবং উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তিনি কখনও ভট্টকে বলেন নাই। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সঙ্গেও উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার বিচার হইয়াছিল; বিচারে আচার্য্য তাঁহার ত্রুটী বুঝিলেন। কিন্তু প্রভুর নিজের মত গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকেও তিনি বলেন নাই। একথা সত্য, বহু ভিন্ন সম্প্রদায়ী লোক মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ভজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সকলেই যে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তর্কের পরাজয়ে সকল সময়ে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পরতত্ত্বের যে মোহনরূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া এবং সেই মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের প্রভাবে যে সমস্ত অদ্ভুত প্রেমবিকার লোক তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াই, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই অধিকাংশ লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ-প্রেমরশ্মিও যে সকলের চিত্তে একটী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল অত্যন্ত উদার—জীবমাত্রকেই রসস্বরূপ ভগবানের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল আহ্বান। অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ-খ্যাপনের ইচ্ছা হইতে এই প্রচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মাধুর্য্যের লোভে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশও অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ সূচিত করে না; বরং এই সমস্ত লোকের অবচেতনায় যে লোভ প্রচ্ছন্ন ছিল, মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাহার পরিস্ফুরণই সূচিত করে।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইবে যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই।

ভজনাদর্শ—গৌড়ে ও বৃন্দাবনে

কেহ কেহ মনে করেন—(ক) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে রূপটী প্রকটিত হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে প্রকটিত রূপ হইতে তাহা পৃথক, (খ) মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুরের ভজনাদর্শও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ভজনাদর্শ হইতে পৃথক্ এবং (গ) বৃন্দাবনের ভজনাদর্শে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কেবল উপায়মাত্র, উপেয় নহে; কিন্তু নবদ্বীপবাসী আদিম বৈষ্ণবগণের ভজনাদর্শে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনই উপেয়।

এই তিনটী বিষয় পৃথক্‌ভাবে ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

(ক)

কোনও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে সেই ধর্ম্মের উপাস্যতত্ত্ব, উপাসকতত্ত্ব—সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব—প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয়েরই অনুসন্ধান করিতে হয়। মুরারিগুপ্তের বা কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে কোনও তত্ত্বসম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা মোটেই নাই; তবে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহারা যে কয়টা সংক্ষিপ্তোক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে এসকল বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানা যায়। প্রথমে আমরা মুরারিগুপ্তের একমাত্র গ্রন্থ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্ বা মুরারিগুপ্তের কড়চা" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। (এস্থলে আমরা শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের শ্লোকাদির উল্লেখ করিব।)

এই গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর উপদেশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থের উপদেশও তাহাই।

নানাস্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দের এবং নীলাচলে বৈষ্ণববৃন্দের গৌর-নামগুণ-কীর্ত্তনাদি হইতে গৌরের উপাস্যত্ব-সম্বন্ধেও ইঙ্গিত কড়চায় পাওয়া যায় (১) কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থলে গৌরের ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে তর্কযুক্তিদ্বারাও গৌরের ভজনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আবার "সদোপাস্য শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ" ইত্যাদি, এবং "উপাসিতপদাম্বুজস্ত্বমনুরক্তরুদ্রাদিভিঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও গৌরের উপাস্যত্বের কথা বলিয়াছেন (২)।

অভীষ্ট (বা সাধ্য)-বস্তুর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যের আস্বাদন, কৃষ্ণপ্রেমরসানন্দ, শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধু (৩) এবং প্রেমভক্তির (৪) উল্লেখ কড়চায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-পাদাব্জে প্রভুবুদ্ধি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শাশ্বতীস্মৃতির কথাও দৃষ্ট হয় (৫)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও মহাপ্রভুর উপদেশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে মনোহংস চরাইবার কথা (২।২৫।২২৩) এবং "চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য"—একথাও লিখিয়াছেন (২।২৫।২২৯)।

---

(১) ৪।২২।১৪, ২০, ২২, ২৫; ৪।২৩।১২, ১৭, ২৩, ৪।১৯।১৬—১৯, ৪।২৬।১৯, ২৩, ৩১।

(২) শ্রীচৈতন্যাষ্টক। স্তবমালা।

(৩) ১।২।১৩; ২।২।৩২, ২।৬।৯, ২।১০।১৪।

(৪) ২।৩।৮, ২।৫।১০, ৩০, ২।৬।১৪, ৪।২৪।২৫, ২৬।

(৫) ২।২।৩৬।

সাধনসম্বন্ধে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ (১।৮।২) ও কীর্ত্তন (৬), গৌর-নামকীর্ত্তন ও গৌরলীলাচিন্তা (৭), বৈষ্ণবসেবা (৪।১৮।২-৫), কৃষ্ণসেবা (৪।২১।২৪-২৫), ধ্যান (১।৮।১), বৃন্দাবনধ্যান (৪।৩।৬), হরিবাসর-পালন (২।৪।২৬), ভক্তির অনুষ্ঠান (৪।১৩।১৬) ইত্যাদির কথা কড়চায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানেও এসমস্ত সাধনাঙ্গের উপদেশ আছে। অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেও তাহাই।

কড়চার মতে ভগবান্ নামস্বরূপ (২।১৭।৮); শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—নাম ও নামীতে ভেদ নাই। কড়চায় একাধিকস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (২।৫।৩০ ; ২।৭।২০) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে কড়চায় প্রত্যক্ষ উক্তি কিছু না থাকিলেও জীবের অভীষ্টসম্বন্ধে এবং অভীষ্টপ্রাপ্তির সাধন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহাই কড়চার অভিপ্রায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলেন—কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব। অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেরও এই-ই মত।

কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ (৪।৩।৩)—কড়চার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কড়চার মতে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থের অভিমতও তাহাই।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধে কড়চা বলেন—"পরমেশ্বরভেদেন কেবলং দুঃখমেবহি (২।৪।১৬)।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। ২।৯।১৪০।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ। ২।৯।১৪১।" কড়চাতেও দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু যে সমস্ত তীর্থক্ষেত্র (শিবক্ষেত্র, রামক্ষেত্র, ভৈরবীক্ষেত্র ইত্যাদি) ভ্রমণ করিয়াছেন, সে সমস্তকে তিনি শ্রীজগন্নাথেরই বিভিন্ন ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ক্ষেত্রাণ্যন্যানি গচ্ছামি তব দ্রষ্টুং জনার্দ্দন। ৩।১৩।১৮।" শ্রীমুরারিগুপ্তের উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরাম হইতে শ্রীগৌরের অভেদবুদ্ধিবশতঃ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে "শ্রীরামগৌরাত্মকঃ" বলিয়াছেন। ৪।২৬।২৬॥

শ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কড়চার অভিমত এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (৮)।

কড়চায় কোনও কোনও স্থলে অন্য কোনও নামের উল্লেখ না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে কেবল কৃষ্ণ (১।১৪।১ ; ২।১।৮ ; ২।১।৩০ ; ৪।১০।১), হরি (২।১১।৩), কেশব (৪।২।১৩), হৃষীকেশ (৪।৩।২১), সর্ব্বেশ্বর (১।১৬।১০), বিষ্ণু (২।৩।৮), পরেশ (২।১।৫) বা ভগবান্ (২।১২।৩ ; ২।১৩।৭) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

আরও বলা হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ (৩।৩।১৭ ; ৪।২৪।৩), রাধারসবিলাসী (৩।৫।১৪), রাধিকারসবিনোদী (৩।১৫।১৮), রাধারসাবিষ্ট (৪।৫।১৫), রাধাভাবাপন্ন (৩।১৫।২৩), রাধিকাপ্রেমভরাতিমত্ত (৪।২০।১৪), শ্রীরাধারসমাধুরীধুরি-তনু (৪।২০।১৯); শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যপূর্ণ (৪।২৪।১) এবং রাধাভাবভাবিতানন্দ (৪।২৪।১১)।

তিনি ভক্তরূপ রসিকেন্দ্রমৌলী—বিষয় ও আশ্রয়ের ভাবে আবৃত (৪।৭।৫), স্বকীয়-মাধুর্য্য-বিলাস-বৈভব (৩।১২।১৬) এবং ভক্তিরসের আশ্রয়রূপে স্বকীয় অদ্ভুত প্রেম-নাম-মাধুর্য্য (৪।২৬।১৮) আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কড়চা বলেন (২।৬।১৭)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ, রসরাজ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (শ্রীরাধা) এ দু'য়ের মিলিত বিগ্রহ (২।৮।২৩৩); রসরাজরূপে তিনি প্রেমের বিষয় এবং মহাভাববতী রূপে আশ্রয়।

---

(৬) ১।২।১২ ; ১।৮।২ ; ২।২।২৮ ; ২।৩।৯ ; ২।৩।২৬ ; ২।৮।১২ ; ২।১৭।৫ ; ২।১৭।১০ ; ২১।৭১।১১৩ ।৪।২৬ ; ৩।১৪।২৩ : ৩।১৪।২৪ : ৪।১।৩ ; ৪।১।৫ ; ৪।২১-১।

(৭) ৪।১৯।১৬—২০ : ৪।২২।১৪—১৫ ; ৪।২৩।১২ ; ৪।২৩।১৫ , ৪।১৪।১৫-১৬ , ৪।২৬।১৭।১৯।

(৮) ১।৭।২৫ , ১।১২।১৮ , ২।৮।২৩ , ২।৮।২৯ , ২।১৮।১৪ , ৩।১২।২৫ , ৪।১।৮ , ৪।২।১১ , ৪।৬।১৯ , ৪।৯।৮ , ৪।১২।১৭ ৪।১৮।১৩ , ৪।১৮।১৬।

গৌররূপে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার তিনটী কারণের মধ্যে একটী হইতেছে স্বমাধুর্য্য আস্বাদন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহাও বলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কড়চা বলেন, ব্রজের বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ (৪।১২।৭)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতও তাহাই।

এইরূপে দেখা গেল, ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কয়টী বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহাদের কোনওটী সম্পর্কেই মুরারিগুপ্তের কড়চার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরোধ নাই।

এক্ষণে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। (সর্ব্বত্রই বহরমপুর-সংস্করণের শ্লোকাদি উল্লিখিত হইবে)।

প্রথমতঃ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের আলোচনা করা যাউক। কর্ণপুর এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মুরারিগুপ্তের কড়চার অনুসরণেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কতকগুলি লীলা বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও মহাপ্রভুর আদর্শে শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে (৪।৫৯-৬০)।

এই গ্রন্থে বহুস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (১)।

সাধনসম্বন্ধে বহুস্থলে নামকীর্ত্তনের কথা (২), গৌর-কীর্ত্তনের কথা (৩) এবং হরিবাসর-ব্রতের কথাও (২।১১০) দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণসেবার কথাও আছে (১১।৯)।

নাম যে ভগবৎ স্বরূপ, তাহা ১১।৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহাও ১৬।৪ শ্লোক হইতে জানা যায়।

সাধ্য বা অভীষ্ট-বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ পাওয়া না গেলেও মোক্ষের অবাঞ্ছনীয়ত্ব এবং ভগবদ্দর্শনের আনন্দাতিশয্যের উল্লেখ (৭।৩৪-৩৫) হইতে এবং জীবের কৃষ্ণদাসত্ব-স্বরূপের ও ভক্তির মাহাত্ম্যের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিই মহাকাব্যের মতে জীবের চরমতম কাম্যবস্তু।

গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকিলেও মহাপ্রভুর রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, মহাকাব্যের মতে শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (৪)।

শ্রীঅদ্বৈতের কারণেই প্রভুর অবতার (৬।৭৯)।

মহাপ্রভুর অবতারের হেতু সম্বন্ধে কোনও কথা দৃষ্ট হয় না; তবে বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহার অতৃপ্তত্বের কথা (৮।৬১), শ্রীরাধার বেশে আবেশের কথা (১১।২৪) এবং গোপী-ভাবাবেশের কথা (১১।৬১ ; ১৫।৫) দৃষ্ট হয়। তাহাতে অনুমিত হয়, মহাকাব্যের মতে বৃন্দাবন-লীলার অতৃপ্তি-নিরসনের জন্যই গোপীভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণসম্বন্ধে কবিকর্ণপুর তাঁহার মহাকাব্যে প্রশ্ন করিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনে গৌরাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত হওয়াতেই কি সচ্চিদানন্দ-সান্দ্র শ্যামসুন্দর নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন (১।১)?

---

(১) ৫।৫৭-৫৮, ৬।৭০, ৬।৮০, ৬।১০২, ১১।১১।

(২) ২।৪১, ২।৬২, ৪।৭৬, ৫।১৩, ৬।১৫, ৬।৪৯, ৭।৭৫, ১১।১১, ১১।১৪-১৮, ১১।৩৮-৩৯, ১১।৭০, ১২।৬১, ১৩।৩৪, ৫।৫৯।

(৩) ১৪।২৯, ১৭।৫৬।

(৪) ১।১, ১।৮-৯, ১।১৩, ৩।৫, ৭।৬৫, ৭।৮০, ৭।১০২, ৮।২, ৮।২৬. ৮।৩২, ৮।৫৭-৫৮, ৮।৬১-৬২, ৯।১, ১১।১, ১২।৩৯, ১২।১০০, ১২।১১৭, ১৩।৯৩, ১৭।৬৬, ১৮।২৮, ১৯।১৫, ১৯।৬১।

মহাকাব্যের মতেও ব্রজের বলদেবই শ্রীমন্নিত্যানন্দ (৭।২৪)।

এইরূপে দেখা গেল, ধর্ম্মসম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তির সঙ্গে কর্ণপুরের মহাকাব্যের কোনও উক্তিরই বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই।

এক্ষণে কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

এই গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণোপাসনাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলা হইয়াছে (১।১২)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে বৃন্দাবনলীলারই সাধ্যত্ব খ্যাপিত হইয়াছে (১০।৭৪)। আবার শ্রীঅদ্বৈতের মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে গৌরলীলা আস্বাদনের ইঙ্গিতও শুনা যায় (১০।৭৫)। ইহা হইতে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা—এই উভয় লীলাই যেন সাধ্য—এরূপ একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২৫।২২৯ (পূর্ব্বোদ্ধৃত) ত্রিপদীতে এইরূপ কথাই আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

সাধনসম্বন্ধে মহাকাব্যের ন্যায় নাটকেও ভক্তিযোগের (১।১২) এবং নামসঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে (১)। বৈষ্ণব-দর্শনের মাহাত্ম্যের (১।১০) এবং বৈষ্ণবের কৃপার অপরিহার্য্যতার (২।১৯) কথাও দৃষ্ট হয়। বহুস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)।

জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকিলেও সাধ্য ও সাধনসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহাই নাটকের অভিমত। সিদ্ধাবস্থায় জীব পার্ষদদেহে ভগবৎ-সেবা করিবে—এই তত্ত্বের ইঙ্গিতও নাটকে দৃষ্ট হয় (১০।৭৪)। দাস্যভাবের উৎকর্ষখ্যাপনও দৃষ্ট হয় (১।৭৬ ; ১।৮০)।

গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে নাটকের অভিমত এইরূপ:—লীলাবিলাসী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ (১।১১)।

শ্রীচৈতন্যই কন্দর্পদর্পহারী হরি (১।৪২), তিনিই শ্রীকৃষ্ণ (২।১৪ ; ২।৫০ ; ২।৫২ ; ২।৬০ ; ৪।৪৯)।

তিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (২।১৭ ; ৮।১০ ; ৯।১)।

আনন্দই তাঁহার রূপ (২।২৫); আনন্দস্বরূপ হইয়াও তিনি মূর্ত্ত এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পরিচ্ছিন্ন (২।৪৩) শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তঃকৃষ্ণ (৬।৪৪);

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব-বিভাবিত (৩।৮ ; ৩।৯ ; ১০।৭৩); আদিপুরুষ হইয়াও তিনি নবীনা ব্রজবধূদিগের কৃষ্ণানুরাগ-ব্যথা অনুভব করিতেছেন (১০।৪২)॥

নামসঙ্কীর্ত্তন প্রধান ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন (১।১২ ; ১।২৮ ; ২।১৭)।

আরও জানা যায়, জীবের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ, ভক্তিযোগ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বীয় লীলাবেশে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৬১)। হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৭০)।

শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমে বশীভূত হইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৬৮)।

নাটকের মতে সঙ্কর্ষণই নিত্যানন্দ; তিনি ব্যাপক (২।৪৫) এবং শয্যা, আসনাদি দশরূপে তিনি ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন (৩।৫২)।

এসমস্ত বিষয়ে নাটকের সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও বিরোধ নাই।

---

(১) ১।১২; ১।১৩; ১।১৭; ১।৮৯; ২।১৩; ৪।১২।

(২) ১।৬৯-৭০; ১।৮০; ২।১৩; ২।৪৩।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে আরও অনেক তত্ত্বের ও তথ্যের উল্লেখ বা ঈঙ্গিত দৃষ্ট হয়; যথা—বিশ্বরূপতত্ত্ব (১।৩৮), লক্ষ্মীপ্রিয়াতত্ত্ব (১।৩৬), বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব (১।৩৭), ঈশ্বর-লক্ষণ (১।৩৩-৩৪; ৭।১০; ৮।২৪-২৬), নরলীলা-তত্ত্ব (১।৩৭; ১।৫১; ১।৮৮; ২।২১; ৫।২০), গোপীতত্ত্ব (১।৭০), বৃন্দাবনতত্ত্ব (৩।৩১; ৩।৩৬), নবদ্বীপতত্ত্ব (২।৪৫), চিচ্ছক্তির ক্রিয়াবৈচিত্রী (১।৮৮; ৩।৫০), শ্রীকৃষ্ণই জীবেই সমস্ত (৪।৬), ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব (২।৫), সাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ (১), প্রভুর উন্মাদের বিশেষত্ব (২।৫১; ৫।৭-৮), ভগবৎ-কৃপাই ভগবদুপলব্ধির হেতু (৪।৮), ভজন-প্রভাবে দেহের স্বভাবের পরিবর্ত্তন (১।৭৫), আনন্দের রূপ (২।২৫), ভগবান্ আনন্দ হইয়াও মূর্ত্ত এবং ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন—এই তত্ত্ব (২।৪৩), আনন্দময়ের অনুভব-লক্ষণ (২।৫৩; ২।৫৫), ধ্যানজনিত স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবের বিশেষত্ব (২।৫৮), ভক্তিরস (৩।৬), সাধনভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি (৩।৫), বিধি ও রাগ (৩।১৮-১৯), লৌকিকী লীলার মাধুরী (৩।২১-২৩-; ৩।৭৭), যিনি কৃষ্ণ নহেন, তিনি কখনও কৃষ্ণ হইতে পারেন না; কিন্তু কৃষ্ণ বিবিধ আকার ধারণ করিতে সমর্থ (৩.৩৮), আবেশের স্বরূপ (৪।৮), সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব, এই তিনরূপে ভগবানের জীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশ (৯।৪), ভাগবতের লক্ষণ (৯।১৯), জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য (৫।৪), অলৌকিক বস্তু সর্ব্বাবস্থাতেই আনন্দপ্রদ (৫।২৫), ঈশ্বর চিনিবার উপায় (৬।৩৮-৪০), মুখ্যাবৃত্তি ও লক্ষণা-বৃত্তিতে অর্থের পার্থক্য (৪।৪৫; ৪।৪৯), মহাপ্রভুতে সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত ইত্যাদি লক্ষণের প্রকাশ (৪।৪৫; ৫।২৯; ৮।২৪), আস্বাদ্য ও আস্বাদকরূপে ভগবানের অভিব্যক্তি (৬।৪৪), মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা (৭।২৫) ইত্যাদি। মুরারিগুপ্তের কড়চায় বা কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে এসমস্ত দৃষ্ট হয় না। এসমস্ত বিষয়েও নাটকের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ক কোনও তত্ত্বের কথা নাই। নবদ্বীপ-লীলার পরিকরগণ দ্বাপর-লীলাতেও ভগবৎ-পরিকর ছিলেন, নবদ্বীপ-লীলার কোন্ পরিকর, দ্বাপর-লীলার কোন্ পরিকর ছিলেন—এসমস্ত তথ্যই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে কর্ণপুরের সঙ্গে অপরের মতভেদ থাকিলেও এই মতভেদে বিরোধ জন্মিবার আশঙ্কা নাই; যেহেতু, সমন্বয় অসম্ভব নয়। নবদ্বীপ-লীলার এক স্বরূপের মধ্যে দ্বাপর-লীলার একাধিক স্বরূপের এবং নবদ্বীপ-লীলার একাধিক স্বরূপেও দ্বাপর-লীলার একস্বরূপের ভাব বিদ্যমান্ দেখা যায়; ইহাই সমন্বয়ের ভিত্তি॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।৮।২১ এবং ৩।৬।৮-৯ পয়ারের গৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকায় এসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা কিছু নাই।

কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত শ্রীকৃষ্ণলীলার গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের স্থাপয়িতা এবং প্রচারক কাহারও সঙ্গেই এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধ থাকিতে পারে না।

কবিকর্ণপুরের অলঙ্কার-কৌস্তুভ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থও বটে, রসগ্রন্থও বটে; ইহাতে বর্ণিত বিষয়-সম্বন্ধেও কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রকটিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রূপ মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুর প্রকটিত রূপ হইতে ভিন্ন নহে।

(খ)

বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের গ্রন্থে ধর্ম্মের যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ভজনেও সেইরূপই প্রতিফলিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের ভজনের বিষয় আলোচনা করিলেও তাঁহাদের প্রকটিত ধর্ম্মের রূপের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে; এবং তাহা হইতেও জানা যাইবে—ইঁহাদের ভজনীয় বিষয়েও পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না।

(১) ১।৫৪; ১।৬৬। ২।২০। ৫।২। ১০।৪৩। ১০।৬২।

কবিরাজগোস্বামীর গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আচরিত এবং প্রচারিত ধর্ম্মের রূপটাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তমদাস-ঠাকুরও শ্রীজীবাদি গোস্বামীদের কৃপায় সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে—বৃন্দাবন-লীলা এবং নবদ্বীপ-লীলা, এই উভয়লীলার ভজনের আদর্শই তাঁহারা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুরের ভজনাদর্শ কি ছিল, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক।

ব্যক্তিগতভাবে মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। তাঁহার কড়চার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতেন (কড়চা ৪।২৬।২৬)।

কবিকর্ণপুর গৌর-ভজন তো করিতেনই শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন। তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে তিনি তাঁহার "কুলদৈবত" বলিয়াছেন (১।৩)। তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণেও তিনি "স্বানন্দরস-সতৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহের" জয় গান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার মহাকাব্য গৌরচরিতময় গ্রন্থ; কিন্তু তাহার মধ্যেও সম্পূর্ণ দুইটী অধ্যায়ে তিনি কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার মহাকাব্যে এবং নাটকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণোপাসনার কথা বহুস্থানে ব্যক্ত করাইয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মুখ হইতে স্ফুরিত সর্ব্বপ্রথম শ্লোকটী--"শ্রবসঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জন মুরসো মহেন্দ্রমণিদাম্। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জ্জয়তি॥"-এই শ্লোকটীও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কই। তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভের সমস্ত উদাহরণই ব্রজলীলাসম্বন্ধীয়। ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা যে রসিক-শেখরের লীলাপ্রবাহের দুইটী অবিচ্ছিন্ন অংশ, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রণয়ন করিয়া কর্ণপুর যেন তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে (শ্যামোঽয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সায়ং তথাপ্যুৎসুকা পুষ্পার্থং সখি যাসি যমুনাতটং যাহি ব্যথা কা মম। কিন্ত্বেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্থালোক্য সদ্যোঽন্যথা শঙ্কাং যৎ কুটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতাস্মি তেনাকুলা॥ ৩০৬ ॥) তাহাও ব্রজের মধুরভাবদ্যোতক। অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর জয়কীর্ত্তনের পরেই তিনি গোপাঙ্গনাদিগের সাত্ত্বিক-ভাবোদ্দীপনকারী শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনির জয় গান করিয়াছেন। আবার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে সর্ব্বপ্রথম দুই শ্লোকে শ্রীরাধিকাদি-গোপাঙ্গনা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের বন্দনা করিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকে তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রী শ্রীনাথদেবের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—তিনি (শ্রীনাথদেব) মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গলিত বৃন্দাবনের রহঃকেলি কথার আস্বাদন গ্রহণ করিয়া সকলেই বৃন্দাবনধামের প্রতি আসক্ত হইত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ২১০-১১ শ্লোকেও কর্ণপুর স্বীয় গুরুর বন্দনা করিয়াছেন—তিনি সুনিপুণ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং কুমারহট্টে তাঁহার কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, কর্ণপুরের গুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এবং রহঃকেলি-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন এবং কর্ণপুরও তাঁহারই কৃপায় কৃষ্ণলীলা-কথায় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নির্ণয়সাগরপ্রেস হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ভূমিকা হইতে জানা যায়, গৌরকৃপা-স্ফুরিত তাঁহার "শ্রবসোঃ কুবলয়মিত্যাদি"-শ্লোকটী কর্ণপুর প্রণীত "আর্য্যা-শতকমের" প্রথম শ্লোক; ইহাতে অনুমিত হয়, "আর্য্যাশতকম্‌ও" গোপীজন-বল্লভেরই স্তবাবলী। এই ভূমিকা হইতে আরও জানা যায়, কৃষ্ণলীলা-গণোদ্দেশ-দীপিকা-নামেও কর্ণপুরের একখানা গ্রন্থ ছিল। ইহাদ্বারাও তাঁহার কৃষ্ণলীলানুরক্তি জানা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে এবং গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণে কর্ণপুরের তুল্য অনুরক্তির কথাই জানা যায়; সুতরাং তিনি যে উভয় স্বরূপেরই উপাসক ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণলীলার আবেশেই দিন কাটাইতেন। তাঁহার প্রভাবে এবং শিক্ষায় নবদ্বীপবাসীরা "হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচ্চস্বরে (মধ্য, তৃতীয়)।" শ্রীমন্নিত্যানন্দকে এবং শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরকে প্রভু আদেশ দিলেন—"সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ; প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা। দিন অবসানে আসি আমারে বলিবা॥ (মধ্য ত্রয়োদশ)।" জগাই-মাধাই প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া "উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে। দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥ আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥ পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার। কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার॥ (মধ্য পঞ্চদশ)॥" এইরূপে দেখা গেল, মহাপ্রভুর আদেশ এবং উপদেশ ছিল—শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য। প্রভুর অনুগত কেহ এই আদেশ ও উপদেশ উপেক্ষা করেন নাই।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও মহাপ্রভুর আদেশ এবং উপদেশ প্রচার করিতেন। নিজের অনুভব অনুসারে তিনি নিজস্ব উপদেশও দিতেন। "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ রে॥" এবং "যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ। যুগে যুগে তারে আমি করি পরিত্রাণ॥ (মধ্য পঞ্চদশ)॥"। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশ করিয়া তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিলেন বা শ্রীকৃষ্ণভজনের অনাবশ্যকতা প্রচার করিলেন, তাহা নয়। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি তো পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শেষ লীলায়ও যেমনি "লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতিমতি। (অন্ত্য, ষষ্ঠ)" তেমনি আবার চোর-ডাকাত-দস্যু-তস্করাদিকেও শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিতেন, উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সুপথে আনিয়া বলিতেন—"জন্মে জন্মে কৃষ্ণের সেবক তুমি দৃঢ়। * *। ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম। (অন্ত্য, পঞ্চম)।"; তাঁহারাও-"ধর্ম্মপথে আসি লৈল চৈতন্য শরণ। * *। সভেই হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগে দক্ষ॥ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর। নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণাসাগর॥ (অন্ত্য, পঞ্চম)।

এইরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও জানা যায়, নবদ্বীপের তৎকালীন বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের ভজনই করিতেন।

(গ)

শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের ভজনাদর্শে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভজনীয় কিনা, ভজনীয় হইলে—উপায় হিসাবে, না কি উপেয় হিসাবে—তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ের উক্তি আদিতে গোস্বামীদের ভজনাদর্শ ই রূপায়িত হইয়াছে।

কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে মহাপ্রভুর ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে যুক্তি-তর্কদ্বারা তিনি গৌরের ভজনীয়ত্ব বা সাধ্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তমদাসের প্রার্থনায়—"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু"-ইত্যাদি, "গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার"-ইত্যাদি বহু পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনের কথা দৃষ্ট হয়।

"কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি। পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"-ইত্যাদি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বহু স্তবে, এবং "গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যোঽখিলজনা মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থূৎকারনিবহম্। স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছ্রীধু চ বচস্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"-ইত্যাদি শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিকৃত বহু স্তোত্রে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপাস্যত্বের কথা জানা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন" (১।১০।৮৮) করিতেন এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণও প্রত্যহ "চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন (২।১৯।১১৯)।" ভক্তিরত্নাকর বলেন, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অষ্টকালীন নিত্যলীলার চিন্তাও করিতেন—"চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন। নিশান্ত নিশা পর্য্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ॥ (৯৪৬ পৃঃ)।" সূত্রাকারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলাবর্ণনাত্মক পাঁচটী শ্লোকও ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে (৯৪৭ পৃঃ)।

শুদ্ধাভক্তিমার্গের ভজনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধ্য এবং সাধনে, উপায় এবং উপেয়ে পার্থক্য কেবল পক্কাপক্কত্বে; শ্রীল নরোত্তমদাস তাই বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।" এবং "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" ইহাতেই গৌরলীলার সাধ্যত্ব ও উপেয়ত্ব সূচিত হইতেছে। (উভয়-লীলার তুল্যভাবে ভজনীয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন এবং ব্রজলীলা আস্বাদন হইল শ্রীমনমহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ উপদেশ। কিন্তু গৌরের ভজন এবং গৌরলীলার আস্বাদন তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশ নয়; ইহা তাঁহার পরোক্ষ-প্রেরণা। ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলা আস্বাদনের ব্যপদেশে মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় যে অপূর্ব্ব মাধুরী অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়াই গৌরলীলা আস্বাদনের জন্য ভক্তবৃন্দের বলবতী লালসা জন্মিয়াছিল। ইহাই গৌর-ভজনের অনুকূলে—প্রভুর পরোক্ষ প্রেরণা বা ইঙ্গিত। ইহা ভক্তগণের অনুভব হইতে উদ্ভূত। রায়রামানন্দাদি পরম-ভাগবত ভক্তগণ অনুভব করিয়াছেন—ব্রজলীলার মাধুরী হইতেও গৌরলীলার মাধুরী অধিকতর চমৎকৃতিজনক (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতেরও নির্দ্দেশ।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ মনে করিতেন—ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা, এই উভয়ের মিলিত আস্বাদনে যে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের বিকাশ, তাহার তুলনা নাই। "চৈতন্য-লীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥ চৈঃ চঃ ২।২৫।২২৯॥" এই মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের লোভ কোন্ লীলারস-লোলুপ ভক্ত সম্বরণ করিতে পারেন?

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের নিকট গৌরলীলার ভজন উপেয়ই ছিল, কেবল উপায় মাত্র ছিল না।

নবদ্বীপের আদিম ভক্তগণের নিকটে কেবল গৌরের ভজনই যে সাধ্য বা উপেয় ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ভজন যে সাধ্য বা উপেয় ছিলনা—তাহা নহে। কবিকর্ণপুর এবং বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গ্রন্থালোচনাপূর্ব্বক আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা, উভয়ই তাঁহাদের নিকটে তুল্যরূপে ভজনীয় ছিল। কর্ণপুরের নাটকে (১০।৭৫) বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গে গৌরলীলার আস্বাদনের লালসার কথাও জানা গিয়াছে।

মহাপ্রভুর পার্ষদদের ব্যক্তিগত ভজনের কথা বিবেচনা করিলেও তাহা জানা যায়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের ভজনের উপদেশই দিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন; তাঁহার খড়দহ শ্রীপাটে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সেবিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ-সেবা চলিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা করিতেন। শ্রীলগদাধর পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং নীলাচল-বাসকালেও শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন; বল্লভ-ভট্টাদিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাও দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, মুকুন্দ-শ্রীবাসাদি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন, প্রভুর আত্মপ্রকাশের পরে তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরং প্রভুর আদেশে এবং উপদেশে শ্রীকৃষ্ণভজনে তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই জানা যায়। পদকর্ত্তা অনন্ত আচার্য্য ছিলেন গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য, তাঁর শিষ্য হরিদাস-পণ্ডিত ছিলেন

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীউর সেবার অধ্যক্ষ। (চৈঃ চ, ১।৮।৫০)। ঠাকুর অভিরাম গোপীনাথের সেবা করিতেন (ভক্তিরত্নাকর, ১২৮ পৃঃ)। পানিহাটীর রাঘব-পণ্ডিতের এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রশংসা প্রভু নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণপুরের পিতা সেন-শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন (চৈ, চ, ৩।২।৩০)। ইহা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র।

নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত-পরিবার, গদাধর-পরিবার—ভুক্ত বৈষ্ণবগণ এখন পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরা-প্রচলিত রীতি অনুসারে গৌরলীলা এবং ব্রজলীলার ভজন করিয়া থাকেন।

পদকর্ত্তাদের পদসমূহ আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে—নরহরিদাস, বংশীবদন, শিবানন্দ, পরমানন্দদাস, বসুরামানন্দ, দ্বিজহরিদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি সকলেই গৌরলীলা ও ব্রজলীলা—উভয় লীলার পদই রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালার পদকর্ত্তা মহাজনদের প্রায় সকলেই ব্রজলীলা-বর্ণনাত্মক পদের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ নবদ্বীপ-লীলাত্মক পদও (যাহাকে গৌরচন্দ্র বলে, তাহাও) রচনা করিয়া গিয়াছেন। উভয় লীলাই যে তুল্যভাবে ভজনীয়, তাহাই ইহাদ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। গৌরলীলা-রসে ডুব দিয়াই ব্রজলীলারস আস্বাদন করিতে হয়—ইহাই মহাজনদের "গৌরচন্দ্রের" দ্যোতনা।

এসমস্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের ভজনাদর্শে এবং নবদ্বীপের আদিম ভক্তদিগের ভজনাদর্শে কোনও পার্থক্যই ছিলনা। সর্ব্বত্রই ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা তুল্যভাবে উপেয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

(ঘ)

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন, সরস্বতীপাদ কেবল গৌরভজনের প্রাধান্যই দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু ইহা যে একটী ভ্রান্ত ধারণা "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" নিম্নোদ্ধৃত কয়টী শ্লোক হইতেই জানা যায়।

কদা শৌরে গৌরে বপুষি পরম-প্রেমরসদে
সদেকপ্রাণে নিষ্কপটকৃতভাবোঽস্মি ভবিতা।
কদা বা তস্যালৌকিকসদনুমানেন মম হৃ-
দ্যকস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ॥ ৬৮

"হে কৃষ্ণ! প্রেমরসনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের প্রাণস্বরূপ, পরম-প্রেমরসদায়ক তোমার গৌরদেহে কবে আমার অকপট ভাব হইবে এবং কবেই বা তাহার অলৌকিক সদনুমানদ্বারা শ্রীরাধিকার পাদনখমণির জ্যোতি অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদিত হইবে।" টীকাকার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক-ভাব যে হৃদয়ে নাই, সেই হৃদয়ে শ্রীরাধিকা-পাদপদ্মে রতিও থাকিতে পারে না।

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্॥ ৮০

"অহে মূঢ়সকল! যাহা গূঢ় এবং দূরপ্রচারিণী দৃষ্টিদ্বারাও মুনিগণ পূর্ব্বে যাহার সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই, সেই ভক্তিমার্গের অনুসন্ধান কর। সেই দুর্লভ-বস্তু কিরূপে লাভ হইবে—তোমাদের চিত্তে যদি এরূপ অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া গৌরচরণে শরণ লও।"

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।

তথা তথোৎসপতি স্বহৃকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥ ৮৮

"বহু-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের পদারবিন্দে যে পরিমাণ ভক্তিলাভ করিবেন, শ্রীরাধার চরণকমল সম্বন্ধীয় প্রেমসমুদ্রও তাঁহার চিত্তে সেই পরিমাণে অকস্মাৎ উদ্গত হইবে ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্ রাধারতিকেলিনাগর রসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥ ১২২

"শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাৎপর্য্য—যাহা অনুশীলনের দ্বারা অধিগম্য নয় এবং ব্যাসতনয় শুকদেব রাসলীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে যাহার উদ্দেশমাত্র দিয়াছেন, তাহা এবং শ্রীরাধার সহিত রতিকেলি-নাগর শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলারসের আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ যে প্রেম, তাহা বিস্তার করিবার নিমিত্ত সেই শ্রীহরি গৌর-বিগ্রহে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

কেচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে
শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অন্যে ধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥ ১২৩

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর করুণায় কাহার কি না সম্পদ লাভ হইয়াছে? (কৃষ্ণাবতারের) উদ্ধবাদি (গৌর অবতারে ব্রজভৃত্যদের) দাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; কেহ কেহ শ্লাঘ্য শ্রীদামাদির সখ্যপদ লাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্য যাঁহারা শ্রীরাধার পাদপদ্ম-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা সুবুদ্ধি এবং ধন্যতম।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের এসমস্ত শ্লোকের মর্ম্ম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার আনুগত্যে ব্রজলীলার সেবাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। এই সেবাপ্রাপ্তির এবং এই লীলারসের আস্বাদনের যোগ্যতা-ল্যভের জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হইয়াছেন; কারণ, গৌরের কৃপাব্যতীত তাহা সহজ-লভ্য নয়। সুতরাং ব্রজলীলা তাঁহার সাধ্য—উপেয়। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে, গৌর-ভজন বুঝি গ্রন্থকারের উপায়মাত্র, উপেয় নহে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য-চরণপদ্ম হইতে ক্ষরিত প্রেমানন্দময় অমৃতরসের প্রতিও গ্রন্থকারের দুর্দ্দমনীয়া লালসা ছিল।

মাদ্যন্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎ-প্রোজ্জ্বল-
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ সর্ব্বে সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহুমন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ৬

"পরমবন্দ্য (গৌরভক্ত)-সকল যাঁহার চরণ-পদ্ম হইতে ক্ষরিত অত্যদ্ভুত উজ্জ্বল-প্রেমানন্দময় রস পানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাদিকেও (শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-মকরন্দ-রসের অনুসন্ধান না করিয়া অন্য বস্তুতে আসক্তি প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া) হাস্যাস্পদ মনে করেন, (শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগত না হইয়া একনিষ্ঠভাবে ভগবদ্‌ভজন-প্রভাবে যাঁহারা) মহাবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও (চৈতন্যচরণ-পদ্মের মধু হইতে বঞ্চিত বলিয়া) বহু মনে করেন না, (শ্রীচৈতন্য-চরণপদ্ম-রস হইতে বঞ্চিত বলিয়া) (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-পরায়ণ) ব্রহ্মযোগবিদ্‌গণকেও ধিক্কার দেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে

নমস্কার করি।” (বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ শ্লোকের টীকার ভাবার্থ)। এরূপ আরও অনেক শ্লোক এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

এ সমস্ত হইতে বুঝা যায়, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা উভয়ই প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সাধ্য বা উপেয় ছিল। একধামের লীলারসে তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; উভয়ধামের লীলাই যখন তাঁহার সাধ্য ছিল, তখন উভয় ধামের ভজনও যে তিনি করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

(ঙ)

মুরারিগুপ্ত, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এবং কবিকর্ণপুর প্রভৃতি গৌড়বাসী চরিতকারগণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাই বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন। আর বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ তাঁহাদের স্তবাদিতে এবং কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাই বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, গৌড়দেশবাসিগণ প্রভুর কেবল নবদ্বীপ-লীলারই উপাসনা করিতেন এবং বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ কেবল নীলাচল-লীলারই উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইবে না।

মুরারিগুপ্ত ছিলেন প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী। নবদ্বীপ-লীলা তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; তাই এই লীলাই তিনি বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন; নীলাচল-লীলা বিশেষ বর্ণন করেন নাই। কবিকর্ণপুরের অবলম্বন ছিল মুখ্যতঃ মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ; তাই তাঁহার গ্রন্থেও নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনেরই প্রাধান্য। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা। নবদ্বীপ-লীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিই ছিল তাঁহার প্রধান-সম্বল। প্রভুর নীলাচল-লীলা বাহুল্যে বর্ণনের নির্ভরযোগ্য উপাদান কবিরাজগোস্বামী যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে পাওয়ার সুযোগ ইঁহাদের কাহারও হয় নাই। তাই ইঁহাদের গ্রন্থে নবদ্বীপ-লীলাবর্ণনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া নীলাচল-লীলা বাদ দিয়াছেন, তাহা নহে।

গোস্বামিগণ নীলাচলে প্রভুর যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহাদের স্তবে উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলা তাঁহাদের সেইভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় নাই। স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং দাসগোস্বামীর স্তবাদি ও সাক্ষাৎ-উক্তি অবলম্বন করিয়া কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর নীলাচল-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের অনুরোধই ছিল প্রভুর শেষ-লীলা বর্ণনের জন্য; প্রভুর আদিলীলা তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেই আস্বাদন করিতেন। কবিরাজগোস্বামী নিজেও বলিয়া গিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই তিনি বর্ণন করিবেন। এসমস্ত কারণেই, ইঁহাদের স্তবে এবং গ্রন্থে প্রভুর নীলাচল-লীলা-বর্ণনার বাহুল্য। ইচ্ছা করিয়া ইঁহারা প্রভুর নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দেন নাই। কবিরাজগোস্বামী নবদ্বীপ-লীলা যে একেবারেই বর্ণন করেন নাই, তাহাও নহে।

শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়-লীলা, গোবর্দ্ধন-লীলা, বৃন্দাবনলীলা প্রভৃতি যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তদ্রূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা এবং নীলাচল-লীলাও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। দিয়াশিনী-বেশে, নাপিতানী-বেশে, যতিবেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত লীলা যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী-বেশের লীলাও তদ্রূপ নবদ্বীপ-বিহারী শচীনন্দনের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। একই লীলা-প্রবাহের বিভিন্ন বৈচিত্রী। বিবিধ-বৈচিত্রীময় সমগ্র-লীলা-প্রবাহই গৌড়ের এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের উপাস্য ছিল এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবগণ এখন পর্য্যন্তও সমগ্র-লীলারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাস হইল প্রভুর একটী নৈমিত্তিক লীলা। এই নৈমিত্তিক লীলার উপলক্ষেই প্রভুর নীলাচলে বাস। তাঁহার রাধাভাবাবেশের দিব্যোন্মাদ নীলাচলে অত্যধিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল বটে; কিন্তু নবদ্বীপেও যে কিছু

প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায়। গৌড়ীয়-ভক্তগণ মনে করেন, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া, নীলাচলে না গিয়া প্রভু যদি নবদ্বীপেই থাকিতেন, তাহা হইলেও নীলাচলের ন্যায়ই তাঁহার ভাবোন্মাদ প্রকটিত হইত; কারণ, ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাব, বেশ-পরিবর্ত্তনে স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। মখমল আচ্ছাদিতই হউক, রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতই হউক, কি সূতী বস্ত্রে আচ্ছাদিতই হউক, চিন্তামণি সকল অবস্থায় একই চিন্তামণিই থাকে।

ব্রজে এবং নবদ্বীপে উভয় ধামেই প্রকটে নৈমিত্তিক লীলা আছে। ভক্তগণ এই নৈমিত্তিক লীলারও আস্বাদন করেন এবং সময়-বিশেষে স্মরণও করেন; কিন্তু নিত্যলীলাই তাঁহাদের নিত্য উপাস্য, নিত্য স্মরণীয়। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাধাম হইল নবদ্বীপ। নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাই ভক্তদের স্মরণীয়, নবদ্বীপ-বিহারীই তাঁহাদের ভজনীয়। যাঁহারা মধুর ভাবের উপাসক, নবদ্বীপ-বিহারীতেই তাঁহারা রাধা-ভাবের আবেশ-জনিত প্রভুর দিব্যোন্মাদাদির স্মরণ ও আস্বাদন করেন। সন্ন্যাসী গৌরের ভজন প্রচলিত নাই।

অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ

গোলোকই অপ্রকট ব্রজ। অপ্রকট ব্রজ বলিতে কোন্ ধামকে বুঝায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইতেছে। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতুবর্ণনের উপক্রমে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন— "পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ১৷৩৩॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ ১৷৩৪॥" এই দুই পয়ার হইতে জানা যায়, গোলোক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম। ১৷৫৷১৪" এই পয়ার অনুসারে গোলোক, ব্রজ, বৃন্দাবন—একই ধামের বিভিন্ন নাম। (১৷৩৷৩ এবং ১৷৫৷১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশই হইল গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্য অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি॥ ১৭২॥" সুতরাং গোলোকই হইল অপ্রকট ব্রজধাম।

শ্রীজীবের মতে অপ্রকট ব্রজে ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হইল তাঁহারই স্বকীয়া শক্তি এবং তাঁহার সঙ্গে এই স্বরূপ-শক্তির নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তরূপ এবং এই মূর্ত্তরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং তাঁহারা স্বকীয়া স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের স্বকীয়াত্বই স্বাভাবিক।

ব্রজসুন্দরীদিগের কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এবং ঋষিবাক্যও দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(খ) উত্তর-গোপালতাপনী-শ্রুতি বলেন—"স বো হি স্বামী ভবতি॥ ২৩॥—সেই নন্দ-নন্দন তোমাদের (গোপীদিগের) স্বামী।" স্বামী-শব্দের মুখ্যার্থে বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, স্বামী-শব্দে সকল সময়ে বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায় না, অন্য অর্থও সূচিত করে; যেমন ভূস্বামী, গৃহস্বামী ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বলা যায়—ভূস্বামী-প্রভৃতি-স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখিয়াই লক্ষণার্থ করা হয়। কোনও স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে যখন স্বামী-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায়, কখনও উপপতিকে বুঝায় না। এস্থলে স্বামী-শব্দের মুখ্যার্থেরই সঙ্গতি।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা বলিয়া বিবাহের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। নিত্যপরিকরদের সম্বন্ধই হইল অভিমানজাত। শ্রীকৃষ্ণ অজ নিত্য বলিয়া তাঁহার কখনও জন্ম হইতে পারে না; তথাপি কিন্তু যশোদামাতার অভিমান—তিনি কৃষ্ণজননী; কৃষ্ণেরও অভিমান—তিনি যশোদা-নন্দন। তদ্রূপ, ব্রজসুন্দরীদেরও গাঢ়ানুরাগজাত অনাদিসিদ্ধ অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ অনুষ্ঠানজাত নহে, পরন্তু অভিমানজাত। ব্রজসুন্দরীদিগের চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমোৎকর্ষবশতঃ সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য চরম-উৎকণ্ঠাময়ী বাসনাবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে এইরূপ অভিমান বিরাজিত। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের সম্বন্ধে লক্ষ্মীদেবীর ভাবের ন্যায় ব্রজসুন্দরীদের এই জাতীয় অভিমান স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ভাগবতের "মৎকামা রমণং জারমিত্যাদি" ১১৷১২৷১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী একথাই বলিয়াছেন। "পতিত্বং তূদ্বাহেন কন্যায়াঃ স্বীকারিতং লোক এব। ভগবতি তু স্বভাবেনাপি দৃশ্যতে। পরব্যোমাধিপস্য মহালক্ষ্মীপতিত্বং হি অনাদিসিদ্ধমিতি।"

(গ) গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ। ২৷২৬॥—অনাদি-সিদ্ধ গোপীদিগের নন্দ-নন্দনই পতি।" পতি-শব্দের মুখ্যার্থে স্বকীয় পতিকেই বুঝায়; (সীতাপতি

বলিলে শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝায়); কখনও উপপতিকে বুঝায় না। যদি কেহ এস্থলে পতি-শব্দের উপপতি-অর্থ করেন, তবে তাহা হইবে অপ্রসিদ্ধ লক্ষণার্থ। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতে লক্ষণার্থ গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য এবং তন্ত্রবাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত বাক্যে স্পষ্ট কথায় গোলোকে গোপসুন্দরীদিগের স্বকীয়াত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

(ঘ) ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৩৭ ॥"-এই শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—আদিপুরুষ অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন; তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন—আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত (পরম-প্রেমময় উজ্জল-রস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত; পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জল-রসময় পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন; ইহাই প্রতি-শব্দের সার্থকতা। শ্রীজীব।), শ্রীকৃষ্ণের কলারূপা (হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিরূপা; হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলা) এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা (নিজের স্বরূপের তুল্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া এবং স্বরূপ-শক্তি স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা বলিয়া তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ১।৪।৮৪-৮৫ ॥ তাঁহারা তাঁহার শক্তি এবং স্বরূপভূতা বলিয়া স্বকান্তা, প্রকটলীলার ন্যায় পরকীয়া-ভাবযুক্তা নহেন। "নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরম-লক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। শ্রীজীব। —শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তিরূপা পরম-লক্ষ্মী গোপসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরদারত্ব সম্ভবেইনা। রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রকট-লীলায় অপ্রকটের স্বদারত্বময় রস—কৌতুকবশতঃ যোগমায়াকর্ত্তৃক পরদারানুরূপ ব্যবহারের আবরণে আবৃত হইয়াছে)।

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোক হইতেও জানা গেল, অপ্রকট গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরীদের স্বকীয়া-ভাব।

(ঙ) ব্রহ্মসংহিতার অন্য এক শ্লোকেও ব্রজসুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের কান্ত (পতি) বলা হইয়াছে। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ ॥ ৫।৫৬ ॥—শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাঃ—টীকায় শ্রীজীব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা বর্ণন প্রসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বরূপগত প্রকৃত সম্বন্ধের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী প্রদর্শিত হইতেছে।

(চ) "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ"-ইত্যাদি ১০।৩৩।৭-শ্লোকে গোপীদিগকে স্পষ্টকথায় "কৃষ্ণবধ্বঃ—শ্রীকৃষ্ণের বধূ" বলা হইয়াছে। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ"-ইত্যাদি প্রমাণে বধূ-শব্দে জায়া, স্ত্রী এবং পুত্রবধূকে বুঝায়; উপপত্নীকে বুঝায় না। সুতরাং কৃষ্ণবধ্বঃ-শব্দে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের জায়া, স্ত্রী বা পত্নীই বলা হইয়াছে। উক্তশ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ননু মধ্যে মণীনামিত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ন ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুক-সম্বন্ধাৎ ন ত্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাত্তদেতাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি—কৃষ্ণবধ্ব ইতি।—মধ্যে মণীনামিত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী (১০।৩৩।৬)-শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, দাম্পত্য না থাকিলে তাহা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, অদাম্পত্য হইল আগন্তুক সম্বন্ধ; স্বাভাবিক নয়। এই (১০।৩৩।৭)-শ্লোকে (মেঘচক্রের) যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবে তাহাও সঙ্গত হয় না। তাই আনন্দবৈচিত্রীবশতঃ শ্রীশুকদেব "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে (দাম্পত্যরূপ) রহস্য-কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।" এই শ্লোকের বৃহৎ-ক্রমসন্দর্ভটীকায় তিনি আবার লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণবধ্ব ইতি। গোপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি—গোপবধূ বলিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসিদ্ধি

আছে, কৃষ্ণবধূ-শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।" এইরূপে দেখা গেল, এই শ্লোকের "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে যে গোপীদিগের স্বকীয়াত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত।

এস্থলে কেহ যদি বধূ-শব্দের "ভোগ্যা স্ত্রী বা উপপত্নী"-অর্থ করিতে চাহেন, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, বধূ-শব্দের এইরূপ অর্থ কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন—কেন, "জায়া, স্নুষা, স্ত্রী"- এ-সব নানা অর্থ তো বধূ-শব্দের দৃষ্ট হয়; উপপত্নী-অর্থ করিতে দোষ কোথায়? উত্তরে বলা যায়—উল্লিখিত তিনটী অর্থ ব্যতীত বধূ-শব্দের অন্য কোনও অর্থ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উপপত্নী-অর্থের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না।

(ছ) "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি (১০।৩৩।২১)-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋষভস্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য—গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণের।" এবং শ্রীজীব লিখিয়াছেন "অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তিকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।" যাহা হউক, এস্থলে জানা গেল, গোপীদিগের বাস্তব স্বকীয়াত্ব শ্রীধরস্বামিপাদেরও অভিপ্রেত।

(জ) "ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৬)-শ্লোকের অন্তর্গত "বল্লবঃ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"যে বল্লব্য ইতি বস্তুতস্তস্যৈব পত্ন্যস্তাঃ—ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী বলিয়া।"

(ঝ) "অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে"-ইত্যাদি (১০।৪৭।২১) শ্লোকের অন্তর্গত "আর্য্যপুত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আর্য্যস্য গোপেন্দ্রস্য পুত্রঃ অস্মৎ-স্বামীতি বা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্বামী বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা আর্য্যপুত্র বলিয়াছেন।" প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, রমণীগণ স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলেন। গোপীদের বাস্তব স্বীয়াত্ব শ্রীপাদসনাতনেরও যে অভিপ্রেত, তাহাই এস্থলে জানা গেল।

আর "আর্য্যপুত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"স এব অস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অন্যস্তু লোক-প্রতীতিমাত্রময়ঃ—গোপীগণ বলিতেছেন, তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) আমাদের বাস্তব পতি; অন্য (যাহাকে আমাদের পতি বলা হয়, সে ব্যক্তি) লোকপ্রতীতিমাত্র পতি, কিন্তু বাস্তব-পতি নহে।"

(ঞ) "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৪)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—"পরমাত্মানমপি মাং দয়িতং নিজপতিমিতি ন তু পাণিগ্রহীতারং গোপমিত্যাদি।—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের স্বপতি মনে করেন,"। শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তদেবং ত্রিভির্যৌগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিম্বদন্তীপ্রাপ্তমন্যাদিত্যর্থঃ।"

পূর্ব্বোল্লিখিত (চ—ঞ) অনুচ্ছেদোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের বাস্তব-সম্বন্ধ যে স্বকীয়াভাবময়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়; এইরূপই শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী এবং শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত।

(ট) শ্রীরূপগোস্বামীর সিদ্ধান্ত কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিবাহ-সভায় সতীশিরোমণি অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবীসহ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ব্রজের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগণ, পৌর্ণমাসীদেবী প্রভৃতি এবং দ্বারকার বসুদেব-দেবকী-বলদেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাপারটী এই। কোনও এককল্পে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধিকা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; সূর্য্যকন্যা যমুনা তখন শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে রাখিলেন। সূর্য্যদেব স্বীয় মিত্র ও উপাসক অপুত্রক সত্রাজিৎ রাজার নিকটে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"ইহার নাম সত্যভামা; ইনিই তোমার কন্যা; নারদের আদেশানুসারে কোনও শোভন-কীর্ত্তি বরের হস্তে এই কন্যাকে সমর্পণ করিবে।" তারপর নারদের আদেশে রাজা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাস্থিত অন্তঃপুরে সত্যভামা নাম্নী শ্রীরাধাকে

পাঠাইয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা শ্রীরাধার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত দ্বারকায় এক নব-বৃন্দাবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমহিষী-রুক্মিণীদেবী সেই নব-বৃন্দাবনেই শ্রীরাধাকে লুকাইয়া রাখিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতীর সাক্ষাৎ না হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, সত্যভামা যে শ্রীরাধা, তাহাও ব্যক্ত হইল। পরে রুক্মিণীদেবীর উদ্যোগেই তাঁহাদের বিবাহ হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরূপের বর্ণিত বিবাহের কোনও পৌরাণিক ভিত্তি আছে কি না। উত্তরে শ্রীজীব বলেন—আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্‌-ভাগবতেও প্রকট-লীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিবাহের—স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও—ইঙ্গিত আছে।

সর্ব্বপ্রথমে, পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ উল্লেখ-পূর্ব্বক তিনি দেখাইয়াছেন—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পরে, শাল্ব-দন্তবক্র-বধান্তে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিয়া দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তখন ব্রজলীলা অপ্রকটিত করিয়া এক প্রকাশে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭৪-৭৭)।

ইহার পরে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের—"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত-সহস্রশঃ॥ ১১।১২।১৩॥"-শ্লোকের বিশদরূপে আলোচনা করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে পতিরূপেই পাইয়াছিলেন—উপপতিরূপে নহে (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭৮-৮০)। তিনি বলেন প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থে (রম্‌+ক্রি+অন্, ঘে) রমণ-শব্দে ক্রীড়া বুঝায়; ইহা ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে ক্রীড়া-অর্থে রমণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, রমণকারী-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "রমণং মাং প্রাপুঃ—রমণরূপে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে, গোপীগণ) পাইয়াছিলেন।" সুতরাং রমণ-শব্দ এস্থলে পুংলিঙ্গ। রমণ-শব্দ যখন পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ হয় পতি—স্বামী (মেদিনীকোষ, বিশ্ব-প্রকাশ অভিধান দ্রষ্টব্য)। এইরূপে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—জার (উপপতি)-রূপে প্রতীয়মান আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) গোপীগণ পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকট-নরলীলায় বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত পতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই উক্ত শ্লোক হইতে বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

এস্থলে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের পূর্ব্বে অন্য গোপগণের সঙ্গে গোপীদের বিবাহের প্রসিদ্ধি ছিল; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমনের পরে পরোঢ়া রমণীদের সঙ্গে কিরূপে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭-শ্লোকে—"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ স্ব-স্ব-পত্নীগণকে স্ব-স্ব-পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই বা অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।" এই শ্লোক হইতে গোপীদিগের পতিম্মন্য গোপদের উপরে শ্রীকৃষ্ণ-মায়ার (যোগমায়ার) প্রভাবের কথা জানা যায়। গোপগণ যাঁহাদিগকে স্ব-স্ব-পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তি; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লীলাবিলাসিনী গোপী ছিলেন না; ইঁহারা তো তখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই ছিলেন। ঐ-গোপেদের সহিত কোনও গোপীর বাস্তবিক বিবাহও হয় নাই; বিবাহের প্রতীতিও স্বাপ্নিক--যোগমায়া-কল্পিত (১।৪।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে পুনরাগমন করেন, তখন যোগমায়াই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—শ্রীরাধিকাদি-গোপসুন্দরীগণ তখনও অনূঢ়া। তখন তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল।

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ইঙ্গিতমাত্রই শ্রীরূপগোস্বামি-বর্ণিত বিবাহের ভিত্তি নহে। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের ১৭শ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—পদ্মপুরাণের ৩২শ অধ্যায়ে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, দ্বারকামহিষীগণ কৈশোরে গোপকন্যা এবং যৌবনে রাজকন্যা ছিলেন এবং স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যে দ্বারকা-মহিষীদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ষোড়শ-সহস্র গোপীই পট্টমহিষী হইয়াছিলেন।

শ্রীজীব লিখিয়াছেন, ইহা গত দ্বাপরের কথা নয়, অন্য কোনও এক কল্পের কথা। যাহা হউক, বিবাহ ব্যতীত পট্টমহিষীত্ব সম্ভব নয়। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শ্রীরূপের বর্ণিত বিবাহ পৌরাণিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আবার কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীরূপ যে বিবাহের কথা লিখিয়াছেন, তাহা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু সেই বিবাহ হইয়াছে দ্বারকায়। দ্বারকাধিপতি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যেরূপ প্রকাশ, দ্বারকায় যাঁহাদের সঙ্গে দ্বারকাধিপতির বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাও শ্রীরাধার সেইরূপ প্রকাশই; তাঁহারা সেখানে মহিষীদিগের ন্যায় সমঞ্জসা-রতিমতী, শ্রীরাধার ন্যায় সমর্থা-রতিমতী নহেন। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহের দৃষ্টান্তে ব্রজে শ্রীরাধিকাদির বিবাহ অনুমিত হইতে পারে না।

উত্তরে এই মাত্র বলা যায়—গত যে দ্বাপরে, বা গতদ্বাপরের ন্যায় অন্যান্য যে যে দ্বাপরে, ব্রজের গোপকন্যাগণ ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দ্বারকায় যাইয়া দ্বারকানাথের সহিত বিবাহিত হন নাই, সেই, বা সেই সেই দ্বাপরের মহিষীগণই সমঞ্জসা-রতিমতী; তাঁহারা শ্রীরাধার প্রকাশ-বিশেষ। কিন্তু শ্রীরূপ-বর্ণিত বিবাহের পাত্রী ছিলেন স্বয়ং শ্রীরাধা; ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া শ্রীরাধাই সত্যভামা-নামের ছদ্মবেশে দ্বারকায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমর্থা রতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও কারণ ঘটে নাই। ধাম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভিন্ন-ভাবাপন্ন পরিকরদের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই ভাবের পরিবর্ত্তন হয়; ব্রজপরিকরদের যে তদ্রূপ ভাব-পরিবর্ত্তন হয় না, কুরুক্ষেত্র-মিলনেই তাহার প্রমাণ। ঐশ্বর্য্যময় ধাম কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়বেশধারী বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদিগের মিলন হইয়াছিল; কিন্তু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে সে স্থানে সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের ভাবাপন্না হইয়া পড়েন নাই; তাঁহাদের সমর্থারতি সেখানেও অক্ষুণ্ণই ছিল। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, গোপীগণ সেস্থানে স্ব-স্বরূপেই গিয়াছিলেন, কোনও প্রকাশরূপে যান নাই। "প্রকাশভেদেনাভিমানভেদশ্চ। উ, নী, ম, সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতিপ্রকরণে প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।" যে কল্পের বিবাহের কথা শ্রীরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেই কল্পেও শ্রীরাধা স্ব-স্বরূপে—শ্রীরাধারূপেই—দ্বারকায় গিয়াছিলেন, নূতন একটী নামের আবরণে। আবরক নাম কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না।

বস্তুতঃ, বিবাহের পরেও শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাবের—সমর্থা রতির—যে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই, শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবের ১০।৩৬-শ্লোকে তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। "যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী-মাধুরীভিঃ। তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণু-র্বিহারম্॥" দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের পরেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে একদিন বলিলেন—"প্রেয়সী, অতঃপর তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, বল।" তখন আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন—"প্রাণেশ্বর, ব্রজস্থ আমার সমস্ত সখীবৃন্দই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও (রুক্মিণীরূপে) এখানে পাইলাম। ব্রজেশ্বরী শ্বশ্রূমাতাকেও পাইলাম; আর এই নববৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে তোমার সহিতও মিলিত হইলাম। ইহার পরে আর কি প্রিয় বস্তু আমার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? তথাপি, একটী প্রার্থনা তোমার চরণে জানাইতেছি। তোমার লীলারসের সৌগন্ধোদ্গারী বনসমূহদ্বারা পরিবৃত এবং মাধুর্য্যসৌষ্ঠবে পরিশোভিত পরমশ্লাঘ্য যে ব্রজভূমি বিরাজিত আছে, সেই ব্রজভূমিতে (প্রেমোদ্দামতাবশতঃ) চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি বিহার কর।" ইহা সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের কথা নয়; ইহা সমর্থারতিমতী মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগেরই কথা। দ্বারকার ঐশ্বর্য্যভাব-মিশ্রিত আবেষ্টনীর মধ্যে সমঞ্জসা-রতিই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে সমর্থা-রতি পারে না। সমর্থা-রতি চাহে সর্ব্বাতিশায়ী নিরঙ্কুশ বিকাশ; ব্রজব্যতীত অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়; তাই বিবাহের পরেও শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনের দিকেই উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র-মিলনেও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। আর একটী কথাও বিবেচ্য। দ্বারকায় প্রবেশমাত্রই যদি শ্রীরাধার সমর্থারতি সমঞ্জসায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার জন্য বৃন্দাবনের অনুরূপ একটা নববৃন্দাবন প্রস্তুত করার প্রয়োজনও বোধ হয় হইত না। দ্বারকার সুবিস্তীর্ণ রাজপুরীতে তাঁহার জন্য স্থানের অসঙ্কুলান হইত না।

দ্বারকাতেই যখন সমর্থা-রতিমতী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইতে পারিয়াছে, তখন বৃন্দাবনে বা ব্রজে বিবাহ হইতেও কোনও বাধা থাকিতে পারে না। বিবাহের বিঘ্ন যদি কিছু থাকে, তাহা হইতেছে — ভাব, স্থান নহে। তাই গত দ্বাপরের প্রকট-লীলার শেষভাগে শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিবাহের কথা বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তিনি তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইঙ্গিতমাত্র আছে ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এবং গর্গসংহিতায় গোলোক-খণ্ডে যোড়শ অধ্যায়ে বৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরকীয়া-ভাবাত্মিকা লীলায় ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শেষকালে কেন আবার স্বকীয়া-ভাব প্রকটনের জন্য বিবাহ-লীলার অনুষ্ঠান করিলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীজীবের কথায়। তিনি বলেন—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বহু-বর্ণিত বিরহ-নিরসনের নিমিত্ত নিত্য-সংযোগময়-সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন শ্রীরূপগোস্বামী দেখিলেন যে, ক্রমলীলার (প্রকটলীলার) রস সিদ্ধ হইতেছে না, তখন, নানাবিধ বিরহাবসানে মিলন জনিত সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ ও সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—যাহাব্যতীত ক্রমলীলা-রস-পরিপাটী সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার নির্ব্বাহার্থ তিনি তাঁহার ললিতমাধবে বিবাহ-লীলার উদাহরণপর্য্যন্ত দিলেন। "যতো বহুবর্ণিতবিরহ-ব্যাবর্ত্তনায় নিত্যসংযোগময়-সিদ্ধান্তমুক্তাপি ক্রমলীলারসস্ত তত্র ন সিধ্যতীত্যপরিতুষ্যা সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্ন-সমৃদ্ধিমদাখ্যেষু চতুর্ষু সম্ভোগেষু ফলরূপেষু বিপ্রলম্ভান্তরাঃপ্রতিঘাত্যস্য সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য সমৃদ্ধিমত উদ্বাহপর্য্যন্তস্যোদাহরণরূপতয়া তৎপরিপাট্যেবাত্র প্রমাণীকরিষ্যতে। উ, নী, নায়কভেদ-প্রকরণে ১৬শ শ্লোকের লোচনরোচনী টীকা।"

শ্রীজীবের কথা হইতে জানা গেল, প্রকট-লীলার রসপরিপাটী-নির্ব্বাহার্থই স্বকীয়া-ভাব প্রকটনের প্রয়োজন। কেন ? তাহা জানিতে হইলে সম্ভোগ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ জানা দরকার। 'পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শনালিঙ্গনাদিরূপ সেবা যখন পরম-উল্লাস প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে সম্ভোগ বলে (কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ। শ্রীজীব উ, নী, সম্ভোগ)। সম্ভোগ চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। যে সম্ভোগে লজ্জা ও ভয় বশতঃ সম্ভোগাঙ্গ বিশেষ প্রকটিত হয় না, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ; সাধারণতঃ পূর্ব্বরাগের পরেই ইহার বিকাশ। নায়ক-কৃত বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বা স্ববঞ্চনাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা যে সম্ভোগে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত মিলনে যে সম্ভোগ, তাহার নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। আর পারতন্ত্র্যবশতঃ যে নায়ক-নায়িকার পক্ষে পরস্পরের দর্শনাদি দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে, পারতন্ত্র্য দূর হইয়া গেলে তাহাদের পরস্পর দর্শনাদি-জনিত উপভোগের আধিক্য জন্মে যে সম্ভোগে, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। "দুর্ল্লভালোকয়োর্য্যুনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকোঃ যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥" নায়ক-নায়িকার ভাববিকাশের তারতম্যানুসারেই সম্ভোগের নাম-ভেদ।

এই চারি রকমের সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের সিদ্ধির জন্য দুইটী বস্তুর দরকার—প্রথমতঃ, নায়ক ও নায়িকা, উভয়েরই পরাধীনত্ব, যাহা মিলন-বিষয়ে উভয়কেই বাধা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের পক্ষেই পরে সেই পরাধীনত্বের বিনাশ, যাহাতে মিলন-বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নায়ক-নায়িকা যদি পরকীয়া-ভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে মিলন-বিষয়ে উভয়েই বাধা প্রাপ্ত হয়. নায়িকা বাধা প্রাপ্ত হয় শ্বাশুড়ী-আদির নিকট হইতে এবং নায়ক বাধাপ্রাপ্ত হয় পিতা-মাতাদির নিকট হইতে। এই বাধাকে অতিক্রম করিয়া যদি কোনও প্রকারে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাধাজনিত উৎকণ্ঠার ফলে মিলন-সুখও পরমাস্বাদ্য হয়। ব্রজের অন্তর্গত কোনও স্থানের নিকট-প্রবাস হইতে সমাগত-নায়কের সহিত, পরকীয়াত্বের বাধাকে অতিক্রমপূর্ব্বক নায়িকার মিলনে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ অপেক্ষা অধিকতর চমৎকারিত্বময় সুখ জন্মে বলিয়া তাহাকে সম্পন্ন-সম্ভোগ বলা হয়। ব্রজের বাহিরে কোনও স্থানের সুদূর-প্রবাস

হইতে দীর্ঘকাল পরে সমাগত নায়কের সঙ্গে মিলনে সম্পন্ন-সম্ভোগ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব চমৎকৃতিময় সুখের অনুভব হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়। এরূপ মিলনে আনন্দাধিক্যের হেতু এই যে, পরকীয়াত্ব এবং দীর্ঘ সুদূর প্রবাস—উভয়ে মিলিয়া মিলন-বিষয়ে বিপুল বাধা জন্মাইয়া মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকে অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করে; তাহার ফলেই মিলন-সুখের পরম-আধিক্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—মথুরাদিস্থানে সুদীর্ঘ সুদূর-প্রবাসের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্না ব্রজদেবীদের মিলনেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সুখের আস্বাদন সম্ভব।

কিন্তু শ্রীরূপ যখন বিবাহেই প্রকট-লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন এবং পুরাণাদিরও যখন তদ্রূপই অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং শ্রীজীবও যখন বলিতেছেন যে, পরকীয়া-ভাবজাত তীব্র পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসানে স্বকীয়ানুগত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেই সম্ভোগ-রসের চরম-পরাকাষ্ঠা এবং তাহাতেই প্রকটলীলারও রসপরিপাটীর পর্য্যবসান, তখন মনে হয়—সুদূর-প্রবাসাগত নায়ক-নায়িকার মিলনে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের আবির্ভাব হয়, উক্তরূপ স্বকীয়ানুগত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের তদপেক্ষাও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের অন্ততঃ দুইটা হেতু দৃষ্ট হয়—পরকীয়া-ভাবগত তীব্র পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসান এবং পারতন্ত্র্যাবস্থায় যাঁহারা মিলনে বাধা-বিঘ্নের হেতু হন, তাঁহাদের সম্মতিতে এবং উদ্যোগেই নায়ক নায়িকার মিলন। সুদূর-প্রবাসান্তের মিলনে এই দুইটী হেতুর অভাব এবং তজ্জনিত আস্বাদন-বৈচিত্রীরও অভাব।

শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবের মতে প্রারম্ভিক পরকীয়াত্ব হইল সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পরম-বৈশিষ্ট্যের পুষ্টিসাধক। রসপুষ্টির উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিতে গেলে শ্রীরূপের এবং শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

রস-বিষয়ে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রয়াগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরূপকে রসতত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধুপারে॥ এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। ২।১৯।১৯৩-৫॥" আলিঙ্গন দ্বারা প্রভু শ্রীরূপের মধ্যে রস-তত্ত্ব-বিচারের শক্তি-সঞ্চার করিলেন। এই কৃপার ফলে শ্রীরূপ প্রভুর হৃদয়ের গূঢ় কথাও জানিতে পারিতেন, তাহা প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন। একবার রথযাত্রা-সময়ে শ্রীরূপ নীলাচলে ছিলেন। রথের অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভু কাব্যপ্রকাশের "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ"-শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন। কোন্ ভাব মনে পড়াতে প্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন; স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত আর কেহই তাহা জানিতেন না। শ্রীরূপ প্রভুর মুখে ঐ শ্লোকটী শুনিয়া সেই শ্লোকের অর্থসূচক একটী শ্লোক রচনা করিয়া তালপাতায় লিখিয়া তাহা চালে গুজিয়া রাখিলেন। দৈবাৎ তাহা প্রভুর হাতে পড়াতে শ্লোক পড়িয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং প্রেমোল্লাসে অতি স্নেহের সহিত শ্রীরূপকে বলিলেন—"গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে। এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ৩।১।৭৬॥" তার পর একসময় স্বরূপ-দামোদরকে সেই শ্লোকটী দেখাইয়া বলিলেন—"মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে। স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞানে॥ ৩।১।৭৮-৯॥" স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ইহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা। যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হৈলা॥ তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ। তুমিও কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥ ৩।১।৮০-১॥" আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপকে মিলিত করাইয়া—"এই দুইজনে। প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে॥ তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হয় তৈছে শক্তি। যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি॥ ৩।১।৫১-২॥" প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—রসতত্ত্ব-বিচারে শ্রীরূপ যোগ্যপাত্র; তাই তিনি স্বয়ং রসতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া আলিঙ্গন দ্বারা রসগ্রন্থ-প্রণয়নের শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রভু নিজেই শ্রীরূপের জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রসের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরূপকে উপদেশ দিবার জন্য পরম-রসজ্ঞ স্বরূপ-দামোদরকেও অনুরোধ করিয়াছেন। এত কৃপা প্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামী ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র করিয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানা নাটক লিখিবার সঙ্কল্প শ্রীরূপের ছিল। তিনি নীলাচলে চলিয়াছেন, পথে নাটকের পরিকল্পনার কথা ভাবিতেছেন, আর কড়চা করিয়া কিছু কিছু লিখিয়াও রাখিতেছেন। পথে সত্যভামাদেবী স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তাঁহার (দ্বারকা-লীলার) নাটক যেন পৃথক্ করিয়া লেখা হয় এবং কৃপা করিয়া ইহাও বলিলেন—"আমার কৃপায় নাটক হইবে বিচক্ষণ। ৩।১।৩৭॥" শ্রীরূপ নীলাচলে গেলেন; নাটক-লিখিবার কথা কাহাকেও বলেন নাই। কিন্তু প্রভুও আপনা হইতে তাঁহাকে বলিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।" শ্রীরূপ বুঝিলেন, ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক্ ভাবে বর্ণন করাই প্রভুর অভিপ্রায়; সত্যভামারও অভিপ্রায় তাহাই। তখন দুই নাটকের জন্য দুই পৃথক্ পরিকল্পনা (সংঘটনা) স্থির করিয়া তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন (৩।১।৬২)। সত্যভামার আদিষ্ট নাটকই ললিতমাধব। আর ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম বিদগ্ধমাধব। একদিন শ্রীরূপ নাটক লিখিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আসিয়া শ্রীরূপের হাত হইতে একটী শ্লোক নিয়া পড়িয়াই প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে সার্ব্বভৌম, রায়রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদরকে নিয়া প্রভু উভয় নাটকের কতকগুলি শ্লোক আস্বাদন করিয়াছিলেন। দ্বারকায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহাত্মক শ্লোকগুলি তখন রচিত না হইয়া থাকিলেও প্রভু যে শ্লোকগুলির আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটী শ্লোকে বিবাহের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেই শ্লোকটী এই—"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা। সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্॥ ললিত মাধব॥ ১।২০॥" রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ?" তখন উল্লিখিত শ্লোকটীর উল্লেখকরিয়া শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছিলেন—'উদ্‌ঘাত্যক'-নাম এই আমুখ-বীথী-অঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১।১৩৬॥" উদ্‌ঘাত্যক, বীথী এবং আমুখ হইতেছে পারিভাষিক শব্দ। সাহিত্যদর্পণ বলেন—'অবোধিত-অর্থযুক্ত পদকে, অর্থসঙ্গতির জন্য যে অন্য পদের সহিত যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে।" উদ্‌ঘাত্যকের এইরূপ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্লোকটীর অর্থ করিলে অর্থ হইবে—"সেই নর্ত্তনপর কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে নিহত করিয়া পূর্ণমনোরথ সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন।" (৩।১।৪৯-শ্লোকের এবং ৩।১।১৩৬ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ইঙ্গিত আছে। মহাপ্রভুর, স্বরূপদামোদরের এবং রামানন্দরায়েরও এই ইঙ্গিত অনুমোদিত; কেননা, তাঁহাদের কেহই এই বিবাহের ইঙ্গিতে আপত্তি প্রদর্শন করেন নাই।

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা, রসতত্ত্ব-বিচারে শ্রীরূপের নিপুণতা-বিষয়ে প্রভুর নিজমুখের প্রশংসার কথা, স্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দ সহ প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের নাটক আস্বাদনের কথা এবং স্বয়ং সত্যভামাদেবীর কৃপার কথা বিবেচনা করিলে শ্রীরূপের রসবিষয়ক-সিদ্ধান্তের যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

তারপর শ্রীজীবের কথা। শ্রীজীব শ্রীরূপগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য; শ্রীজীব তাঁহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নও করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীরূপের হার্দ্দ অভিপ্রায় সমস্তই শ্রীজীব জানেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকায় শ্রীজীব নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "গ্রন্থকৃতাং স্বারস্যাৎ, কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি" এতাদৃশ শ্রীজীবের সিদ্ধান্তও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

লীলারস-সম্বন্ধে রসজ্ঞ ভক্তের অনুভূতি এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিই একমাত্র প্রমাণ। তদ্রূপ অভিজ্ঞতা কোনও সাধারণ সমালোচকের থাকার কথা নয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীরূপ এবং শ্রীজীব, উভয়েই ব্রজের কান্তাভাবের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। যাঁহারা তাঁহাদের পার্ষদত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলিবেন, আলোচ্য রস-পরিপাটী-বিষয়ে শ্রীরূপের এবং শ্রীজীবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে—সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। কেহ বলিতে পারেন, ললিতমাধব-নাটকে শ্রীরূপগোস্বামী কল্পবিশেষের প্রকটলীলারই পর্য্যবসান দেখাইয়াছেন—বিবাহজাত স্বকীয়াতে। সকল প্রকটলীলার পর্য্যবসানই যে এইরূপ হইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে?

কোনও সঙ্কল্পিত ব্যাপারের পর্য্যবসানদ্বারাই সেই ব্যাপারের মূল উদ্দিষ্ট বস্তুটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং পর্য্যবসান হইল সেই ব্যাপারের মুখ্যতম অঙ্গ। প্রকটলীলারও পর্য্যবসানই হইল মুখ্যতম অঙ্গ। কল্পভেদে রস-নিষ্পত্তির দ্বার বা ঘটনাপরম্পরার বৈলক্ষণ্য থাকিতে পারে; কিন্তু মূল অভীষ্ট রসের বা পর্য্যবসানের বৈলক্ষণ্য থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সকল প্রকট-লীলার পর্য্যবসানই পরকীয়া-ভাবসম্ভূত চরম পারতন্ত্র্যের অবসানে বিবাহজাত স্বকীয়াভাবানুগত পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি গত দ্বাপরের পর্য্যবসানও যে বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবে, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্বকীয়ভাবেই যে প্রকটলীলার পর্য্যবসান, ললিতমাধব হইতে তাহা না হয় বুঝা গেল; কিন্তু অপ্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব, না কি পরকীয়াভাব, সে সম্বন্ধে শ্রীরূপের অভিপ্রায় কিরূপে জানা যাইবে ?

প্রকটলীলার পর্য্যবসান হইতেই তাহা জানা যায়। কিরূপে ? তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের প্রমাণবলে বলিয়াছেন—প্রকটলীলার পর্য্যবসানের সঙ্গেসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকটলীলাকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করান; নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন প্রকটলীলাও তদ্রূপ অপ্রকট-লীলার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকটলীলার পর্য্যবসান-কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-জনিত পরমানন্দ নিবিষ্টচিত্তা গোপীগণ অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে দুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই দুইলীলার অভিমান এবং লীলা যে পৃথক্, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। উভয়ের পার্থক্য-জ্ঞান তাঁহাদের না থাকতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবাবিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৭।" ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার শেষভাগে স্বকীয়াভাবানুগত পরমবৈশিষ্ট্যময় যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসে ব্রজসুন্দরীগণ তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন, সেই তন্ময়তার আবেশ এবং সেই স্বকীয়া-ভাবের আবেশ লইয়াই তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাঁহাদের সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে।

উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও মনে হয় যে, প্রকটের শেষ সময়ে যে বিবাহ, তাহাও অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি-স্বরূপই—প্রকটের পরকীয়া-ভাবের আবরণে প্রচ্ছন্ন অপ্রকটের নিত্যসিদ্ধ স্বকীয়াভাব-প্রকটনের একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

এইরূপে দেখা গেল, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাবই শ্রীরূপেরও অভিপ্রেত।

(ঠ) শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়; সেই দুইটী শ্লোক হইতেও কান্তাভাবসম্বন্ধে শ্রীরূপের অভিপ্রায় জানা যায়। এই দুইটী শ্লোকের একটী হইতেছে, নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ শ্লোক। তাহা এই—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥—ঔপপত্য-বিষয়ে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক সম্বন্ধেই; পরন্তু রস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে (অর্থাৎ, রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য রসশাস্ত্রে দূষণীয় নহে)।" অপর শ্লোকটী হইতেছে, নায়িকাভেদ-প্রকরণের ৩য় শ্লোক; এই শ্লোকটী শ্রীরূপের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রাচীন আচার্য্যের রচিত। শ্লোকটী এই—"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্ গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥—প্রাচীন রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে অঙ্গী-কান্তারসে পরোঢ়া নায়িকাকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন, তাহা কেবল কমল-নয়না-ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য পরোঢ়া নায়িকা-সম্বন্ধে। ব্রজদেবীগণ পরোঢ়া হইলেও রস-শাস্ত্রে অনভিপ্রেত নহেন; যেহেতু, রসবিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-মণ্ডল-শেখর কংসারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন।"

যাহারা স্বতঃই অন্যের পত্নী, তাহাদের লইয়াই প্রাকৃত বা লৌকিক ঔপপত্য। ইহা নীতি-বহির্ভূত, সমাজের শৃঙ্খলা-নাশক, অধর্ম্মজনক এবং নিরয়-প্রাপক। তাই রস-শাস্ত্রে ইহা ঘৃণিত, বর্জ্জিত। কিন্তু প্রকট-

লীলায় ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে ঔপপত্য বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের যে পরকীয়া-ভাব, রসশাস্ত্রে তাহা ঘৃণিত বা বর্জ্জিত নয়; যেহেতু, রস-নির্য্যাস-বিশেষ আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজসুন্দরীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন।—ইহাই হইল উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ব্রজ-পরকীয়ারস নিন্দিত নহে কেন, তাহার হেতুরূপে উভয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে—রসনির্য্যাস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণও অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রজদেবীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, পরকীয়া-রস আস্বাদনের জন্যই অবতার এবং ইহাও বুঝা যায়, প্রকটলীলায় অবতীর্ণ না হইলে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে থাকিলেও অপ্রকটে এই পরকীয়া-রস আস্বাদিত হইতে পারিত না। ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতু বর্ণন উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজগোস্বামীও বলাইয়াছেন—"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ ১।৪।২৫-২৬॥" ইহা হইতে বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের স্বকীয়া-ভাব; প্রকটলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা পরকীয়া-ভাবাপন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরকীয়া-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করান। সুতরাং প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের পরকীয়া-ভাব হইল প্রাতীতিক—অবাস্তব, আগন্তুক; ইহা স্বকীয়াভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব পরকীয়াই দূষণীয়; কারণ, ইহা অধর্ম্মজনক, নিরয়-প্রাপক; ইহা সামাজিকের মনে ঘৃণা জন্মায়। কিন্তু যে পরকীয়া-ভাব অবাস্তব, প্রাতীতিক, স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধর্ম্মজনকও নয়, নিরয়-প্রাপকও নয় এবং তাহা সামাজিকের মনেও ঘৃণার উদ্রেক করে না, বরং কৌতুকাবহ ব্যাপার রূপে রসাস্বাদনের পুষ্টিবিধানই করে। এজন্যই রসশাস্ত্রে ইহা দূষণীয় নহে। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীজীবও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করিবার একটী বিশেষ বিষয় হইতেছে এই যে, ঔপপত্যের বা পরকীয়াত্বের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দোষের বা দোষাভাবের বিচার করা হইয়াছে। যে কারণবশতঃ প্রাকৃত (বা লৌকিক) ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষযুক্ত, সেই কারণের অভাববশতঃই ব্রজের ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষমুক্ত। লৌকিক ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব বাস্তব বলিয়া নিন্দিত; ব্রজের ঔপপত্য বা পবকীয়াত্ব অবাস্তব বলিয়া অনিন্দিত; উভয় শ্লোকের শেষার্দ্ধের হেতুগর্ভ বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন—উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের (নায়ক-প্রকরণের) প্রথম শ্লোকে "প্রাকৃত"-শব্দটী থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলিয়াই ব্রজের ঔপপত্য দোষমুক্ত—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই। প্রথমতঃ—প্রথম শ্লোকেই "প্রাকৃত"-শব্দ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকে নাই; দ্বিতীয় শ্লোকে আছে "পরোঢ়া"-শব্দ; তাহাতেই বুঝা যায়, পরকীয়াত্বের স্বরূপের বিচারেই প্রাধান্য অর্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—অলৌকিক বলিয়াই যদি ব্রজের ঔপপত্য দোষমুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, লৌকিক বলিয়াই লৌকিক ঔপপত্য দূষণীয়। কেবল লৌকিক বলিয়াই যদি ইহা দূষণীয় হয়, তাহা হইলে লৌকিক স্বপতিত্বও দূষণীয় হইত, যেহেতু ইহাও লৌকিক; কিন্তু স্ব-পতিত্ব যখন দূষণীয় নয়, তখন ইহাই মনে করিতে হইবে যে, ঔপপত্যের দোষ-গুণের বিচারে লৌকিকত্ব বা অলৌকিকত্বের উপরেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ—নীতি, সমাজ বা ধর্ম্মের দিক হইতে যে বস্তুটী সামাজিকের (দৃশ্যকাব্যে দর্শকের, শ্রব্যকাব্যে শ্রোতার) মনে একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মাইয়া মনের তন্ময়তাকে বিচলিত করিয়া রসাস্বাদনের উপযোগিনী অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়, রসশাস্ত্রে তাহা উপাদেয় বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ব্রজের ঔপপত্য-বিষয়ে কেবলমাত্র অলৌকিকত্বের জ্ঞানই যে সাধারণ সামাজিকের মন হইতে উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহের ভাবকে দূরে রাখিতে পারে না, মহারাজ-পরীক্ষিত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ তাঁহার ঔপপত্যও অলৌকিক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যময়ী লীলাকাহিনীর বক্তা—বিষয়-মলিনতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত দেবর্ষি-মহর্ষিগণ-সেবিত বিরক্ত-শিরোমণি পরম-ভাগবত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। তথাপি, সাধারণ-সামাজিকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মরক্ষক, সেই ভগবান্ কেন জুগুপ্সিত পরদারাভিমর্ষণ করিলেন (শ্রী, ভা,

১০।৩৩।২৬-২৮)? শ্রীশুকদেব উত্তর দিলেন—"তেজীয়সাং ন দোষায় ইত্যাদি। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ॥"—ইত্যাদি বাক্যে। মহারাজ-পরীক্ষিতের সভা ছিল ঐশ্বর্য্যময়ী; শুকদেবও তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের দিকটা উজ্জলরূপে প্রকাশ করিয়াই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সভায় দেবর্ষি-মহর্ষি-আদি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও ছিলেন ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন; তাই শুকদেবের উত্তরে তত্রত্য সামাজিকবর্গের চিত্তের সন্দেহ-নিরসন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ সামাজিকের সন্দেহ তাহাতে নিরসিত হইবে কিনা, বলা যায় না। কিন্তু শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উত্তরের সঙ্গে এই প্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।"-ইত্যাদি বাক্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যোগ করিয়া অর্থ করিলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাতে সাধারণ-সামাজিকের মনের সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। সেই উত্তরই উজ্জলনীলমণির শ্লোকদ্বয়ের শেষার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল কেবল অলৌকিকত্বই ব্রজের ঔপপত্যের দোষহীনতার হেতু হইতে পারে না। অলৌকিক হইয়াও যদি ইহা বাস্তব হইত তাহা হইলেও রসশাস্ত্রে ইহা দূষণীয়ই থাকিয়া যাইত। অবাস্তব বলিয়াই ইহা দূষণীয় নয়।

যাহা হউক উজ্জলনীলমণির শ্লোকদ্বয় হইতে শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত যাহা জানা গেল তাহা এই। অপ্রকট ব্রজে স্বকীয়া-ভাব এবং প্রকট ব্রজে পরকীয়াভাব এবং প্রকটের এই পরকীয়া, প্রাতীতিক, অবাস্তব এবং স্বকীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবাস্তব শব্দের তাৎপর্য্য এই যে ব্রজসুন্দরীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও পত্নী নহেন হইতেও পারেন না; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তাঁহাদের নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অপর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রাতীতিক শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবেই প্রকটে ব্রজদেবীদিগের পরকীয়াত্বের প্রতীতি, বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া-কান্তা নহেন।

পরম স্বীয়া। উল্লিখিত কারণ পরম্পরাবশতঃ দার্শনিকতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, শ্রুতিবাক্য এবং ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অপ্রকটব্রজে ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব এবং কেবলমাত্র প্রকট ব্রজেই তাঁহাদের যোগমায়াকৃত পরকীয়া ভাব। পরকীয়া ভাব স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক মাত্র।

কিন্তু অপ্রকট-ব্রজের এই স্বকীয়াভাব মহিষীদিগের স্বকীয়াভাবের অনুরূপ নয়। মহিষীদিগের কৃষ্ণপ্রীতি সমঞ্জসা-রতি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহার উপরে নয়। ব্রজদেবীদিগের প্রীতি সমর্থারতি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; মহাভাবাখ্য প্রেম এবং তৎসম্ভূত সমর্থারতি হইল ব্রজদেবীগণের স্বরূপগত সম্পত্তি; মহিষীগণের পক্ষে ইহা পরম দুর্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্লভঃ। উ' নী, ম।" পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখান হইয়াছে প্রকট লীলার শেষভাগে পরকীয়াত্বের অবসানে স্বকীয়াত্ব প্রকটনের পরেও ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থারতি এবং মহাভাব অক্ষুন্নই থাকে। মহাভাব তাঁহাদের স্বরূপগত বস্তু বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। যে অবস্থাতেই রক্ষিত হউক না কেন অগ্নি তাহার উত্তাপ হারায় না। মৃদ্‌ভাণ্ডের আবরণে যখন থাকে তখন স্বীয় প্রচণ্ড উত্তাপে অগ্নি মৃদ্‌ভাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতেও পারে; কিন্তু মৃদ্‌ভাণ্ডের আবরণ অপসারিত হইলেও তাহার উত্তাপ পূর্ব্ববৎই থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকটলীলার অবসানে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ তন্ময়তার আবেশ লইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করেন, তখন ঐ তন্ময়তাবশতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা লীলার নূতন এক প্রকাশে আসিয়াছেন। ইহাতেই জানা যায়, প্রকট প্রকাশের শেষভাগের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সুখ এবং অপ্রকট-প্রকাশগত সম্ভোগ-সুখ, এতদুভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; থাকিলে এই পার্থক্যই প্রকট-লীলাবসানের সুখ-তন্ময়তা অপসারিত করিয়া দিত, তাঁহাদের চিত্তে উভয় প্রকাশের পার্থক্য জ্ঞান স্ফুরিত করিয়া দিত। বাস্তবিক, যে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উন্মাদনা লইয়া ব্রজদেবীগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন, অপ্রকটেও তাহাই তাঁহাদের থাকিয়া যায়। ইহাও মহিষীবৃন্দের পক্ষে দুর্লভ; যেহেতু, পরকীয়াত্বজনিত কঠোর পারতন্ত্র্যের অবসানে তাঁহাদের স্বকীয়াত্ব সংঘটিত হয় নাই।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনা লইয়া ব্রজদেবীগণ অপ্রকটে প্রবেশ করিলেও মিলন-বিষয়ে তখন আর কোনও বাধাবিঘ্ন থাকে না বলিয়া ক্রমশঃ সেই উন্মাদনা তো স্তিমিত হইয়া যাইতে পারে। তখন আর আস্বাদন-চমৎকৃতি থাকিবে কিরূপে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। প্রথমতঃ—ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের সুখোন্মত্ততা অক্ষুণ্ণ থাকে। দ্বিতীয়তঃ—উক্ত সুখোন্মত্ততার নব-নবায়মানত্ব-সাধক উৎস নিত্যই বিদ্যমান। তাহার হেতু এই। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নিত্য, প্রকটের প্রতি খণ্ড-লীলাও নিত্য—এমন কি জন্মলীলাও নিত্য। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন জন্মলীলা শেষ হইয়া যায়, তখনই তাহা আবার আর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, তাহার পরে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে। এইরূপে কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে জন্মলীলা সর্ব্বদাই আছে; মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড থাকে না, তখনও যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা চলিতে থাকে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের পক্ষে জন্মলীলা নিত্য না হইলেও লীলা-হিসাবে ইহা নিত্য। এই ভাবে প্রত্যেক খণ্ডলীলাই নিত্য এবং ক্রমলীলার প্রবাহও নিত্য। প্রকটের পরকীয়াভাবও প্রকটে নিত্য, পরকীয়াত্বের অবসানে বিবাহ-লীলাও নিত্য এবং বিবাহের পরে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ-তন্ময়তার আবেশ লইয়া অপ্রকট-লীলার প্রবেশও নিত্য। এইরূপ আবেশময় প্রবেশই অপ্রকটের সুখোন্মত্ততা নবায়মান করিয়া তোলে। কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সর্ব্বদাই যখন এভাবে অপ্রকটে প্রবেশ চলিতেছে, তখন অপ্রকটের পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব যে নিত্যই নব-নবায়মান থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ইহাই হইল মহিষী-আদির স্বকীয়াভাব অপেক্ষা অপ্রকট-ব্রজের স্বকীয়া-ভাবের সর্ব্বাতিশায়ী পরম-বৈশিষ্ট্য এবং এ-জন্যই শ্রীজীবগোস্বামী অপ্রকট-ব্রজের নিত্য ভাবকে কেবলমাত্র স্বকীয়া-ভাব না বলিয়া পরম-স্বকীয়াভাব—এবং ব্রজসুন্দরীগণকে "পরম-স্বীয়া" বলিয়াছেন। "বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ ॥ প্রীতিসন্দর্ভ। ২৭৮ ॥"

আপত্তি। শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি উঠিতে পারে। আমাদের মন্তব্যসহ যে সমস্ত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রকটলীলার পরকীয়াভাবের আনুগত্যেই কান্তাভাবের সাধকের ভজন। যদি প্রকটের পরকীয়াভাবই অবাস্তব হয়, তাহা হইলে ভজনের ফল কিরূপে বাস্তব ?

মন্তব্য। পরকীয়াভাবের অবাস্তবত্বের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই খুলিয়া বলা হইয়াছে। এই ভাবটী অবাস্তব হইলেও ব্রজদেবীগণের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ভাবানুকূল-অভিমানটী কিন্তু সত্য—নাটকের অভিনেতার অভিমানের ন্যায় বাহিক বা কৃত্রিম নহে। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়-প্রতীতি এই যে—ব্রজদেবীগণ পরকীয়াকান্তা। আর অন্য ব্রজবাসীদিগের প্রতীতিও তদ্রূপ। তাহার ফলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে, যদিও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের পতিম্মন্যদিগকে কখনও পতি বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের একমাত্র প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি লৌকিক রীতি অনুসারে তাঁহাকে তাঁহাদের পতি বলিয়াও স্বীকার করিতে পারিতেন না; যেহেতু, প্রকট-লীলারস-পুষ্টির জন্য যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। স্বপতিত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকায় এবং পতি বলিয়া স্বীকার করিতেও না পারায়, বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাঁহাদের পর-পত্নীত্বের অনুকূল থাকায়, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে লৌকিক-রীতিতে পর-পুরুষ বলিয়াই মনে করেন; তাহাতে তাঁহাদের অভিমান বা প্রতীতিও পরকীয়াত্বেই পরিণত হয়। এই প্রতীতি তাঁহাদের নিকটে অবাস্তব নয়। এই বাস্তব অভিমানকে অবলম্বন করিয়াই ভজন; সুতরাং তাহা অবাস্তবে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ভগবৎ-কৃপায় সাধনের পরিপক্কতায় সাধক যখন পরিকররূপে লীলায় প্রবেশ লাভ করিবেন, তখন তিনিও এই প্রতীয়মান পরকীয়াভাবকে বাস্তব বলিয়াই মনে করিবেন। সুতরাং সাধনের ফলও অবাস্তব হইবে না।

(২) প্রকটলীলায় পরকীয়াত্বের অভিমান বাস্তব হইতে পারে; কিন্তু অবাস্তব বলিয়া পরকীয়াভাবই যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলেও তো সাধন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। অবাস্তব বস্তুর নিত্যতা কিরূপে সম্ভব? বিশেষতঃ প্রকটলীলার শেষভাগে যখন পরকীয়াভাব তিরোহিত হইয়া যায়, বিবাহ-লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বকীয়াত্ব প্রকটিত হয়, তখন পরকীয়াভাব যে অনিত্য, তাহা তো সহজেই বুঝা যায়।

মন্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকটলীলা বা তাহার কোনও অংশ ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের পক্ষে অনিত্য হইলেও লীলা-হিসাবে অনিত্য নয়। যখনই কোনও ব্রহ্মাণ্ডে পরকীয়া-ভাবের অবসান হয়, তন্মুহূর্ত্তেই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার পরে অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে—ইত্যাদি ক্রমে তাহার আবির্ভাব হইতে থাকে; সুতরাং অবাস্তব হইলেও প্রকটলীলার প্রবাহ নিত্য বলিয়া পরকীয়া-ভাবের প্রবাহও নিত্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জাত অবাস্তব বস্তুর নিত্যতা নাই; যেহেতু, তাহার মুখ্য সম্বন্ধই হইতেছে জীবের অনিত্য কর্ম্মফলের সঙ্গে, অনিত্য দেহের সঙ্গে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু, তাঁহার লীলারস আস্বাদনের বাসনাও নিত্য; যেহেতু, তিনি রসস্বরূপ বলিয়া ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। আবার তিনি রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহার নিত্য-বাসনা পূর্ত্তির উপায়ভূত লীলাও হইবে নিত্য। যোগমায়া হইল তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত যোগমায়া যাহা উদ্ভাবিত করেন, তাহার সম্বন্ধ হইতেছে লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবাসনার সঙ্গে; সুতরাং তাহাও নিত্যই হইবে। তাই পরকীয়াত্বের অভিমান নিত্য, পরকীয়াভাবের লীলাপ্রবাহও নিত্য। সিদ্ধিলাভান্তে সাধকের দেহভঙ্গের সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা চলিতে থাকে, দেহভঙ্গের পরে সেই ব্রহ্মাণ্ডেই আহিরী-গোপের ঘরে তাঁহার জন্ম হয় এবং যথাসময়ে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা যখন অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করে, তখন তিনিও এক প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিবেন এবং আর এক প্রকাশে প্রকটলীলায় থাকিবেন। এইরূপে সাধকের ভজনের ব্যর্থতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(৩) পরকীয়াভাব অবাস্তব হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলার রসোৎকর্ষ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

মন্তব্য। পরকীয়াত্বের অভিমান বাস্তব বলিয়া রসোৎকর্ষের অসদ্ভাবের আশঙ্কা হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার—পরকীয়াত্বই রসোৎকর্ষ-সম্পাদক নহে; তাহাই যদি হইত, প্রাকৃত পরকীয়াত্বও রসোৎকর্ষ-সাধক হইত এবং সৈরিন্ধ্রী কুব্জার ভাবেরও পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইত। ব্রজদেবীদিগের প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যই রসোৎকর্ষের হেতু। পরকীয়াভাব মিলন-বিষয়ে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের অবতারণা করিয়া রসোৎকর্ষের এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী সম্পাদন করে মাত্র।

(৪) প্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাববতী বলিয়াই ব্রজদেবীগণ স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এইরূপ ত্যাগের জন্যই তাঁহাদের প্রেম উদ্ধবাদি পরম-ভাগবতগণ কর্ত্তৃক এবং "ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। অপ্রকটের স্বকীয়াভাবেও যদি প্রকটের ন্যায় মহাভাবই বিদ্যমান্ থাকে, তাহা হইলে সেখানে স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

মন্তব্য। প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীগণের স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগের প্রশংসা কেবলমাত্র ত্যাগের জন্যই নয়। তাঁহাদিগের প্রেমের যে চরমোৎকর্ষের অদ্ভুত প্রভাব তাঁহাদিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদির দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্নকেও উল্লঙ্ঘন করার সামর্থ্য দিয়াছে, সেই প্রেমোৎকর্ষই উদ্ধবাদির প্রশংসার বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চিরঋণিত্বেরও হেতু। ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল প্রকট-লীলাতেই চিরঋণী, তাহা নয়; অপ্রকটেও তিনি এইরূপই ঋণী। এই প্রেমোৎকর্ষের যে কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা প্রমাণ করার সুযোগ অপ্রকটে ঘটে না। প্রকটে পরকীয়া-ভাবের আশ্রয়ে সেই প্রেমোৎকর্ষই স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগ করাইয়া একটা সুযোগ ঘটাইয়া দেয়।

তাই প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ এই ত্যাগের সাক্ষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ-খ্যাপন-পূর্ব্বক তাহার নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব ঘোষণা করেন।

অপ্রকটে তাঁহারা নিত্য মিলিত বলিয়া স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগের প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু ইহাতেই ব্রজ-সুন্দরীদের মহাভাবের অভাব সূচিত হয় না। মত্ত মাতঙ্গ তাহার গতিপথের বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু যেস্থানে তাহার গতিপথে কোনও বৃক্ষ তাহার গমনের বাধা সৃষ্টি করে না, সেস্থানে তাহাকে কোনও বৃক্ষ উৎপাটিত করিতে হয় না বলিয়া ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তাহার বৃক্ষোৎপাটনের শক্তি নাই। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উত্তাল-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া মহাসমুদ্রের এক বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকটিত করায়; কিন্তু যখন ঝঞ্ঝাবাত থাকে না, তখনও মহাসমুদ্র মহাসমুদ্রই থাকে, তখন তাহা ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায় না। তদ্রূপ, প্রকটলীলার পরকীয়া ভাবরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ব্রজসুন্দরীদিগের স্বাভাবিক মহাভাবরূপ মহাসমুদ্রকে তুমুলভাবে উদ্বেলিত করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীতে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে; কিন্তু অপ্রকটে যখন এই পরকীয়া-ভাবরূপ ঝঞ্ঝা থাকে না, তখনও মহাভাব-সমুদ্র মহাভাব-সমুদ্রই থাকে। তখন তাহাতে বৈচিত্রী জন্মায়—পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের নব-নবায়মান আস্বাদন-চমৎকারিত্ব।

গোপালচম্পূ। শ্রীজীবগোস্বামী অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধে গোপালচম্পূ-নামে একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার কি অভিপ্রায় ছিল, তাহা নিজেই গ্রন্থসূচনায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্। তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া॥—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে আমি যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, কাব্যকৃতি-বুদ্ধিরূপা রসনাদ্বারা এই গ্রন্থে সেই অমৃতেরই আস্বাদন করা হইবে।" এই গ্রন্থে তিনি অপ্রকটে স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থখানি যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, কবিরাজগোস্বামীই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীজীব "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর॥ ২।১।৩৯॥ গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল। ব্রজের প্রেমরস-লীলাসার দেখাইল॥ ৩।৪।২২১॥"

বিরুদ্ধবাদ। শ্রীজীব যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন এবং তাহার প্রায় শতবৎসর পর পর্য্যন্তও শ্রীজীবের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে যে কেহ কোনও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় শতবৎসর পরে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে এবং সম্ভবতঃ তাহারও কিছু পূর্ব্বে একটা বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদের মতে প্রকট এবং অপ্রকট—উভয়ত্রই পরকীয়াভাব। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বিরুদ্ধবাদ ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা। উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীজীবকৃত লোচন-রোচনী টীকার কোনও কোনও আদর্শে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থম-বতারিণি॥"-শ্লোকের টীকার সর্ব্বশেষে শ্রীজীবের উক্তিরূপে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥—এস্থলে আমি যাহা কিছু লিখিলাম, তাহার কিছু আমার নিজের ইচ্ছায়, আর কিছু পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল। যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমার নিজের ইচ্ছায়—আর যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই, তাহা পরের ইচ্ছায়—লিখিত বলিয়া জানিবে।" কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আচার্য্যস্থানীয় গ্রন্থকার নিজের লেখাসম্বন্ধে এইরূপ একটী কথা লিখিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ এই শ্লোকটী গ্রন্থের সকল আদর্শে নাইও। সুতরাং এই শ্লোকের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বিবেচ্য। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদকৃত উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকানাম্নী টীকার ভূমিকাতেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়; সুতরাং এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে চক্রবর্ত্তিপাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহই প্রক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক, উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টীকায় কোনওরূপ অসামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহাই দেখা যাউক।

টীকার মর্ম্ম। টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন :—কৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দনীয় নহে; যেহেতু তিনি "রসনির্য্যাসেতি রসনির্য্যাসো রসসারঃ মধুররসবিশেষ ইত্যর্থঃ—রসনির্য্যাস অর্থাৎ মধুর-রসবিশেষ আস্বাদনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মধুর-রস-বিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দনীয় হইবেনা কেন? তদুত্তরে শ্রীজীব বলেন—"অত্রাবতার-সময় এব ঔপপত্যরীতিঃ প্রত্যায়িতা * * * তদর্থমেবাবতারঃ * * * অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্যতে।—অবতার সময়েই (প্রকট-লীলা-কালেই) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যরীতি প্রত্যায়িত হয় (অন্য সময়ে—অপ্রকট-লীলা-কালে নহে); সেই উদ্দেশ্যেই (ঔপপত্য-মূলক-লীলাবিলাসের নিমিত্তই) তাঁহার অবতার। (অবশ্য জগতের ভারাবতারণ-নিমিত্ত দেবাদির প্রার্থনাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে; তাহা সত্য; অবতীর্ণ হইয়া তিনি ভারাবতারণ করিয়াছেন, তাহাও সত্য; এই) ভারাবতারণ দেবতাদের ইচ্ছাতেই করা হইয়াছে, কিন্তু এই ঔপপত্য তাঁহার নিজের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ অবতার সময়ে স্বেচ্ছায় ঔপপত্য-সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাহা নিন্দিত হইবে না কেন? তদুত্তরে শ্রীজীব-গোস্বামী—শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"তদেবং শ্রীমদুদ্ধববাক্যে ব্রহ্মসংহিতাবাক্যেচ তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃপরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। তদসঙ্গতেশ্চ অবতারে তথা প্রতীতির্মায়িক্যেব।—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-বাক্য এবং ব্রহ্মসংহিতা বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না; অসঙ্গত বলিয়া প্রকট লীলা-কালে ঐ পরকীয়াত্বের প্রতীতি মায়িকী (যোগমায়া প্রভাবে সঞ্জাতা) মাত্র।" ইহার পরে ললিত-মাধবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলেন; পরে লিখিলেন—"তদেব শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যত্যেবাস্ততো মায়িকমস্তত্তস্বনাশেঽনাদিত্বে চ সতি নিত্যমেব স্যাত্তদ্রূপত্বে সতি পূর্ব্বরীত্যা রসাভাসঃ স্যাদিত্যতোঽবতারসময়স্যাপরভাগে ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্। স এব পর্য্যবসানসিদ্ধান্তশ্চ ললিতমাধব-প্রক্রিয়য়াঽত্র চ নির্ব্বাহয়িষ্যতে।—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের নিত্যদাম্পত্য-সম্বন্ধ বলিয়া প্রকটলীলার শেষ সময়ে মায়িক-পরকীয়াত্ব অন্তর্হিত হয়। পরকীয়াত্ব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বরীতি-অনুসারে রসাভাস হইবে; তাই প্রকট-লীলার শেষভাগে দাম্পত্য ব্যক্তীভূত হয়। ললিত মাধব-বর্ণিত প্রক্রিয়া-অনুসারে ব্রজেও দাম্পত্যে পর্য্যবসান-সিদ্ধান্ত নির্ব্বাহিত হইবে (বস্তুতঃ শ্রীগোপাল-চম্পূতে প্রকট-লীলার শেষ সময়ে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-লীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাদের সম্বন্ধকে দাম্পত্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন)। ইহার পরে ললিতমাধবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব দেখাইলেন যে শ্রীরাধাগোবিন্দের বহু-বর্ণিত বিরহ-নিরসনের নিমিত্ত নিত্য-সংযোগময়-সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন শ্রীরূপগোস্বামী দেখিলেন যে, ক্রমলীলারস সিদ্ধ হইতেছেনা, তখন নানাবিধ-বিরহাবসানে মিলন-জনিত সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ও সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—যাহা ব্যতীত ক্রমলীলারস-পরিপাটী সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার নির্ব্বাহার্থ তিনি বিবাহ-লীলার উদাহরণ পর্য্যন্ত দিলেন। পরে শ্রীজীব বলিলেন—"তস্মাদুপপতীয়মানত্বে-নৈবাসাবুপপতিরিত্যুপদিষ্টঃ।—প্রকট-লীলায় উপপতিরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলা হয়।" "উত্তরত্র ব্যক্তে দাম্পত্যে বিপ্রলম্ভাঙ্গস্যৌপপত্যে ভ্রমস্য সমৃদ্ধিমদাখ্য-সম্ভোগ-রসপোষকত্বাত্তস্মিংস্ত ন লঘুত্বং যুক্তং কিন্তু মহত্ত্বমেবেত্যাহ ন কৃষ্ণ ইতি।—শেষকালে দাম্পত্য প্রকটিত হয় বলিয়া বিপ্রলম্ভের অঙ্গস্বরূপ যে ঔপপত্য, তাহাতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পোষকতা সাধিত হওয়ায় তাদৃশ ঔপপত্যের লঘুত্ব (জুগুপ্সিতত্ব) সঙ্গত হয় না, বরং মহত্ত্বই যুক্তিসঙ্গত; তাই মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে 'ন কৃষ্ণে' ইত্যাদি।" পরে বলিলেন—"প্রাকৃত বাস্তব ঔপপত্যে রস-পাটী সম্ভাব নাই; তাই রসশাস্ত্রে তাহা নিন্দিত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য অবাস্তব, অথচ তাহা রস-পরিপাটীর পোষকতা করে, তাই—তাহা নিন্দিত নহে, যেমন পরম-লোভনীয় পথ্য যদি কুপথ্য মনে করিয়াও ভোজন করা যায়, তাহা হইলেও যেমন পথ্য-ভোজন করা হইয়াছেই বলা হয়, তদ্রূপ।" ইহার পরে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম—মহিষী-আদির প্রেম অপেক্ষা যে জাতিতেই শ্রেষ্ঠ, ঔপপত্যের বারণাদি যে তাঁহাদের সেই প্রেমবলের-ব্যঞ্জকমাত্র, পরন্তু

উৎপাদক নহে, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া শ্রীজীব পুনরায় বলিলেন—"যদবতারাদন্যদা ন তাদৃশতায়াঃ স্বীকারঃ কিন্তু দাম্পত্য স্যৈবেতি লভ্যতে—প্রকট লীলা-সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পরকীয়াত্ব স্বীকৃত হয় না, দাম্পত্যই স্বীকৃত হয়।" অনন্তর এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ দেওয়ার নিমিত্ত ব্রহ্মসংহিতা, গৌতমীয়তন্ত্র, বেদান্তসূত্র, গোপালতাপনী, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্থলবিশেষে কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—"তস্মাদনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতায়াং রাসাদিক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এবেতি ভাবঃ।—সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সেই সমস্ত ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সমুচিত রাসাদিক্রীড়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া পরদারত্ব ঘটিতেই পারেনা, ইহাই সারার্থ।" ইহার অব্যবহিত পরেই কোন কোন গ্রন্থে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজীবকৃত টীকাটীর সম্যক্ বিবরণই সংক্ষেপে উপরে প্রদত্ত হইল। স্পষ্টই দেখা যায়—উহার উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যভাগে সর্ব্বত্রই—শ্রীজীব প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের স্বরূপতঃ স্বকীয়া-ভাবময় দাম্পত্য-সম্বন্ধ; রস-নির্য্যাস-পরিপাটীর উদ্দেশ্যে কেবল প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপপতি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন; এই ঔপপত্য বাস্তব নহে, পরন্তু যোগমায়া-কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও বিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক শ্রীজীব বলিয়াছেন—"প্রযত্নেনোপপাদনাজ্জারত্বস্ক প্রাতীতিকমাত্রম্।—গোপীদিগের নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া (প্রযত্নেন—যোগমায়ার সহায়তায়) তাঁহাদের উপপতি সাজিয়া ছিলেন। এই উপপতিত্ব প্রতীতিমাত্র, বাস্তব নহে। ১৭৭॥"

শ্রীজীব তাঁহার টীকায় প্রসঙ্গক্রমে বরং ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ঔপপত্য যদি মায়িক না হইয়া বাস্তব হইত এবং শেষকালে যদি দাম্পত্য প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে ক্রমলীলা-রস-সিদ্ধিমূলক পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসই নিষ্পন্ন হইত না। এই-বিষয়টী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

টীকায় পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্যের অভাব নাই। টীকার সর্ব্বত্রই এক ভাবের কথা—পরস্পর-বিরোধী দুই ভাবের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং "কিছু নিজের ইচ্ছায়, কিছু পরের ইচ্ছায় (সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) লিখিত"—উক্ত টীকা-সম্বন্ধে এরূপ কোনও যুক্তিই খাটিতে পারে না। শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপক্রমের সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য আছে এবং সন্দর্ভ, চম্পূ, সঙ্কল্পক্রম, ক্রমসন্দর্ভ, ব্রহ্ম-সংহিতার টীকা প্রভৃতিতে এই বিষয়ে শ্রীজীব যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গেও উক্ত টীকার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং উক্ত টীকার পরে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী নিতান্তই খাপছাড়া হইয়া পড়ে; ঈদৃশ কোনও শ্লোক এস্থলে লিখিবার কোনও হেতুও দেখা যায় না। যাঁহারা শ্রীজীবের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কেহই পরবর্ত্তী কালে উক্ত শ্লোকটী যোজনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়।

বিরুদ্ধবাদ ও কর্ণানন্দ। কর্ণানন্দ-নামক একখানা গ্রন্থ বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্র হইতে বহুবৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকাশক পণ্ডিতপ্রবর রাম রামায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীযদুনন্দন দাস; ইনি নাকি শ্রীলশ্রীনিবাস-আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য—এইরূপই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবার আচার্য্যপ্রভুর পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদির এবং তাঁহাদের শিষ্যানু-শিষ্যাদিরও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও বহু পয়ার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অপ্রকট-ব্রজে পরকীয়াভাবই যে শ্রীজীবের হার্দ্দসিদ্ধান্ত, কর্ণানন্দে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রকাশক বিদ্যারত্নমহাশয় বলেন—বহুবৈষ্ণব-গ্রন্থের অনুবাদক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসই কর্ণানন্দের গ্রন্থকার। ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না; গ্রন্থখানি কৃত্রিম বলিয়াই আমাদের মনে হয়; তাহার হেতু এই।

(১) কর্ণানন্দে লিখিত আছে, ১৫২৯ শকের বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গ্রন্থ-লিখন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে ১৫৩৭ শকে সমাপিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহু পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

(২) শ্রীনিবাস-আচার্য। ১৫২১-২২ শকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন, তারপরে তাঁহার বিবাহ। অথচ তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসার ছয় সাত বৎসর পরে ১৫২৯ শকের বৈশাখে সমাপিত কর্ণানন্দে তাঁহার পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়; তাঁহার কন্যা হেমলতাঠাকুরাণীর শিষ্যই নাকি কর্ণানন্দের গ্রন্থকার যদুনন্দনদাস এবং হেমলতাঠাকুরাণীর আদেশেই নাকি গ্রন্থের নাম কর্ণানন্দ রাখা হইয়াছে—এসব কথাও কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে।

(৩) যদুনন্দনদাসঠাকুরের ন্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গ্রন্থে কোনও ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর—বিরুদ্ধ উক্তি থাকা সম্ভব নহে; কিন্তু কর্ণানন্দে তাহাও দৃষ্ট হয়। রাজা বীরহাম্বীর কর্তৃক শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থ চুরির ন্যায় একটা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধেই দুই রকম উক্তি দৃষ্ট হয়; চতুর্থ নির্য্যাসে লিখিত আছে—আচার্য্যপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া আসার সময়ে গ্রন্থ চুরি হয়; কিন্তু প্রথম নির্য্যাসে লেখা আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে আসার পরে আচার্যপ্রভু যখন গ্রন্থ লইয়া পুরুষোত্তম যাইতেছিলেন, তখন বীরহাম্বীরের লোক গ্রন্থ চুরি করে।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্যহেতু এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, কর্ণানন্দ ১৫২৯ শকের অনেক পরের লেখা; ইহা যদুনন্দনদাসঠাকুরের লেখাও নহে। গ্রন্থখানিতে প্রাচীনত্বের ছাপ দেওয়ার জন্য সমাপ্তিকাল ১৫২৯ লেখা হইয়াছে এবং প্রামাণ্যত্বের ছাপ দেওয়ার জন্য যদুনন্দনদাসঠাকুরের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ণানন্দ-প্রকাশের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

(৪) কর্ণানন্দের চতুর্থ নির্য্যাসে লিখিত হইয়াছে—"এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীল দাসগোসাঞি। নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই ॥ সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণকথা সদা অবিরত ॥ হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল-চম্পূ নাম। সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম ॥ আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস। অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ ॥ বাহ্যার্থে বুঝায় ইহা স্বকীয়া বলিয়া। ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥ শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া ॥ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া ॥ * * * ॥ চম্পূগ্রন্থ মর্ম্ম জানি গোসাঞি কৃষ্ণদাস। নিত্যলীলা স্থাপন করিলা গ্রন্থমাঝ ॥"

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূতে অপ্রকট-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—গোকুলের একই পুরীতে শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বাস করেন, এবং শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীরোহিণী মাতা এবং শ্রীবলদেবাদিও সেই পুরীতেই বাস করেন। আবার নন্দমহারাজের রাজসভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ যখন শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতেন তখন শ্রীরাধিকাদিকে সঙ্গে লইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত হইয়া ব্রজেশ্বরী যশোদামাতাও রাজসভার দ্বিতল কক্ষে স্বর্ণতন্তুজালের অন্তরালে অবস্থান করিয়া হৃৎকর্ণ রসায়ন কৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিতেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বপত্নী না হইয়া উপপত্নী হইতেন. তাহা হইলে সকলের জ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে লইয়া পিতা মাতার সহিত একই পুরীতে অবস্থান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইত। শ্রীশ্রীনন্দ যশোদা স্বীয় পুত্রের উপপত্নীদিগকে স্বীয় অন্তঃপুরমধ্যে পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযশোদামাতা তাঁহাদিগের সঙ্গে লইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন—পুত্রের উপপত্নী সমূহকে তাঁহারা পুত্রবধূর মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিলে নন্দ যশোদার নির্ম্মল বাৎসল্য প্রেমেই দুরপনেয় কলঙ্কের আরোপ করা হয়। উক্ত বর্ণনায় শ্রীজীব গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরেই শ্রীরাধিকাদিকে যশোদা মাতার "তনয় বধূ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—মণিময়বরপীঠে যাতৃমুখ্যান্তরালে নবতনয়বধূভিঃ সেবিতারাৎ প্রদেশা। সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবন্তী সুত সুচরিতকৃষ্ণক শ্রীশ্রীমাতা ব্যরাজীৎ। —শ্রীগোপাচম্পূ—পূ ৩।১৩।" অথচ কর্ণানন্দ বলেন—অপ্রকট ব্রজে পরকীয়াত্বই নাকি চম্পূর গূঢ় অভিপ্রায়।

কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকটনের হেতু বর্ণন উপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন—অপ্রকটে স্বকীয়াভাব বলিয়া প্রকটে যোগমায়াদ্বারা ব্রজদেবীদের পরকীয়াভাব জন্মাইয়া লীলারস আস্বাদনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা গোপালচম্পূর অনুগত সিদ্ধান্ত। অথচ কর্ণানন্দ বলেন—কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে চম্পূর গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়া অপ্রকটে পরকীয়াত্বই স্থাপন করিয়াছেন।

কর্ণানন্দ হইতে জানা যায়, চম্পূর অভিপ্রায় লইয়া এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে একটা তর্ক উঠিয়াছিল। কর্ণানন্দ বলেন, তাহার মীমাংসার জন্য বীরহাম্বীর প্রমুখ তিন ব্যক্তি বসন্তরায়ের মারফতে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকটে এক পত্র লিখেন। পত্রের উত্তরে শ্রীজীব নাকি লিখিয়াছেন—"বিশেষে উপদেশিলা আচার্য্য মহাশয়। তাঁর যেই মত সেই মোর মত হয়॥ সাধনে যেই ভাব্য, সেই প্রাপ্তি বস্তু হয়। পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয়॥ পঞ্চম বিলাস।" এস্থলে উল্লিখিত "পত্রীটী" বীরহাম্বীরের নিকটে লিখিত; পত্রীটীও কর্ণানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে আছে,—"* * * অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি। সেবা সাধকরূপেণেত্যাদিনা। তত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপচিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুগানুসারেণৈবেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কীয়ন্তি লেখ্যা। সাধকরূপেণ সেবা তু বৈধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যন্তি। এতেহস্মাকং সর্ব্বমেবেতি কিমধিকেন। (তারকা-চিহ্নিত স্থানে কুশলাদি লিখিত হইয়াছে)। —নিত্য-স্মরণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেবা সাধকরূপেণ ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে সাধকরূপে অর্থ বাহ্যদেহে, সিদ্ধরূপে অর্থ স্বীয় অভীষ্ট সেবার অনুরূপ অন্তশ্চিন্তিতদেহে। সিদ্ধদেহও রাগানুগানুসারেই নির্ণীত হয়। সাধকদেহের সেবা আগমাদি-অনুসারে বৈধপ্রক্রিয়ায় নির্ব্বাহিত হয়—জানিবে। সেস্থানে শ্রীল-আচার্য্য-মহাশয়গণ আছেন, তাঁহারাই বিশেষ উপদেশ দিবেন। তাঁহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব।"

গোপাল-চম্পূর স্বকীয়া-পরকীয়া-বিষয়ক তর্কসম্বন্ধীয় পত্রের উত্তরেই নাকি উক্ত পত্র শ্রীজীব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ণানন্দ বলেন। কিন্তু উক্ত পত্রে চম্পূ-সম্বন্ধীয় কোনও কথাই নাই। পত্র পড়িলে মনে হয়, রাজা বীরহাম্বীর রাগানুগামার্গের ভজন সম্বন্ধেই কোনও প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীজীবও তৎসম্বন্ধেই সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছেন; বিশেষ বিবরণ শ্রীল-আচার্য্য প্রভুর নিকটে জানিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। অথচ এই পত্রখানিকে উপলক্ষ্য করিয়াই কর্ণানন্দকার বলিতেছেন, পত্রে নাকি শ্রীজীব বলিয়াছেন—"চম্পূর অভিপ্রায় সম্বন্ধে আচার্য্য-ঠাকুরের যেই মত, আমারও সেই মত।" (অবশ্য কর্ণানন্দ বলেন—অপ্রকটে পরকীয়া-ভাবই বর্ত্তমান, ইহাই আচার্য্যের অভিমত। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই)।

উল্লিখিত পত্রখানি ভক্তিরত্নাকরেও উদ্ধৃত হইয়াছে (ভক্তিরত্নাকরে, বৈধ-প্রক্রিয়য়া স্থলে ত্রিবিধ-প্রক্রিয়য়া পাঠ দৃষ্ট হয়)। কিন্তু চম্পূবিষয়ক কোনও তর্ক-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যে এই পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরত্নাকর বলেন না।

শ্রীজীবগোস্বামী আচার্য্য প্রভুর নিকটেও পত্রাদি লিখিতেন। কর্ণানন্দে এরূপ একখানা এবং ভক্তিরত্নাকরে দুইখানা পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। কোনও পত্রেই চম্পূর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও তর্কের উল্লেখ নাই। প্রথম পত্রে লিখিত হইয়াছে—উত্তর-চম্পূর সংশোধন কিছু বাকী আছে। দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—উত্তর-চম্পূ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আরও বিচার করিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, কোনওরূপ সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি না থাকে, তদুদ্দেশ্যে শ্রীজীব নিজেই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া তাহার পরেই চম্পূগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন।

কর্ণামৃতে আরও লিখিত হইয়াছে—আচার্য্য প্রভু নাকি তাঁহার অনুগত লোকদিগকে চম্পূ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও চম্পূর প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উক্তির অনুকূল কোনও প্রমাণ কর্ণামৃতেও পাওয়া যায় না, অন্য কোনও গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। ইহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে। অপ্রকটে-স্বকীয়া-ভাবাত্মিকা

লীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই যদি চম্পূর অধ্যয়ন ও প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, প্রীতি-সন্দর্ভ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীজীবকৃত টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীবকৃত টীকা, গোপাল-তাপনী শ্রুতি, লোচনরোচনী টীকা, গৌতমীয়-তন্ত্রাদি সমস্ত গ্রন্থেরই অধ্যয়ন ও প্রচার বন্ধ করিতে হইত; কারণ, এই সমস্ত গ্রন্থেই অপ্রকটে স্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক-বিচার-মূলক সিদ্ধান্ত বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

কর্ণামৃতের নানাস্থানেই অপ্রাসঙ্গিক ভাবেও পরকীয়া-বাদের কথা বহু বার বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অপ্রকটে স্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক যে সিদ্ধান্ত শ্রীজীব স্থাপন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তটীকে উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বহু পরবর্ত্তী কালে কোনও লোক কর্ণামৃত রচনা করিয়াছেন।

আধুনিক বিরুদ্ধবাদ। জনৈক আধুনিক বৈষ্ণব বলিয়াছেন—"পরকীয়া-ভাবের উপাসনামূলক ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় প্রচারিত হওয়ায়, তৎকালীন অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া পরকীয়া-বাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে অসম্প্রদায়ী বলিয়া বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন। তখন মধ্যস্থের অভাবে কোনও বিচার-সভা আহূত হইতে না পারায় বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীজীব-গোস্বামী সন্দর্ভে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করেন এবং তদনুরূপ লীলা বর্ণন করিয়া গোপালচম্পূ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

এই জাতীয় অভিযোগের কথা উক্ত বৈষ্ণব-মহাশয়ই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের প্রকটকালেই যে কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে শুনা যায় নাই। তৎকালে "অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের" মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু শ্রীসম্প্রদায় ব্রজভাবের উপাসক নহেন; সুতরাং ব্রজের কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহাদের বাদানুবাদ করা সম্ভবপরও নয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ও তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ নাই; শ্রীজীবগোস্বামীর সর্ব্বসম্বাদিনীতে গৌতম, কণাদ, জৈমিনী, কপিল, পতঞ্জলি, পৌরাণিক, শৈব, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, ভাস্কর প্রভৃতি বহু প্রাচীন এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিম্বার্কাচার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি লিখিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরকীয়াভাবাত্মিকা লীলার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন; শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির বিরুদ্ধে যে কোনও বৈষ্ণবসম্প্রদায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না।

কাশীর গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীলগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয়-সম্পাদিত শ্রীপাদ-বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রণীত সিদ্ধান্তরত্নের ভূমিকা হইতে জানা যায় (শ্রীজীবাদির প্রায় এক শত বৎসর পরে) ১৬৪০ শকাব্দে অম্বরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে এক সভায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের একটা বিচার হয়। শ্রীপাদ-বলদেব-বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সেই বিচার-সভায় যোগদান করিয়া এই সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সেই সময়েই তিনি বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সেই সভাতে সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক-ভিত্তিসম্বন্ধেই বিচার হইয়াছিল; বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্য সকল সম্প্রদায়কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে ব্রজের গোপীভাব সম্বন্ধে কোনও বিচার হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। শ্রীরূপের গ্রন্থ যদি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টিই করিয়া থাকিবে এবং সেই গ্রন্থ যখন উক্ত বিচার, সভার সময়েই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন উক্ত সভায় যে এবিষয়ে কোনও আলোচনা হইত, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যায়।

একখানা আধুনিক গ্রন্থ (মুর্শিদাবাদ-কাহিনী) হইতে জানা যায়, উল্লিখিত সভার দুই তিন বৎসর পরে (১১২৭।২৮ সনে ১৬৪২।৪৩ শকে) বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব-সাহেবের দরবারে এক সভায় জয়নগর হইতে আগত জনৈক স্বকীয়াবাদী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়দেশবাসী কতিপয় পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া পরকীয়াবাদ স্বীকার করিয়া যান। তৎপূর্ব্বে তিনিই একবার গৌড়দেশবাসীদিগকে পরাজিত

করিয়া নবাব-দরবারে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে এ-বিষয়ে দুই খানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রকট কি অপ্রকট লীলাসম্বন্ধেই এই বিচার, পত্রদ্বয় হইতে তাহা জানা যায় না। তর্কদ্বারা যে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, উল্লিখিত দুই সভায় পরস্পর-বিরোধী দুইটী সিদ্ধান্তই তাহার প্রমাণ। বেদান্তও বলেন—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। যাহা হউক, নবাব-দরবারের সিদ্ধান্ত—বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মধ্যস্থ পণ্ডিতদেরই সিদ্ধান্ত, শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীজীবের সিদ্ধান্তই আমাদের অনুসন্ধেয়। তবে উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহা জানা যায় যে, সেই সময়ে স্বকীয়া-পরকীয়া লইয়া একটা আন্দোলন চলিতেছিল।

যাহা হউক, উক্ত বৈষ্ণব-মহাশয়ের উক্তির যে কোনও মূল্য নাই, অন্তরূপেও তাহা দেখা যায়। তাহাই দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে যে পরকীয়ার কথা শ্রীরূপ বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে প্রকট-লীলার পরকীয়াভাব। শ্রীজীবের সন্দর্ভাদিতেও প্রকটলীলায় পরকীয়া-ভাবের কথাই আছে; প্রকটে স্বকীয়-ভাবের কথা নাই। সুতরাং তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরূপের গ্রন্থ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, শ্রীজীবের সন্দর্ভদ্বারা সেই উত্তেজনা প্রশমিত না হইয়া বরং আরও বর্দ্ধিত হওয়ারই কথা।

দ্বিতীয়তঃ—অপ্রকট-লীলায় যে পরকীয়া-ভাব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কি উজ্জ্বলনীলমণিতে কোথাও এমন কথা নাই; সুতরাং তথাকথিত বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনার উদ্রেকের প্রশ্নও উঠে না এবং সেই তথাকথিত উত্তেজনা-প্রশমনের জন্যই শ্রীজীবের পক্ষে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বকীয়াবাদ স্থাপনের প্রয়াসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

শ্রীজীব হইলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আচার্য্য। সন্দর্ভ হইল তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ; তাঁহার সন্দর্ভে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রচার না করিয়া যদি কেবল অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সর্ব্বজন-মান্য আচার্য্যরূপে কিরূপে পরিগণিত হইলেন?

যাহা হউক, উল্লিখিত আধুনিক বৈষ্ণব-মহাশয়ের ঐরূপ আরও কয়েকটী অদ্ভুত কথা আছে। তৎসমস্তের আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্ত। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী বলেন, প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয়লীলাতেই ব্রজদেবীদিগের পরকীয়াভাব এবং তাহাদের পরকীয়া বাস্তব।

পরকীয়ার বাস্তবত্বের দুইটা দিক্ আছে—পরকীয়াত্বের বাস্তবত্ব এবং পরকীয়াভাবের বাস্তবত্ব। গোপসুন্দরীগণ যদি বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য-গোপদিগের পত্নী হন, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের পরকীয়াত্ব বাস্তব হইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় পরকীয়া-বাস্তবত্ব চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, ব্রজগোপীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি, তিনি তাহা স্বীকার করেন। তাঁহাদের কৃষ্ণ-শক্তিত্ব স্বীকৃত হইলে অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতে পারে না। উভয়রূপ স্বকৃতি হইবে পরস্পর-বিরোধী। তাই মনে হয়, পরকীয়ার বাস্তবত্ব বলিতে তিনি যেন পরকীয়া-ভাবের বা পরকীয়া-অভিমানের বাস্তবত্বের কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, পরকীয়া-অভিমান-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ বিষয়ে শ্রীজীবের সঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের মতের বিশেষ অসঙ্গতি নাই।

আর, অপ্রকট-লীলায় পরকীয়া ভাবের সমর্থনে চক্রবর্ত্তিপাদ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটীই প্রধান বলিয়া মনে হয়; অন্য যুক্তি এবং তৎকৃত ঋষিবাক্যাদির ব্যাখ্যা এই দুইটী যুক্তিরই অনুগত। আমাদের মন্তব্যসহ তাঁহার যুক্তি দুইটী এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই নিত্য, সুতরাং প্রকটলীলাও নিত্য; প্রকটলীলা নিত্য হইলে প্রকটের পরকীয়া-ভাবও নিত্য এবং বাস্তবই হইবে।

মন্তব্য। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এ বিষয়ে শ্রীজীবের সঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। প্রকটলীলায় এবং অপ্রকট-লীলায় কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। "ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি। উ, নী ম, নায়কভেদ ১৬ টীকা।" সুতরাং প্রকটলীলার ন্যায় অপ্রকটেও পরকীয়া ভাবই বিদ্যমান।

মন্তব্য। চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে বলিলেন, প্রকট এবং অপ্রকট লীলায় কোনওরূপ বৈলক্ষণ নাই; অন্যত্র তিনিই আবার বৈলক্ষণ্যের কথাও বলিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ বিয়োগ স্থিতি প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—অপ্রকটে "মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকট প্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিত লীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমাবিতি গমো ব্রজভূমেঃ প্রকাশা ন্মথুরাপুরীং প্রতি গমনং আগমো দ্বারকাতঃ দন্তবক্রবধানন্তরমাগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং ন তু অপ্রকটলীলায়াম্। —ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন এবং দন্তবক্রবধের পরে মথুরা হইতে ব্রজে আগমন কেবল প্রকট লীলাতেই আছে, অপ্রকট লীলায় ব্রজ হইতে মথুরায় গমন এবং মথুরা হইতে ব্রজে আগমন লীলা নাই। অপ্রকটে তদুচিত লীলা বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরগণের সহিত নিত্যই মথুরায় বিদ্যমান আছেন।" এইরূপ পরস্পর বিরোধী বাক্যের সমাধান আছে, তাই এই। অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে অনন্ত প্রকাশ নিত্য বিদ্যমান, তাহা সর্ব্বসম্মত। এই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এমন একটি প্রকাশও আছে, যাহার সঙ্গে প্রকট প্রকাশের কোনও অংশেই বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপ অপ্রকট প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—প্রকটে এবং অপ্রকটে কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য নাই। আবার অপ্রকটে এমন প্রকাশও আছে, যাহার সঙ্গে প্রকটের বৈলক্ষণ্য আছে, এইরূপ প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি আবার বলিয়াছেন—প্রকটে ও অপ্রকটে বৈলক্ষণ্য আছে। ইহাই পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান।

অপ্রকট লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তীর মধ্যে যে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই মতভেদের সমাধানও উল্লিখিত রূপেই করা যায়।

অপ্রকট লীলার যে প্রকাশের সঙ্গে প্রকট প্রকাশের কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই, সেই প্রকাশের প্রতি চিত্তের আবেশবশতঃই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—প্রকটের ন্যায় অপ্রকটেও পরকীয়া ভাব। আর শ্রীজীব বলিয়াছেন—অপ্রকট গোলোকের কথা—প্রকটলীলার অপ্রকটলীলানুগত মুখ্যপ্রকাশের কথা। অপ্রকট গোলোকের সঙ্গে প্রকট বৃন্দাবন লীলার কোনও কোনও অংশে বৈলক্ষণ্য আছে। শ্রীজীব বলেন—এই অপ্রকট গোলোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের পরম স্বকীয়া ভাব।

দুই জনের আবেশ দুই প্রকাশের লীলায়, তাই আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহাদের মধ্যে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। উভয় কথাই সত্য। যাহা হউক, প্রকটলীলা অবলম্বনেই যখন ভজন এবং সাধনের পূর্ণতায় প্রাপ্তিও যখন প্রকটলীলার যোগেই, তখন অপ্রকটে কান্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধকের বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হওয়ারও প্রয়োজন দেখা যায় না। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্তানুসারে প্রকট ও অপ্রকট—উভয়ত্রই সাধনসিদ্ধ জীব পরকীয়া লীলার সেবা পাইবেন। আর, শ্রীজীবের সিদ্ধান্তানুসারে প্রকটে পরকীয়া লীলার এবং অপ্রকটে স্বকীয়া লীলার—অধিকন্তু প্রকাশান্তরে পরকীয়া লীলারও—সেবা পাইয়া সাধনসিদ্ধ জীব কৃতার্থ হইতে পারেন; সুতরাং সাধকের চিন্তার কোনও হেতুই নাই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ রূপ

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। "শ্লোকব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার ॥ —শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্য-৩য় অঃ।" কিন্তু এই ষড়্ভুজ-মূর্ত্তির কোনও বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখাইলেন, তারপরে স্বকীয় বংশীমুখ শ্যামরূপ দেখাইলেন। "কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥ দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। ২।৬।১২-৮৪ ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রথমে প্রদর্শিত চতুর্ভুজ-রূপের কোনও বর্ণনা নাই; কিন্তু "বংশীমুখ শ্যামরূপ" শব্দসমূহে পরবর্ত্তী রূপের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চায় সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে ষড়্ভুজরূপাবির্ভাবের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে শতকোটি-দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিশালী চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে:—"প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ। ততোঽধিকং সোঽপি ননন্দ বিপ্রস্ততোধিকঞ্চ স্তবমপ্যকার্ষীৎ। ১২।৩৩ ॥" চতুর্ভুজ-রূপ বলিতে রূঢ়িবৃত্তিতে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী রূপকেই সাধারণতঃ বুঝায়। সার্ব্বভৌমকেও প্রভু এই রূপই দেখাইয়াছিলেন কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসামান্য রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়াছিলেন; বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে তিনি মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন যে—"এই যে অপূর্ব্ব বস্তুটি দেখিতেছি, ইনি কি বৈকুণ্ঠ হইতেই অবতীর্ণ হইলেন? না কি ইনি সচ্চিদানন্দ-রসবিগ্রহ? অথবা সর্ব্বজীব-হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বরই ইনি?" "কিমসৌ পুরুষব্যাঘ্রো মহাপুরুষলক্ষণঃ। অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্দেবরূপধৃক্ ॥ কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দ-রূপবান্ রসমূর্ত্তিমান্। কিংবাসৌ সর্ব্বজীবানাং হিতকৃদীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩।১১।১২-১২ ॥" ইহাতে বুঝা যায়, সার্ব্বভৌমের চিত্তে এইরূপ একটী সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, "এই যে হেম-গৌরকান্তি সন্ন্যাসীটী দেখিতেছি, ইনি তো নিশ্চয়ই কোনও ভগবৎস্বরূপ। ইনি কি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ? নাকি রসময়-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ?" সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌমের অন্তর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সন্দেহের কথাও জানিতে পারিয়াছিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভক্ত সার্ব্বভৌমের এই সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত যে কিছু করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ এই সন্দেহ-নিরসনের উদ্দেশ্যেই প্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজ-রূপাদি দেখাইয়াছিলেন; এবং যদি এই অনুমানই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ঐ ষড়্ভুজ বা চতুর্ভুজাদি রূপে যে প্রভু নিজ স্বরূপেরই পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ, স্বরূপ না জানাইলে সার্ব্বভৌমের সন্দেহ দূর হইবে কেন?

কিন্তু সার্ব্বভৌমকে প্রভু কি দেখাইলেন? এবং সার্ব্বভৌমই বা কি দেখিলেন?

সার্ব্বভৌম কি দেখিলেন, সার্ব্বভৌমের মুখেই বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন, চতুর্ভুজাদিরূপ—"দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ শত-শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে ॥ ২।৬।১৮৪, ১৮৬ ॥"

চতুর্ভুজাদি রূপ দেখিয়া সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। কবিকর্ণপূরও একথা বলেন:—"যদ্যৎ স ভূমিসুরসত্তমমুখ্যস্তুষ্টাব তুষ্টঃ সুমহাপ্রগল্ভঃ। তত্তন্ন বাচস্পতিরপ্যভীক্ষ্ণং প্রয়াসতোঽপি প্রভবেদ্ভবিষ্ণুঃ ॥—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যম্—১২।৩৪ ॥" স্তবে সার্ব্বভৌম কি কথা বলিলেন, তাহা কবিকর্ণপূরও প্রকাশ করেন নাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামীও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় কিছু প্রকাশ

করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শতশ্লোকে স্তবের কথা উল্লিখিত আছে এবং এই শত শ্লোকের দু একটী শ্লোক মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও বলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই সার্ব্বভৌম একশত স্তব-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত একশত শ্লোকের মধ্যে অল্প কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের যে সন্দেহের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মুরারিগুপ্তের উল্লিখিত শ্লোকে সেই সন্দেহ নিরসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রভুর স্বরূপের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। স্তবে সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন :—
"পুরা পৃথিব্যাং বসুদেবগৃহেঽবতীর্য্য কংসাদি-মহাসুরাণাম্। কৃত্বা বধং ত্বং প্রতিপাদ্য ধামং ভূদেবগেহে পুনরাবিরাসীঃ॥ স্বকীয় মাধুর্য্যবিলাসবৈভবমাস্বাদয়ংস্ত্বং স্বজনং সুখায় চ। কৃতাবতারো জগতঃ শিবায় মাং পাহি দীনং করুণামৃতাব্ধে॥ —শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ৩।১২।১৫—১৬॥—প্রভো! তুমি পূর্ব্বে বসুদেবের গৃহে আত্মপ্রকট করিয়া কংসাদি মহা অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছ, তারপর তুমি তোমার সেই লীলা অপ্রকট করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছ। জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিকরবর্গকে নিজের মাধুর্য্য-বিলাস-বৈভব আস্বাদন করাইতেছ, নিজেও আস্বাদন করিতেছ। হে করুণানিধি, আমি অত্যন্ত দীন, আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।"

প্রভুর রূপ-দর্শনের পরে সার্ব্বভৌম এইরূপে স্তব করিলেন; সুতরাং সার্ব্বভৌম যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই এই স্তবে ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহা অনুমান করা যায়। যদি এই অনুমান সমীচীন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন—"সার্ব্বভৌম, যিনি দ্বাপরে কংস-কারাগারে বসুদেব-গৃহে চতুর্ভুজ-রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তিনিই আমি: আমি অপর কেহ নহি।" তারপর "বংশীমুখ শ্যামরূপ" দেখাইয়া জানাইলেন—"সার্ব্বভৌম, যিনি দ্বাপরে গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর, শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে স্বীয় পরিকরবর্গকে লীলা-রস আস্বাদন করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও আস্বাদন করিয়াছিলেন, তিনিই আমি: আমি অপর কেহ নহি।"

বসুদেব গৃহে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ-রূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে যে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী রূপই!

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সঙ্গতি কিরূপে স্থাপন করা যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলেন, প্রভু প্রথমে চতুর্ভুজরূপ দেখান, "পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয়স্বরূপ" দেখান! এই দুইটী উক্তির সঙ্গতি কিরূপে সম্ভব হয়?

কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণনা করেন নাই, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা সূত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহাই বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামীর এই উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতুই নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ষড়্‌ভুজ-রূপের উল্লেখমাত্রই করিয়াছেন, কিন্তু সে ষড়্‌ভুজ-রূপ কি রকম বা কি প্রকারে প্রভু তাহা দেখাইলেন, তাহার কোনও উল্লেখই করেন নাই—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বোধ হয় সেই ষড়্‌ভুজ-রূপেরই বিবরণ দিয়াছেন এবং কি প্রকারে তাহা দেখাইলেন, তাহাও বোধ হয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। তিনি বোধ হয় বলিলেন, "প্রভু একসঙ্গেই হঠাৎ ষড়্‌ভুজরূপ দেখান নাই; প্রথমে যে রূপে তিনি বসুদেব-গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলেন, পরে "শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয়-স্বরূপ" দেখাইলেন। এইভাবে দুইবারে দেখাইবার হেতু বোধহয় এই যে,—যিনি প্রথমে চতুর্ভুজ-রূপে বসুদেব-গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন এবং পরে দ্বিভুজ-মুরলীধর-রূপে ব্রজে লীলা করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে

সন্ন্যাসিরূপে সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে উপস্থিত—একথাটী সার্ব্বভৌমকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং এইভাবে সার্ব্বভৌমের মনের সন্দেহটী দূর করা।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন এই যে, চতুর্ভুজ-রূপটী অপ্রকট করিয়াই কি "শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ" দেখাইলেন, না কি ঐ চতুর্ভুজ-রূপের মধ্যেই আরও দুইটী হস্ত প্রকট করিয়া বংশীবদন-রূপ দেখাইলেন? সম্ভবতঃ ঐ চতুর্ভুজ-রূপ অপ্রকট না করিয়াই, ঐ চতুর্ভুজ-রূপের মধ্যেই আরও দুইটী হস্ত প্রকট করিয়া নবপ্রকটিত হস্তদ্বয়ে শ্রীমুখে বংশী ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান করিলেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম-দৃষ্ট ষড়্ভুজ-রূপের চারি হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ছিল এবং অবশিষ্ট দুই হাত বেণুবাদনে নিযুক্ত ছিল।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকেও শ্রীবাসের গৃহে একবার ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীল মুরারিগুপ্ত ও শ্রীল কবিকর্ণপুর—ইঁহারা সকলেই স্ব-স্ব গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন, "ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকালে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষলে ॥—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ অঃ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে ষড়্ভুজরূপ দেখাইলেন; এই রূপের একহাতে শঙ্খ, একহাতে চক্র, একহাতে গদা, একহাতে পদ্ম, একহাতে হল এবং একহাতে মুষল ছিল।

কিন্তু মুরারিগুপ্ত বা কবিকর্ণপুর এই ষড়্ভুজের কোনও বর্ণনা দেন নাই, কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। তবে বৃন্দাবন দাস যাহা বলেন নাই, এমন একটী কথা তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে প্রথমে ষড়ভুজ রূপ দেখাইলেন, তারপর তৎক্ষণেই চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইলেন এবং সর্ব্বশেষে তৎক্ষণেই দ্বিভুজ-রূপ দেখাইলেন:—"স দদর্শ ততোরূপং কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ। ক্ষণাচ্চতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজঞ্চ ততঃক্ষণাৎ ॥—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ ২।৮।২৭ ॥ পুরঃ ষড়্‌ভি দোর্ভিঃ পরমরুচিরং তত্রচ পুনশ্চতুর্ণাং বাহূনাং পরমললিতত্বেন মধুরম্। তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পরিলোচ্যাশু সহসা তদাশ্চর্য্যং ভূয়ো দ্বিভুজমথ ভূয়োঽপ্যকলয়ৎ ॥—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্ ৬।১২২॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল লোচনদাস-ঠাকুরও ঐ কথাই বলেন:—"ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে। তবে চতুর্ভুজ-রূপ দুইভুজ তবে ॥ —চৈঃ মঃ মধ্য ১০৭ পৃঃ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)॥" মুরারিগুপ্তের উক্তি হইতে বুঝা যায়, ষড়্ভুজ রূপটী বোধ হয় কৃষ্ণবর্ণই ছিলেন (কৃষ্ণস্য ষড় ভুজং মহৎ)। সকলের উক্তির সমন্বয় করিতে গেলে মনে হয়, প্রভু সর্ব্বপ্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-ধারী ষড়ভুজ রূপই দেখাইয়াছিলেন; তারপর, তৎক্ষণাৎই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ রূপই বোধ হয় দেখাইয়াছিলেন। কারণ, চতুর্ভুজের স্ফূর্তিবৃত্তিতে ঐ রূপই মনে আসে। চতুর্ভুজের পরে বোধ হয় দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপই দেখাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ-রূপটী দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসিরূপ হইলেও বা হইতে পারে; এই রূপটী দেখাইয়া হয় তো তাঁহার ভাবী-সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের ইঙ্গিতই দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সর্ব্বশেষ দ্বিভুজ-রূপটী শ্যামসুন্দর মুরলীধর রূপ হইলেই বেশ একটা অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে। এই তিন রকম রূপে প্রভু জানাইলেন, "যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ রূপে বসুদেব গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন, পরে যিনি মুরলীধর রূপে ব্রজে লীলা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন শ্রীনিতাইকে ঐ অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ রূপ দেখাইলেন। চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপের দ্বারা প্রথমে প্রদর্শিত ষড়্ভুজ রূপের পরিচয় দিলেন; ষড়ভুজের হল ও মুষলদ্বারা ব্রজলীলারই ইঙ্গিত দিলেন; বলদেব স্বরূপ শ্রীনিতাইচাঁদকে ঐ রূপটি দেখাইতেছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বলদেবের হল দেখাইলেন। হল দেখিয়া পাছে শ্রীনিতাই তাঁহাকে বলদেব বলিয়াই মনে করেন, তাই সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ-মুরলীধর রূপ দেখাইলেন। দণ্ড কমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসি রূপের দ্বারা তাঁহার সম্যক্ পরিচয় হইত না, কারণ ভাবী-সন্ন্যাসের কথা তখনও কেহ জানিতেন না।

বঙ্গবাসী-সংস্করণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পুর্ব্বোল্লিখিত ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপের উক্তির পরে নিম্নলিখিত চারি পংক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—["দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা। এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা॥ রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্যতনু। পশ্চাতে দেখিল—নব-কৈশোর রাধাকানু॥]" এই চারিটী পংক্তি বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে; বন্ধনীর মধ্যে রাখার হেতু যে, এই পংক্তিচতুষ্টয় সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর একটী মুদ্রিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কয় পংক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"ঊর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর। মধ্য দুই হস্ত বক্ষে—মুরলী অধর॥ অধঃ দুই হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু-দণ্ড। ইত্যাদি।" এই কয় পংক্তিও সকল গ্রন্থে নাই। সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, এই সকল উক্তি যে লোচনদাস-ঠাকুরেরই লিখা, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ জন্মে। এইরূপ সন্দেহের আর একটী হেতু আছে; এই সকল উক্তির মর্ম্মের সঙ্গে পুর্ব্ববর্ত্তী চারি পংক্তির অর্থ-সঙ্গতি দেখা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীলবৃন্দাবন দাস, শ্রীলমুরারি গুপ্ত, ও শ্রীলকবিকর্ণপুর—ইঁহাদের কাহারও গ্রন্থেই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমন্নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু যে ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়া ছিলেন, কবিরাজ গোস্বামীও তাহা বলিয়াছেন! কিন্তু এই ষড়্ভুজরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ বেণুধর॥ তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গে বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খচক্র॥ তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। শ্যামঅঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১।১৭।১১-১৩॥" শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম দ্বারকানাথের পরিচায়ক, শার্ঙ্গ হইতেছে মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুক; আর বেণু হইতেছে ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য! এতাদৃশ ষড়্ভুজরূপের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে প্রভু হইতেছেন দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজে একই শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত ভাববৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক মহাপ্রভুতেই সমস্ত বিরাজিত। এই ষড়্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া প্রভু আবার চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন—তাহার দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র এবং অপর দুই হস্ত বেণুবাদনরত। শঙ্খ চক্র দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং ত্রিভঙ্গরূপে বেণুবাদনভঙ্গী দ্বারা ঐশ্বর্য্যগর্ভ পুর্ণতম মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে। এই চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে. শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ব্রজনাথের ঐশ্বর্য্যগর্ভ পুর্ণতম মাধুর্য্য থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তিনি দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত করিবেন। আবার এই চতুর্ভুজ রূপ অন্তর্হিত করিয়া তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন পীতবাস দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপও দেখাইলেন—ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, তিনি স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনই, দ্বারকা-মথুরানাথ তাঁহারই প্রকাশ।

সার্ব্বভৌমকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণও শ্রীললোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেনঃ—"হেনই সময় প্রভু ষড়্ভুজ শরীর। দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির।—চৈঃ মঃ মধ্য ১৬৯ পৃঃ ব, সং।" এই পয়ারের অব্যবহিত পরেই বন্ধনীর মধ্যে আবার নিম্নলিখিত কয়টী পয়ার দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"[ঊর্দ্ধ দুই হাথে ধরে ধনু আর শর। মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর॥ নম্র দুই হাথে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু! দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দ বিহ্বল॥] এই উক্তিও সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; শ্রীলমুরারি গুপ্ত, শ্রীলবৃন্দাবনদাস শ্রীলকবিকর্ণপুর ও শ্রীলকবিরাজগোস্বামী—ইঁহাদের কেহও এই রকম উক্তির উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ ষড়ভুজ রূপ দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ বর্ণনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং এই উক্তিগুলিও শ্রীললোচনদাসের নিজের উক্তি কিনা সন্দেহ। হয়তো পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি লোচনদাসের লেখার মধ্যে এই কয় পংক্তি প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন।

আধুনিক চিত্রকরগণ ষড়ভুজরূপের যে চিত্র বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা উপরোক্ত সন্দেহমূলক উক্তিরই অনুরূপ; সুতরাং এই চিত্র বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত কিনা, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে।

এই চিত্রের ষড়ভুজ রূপটাই যদি প্রভু সার্ব্বভৌমকে দেখাইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের স্তবে এই

রূপের উল্লেখ, অথবা ইঙ্গিত পাওয়া যাইত ; বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের মনে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই রূপ-দর্শনে সেই সন্দেহ-নিরসনের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অন্য প্রকারেও শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সমন্বয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে যেমন প্রথমতঃ ষড়্ভুজরূপ, তারপর চতুর্ভুজ এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সার্ব্বভৌমকেও সেইভাবে প্রথমতঃ ষড়্ভুজ তারপর চতুর্ভুজ এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদের সংশ্রবে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হল মুষল ধারী রূপে ষড়্ভুজের বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া শ্রীলবৃন্দাবনদাস আর সার্ব্বভৌমের সংশ্রবে ঐ রূপের বিশেষ বর্ণনা দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন মনে করেন নাই—কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। আবার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঐ ষড়ভুজের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীলকৃষ্ণদাস-কবিরাজও আর তাহার উল্লেখ করেন নাই; এবং ষড়ভুজরূপ প্রদর্শনের পরে যথাক্রমে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শনের কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই বলিয়া শ্রীলকবিরাজ তাহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তই যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, প্রভু সার্ব্বভৌমকে প্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল-ধারী ষড়ভুজরূপ দেখান, তারপরে যথাক্রমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ রূপ দেখান এবং সর্ব্বশেষে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখান।

রাজা প্রতাপরুদ্রও ষড়ভুজরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চার (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ নামক গ্রন্থের) চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শসর্গ হইতে জানা যায়, রাজা প্রতাপরুদ্র ক্রমাগত তিনবার মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাক্ষাতে তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত এতই অধীর হইলেন যে, তৃতীয় বার স্বপ্নদর্শনের পরেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর প্রভুর সমীপে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর চরণকমল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ষড়ভুজরূপ দেখাইলেন। "এবং স্তুবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ শৃঙ্গারপোষং নিজ বৈভবং প্রভুঃ। শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৩ ॥" এই ষড়্ভুজ রূপের ঊর্দ্ধ দুই বাহুতে ধনুর্ব্বাণ মধ্যের দুই বাহু বক্ষঃস্থলে বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং শেষ বাহুদ্বয় নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল। "ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং বংশীবক্ষঃস্থল বিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ। শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যাবেশং স বিভ্রৎ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণ দদর্শঃ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্। ৪।১৬।১৫॥"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দীক্ষাদান

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু নাকি শ্রীরূপকে প্রয়াগে এবং শ্রীসনাতনকে কাশীতে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত কথা নহে। প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাতের পুর্ব্বেই রামকেলি-গ্রামে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রামকেলিতে প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পুর্ব্বেই তাঁহারা স্ব-স্ব-গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—"শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে। প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥ দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল। বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২।১৯।২-৪।" রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন স্বগৃহে গেলেন। গিয়া উভয়েই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইলেন—উদ্দেশ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি। দীক্ষার পুর্ব্বে পুরশ্চরণের বিধি নাই; দীক্ষার পরেই শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ পুর্ব্বক পুরশ্চরণ করিতে হয়। শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি। দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনানুজ্ঞাতঃ প্রারভেত তৎ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৩॥" শ্রীরূপ-সনাতনের পুরশ্চরণের কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে, পুর্ব্বেই তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। পুরশ্চরণের একতম ফল হইতেছে—বাঞ্ছিত লাভ; "কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্। হ, ভ, বি, ১৭।৪" শ্রীরূপ-সনাতনের বাঞ্ছিত বস্তু ছিল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি; এই অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে—"অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ"—তাঁহারা পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন। দীক্ষাকালেই শ্রীগুরুর চরণ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; তজ্জন্য পুরশ্চরণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। মহাপ্রভুর চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্তই যখন শ্রীরূপ-সনাতন পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু তাঁহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন না, উপাস্যদেব ছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতনের দীক্ষাগুরু ছিলেন,—বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি; বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে শ্রীপাদসনাতন নিজেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। "ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিন্ গুরূন্॥" ভক্তিরত্নাকরেও একথার উল্লেখ আছে। "শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি॥ মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে যাঁর স্থিতি॥ ভক্তি-রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৪৩ পৃষ্ঠা॥" আর শ্রীপাদরূপগোস্বামীর দীক্ষাগুরু যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীই ছিলেন, শ্রীজীবের লেখার বহুস্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ আবার শ্রীপাদগোপালভট্ট-গোস্বামীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন, তাহাও প্রকৃত কথা নহে। গোপালভট্ট গোস্বামী ছিলেন শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য; শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণ হইতেই তাহা জানা যায়। "ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥ ১ম বিলাস।৫।'

কেহ কেহ আবার স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং মাধবীদাসীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন। তাহারও প্রমাণ নাই। প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পুর্ব্ব হইতেই রায়রামানন্দ পরম বৈষ্ণব, পরম রসিকভক্ত; মহাপ্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় (শ্রীচৈঃচঃ ২।৭।৬১ ৬৬)। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পুর্ব্ব হইতেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। যাহা হউক উক্ত চারিজনকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন। শ্রীচৈঃচঃ ৩।২।১০৪॥" ইহার হেতু সম্বন্ধে ৩।২।১০৪ পয়ারের টীকায় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে।

মহাপ্রভু যে কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; প্রমাণ কেন, ইঙ্গিত পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। তবে বহু লোকের মধ্যেই তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, বহু লোককে কৃপা

করিয়া প্রেমভক্তি দিয়াছেন—একথা সত্য। কিন্তু শক্তি-সঞ্চার এবং আনুষ্ঠানিক মন্ত্রদীক্ষা এক কথা নহে। মন্ত্রদীক্ষার ফলে শিষ্যের পক্ষে প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা জন্মিতে পারে সত্য; তথাপি কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা এবং প্রেমভক্তিদানও এককথা নহে। মন্ত্রদীক্ষা হইল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার—শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদির পরে যোগ্য গুরু-কর্তৃক শিষ্যের কর্ণে ইষ্টমন্ত্রদানই হইল দীক্ষা। এইভাবে মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরে তপনমিশ্র তাঁহার নিকটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকেও দীক্ষা দেন নাই, হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে কি পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালেও প্রভু অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করিয়াছেন—কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা নহে, শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক হরিনামোপদেশ দ্বারা—প্রেমভক্তি দানের দ্বারা।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমষ্টি-গুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। যোগ্য ভক্তদ্বারা দীক্ষা দান করাইয়া থাকেন "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে। শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৩০॥" ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণকৃপা ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ; তাই ভক্তরূপী ব্যষ্টিগুরুর প্রয়োজন। ধ্রুবের ঐকান্তিকতায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি ধ্রুবকে যথার্থ কৃপা—ভক্তিদান—করিতে পারেন না; যেহেতু, ধ্রুবের ঐকান্তিক আহ্বানের মূলে ছিল বিষয়-বাসনা, পিতৃসিংহাসন-লাভের বাসনা; সেই বাসনার মূলোচ্ছেদ না হইলে ভক্তিরাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" পরমকরুণ ভগবান নিজেও ধ্রুবের চিত্ত হইতে এই বিষয়-বাসনা দূর করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের কৃপাতেই যে জীবের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নারদকে পাঠাইলেন ধ্রুবের নিকটে; নারদ কৃপা করিয়া ধ্রুবকে দীক্ষা দিলেন; দীক্ষা দিয়া তাঁহার চিত্তের বিষয়-বাসনারূপ মলিনতা দূর করিলেন; তারপর ভগবান্ তাঁহাকে স্বচরণ দর্শন করাইলেন।

যাহাহউক, মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই—একথা বলাতে কেহ যেন মনে করেন না, তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন না; লৌকিক-লীলায় তিনি নিজেও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রদীক্ষাদান স্বয়ং ভগবানের কাজ নহে—ভঙ্গিক্রমে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই লৌকিক-লীলাতেও তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই।

প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়

(শ্রীগদাধর-তত্ত্ব)

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পরে মায়ের আদেশে নীলাচলে বাস করিতে থাকেন। নীলাচলে যাওয়ার অল্প কিছুকাল পরে, শ্রীবিশ্বরূপের অনুসন্ধানের ব্যপদেশে দক্ষিণাঞ্চল উদ্ধারের জন্য গমন করেন। দক্ষিণাঞ্চল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে গমন করেন, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীও সেই সঙ্গে নীলাচলে যায়েন। চতুর্ম্মাস্যের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী আসিলেন না। তিনি নীলাচলবাসের সঙ্কল্প করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা করির্তে লাগিলেন; আর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে ব্রজলীলা-রস আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ইচ্ছা হইল; শ্রীবৃন্দাবনের পথে, জননীর চরণ এবং গঙ্গা দর্শনের অভিপ্রায়ে তিনি গৌড় হইয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিলেন। গৌরগত-প্রাণ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"গদাধর, তুমি নীলাচলে বাসের সংকল্প করিয়াছ; সেই সংকল্প ত্যাগ করিওনা, ক্ষেত্রসন্ন্যাস-ছাড়িওনা।" উত্তরে শ্রীগদাধর বলিলেন—"প্রভু, তুমি যেখানে থাক, সেখানেই নীলাচল; আমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস রসাতলে যাউক, আমি তোমার সঙ্গেই যাইব।"—

"পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥ চৈঃ ২।১৬।১৩০॥" প্রভু বলিলেন—গদাধর, তুমি নীলাচলে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর। পণ্ডিত বলিলেন—প্রভু, তোমার চরণদর্শনই কোটি-বিগ্রহ-সেবা। "প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎ-পাদ-দর্শন॥ ২।১৬।১৩১॥" প্রভু আবার বলিলেন—গদাধর, আমার জন্যই তুমি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছ; সুতরাং সেবাত্যাগের অপরাধ আমাতেই বর্ত্তিবে। তুমি এইস্থানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। "প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ। ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥ ২।১৬।১৩২॥ তদুত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ও সেবাত্যাগের অপরাধ আমি শিরোধার্য্য করিব, তাহা তোমাকে স্পর্শ করিবে না। আর আমি তোমার সঙ্গেও যাইব না, একাকী যাইব—আমি তোমার জন্যও তোমার সঙ্গে যাইবনা, আমি যাইব নদীয়াতে মায়ের চরণ দর্শন করিতে। "পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। তোমার সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর॥ আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞাসেবা-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী॥ ২।১৬।১৩৩-৩৪॥"

এই বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী পৃথক্ ভাবে চলিলেন। প্রভু যখন কটকে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি গদাধরকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে আনিলেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায়। প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥ ২।১৬।১৩৬॥" শ্রীগদাধরের আচরণে প্রভু অন্তরে সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন; তথাপি বাহিরে প্রণয়-রোষ দেখাইয়া পণ্ডিতের হাতে ধরিয়া তিনি বলিলেন,—গদাধর, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প এবং শ্রীগোপীনাথের সেবাত্যাগ করাই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি ক্ষেত্র ছাড়িয়া কটকপর্য্যন্ত আসিয়াছ, সুতরাং ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে। আর নীলাচল হইতে চলিয়া আসা অবধি শ্রীগোপীনাথের সেবাও করিতেছনা; সুতরাং সেবাত্যাগের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ। তার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ। প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়িবে এই

তোমার উদ্দেশ। সেই সিদ্ধ হৈল ছাড়ি আইলে দূর দেশ ॥" ২।১৬।১৩৭-৩৮ কিন্তু গদাধর, তুমি যে আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেছ, তাহাতো কেবল তোমার নিজের সুখের জন্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি তোমার নিজের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহাই করিলে; আমার নিষেধ শুনিলে না। তাতে দুটী ধর্ম্মই নষ্ট হইতেছে—নীলাচল-বাসের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্ম—এই উভয়ই নষ্ট হইতেছে; পণ্ডিত, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি। গদাধর, প্রাণের গদাধর, তুমি যদি বাস্তবিক আমার সুখ বাসনা কর, তবে আমার কথা শুন, আর আমার সঙ্গে আসিও না—তুমি নীলাচলে ফিরিয়া যাও; আমার শপথ দিয়া বলিতেছি, তুমি আর দ্বিরুক্তি করিও না। "আমাসহ রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল; আমার শপথ যদি আর কিছু বোল ॥ ২।১৬।১৩৯-৪০ ॥"

এই কথা বলিয়া, আর কোনও উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রভু নৌকায় চড়িয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন, পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতকে নীলাচলে লইয়া যাওয়ার জন্য সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে প্রভু আদেশ করিলেন; সার্ব্বভৌম প্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রা-উপলক্ষে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণ সম্বন্ধে এইরূপই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে। এখন, পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণের ও উক্তির তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ নাকি বলিতেছেন:—"শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীই যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন, 'কোটিগোপীনাথ-সেবা ত্বৎপাদদর্শন', এবং পণ্ডিত-গোস্বামীই যখন 'প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িলেন তৃণপ্রায়,' আবার যখন 'তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ,' তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য।" এইরূপ সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণ ও উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে, বোধ হয়, তাঁহার স্বরূপ এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ, এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের স্বরূপটী জানা একান্ত আবশ্যক।

নবদ্বীপলীলায় ও ব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই—ইহারা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র। যে উদ্দেশ্যে রসিকশেখর—কৃষ্ণ লীলা-প্রকটন করেন, তাহার সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। শ্রীকৃষ্ণ যে রসিক-শেখর, তিনি যে প্রেমের বশীভূত, তিনি যে প্রেয়সী-পরতন্ত্র—তাহা শ্রীনবদ্বীপলীলাতেই পূর্ণতমরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজে শারদীয় মহারাসে, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" শ্লোকে তিনি কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপলীলায়, নিজেকে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবের অধীন করিয়া কার্য্যতঃই ঋণী হইলেন। নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন। পূর্ণতম মাধুর্য্যাস্বাদনের একমাত্র উপায় মাদনাখ্য-মহাভাব; এই মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীমতী-রাধিকা ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—"এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীমতীর মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী তখনই তাঁহার প্রাণবল্লভকে তাহা দিলেন; শ্রীরাধিকার সমস্ত চেষ্টাই যে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—ইহা দ্বারা শ্রীভানুসুতা তাঁহার অসমোর্দ্ধ-প্রেমের কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়তার চরম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন প্রেয়সী-পরতন্ত্রতাদির পূর্ণতম বিকাশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম কৃষ্ণত্ব প্রকটিত হইয়াছে, অপর দিকে কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি-নিমিত্ত চেষ্টার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের দ্বারা শ্রীরাধিকারও পূর্ণতম রাধিকাত্ব প্রকটিত হইয়াছে। "অতএব রাধিকা নাম বাখানে পুরাণে। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। ১।৪।৭৫ ॥" শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে নিজের ভাব দিলেন, নিজের কান্তিও দিলেন—কান্তি দিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌর করিলেন। ব্রজলীলায় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী অনুরাগের প্রবল উৎকণ্ঠায়, তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণকে যে কোথায় রাখিবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না; কাছে কাছে রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না, নয়নে নয়নে রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না, অঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না; দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে চাপিয়া ধরিয়াও তৃপ্ত হইতেন না; কিছুতেই যেন প্রাণের আশা মিটিত না; মনে হইত, বুঝিবা বুক চিরিয়া—হৃদয়ের ধনকে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্বকে—হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিলেই কিছু তৃপ্তি পাইবেন; তিনি যেন তাহাই করিলেন—বুক চিরিয়াই যেন তাঁহার বুকের ধন শ্যামসুন্দরকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; তাহাতেই যেন শ্যামের শ্যামরূপ হেম-গৌরাঙ্গীর হেমকান্তির অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আর রসিকশেখর শ্যামসুন্দরও পরম আনন্দেই—রস-আস্বাদনের অদম্য পিপাসার তাড়নায় অখণ্ড প্রেমরসের মূল উৎস-স্বরূপ, এবং মাদনাখ্য-মহাভাব-গ্রহণের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায় ঐ ভাবের একমাত্র মূল ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীরাধিকার হৃদয় প্রকোষ্ঠে পরম আনন্দেই—আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনি যেন ঐ গোপনীয় মণি কুঠরীতেই আত্মগোপন করিয়াছেন—যেন মণি কুঠরীর সর্ব্বস্বই লুণ্ঠ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

যাহা হউক, শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ভাবটী দিলেন; কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের কি প্রবল পরাক্রম, তাহা একমাত্র বৃষভানু নন্দিনীই জানেন, অপর কেহ জানেন না; কৃষ্ণ তো জানেনই না, তাঁহার প্রাণ প্রিয়সখীগণও তাহা জানেন না; কারণ, এই মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় তাঁহারা কেহই নহেন। ইহাতে একদিকে যেমন অসমোর্দ্ধ আনন্দ, অপর দিকে আবার তেমনি অসমোর্দ্ধ যন্ত্রণা; ইহারা যুগপৎ বর্ত্তমান—বিষামৃতে একত্রে মিলন। তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, এই মাদনাখ্য মহাভাবের অমৃতটুকু পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করুন, ইহাই যেন শ্রীরাধিকার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু বিষটুকুর ছায়া কণিকাও যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ইহাও তাঁহার প্রবলতর ইচ্ছা। কিন্তু উভয়ে—এই বিষ ও অমৃত—উভয়েই মহাভাবে নিত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে বর্ত্তমান; ইহাতে বিষ ছাড়িয়া অমৃত থাকিতে পারে না, অমৃত ছাড়িয়াও বিষ থাকিতে পারে না, ছাড়াছাড়ি হইলে এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। উৎকট ক্ষুধা এবং প্রচুর পরিমাণে লোভনীয় ভোজ্য বস্তু যুগপৎ বর্ত্তমান না থাকিলে, ভোজন রসের আস্বাদন পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না। উভয়ের মিলনজনিত পরাক্রমও অত্যন্ত প্রবল। এই পরাক্রম তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়ই বা হইয়া উঠে, এই পরাক্রমে তাঁহার প্রাণবল্লভ কোনও সঙ্কটেই বা পতিত হয়েন, এই আশঙ্কাতেই বৃষভানু নন্দিনী যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কাই বন্ধুহৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠে। যেন এই ব্যাকুলতার তাড়নেই—কৃষ্ণগতপ্রাণা বৃষভানু নন্দিনী মাদনাখ্য মহাভাবের পরাক্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া—ভাবের পরাক্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন, নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। মনের উপরেই ভাবের পরাক্রম অত্যধিক; তাই যেন তিনি নিজের মনের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের মনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তাই শ্যামের রূপ দেখিয়া রাধারূপ বলিয়া মনে হয়, শ্যামের মন দেখিয়া রাধা মন বলিয়া মনে হয়, শ্যামের চেষ্টা দেখিয়াও রাধার চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্বা বৃষভানু নন্দিনী আলিঙ্গন দ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াও যেন স্বস্তি অনুভব করিতেছেন না; হৃদয় গুহায় লুক্কায়িত রাখিয়াও যেন আশ্বস্ত হইতেছেন না; বুঝি বা তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বাহির হইতে কোনও বিপদ্ আসিয়াই যদি তাঁহার প্রাণবল্লভকে আক্রমণ করে; সেই বহির্ব্বিপদের পরাক্রম তাঁহার নিজের অঙ্গেই ক্রিয়া করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই,—বরং তাতে একটু সুখের সম্ভাবনাই আছে, কারণ তাতে তাঁহার প্রাণবল্লভ নিরাপদে থাকিতে পারেন; কিন্তু বহির্ব্বিপদের তাড়নায় তাঁহার নিজের অঙ্গের প্রতিঘাত যদি তাঁহার প্রাণবল্লভের কুসুম সুকোমল অঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে না জানি তাঁহার কতই কষ্ট হইবে—এই আশঙ্কাতেই শ্রীরাধিকা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এই ব্যাকুলতার ফলেই যেন তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইল, বহির্ব্বিপদ হইতে তাঁহার প্রাণবল্লভকে রক্ষা করিবার জন্য বাহিরেও এক স্বরূপে অবস্থান করেন।

অথবা, মাদনাখ্য মহাভাবের সহায়তায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কত আনন্দ পায়েন, ঐ আনন্দের

আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই বা কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও আস্বাদন করিবার জন্য—এবং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ত্তির সহায়তা করার জন্যই যেন বৃষভানু নন্দিনী স্বতন্ত্র এক স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সমীপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অথবা, শ্রীরাধিকা—"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।" তিনি যখন আলিঙ্গন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন, অথবা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তো রহিলেন কেবল মাত্র তাঁহার ভিতরে—তাহাতে তাঁহাকে ভিতরে রাখিয়া যে ভাবে আস্বাদন করা যায়, তাহাই হইতে পারে; কিন্তু বাহিরে রাখিয়া আস্বাদনের তৃপ্তি লাভ করা যায় না। তাই বুঝিবা শ্রীরাধিকা স্বতন্ত্র এক স্বরূপে তাঁহার সমীপে থাকিবার ইচ্ছা করিলেন—যেন তাঁহার প্রাণবল্লভকে বাহিরে রাখিয়া আস্বাদন করিতে পারেন।

নবদ্বীপ লীলায় শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর এই পৃথক্ স্বরূপই শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। শ্রীগদাধরে শ্রীমতী রাধিকার দক্ষিণা নায়িকার ভাবই প্রকট বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাখা সত্ত্বেও কেন যে আবার স্বতন্ত্র একরূপে শ্রীগদাধর পণ্ডিতরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। এক শক্তিশালী যুবক তাহার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ একটী বালককে ঘুড়ি উড়ানের আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য মাঠে লইয়া গেল। মাঠে যাইয়া ঘুড়ি উড়াইয়া দিল; যুবক নিজের হাতেই ঘুড়ির সূতা ধরিয়া রহিল। ঘুড়ি বহু উপরে উঠিয়া বিচিত্ররূপে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। বালকটি ইহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহাতে যুবকের প্রফুল্লতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যুবক নানা ভঙ্গীতে ঘুড়ি লইয়া খেলা করিতে লাগিল; তাহাতে নিজহাতে সূতা ধরিয়া ঘুড়ি উড়াইবার জন্য বালকের অত্যন্ত লালসা জন্মিল; এই লালসা চরিতার্থতার আনন্দ হইতে যুবক তাহাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক নহে; কিন্তু তাহার হাতে সূতা ছাড়িয়া দিতে আশঙ্কা হয়—পাছে সূতার টানে বালক পড়িয়া যায়, বা তাহার হাত কাটিয়া যায়; স্নেহবশতঃ ও এইরূপ আশঙ্কা যেমন বলবতী, বালকের হাতে সূতা ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ করার ইচ্ছাও তেমনি বলবতী। যুবক বালকের হাতে সূতা দিল, কিন্তু তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তাহাকে স্নেহভরে জড়াইয়া ধরিয়া বালকের হাতের নিকট নিজের হাত দুখানি সূতায় সংযুক্ত করিয়া রাখিল,—যদিইবা সূতার প্রবল আকর্ষণে বালকের পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজে তাহাকে রক্ষা করিবে। সূতা ধরিয়া বালক বেশ আনন্দ পাইতেছে; কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বালকের মুখমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তারিত হইতেছে, যুবক পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না। আবার বালকও যুবকের মুখ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া যেন সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছে না—যুবকের ইচ্ছা হইল, বালককে ছাড়িয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে; কিন্তু আশঙ্কায় বালককে ছাড়িতে পারিতেছে না—যদি যুগপৎই বালককে জড়াইয়া ধরা এবং বালক হইতে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার রঙ্গ দেখা যুবকের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে বোধ হয় যুবকের সাধ মিটিত। কিন্তু যুবক সাধারণ মানুষ, তাহার পক্ষে যুগপৎ দুইস্থানে থাকা অসম্ভব। তাই, কখনও বা বালককে জড়াইয়া থাকে, কখনও বা সশঙ্কচিত্তে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে। শ্রীমতীবৃষভানু নন্দিনীর অবস্থাও প্রায় এইরূপ। মাদনাখ্য মহাভাবরূপ সূতার সাহায্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন রূপ ঘুড়ি উড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা হইল—নিজেই সূতা ধরিয়া ঘুড়ি উড়ান; শ্রীরাধিকা তাঁহার হাতে সূতা দিলেন; কিন্তু যোগমায়ার শক্তিতে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন এবং স্বতন্ত্র এক মূর্ত্তিতে শ্রীগদাধর পণ্ডিত রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে কত অনুরাগ, এবং উভয়ে উভয়ের নিকটে থাকিবার জন্য এবং উভয়ে উভয়ের আনন্দবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা যে কত উৎকণ্ঠিত, তাহা দেখাইবার জন্যই এখানে এত কথা বলিতে হইল। নচেৎ সংক্ষেপে বলিলেই চলিত—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং শ্রীরাধাই শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

এক্ষণে আমরা শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণের ও উক্তিগুলির একটু আলোচনা করিতে বাসনা করি।

প্রথমতঃ—তাঁহার ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা। ক্ষেত্র বাসের প্রতিজ্ঞার মুখ্য এবং একমাত্র তাৎপর্য্য—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে থাকা। ক্ষেত্রবাসের কথাটা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌশল বিশেষ। এইরূপ কৌশলময় বাক্য-বিন্যাস ও আচরণ ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও বিরল ছিল না। তাঁহারা যমুনার ঘাটে যাইতেন—শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত—কিন্তু বাহিরে লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন—'আমরা জল আনিবার জন্য যমুনায় যাইতেছি।' কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতেন, যমুনার ঘাটে, বা যমুনার পথে শ্রীকৃষ্ণ নাই, তাহা হইলে যমুনায় যাওয়ার জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠার আভাসও দৃষ্ট হইত না, তাঁহাদের যমুনায় যাওয়াও হইত না। পশ্চাদভাগে স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কণ্ঠের মুক্তামালার সূত্রচ্ছেদন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের গূঢ় অভিপ্রায়ে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ-বিক্রয়ের ছলে গৃহ হইতে বহির্গমন, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও প্রচ্ছন্নতার আবরণে প্রেমপুষ্টির নিমিত্ত মথুরায় যাওয়ার কপটবাক্য-প্রয়োগ—ইত্যাদিই ব্রজসুন্দরীদিগের কৌশলময় চাতুর্য্য। প্রেমের স্বভাবেই এই সমস্তের স্ফুরণ। গদাধরও তো ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ব্যতীত অপর কেহ নহেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্পরূপ একটী চাতুর্য্য প্রকটন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যদি কাশীতে বাস করিতেন, গদাধরও কাশীতে বাস করার সঙ্কল্প করিতেন। ক্ষেত্রে বাস করিলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইবেন, তাই তাঁহার ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প। এখন, প্রভু ক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, গৌরগতপ্রাণ গদাধর আর কিরূপে থাকেন? যতদিন ছোব্‌ড়ার ভিতরে নারিকেল থাকে, ততদিন ছোবড়ার আদর; যে ছোব্‌ড়ার মধ্যে নারিকেল নাই, কে তাহার আদর করে? তখন ছোব্‌ড়া থাকুক বা না থাকুক, কি আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, তাহাতে নারিকেল-কামীর কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যে ক্ষেত্রে শ্রীগৌর নাই, সেই ক্ষেত্রে বাস করিয়া গদাধরের কিছু মাত্র শান্তি নাই; বিশেষতঃ শ্রীগৌরের সঙ্গে থাকিলেই তাঁহার ক্ষেত্রবাস সঙ্কল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তিনি গৌরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং বলিলেন—"ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।"

তারপর শ্রীগোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তিসেবা। শ্রীগদাধরের পক্ষে এই শ্রীমূর্ত্তি সেবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে; একটী বহিরঙ্গ বা আনুষঙ্গিক, অপরটী অন্তরঙ্গ বা মুখ্য। বহিরঙ্গ উদ্দেশ্যটী এই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা প্রকটনের বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য—কলিহত জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া; তাই তিনি সাধক জীবের ন্যায় নিজেও ভজন করিয়াছেন; গোবর্দ্ধনশিলার পূজাদিও করিয়াছেন। তাঁহার পরিকরবর্গও তাঁহার এই বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুকূল্যার্থ জীব-ভাবে ভজন করিয়াছেন। ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির সেবা অন্যতম মুখ্য অঙ্গ; ইহার "অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়।" গদাধর পণ্ডিতের পক্ষে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সেবার বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া—শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা সাধক জীবের নিকটে জ্ঞাপন করা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ততদিন, এই শ্রীমূর্ত্তি-সেবার, তাঁহার ক্ষেত্রবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীগৌরের নিকটে থাকার, বিঘ্ন হইত না। কিন্তু যখন শ্রীগৌরসুন্দর কিছু দিনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন তাঁহার ভাবী বিরহের আশঙ্কায় গদাধর আকুল হইয়া পড়িলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলবতী উৎকণ্ঠায় তিনি তাঁহার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য শ্রীমূর্ত্তিসেবার কথা যেন ভুলিয়াই গেলেন। বাস্তবিক মুখ্য ও আনুষঙ্গিকের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, মুখ্যকে বজায় রাখিয়া যদি পারা যায়, তবে আনুষঙ্গিক কাজটী করিতে হয়। আনুষঙ্গিকটীকে রক্ষা করিতে গেলে যদি মুখ্য কাজটিই উপেক্ষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কেহই আর আনুষঙ্গিক কাজে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিজের আহারের জন্যই লোক রন্ধন করিয়া থাকে; রন্ধনের পরে দুই এক মুষ্টি খাদ্য হয়তঃ অন্য কোনও প্রাণীকে দিয়া থাকে। এস্থলে নিজের আহারই হইল মুখ্য কার্য্য; অন্য প্রাণীকে দু এক মুষ্টি খাদ্য দেওয়া আনুষঙ্গিক কার্য্য। কিন্তু অন্য প্রাণীকে আহার্য্য দিতে গেলে যদি নিজকেই আহার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে কেহই অন্য প্রাণীকে কিছু দেয় না। অথবা, যে দিন নিজের আহারের জন্য রন্ধন করার

প্রয়োজন হয় না, সেই দিন,—কেবল অন্য প্রাণীকে দু এক মুষ্টি আহার্য্য দেওয়ার জন্য কেহই আর রন্ধন করে না।

যাহা হউক, এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবশিক্ষার জন্য শ্রীমূর্ত্তিসেবা—গদাধর পণ্ডিতের পক্ষে আনুষঙ্গিক বা বহিরঙ্গ কার্য্য, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা আনুষঙ্গিকও নহে, বহিরঙ্গও নহে; ইহা সাধক জীবের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং কোনও সময়েই পরিত্যাজ্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীগদাধর, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহসেবামাত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ করেন নাই; সাক্ষাৎ-শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সাক্ষাৎ সেবার জন্যই বিগ্রহ সেবা ত্যাগ করিতেছেন। জীবের ভাগ্যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সেবা যখন অসম্ভব, তখন শ্রীমূর্ত্তি সেবার ত্যাগদ্বারাই তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ বুঝাইবে।

এখন, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গোপীনাথসেবার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যও দুইটী, একটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে, অপরটি গদাধর পণ্ডিতের নিজের সম্বন্ধে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যটী এই:—শ্রীরাধার ভাবে নিজের চিত্তকে বিভাবিত করিয়া, শ্রীরাধা অভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন, ইহাই গৌরলীলার উদ্দেশ্য। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের পরিকর, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কর্ত্তব্য হইল—ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করা। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাম্বুধিতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি, প্রিয় ব্যক্তির ব্যবহারের জিনিস, এমন কি প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতির বা কার্য্যকলাপের উদ্দীপক জিনিসমাত্রই লোকের নিকটে অত্যন্ত আদরের হইয়া থাকে; আর যাহারা ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহারাও তাহার অত্যন্ত প্রীতির পাত্র হইয়া উঠে। আমি যাহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি, আমি যাহার প্রীতি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি, আমার কর্ত্তব্য হইবে—তিনি যাহাতে সুখী হয়েন, তাহা করা। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর জীবনসর্ব্বস্ব; তাঁহার সেবার জন্য শ্রীমতী স্বজন আর্য্যপথাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরাধার যে কত আদরেরবস্তু, তাহা শ্রীমতী রাধিকা এবং তাহার অন্তরঙ্গ সখীগণ ব্যতীত অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। রাধাভাব সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পক্ষেও শ্রীগোপীজনবল্লভের শ্রীবিগ্রহ ঠিক ততদূরই আদরের বস্তু। গৌরের প্রীতির জন্য গৌরের প্রাণের ধন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা গৌর পরিকরগণের অত্যন্ত প্রাণারাম বস্তু। কৃষ্ণ বিরহ ব্যাকুলা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট উপস্থিত করিয়া বিশাখা সুন্দরী তাঁহার কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য আনয়ন করিয়াছিলেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিরহ বিধুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহ কাতরতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার পক্ষেও গদাধর পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ততদূর উপযোগী। শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে ভাবের উদ্দীপন হয়: সুতরাং লীলারসের পুষ্টি সাধিত হয়। এইরূপে ভাবের উদ্দীপন দ্বারা লীলারসের পুষ্টি সাধন করা, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া কৃষ্ণ বিরহ কাতরতা কথঞ্চিৎ দূর করা,—ইত্যাদি শ্রীগদাধরের গোপীনাথ সেবার প্রতি অন্তরঙ্গ কারণ। আবার, গদাধর গোপীনাথের সেবা করেন বলিয়া, তাঁহাকে দেখিলেই প্রভুর মনে হইত,—গদাধর গোপীনাথের সেবক; তখনই প্রভুর গোপীজনবল্লভের কথা মনে হইত, সঙ্গে সঙ্গে গোপীজন বল্লভের লীলাদির কথা মনে উঠিত, এবং মহাভাবের প্রবল তরঙ্গে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

গদাধর এইভাবে গোপীনাথ-সেবাদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলার সহায়তা করিতেন। কিন্তু গৌর যখন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন গদাধর বিগ্রহ-সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহা শ্রীগদাধরের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল নহে; বরং অনুকূলই। শ্রীবিগ্রহের সান্নিধ্যে ভাবের উদ্দীপনাদি হয়, বিরহকাতরতা প্রশমিত হয়। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনধাম এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে বহুগুণে প্রশস্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। আর সেই লীলাস্থলে যদি লীলার মুখ্য সহায় শ্রীমতী বৃন্দাবনবিহারিণীর অভিন্ন স্বরূপ শ্রীগদাধর স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে যে ভাবের প্রবল বন্যায় রাধাভাবমূরতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কি অবস্থা হইবে, তাহা একমাত্র রসিকজনবেদ্য

যাহারও কোনও কার্য্যের বা আচরণের বিচার করিতে হইলে. কার্য্যের বা আচরণের প্রকারটা না দেখিয়া উদ্দেশ্য কি তাহাই দেখিতে হইবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে প্রকার ভিন্নরূপ হইলেও দূষণীয় হইতে পারে না।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় শ্রীগদাধরের নিজ-সম্বন্ধীয় অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যটী এই :—গদাধর স্বরূপতঃ কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য সেব্য। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিরহাবস্থায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। ইহাই গদাধরের শ্রীবিগ্রহসেবার নিজস্ব অন্তরঙ্গ হেতু।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন, গদাধর শ্রীবিগ্রহ সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গে চলিলেন। ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হয় নাই। তাহার হেতু এই :—স্বয়ংরূপের সেবার সাধ—বিগ্রহ-সেবায় মিটে না ; নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের পক্ষে বিগ্রহাদি ভাবের উদ্দীপনা করে মাত্র, স্বয়ংরূপের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা জন্মায় মাত্র ; কিন্তু স্বয়ংরূপের সহিত মিলনজনিত লীলা-বিলাসাদিতে যে আনন্দ, তাহা বিগ্রহাদি হইতে দুর্লভ। বিশাখাদত্ত চিত্রপট শ্রীরাধিকার ভাবের উদ্দীপন করিয়া কৃষ্ণসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠা বাড়াইয়াছিল মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দ দিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশমিত করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন কেবল চিত্রপট দেখিয়া বিরহ-বেদনা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীগণ গৃহে বসিয়া থাকেন নাই ; তাঁহারা বনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সেই কুঞ্জবিহারীকে অন্বেষণ করিয়াছেন—কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে নাই, তিনি যে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, অনুরাগের বলবতী উৎকণ্ঠায় একথা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বুঝি রঙ্গ করিবার জন্য রসিকশেখর নাগর-চূড়ামণি কোনও কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তাই তাঁহারা কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতেন। ইহা মহাভাবের স্বরূপগত ধর্ম্ম—সাধারণ জীবের ন্যায় মস্তিক-বিকৃতি-জনিত ভ্রান্তি নহে। যাহাহউক, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত রাধিকা-স্বরূপ ; প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মের প্ররোচনায়, তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করার জন্য শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। স্বয়ংরূপের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় বনে যাওয়ার সময় গৃহে কৃষ্ণের চিত্রপট ফেলিয়া যাওয়া যেমন শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে দূষণীয় নহে—ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনুসন্ধানের জন্য যাত্রাকালে ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীবিগ্রহ ফেলিয়া যাওয়াও শ্রীরাধিকা-স্বরূপ গদাধরের পক্ষে দূষণীয় হইতে পারে না।

তারপর, গদাধর-পণ্ডিত কাহার সঙ্গে যাইতেছেন, তাহাও বিবেচ্য। গদাধর স্বয়ং শ্রীরাধা ; তিনি যাইতেছেন স্বয়ং-রাধারমণ-স্বরূপ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সঙ্গে ; ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই ; উভয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু নাই। আবার, যাইতেছেন শ্রীবৃন্দাবনে—যাহা অপ্রাকৃত নবীন মদন—শ্রীরাধা-মদনগোপালের নিজস্ব ধাম। ব্রজব্যতীত অন্য কোনও স্থানে শ্রীরাধা-মদনগোপালের ব্রজভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না ; সখীজন পরিবেষ্টিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত মিলিত হইলেও ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধী ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। কুরুক্ষেত্র-মিলনে আমরা তাহার প্রমাণ পাই—সেই বৃষভানুনন্দিনী, সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন ; আবার দীর্ঘবিরহের পরে মিলন বশতঃ উভয়ের মিলন নায়ক-নায়িকার নব-সঙ্গমের মতই চমৎকারিতা দায়ক হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে সুখ সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ। আমা লঞা পুনঃলীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়েত পূরণে॥ * * * * প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন। ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৩ পরিচ্ছেদ।

এইরূপই শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা। স্বীয় জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন স্বরূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে—কৃষ্ণগত-প্রাণা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বলীলাস্থলী এবম্বিধ মহিমান্বিত শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য যে স্বভাবতঃই উৎকণ্ঠিত হইবেন এবং এই প্রবল উৎকণ্ঠার প্রভাবে তিনি যে অন্য সমস্তই ভুলিয়া যাইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের তো কিছুই নাই। মহাভাবোচিত অনুরাগের প্রবল আকর্ষণে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের কথা

কি ক্ষেত্রসন্ন্যাসের কথা যেন তাঁহার স্মৃতিপথেই উদিত হইল না; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন তাঁহার চৈতন্য হইল না; অনুরাগের খরস্রোতে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্থগিত করিতে পারে না। প্রবল স্রোতে কেহ যখন তীব্রবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, তখন তীরস্থিত বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টিই পতিত হয় না। তীর হইতে তাহাকে ডাকিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কেহ চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; আহ্বানকারীর শব্দ স্রোতের কলকল-নাদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তাহা আর ভাসমান ব্যক্তির কর্ণকুহরেই যেন প্রবেশ করিতে পারে না। শারদীয় মহারাসে শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থা হইয়াছিল। যেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই উন্মত্তার ন্যায় তাঁহারা বনের দিকে ধাবিত হইলেন, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ধাবিত হইলেন; যিনি আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করিতেছিলেন, বংশীধ্বনি শুনামাত্র, পরিবেশন-পাত্র তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল; তিনি কৃষ্ণানুরাগের প্রবল আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। যিনি আত্মীয়ার শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া গো-দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, শিশু কখন যে তাঁহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া গেল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না; তিনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন। আজই হয়ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বস্ত্রহরণ দিবসে-প্রতিশ্রুত মিলন সংঘটিত হইবে, ইহা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য যিনি নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-সামগ্রী তাঁহার দেহলতাকে সজ্জিত করিতেছিলেন—বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র তিনিও বহির্গত হইয়া পড়িলেন; সজ্জা শেষ করার জন্য অপেক্ষা করিলেন না—সজ্জা শেষ করা হইল কিনা, তাহা বিবেচনা করার কথাও তাঁহার মনে উদিত হইল না। তাঁহারা এসব বিবেচনা করিবেন কিরূপে? বিচারের শক্তিতো তখন তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের বলিতে যাহা কিছু, তৎসমস্তই তখন কৃষ্ণানুরাগের প্রবলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। যদি বিচার-শক্তি থাকিত, তবে হয়তঃ তাঁহারা মনে করিতেন—"শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই তো আমরা যাইতেছি; আচ্ছা, বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লই, যেন দেখিয়া কৃষ্ণ সুখী হয়েন।" এইরূপ চিন্তা ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের প্রতিকূল হইত না। তথাপি এতাদৃশী চিন্তাও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় নাই—বংশীধ্বনিরূপ প্রবলশক্তিসম্পন্ন রজ্জু যেন তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসমীপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। গদাধরপণ্ডিত-সম্বন্ধেও ঐ কথা; মহাভাবোচিত অনুরাগের প্রবল আকর্ষণে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সমীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন - ব্রজসুন্দরীদিগের বেশ-ভূষা রচনার ন্যায়, কিম্বা তাঁহাদের ক্রোড়স্থ আত্মীয়-শিশুর ন্যায়, গোপীনাথ বিগ্রহের কথাও তাঁহার মনেই স্থান পায় নাই। তিনি যে বিচার পূর্ব্বক বিগ্রহ-সেবা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে; বিচারের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। কোনও জড়বস্তুকে লোক যেমন রশি দিয়া জোরে টানিয়া লইয়া যায়, অনুরাগ-রশিও তদ্রূপ গদাধরকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়।" এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা অর্থে—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-সেবাই বুঝায়; কারণ শ্রীগদাধর গোপীনাথ-বিগ্রহসেবাই ছাড়িয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু এস্থলে "তৃণপ্রায়" শব্দের সার্থকতা কি?

সরলপ্রাণ শিশুদিগের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় কোনও একটী বস্তু যদি তৃণের আবরণে লুক্কায়িত থাকে, আর যদি কোনও শিশু তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেখা মাত্রেই ঐ শিশু সেই বস্তুটী লইয়া পলায়ন করিবে—যে স্থানে লইয়া গেলে ঐ বস্তুটী সে ইচ্ছানুরূপভাবে আস্বাদন করিতে পারিবে, সেই স্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত শিশু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। জিনিসটী নেওয়ার সময় হয়তঃ সে জিনিসের আবরণ-স্বরূপ তৃণগুলিকে ফেলিয়াই যাইবে; অথবা জিনিসটী বাহির করার সুযোগ না পাইলে, হয়ত তৃণসহই জিনিসটি লইয়া যাইবে। কিন্তু তৃণ লইয়া গেলেও তাহার অভীষ্ট স্থানে যাইয়া তৃণগুলিকে ফেলিয়া দিয়াই জিনিসটি আস্বাদন করিবে। এস্থানে, শিশু যে তৃণগুলি ফেলিয়া দেয়, তাহার হেতু তৃণের অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা নহে. তৃণেতেও শিশুর প্রয়োজন আছে। তৃণ দ্বারাও শিশু খেলার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তথাপি লোভনীয় বস্তুটি লইবার সময় শিশু তৃণগুলি ফেলিয়া দেয়। ইহার হেতু এই:—লোভনীয় বস্তুটি যখন পায়, তখন ঐ বস্তুর প্রতি গাঢ় লোভবশতঃ তাহাতেই

তাহার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে; তৃণের কথা তাহার মনেই উদিত হয় না—অনবধানতাবশতঃই সে তৃণ ত্যাগ করিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুখজনক; ইহা ব্রজসুন্দরীগণও জানেন, এবং ইহা জানেন বলিয়াই তাঁহারা বেশভূষা করিয়া থাকেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রেই গাঢ় অনুরাগ-জনিত কৃষ্ণসঙ্গের প্রবল উৎকণ্ঠায় অসম্পূর্ণ বা বিপর্য্যস্ত বেশভূষা লইয়াই তাঁহারা উন্মাদিনীর মত উর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বেশভূষার অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা ইহার কারণ নহে; কৃষ্ণসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠাধিক্যে বেশভূষার প্রতি অনবধানতাই ইহার হেতু; তাঁহারাও বেশভূষা-রচনার চেষ্টাকে "তৃণবৎ" ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর-পণ্ডিত সম্বন্ধেও ঐ কথা। তিনি যখনই শুনিলেন, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহার পূর্ব্বলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন, তখনই সেই বৃন্দাবনে তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার জন্য গদাধরের চিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হইল যে, অন্য কোনও বিষয়ই তাঁহার চিত্তে আর স্থান পাইল না—"প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা"র কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবাকে" যে তৃণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তার অংশে নহে, অত্যন্ত লোভনীয়-বস্তু লাভের জন্য প্রবল-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাহাদের রক্ষণ-বিষয়ে অনবধানতাংশেই তাহাদের তুল্যতা। সাধকজীবের পক্ষে এইরূপ অনুরাগোৎকণ্ঠা অসম্ভব। গদাধর-পণ্ডিতের আচরণের দোহাই দিয়া যে সকল সাধকজীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগকরতঃ একমাত্র গৌরের সেবা করিতেই প্রয়াসী, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, শ্রীপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ-সেবামাত্র ছাড়িয়া যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়েন নাই। তাঁহাদের আরও বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাত্যাগ বিচারমূলকই হইবে প্রেমোৎকণ্ঠাজাত অনবধানতামূলক হইবে না। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে এইজাতীয় বিচারের স্থান নাই।

আর একটী বিবেচনার বিষয় এই যে, উপাস্যের প্রীতিসম্পাদনই সেবা; উপাস্য কিসে সুখী হয়েন, তাহাই দেখিতে হইবে—সাধক কিসে সুখী হয়েন, তাহা সাধকের অনুসন্ধানের বিষয় নহে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুখজনক; শ্রীকৃষ্ণের ভজনশিক্ষা দেওয়াই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলার একটী উদ্দেশ্য—তিনি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ-ভজন ত্যাগ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপে প্রসন্ন হইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মুখ্য উদ্দেশ্যও ব্রজলীলার এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এতই লোভনীয় বস্তু যে, ইহার জন্য পূর্ণকাম শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে লালসাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই লালসাই গৌর-লীলার হেতু। ব্রজলীলা এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত আদরের বস্তু, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত কটক পর্য্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করিলেন। প্রভুর অন্তর গদাধরের প্রতি সন্তুষ্ট। "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা" ত্যাগের জন্য প্রভু সন্তুষ্ট নহেন; যে অনুরাগের আধিক্যে "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবার" প্রতি গদাধরের অনবধানতা জন্মিয়াছে, সেই অনুরাগাধিক্য দেখিয়াই সন্তুষ্ট। প্রভু জানেন—গদাধর সঙ্গে থাকিলেই তাঁহার পূর্ব্বলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার পক্ষে ব্রজ-রসাস্বাদনের প্রাচুর্য্য সম্ভব হইবে; প্রভু জানেন,—গদাধরকে তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিলে, তাঁহার নিজেরই বা কত কষ্ট হইবে, আর গদাধরেরই বা কত কষ্ট হইবে। তথাপি তিনি গদাধরকে তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিলেন—দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে নীলাচলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কুসুম-কোমল-হৃদয় প্রভু গদাধরের প্রতি এত কঠোর হইলেন কেন? জীবের জন্য। প্রভু এবার পতিত-পাবন অবতার। কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যায়েন—মায়ামুগ্ধ জীব মনে করিবে—"গদাধর পণ্ডিত তো শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গেই চলিয়া গেলেন। গৌরও তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনও প্রয়োজনই নাই, কেবল গৌরের সেবাই কলি-জীবের কর্ত্তব্য।" তাই পরমকরুণ প্রভু সহস্রবৃশ্চিকদংশন-তুচ্ছকারি-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও জীবের ভজনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে গদাধরকে নীলাচলে শ্রীগোপীনাথের সেবায় পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর এই আচরণের দুইটী অংশ। প্রথমে তিনি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া যায়েন, পরে গৌরের আদেশে আবার গোপীনাথের সেবা করার জন্য নীলাচলে যায়েন। পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণকেই যদি আমাদের ভজনের বিধি-নির্দ্দেশক বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে—পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধিই বলবান্ এই ন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণসেবার বিধিই তো আমরা পাইয়া থাকি।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ; উভয় লীলাই স্বরূপতঃ এক; কিন্তু এক হইলেও ব্রজলীলাই, নবদ্বীপলীলার মূল; ব্রজলীলারূপ নির্ঝর সমূহ হইতেই নবদ্বীপ-লীলাতরঙ্গিণী সম্পুষ্টা। শ্রীকৃষ্ণসেবা বাদ পড়িলে, ব্রজলীলারূপ নির্ঝর-সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই মনে হয়; তাহাতে নবদ্বীপলীলা পুষ্ট হইবে কিরূপে? যদি কেহ বলেন, "কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, চারিদিকে বহে যাহা হ'তে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে।"—ইত্যাদি প্রমাণে বুঝা যায়, শ্রীগৌরলীলা-রসে নিমগ্ন হইতে পারিলে ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইবে (গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে)। তাহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—গৌরলীলায় নিমগ্ন হইতে পারিলেই যে ব্রজলীলা স্ফুরিত হইবে, ইহা ধ্রুবসত্য, এবং ব্রজলীলারস আস্বাদনের অন্যপন্থাও যে নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার বিরোধী, তাঁহাদের পক্ষে গৌর-লীলারসে নিমগ্ন হওয়া সম্ভব কি না, তাহাও বিবেচ্য; কারণ, এইরূপ নিমগ্নতা শ্রীগৌরের কৃপাসাপেক্ষ; গৌরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, গৌরের প্রাণারামবস্তু ব্রজলীলাকেও উপেক্ষা করিয়া গৌরের কৃপালাভের আশা আমাদের হীনবুদ্ধিতে আত্মবঞ্চনার প্রয়াস বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীগৌরের কৃপালাভের চেষ্টা, বৃক্ষের মূল কাটিয়া শাখায় ফল-উৎপাদনের চেষ্টার মত—অথবা কুক্কুটীর সম্মুখ ভাগ পোষণ করিতে গেলে তাহার আহার যোগাইতে হয়, সুতরাং কিছু ব্যয় বহন করিতেও হয় বলিয়া, তাহার গলাটা কাটিয়া ফেলিয়া কেবল লাভজনক-ডিম্ব-প্রসবকারী পশ্চাদভাগ রক্ষা করার প্রয়াসের ন্যায় বলিয়াই মনে হয়।

ধর্ম্মে সার্ব্বজনীনতা

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু ধর্ম-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে এবং প্রসার লাভ করিয়াছে। আবার খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত হইলেও ভারতবর্ষেও তাদের বিস্তৃতি কম নহে। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকগণই বলিয়া থাকেন—তাঁহাদের ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন; কেহ কেহ একথাও বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন নহে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীনতার ব্যাপকতা কতটুকু, তৎসম্বন্ধেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা ধর্ম্ম-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি—ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম। ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত—স্থূলতঃ সেই নিত্য সম্বন্ধাত্মকই—যে ধর্ম্ম, তাহা আত্মধর্ম্ম, ইহা নিত্য। আর অনাত্ম দেহাদির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্ম্ম, তাহা অনাত্মধর্ম্ম; দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ইহা পরিবর্ত্তনশীল; লোকধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম সমাজ-বিধি প্রভৃতি অনাত্মধর্ম্ম। অনাত্ম ও পরিবর্ত্তনশীল দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া নিত্য আত্মধর্ম্মের সাধনাঙ্গগুলিও যুগে যুগে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেক আচারও ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে; সম্ভবতঃ আচারের অবশ্য-পালনীয়তা জনসাধারণের চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রাচীন মনীষীগণ এতদ্দেশের প্রায় প্রত্যেক আচারের সঙ্গেই ধর্ম্মভাব জড়িত করিয়া গিয়াছেন; অথবা, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারেও যাহাতে ভগবৎ-স্মৃতিমূলক ধর্ম্মভাব চিত্তে উদ্দীপিত হইতে পারে, তজ্জন্যই হয়তো মনীষীগণ প্রত্যেক আচারের সঙ্গে ধর্ম্মকে জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভগবৎ-স্মৃতিমূলক ধর্ম্মভাবের সহিত জড়িত থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক জাতির বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচারকেও এক অর্থে ধর্ম্ম বলা যায়। যদ্দ্বারা ধৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম; এই সমস্ত বিশিষ্ট আচার দ্বারাই সম্প্রদায়স্থ লোকগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে ধৃত হইয়া থাকে; তাই তাহারা ধর্ম্ম। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। যখন সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পতির সঙ্গে চিতায় আরোহণ না করিলে উচ্চবর্ণের বিধবাগণ সমাজে এবং গৃহে নিন্দনীয় হইত—তাহারা অসতী বলিয়া পরিগণিত হইত; কারণ, তাহারা সতীদাহরূপ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইত। সতীদাহ-প্রথাই তাহাদিগকে স্বীয় গৃহে বা সমাজে শ্রদ্ধার আসনে ধৃত করিয়া রাখিত; সুতরাং তাহা তাহাদের ধর্ম্ম ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অহিন্দুর অন্নগ্রহণ হিন্দুর জাতি-চ্যুতির একটি কারণ; অহিন্দুর অন্নত্যাগ হিন্দুর একটী আচার—এই আচার হিন্দুকে স্বীয় সমাজে ধৃত করিয়া রাখে, এই আচারের লঙ্ঘন করিলে (অহিন্দুর অন্ন গ্রহণ করিলে) হিন্দু আর হিন্দু-সমাজে থাকিতে পারে না। তাই অহিন্দুর অন্নত্যাগ হিন্দুর একটী ধর্ম্ম—অন্ততঃ অহিন্দুর অন্নগ্রহণ হিন্দুর পক্ষে অধর্ম্ম। কিন্তু এই সমস্ত আচার সমাজ-বিধি মাত্র—তথাপি, তাহারা ধর্ম্ম—অবশ্য অনাত্মধর্ম্ম, কিন্তু আত্মধর্ম্ম নহে।

অনাত্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত যে সমস্ত আচার—দেশাচার, লোকাচার স্ত্রী-আচার (বিবাহাদিতে), সামাজিক আচার প্রভৃতি—তাহাদের স্বরূপ এক এক দেশে, এক এক সমাজে, এক এক জাতিতে এক এক রকম। সুতরাং এই সমস্ত আচার সার্ব্বজনীন নহে,—সম্ভবতঃ সার্ব্বজনীন হইতেও পারে না।

এখন আত্মধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা যাউক। আত্মধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ—সাধ্য ও সাধন—লক্ষ্য ও উপায়।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন; অবশ্য এই সম্বন্ধের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে—ব্রহ্ম সেব্য, আর জীব তাঁর সেবক; ইত্যাদি। সম্বন্ধের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, যে সম্প্রদায় যে স্বরূপ স্বীকার করেন, সে সম্প্রদায় মনে করেন, জীবমাত্রের সঙ্গেই ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ—বিশেষ শ্রেণীর জীবের সহিত ব্রহ্মের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই, সকলের সহিত একই সম্বন্ধ; সুতরাং জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধটী সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু

এই সম্বন্ধের অনুভূতি মায়াবদ্ধ জীবের নাই। এই সম্বন্ধের অনুভূতি জাগাইয়া সম্বন্ধানুরূপ অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করাই—যেমন, যাঁহারা জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হওয়া, মিশিয়া যাওয়া; যাঁহারা সেব্য-সেবকত্ববাদী, তাঁহাদের পক্ষে, সিদ্ধদেহে ব্রহ্মের অভীষ্ট স্বরূপের সেবা পাওয়া; ইত্যাদিই—হইল জীবের লক্ষ্য, ইহাই সাধ্যধর্ম্ম। ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ সার্ব্বজনীন বলিয়া সেই সম্বন্ধানুরূপ সাধ্যধর্ম্মও সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সাধ্যধর্ম্মকেও সর্ব্বাংশে সার্ব্বজনীন বলা যায় না। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মোটামুটী লক্ষ্য—ব্রহ্মের সহিত জীবের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ্য মধ্যে ইহাই সাধারণ; সুতরাং এইটুকুই সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে এই সম্বন্ধের অনেক ইতর-বিশেষ আছে, অনেক বৈচিত্রী আছে; এসমস্ত বৈচিত্রী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; সুতরাং ইহাদিগকে সার্ব্বজনীন বলা যায় না; অবশ্য এ বিষয়ে রুচির পার্থক্যে যদি কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ না করা যায়, তাহা হইলে এ সমস্ত বৈচিত্রীর যে কোনওটাই বোধ হয় সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কারণ, এই বৈচিত্রী-স্বীকারে কোনও রূপ শারীরিক আয়াস নাই, সামাজিক প্রতিবন্ধক নাই—ইহা একটী মানসিক ব্যাপার মাত্র।

যাহা হউক, লোকসমাজে সাধ্যধর্ম্মের বৈচিত্রীর সার্ব্বজনীনত্বের উপরে সাধারণতঃ ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে—সাধনাঙ্গ এবং আচার দ্বারাই লোক সাধারণতঃ সার্ব্বজনীনত্বের বিচার করিয়া থাকে।

সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির উপায়কেই সাধন বলে—ইহা ইন্দ্রিয়-সাধ্য-ব্যাপার-বিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন সাধনপন্থা লক্ষিত হইলেও, সকলের মধ্যে এবং সমস্ত সাধনাঙ্গে একটা সাধারণ জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে—ভগবৎ-স্মৃতি বা ব্রহ্ম-স্মৃতি। বৈচিত্রীভেদে এই স্মৃতিকে কেহ বা ধ্যান বলেন, কেহবা লীলাস্মরণ বলেন; এই স্মরণ,—উপাস্য স্বরূপে এই মনঃসন্নিবেশ,—ইহাই হইল সাধনের প্রাণ; তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন —"সাধন স্মরণ-লীলা।" সাধন-বিষয়ে যতকিছু বিধিনিষেধ আছে, সমস্তের মূলেই ভগবৎস্মৃতি; ভগবৎস্মৃতিই মূল বিধি। ভগবৎ-বিস্মৃতিই মূল নিষেধ।

"সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ,র,সি, ১।২।৫॥"

সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান যদি ভগবৎ-স্মৃতিযুক্ত হয়, তবেই তাহা ফলপ্রদ। কিন্তু তাহা যদি ভগবৎ-স্মৃতিহীন হয়, অনাসঙ্গ হয়—তাহা হইলে কোটিজন্মের অনুষ্ঠানেও সাধ্যবস্তু পাওয়া যাইবে না। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। ভ, র, সি, ১।১।২২॥" এবং একথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥"

যাহা হউক, সাধনের প্রাণস্বরূপ এই যে সর্ব্ববাদিসম্মত ভগবৎ-স্মৃতি, ইহা মানসেন্দ্রিয়ের ব্যাপার; ইহাতে শারীরিক ক্লেশ নাই, সামাজিক প্রতিবন্ধক নাই, লৌকিক অসুবিধাও নাই; সুতরাং ইহা সার্ব্বজনীন হইতে পারে; ইহাতেও মনকে স্মরণের উপযোগী করিয়া লইতে হয় —তাহার উপায়ও ঐ স্মরণই; অন্য উপায়ের প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রথমতঃ একটু বেগ পাইতে হইবে; মন ছুটিয়া বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইবে—তাহাকে পুনঃ পুনঃ টানিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু একটু চেষ্টা ছাড়া কোন্ বস্তুই বা পাওয়া যায়? প্রকৃতিদত্ত রৌদ্র-বায়ুর জন্যও একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

অন্য যত কিছু সাধনাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐ ভগবৎ-স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভগবৎ-স্মৃতির সহায়ক। দেশকাল-পাত্রভেদে এ সকল সাধনাঙ্গের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। এ সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ অধিকার থাকিলেও সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানে সকলের হয়তো সামর্থ্য থাকে না। ব্রহ্মের সঙ্গে সকল জীবেরই সমান সম্বন্ধ বলিয়া ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে সকলেরই সমান স্বরূপানুবন্ধী অধিকার আছে এবং এই স্বরূপানুবন্ধী অধিকারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধনাঙ্গই হয়তো সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু যাহা সামর্থ্যের দিক্ দিয়া সার্ব্বজনীন নয়, যে অঙ্গের অনুষ্ঠানে অল্পায়াসে সকলে সমর্থ নহে, লোক-সমাজে তাহা সার্ব্বজনীন বলিয়া গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। কোনও কোনও সাধনপন্থায় অর্চ্চনা বা বিগ্রহ সেবা সাধনের একটা অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই অঙ্গটী সার্ব্বজনীন হইতে পারেনা; কারণ, ইহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে

স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিবন্ধক আছে, কাহারও কাহারও পক্ষে অন্যরূপ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা আছে। যে কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে নিজের ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই অঙ্গের সাধনই অনেকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়—বিশেষতঃ যদি প্রয়োজনীয় অন্য বস্তু অনায়াসলভ্য না হয়।

অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের মধ্যেই—প্রার্থনার প্রচলন আছে,নাম-জপের প্রচলন আছে। প্রার্থনায় ও নামজপে অন্য উপকরণ-সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, সামাজিক বা লৌকিক প্রতিবন্ধক বা অসুবিধাও নাই; সুতরাং প্রার্থনা, নামজপ ও তদনুরূপ ভজনাঙ্গগুলি সার্ব্বজনীন হইতে পারে—যদি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী দূর করা যায়।

প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই সাধনাঙ্গ-নির্দ্দেশক শাস্ত্র আছে; এসকল শাস্ত্রে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-বিষয়ে উপদেশ আছে, সাধনের অনুকূল বিষয়ের উপদেশও আছে। আবার এমন বিধি-নিষেধও আছে, যাহার সহিত সাধনাঙ্গের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই—এইগুলি সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক বিধি। সাধনাঙ্গের সহিত এই সমস্ত বিধির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য এইগুলি পালিত হইয়া থাকে। এই সকল শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যতীতও অনেক আচার প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে—প্রায় প্রত্যেককেই এ সমস্ত আচার পালন করিতে হয়—যে কেহ এই আচারের লঙ্ঘন করিবে, সম্প্রদায়ের শাসনদণ্ড তাহার মস্তকে উত্তোলিত হইতে পারে—অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

নববিধা-ভক্তির বা তাহাদের কোনও একটীর আধিক্যে অনুষ্ঠানই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখ্যভজন। ইহাদের অনুকূল বা অপ্রতিকূল আরও কয়েকটী আচারের আদেশ করিয়া এবং উক্ত নববিধা-ভক্তিরই কোনও কোনওটীর অঙ্গগুলির পৃথক্ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার বিশটী অঙ্গ সাধনভক্তির দ্বারস্বরূপ; এই বিশটীর মধ্যে আবার দশটী বর্জ্জনাত্মক এবং দশটী গ্রহণাত্মক। বর্জ্জনাত্মক আচারগুলির মধ্যে একটী আছে—সেবাপরাধ, সেবাপরাধ বর্জ্জন করিতে হইবে। সেবাপরাধ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন তালিকা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে আগম, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন রকমের তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত তালিকার মিল যে না আছে, তাহা নহে; তবে তাহা খুব কম; অমিলের ভাগই যেন বেশী। তবে বিভিন্ন তালিকাগুলি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবদর্চ্চনে শ্রদ্ধাভক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপরাধ। যাহাহউক, বিভিন্ন তালিকার মধ্যে একটী তালিকায় দেখা যায়—গণেশের পূজা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে অপরাধ হয়, (হরিভক্তিবিলাস ৮।২১৫); কিন্তু তথাপি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে গণেশের পূজার প্রথা প্রচলিত নাই, ইহা সকলেই জানেন। এই গণেশের পূজার অভাব কোনও শাস্ত্রের মত অপরাধজনক হইলেও বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজ ইহাকে অপরাধ বলিয়া মনে করেন না। কেবল ইহা নহে, এই তালিকার সাড়ে পনর আনা অংশের অপালনকেও বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজ অপরাধজনক মনে করে বলিয়া কার্য্যতঃ দেখা যায় না; কিন্তু এই তালিকার মধ্যে আবার ইহাও আছে যে—"অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন দ্বারা ভোগ দিলে অপরাধ হয়। ৮।২।১৫।" গণেশের পূজার অভাবকে এবং এই তালিকার সাড়ে পনর আনা অংশের অপালনকেও অপরাধজনক বলিয়া মনে না করিলেও অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন দ্বারা ভোগ না দেওয়া সম্বন্ধে বৈষ্ণবসমাজ বিশেষভাবে সতর্ক—বরং কিছু অতিরিক্ত সতর্কই বলা যায়। এ বিষয়ে বৈষ্ণবের সংজ্ঞাটীকেও যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব; যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত, তিনি বৈষ্ণবতর এবং যাঁহাকে দর্শন করিলেই আপনা-আপনি মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি বৈষ্ণবতম। আর শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে "যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুসেবাপরায়ণ, তিনি বৈষ্ণব। ভীষণ বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াও, অথবা বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াও যিনি একাদশী ত্যাগ না করেন, যিনি বৈষ্ণব-বিধানে দীক্ষিত, যিনি সর্ব্বভূতে সমচিত্ত, যিনি স্বাচারবান্ এবং যিনি শ্রীহরিতে সমস্ত অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়; দীক্ষাবিধি, ন্যাস, যন্ত্রসহ দ্বাদশ বা অষ্টার্ণ মন্ত্রের আরাধনা করিলে এবং হরিপূজায় নিরত থাকিলে সেই ব্যক্তিই সংসারে বৈষ্ণব নামে প্রথিত॥

১২।১৩২—১৩৪॥" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা বলিয়াছেন, পাচিত-অন্নবিচারে সেই সংজ্ঞা বর্ত্তমান-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে যে লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টীকানুসারে তাহাদের সমস্ত লক্ষণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনি বৈষ্ণব (তথেতি সমুচ্চয়ে)। কিন্তু যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন, মালাতিলক ধারণ করেন এবং এরূপ আরও দু'একটী আচার পালন করেন—শাস্ত্রবিহিত লক্ষণাক্রান্ত গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া থাকিলেও এবং শাস্ত্রবিহিত মুখ্য ভজনাঙ্গের একটীর অনুষ্ঠান না করিলেও—অধিকন্তু মিথ্যাভাষণ-চৌর্য্যাদি দোষে দুষ্ট হইলেও অন্নপাকের অধিকারি-বিচারে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহারই সমাদর করিয়া থাকেন; যিনি সম্প্রদায়-প্রচলিত নিয়মে দীক্ষিত নহেন, এবং যিনি তিলকাদি ধারণ করেন না, তাঁহার "গৌরাঙ্গ বলিতে পুলক শরীর" হইলেও এবং "হরি হরি বলিতে তাঁহার নয়নে নীর" প্রবাহিত হইলেও রান্নাঘরের ছায়া-স্পর্শের অধিকারও যেন কোনও কোনও বৈষ্ণব তাঁহাকে দিতে চাহেন না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত অপরাধ-তালিকায় কেবল পাচিত অন্ন সম্বন্ধেই বৈষ্ণবত্বের বিচারের কথা আছে; ফল, মূল প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য রন্ধন ব্যতীতই ভোগে দেওয়া যায়, সে সকলের ভোগের উপযোগী ভাবে প্রস্তুতীকরণ, সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাতে নাই এবং জল সম্বন্ধেও কোনও কথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের মতে যিনি বৈষ্ণব নহেন, ফল-মূল তৈয়ার করার কথা তো দূরে—জল স্পর্শের অধিকার, এমন কি স্থলবিশেষে রান্নার কি ভোগের ঘর স্পর্শ করিবার অধিকারও বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে দেন না—বৈষ্ণব-সমাজে তিনি অস্পৃশ্য;—যদিও এরূপ অস্পৃশ্যতা শাস্ত্র এবং প্রাচীন মহাজনগণের আচরণের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। * কেহ কেহ বলেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন এবং অমানিনা মানদেন" নীতির উপাসক বৈষ্ণব-সমাজের এইরূপ ব্যবহারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমুদার ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা এবং তাঁহার মরমের ধর্ম্মে কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। এই উক্তির মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। কিন্তু এতাদৃশ আচারের ফলে অনেক বৈষ্ণবের যে বিশেষ অসুবিধা এবং কষ্ট হইতেছে—তাহা অন্ততঃ মনে মনে সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে এইরূপ আচারের পালনকেই যেন জীবনের ব্রত করিয়া বসিয়াছেন—ইহার প্রাবল্যে মুখ্য ভজনাঙ্গকে অনেক সময় দূরে সরিয়া থাকিতে হইতেছে। আমাদের মনে হয়, ইহা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের জাতির বিশেষত্ব-সূচক আচারেরই বিস্তৃতি মাত্র। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটী

---

* বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস যখন ঠাকুর শ্রীঅভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅভিরাম তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য আটকড়া কড়ি দিলেন। শ্রীনিবাস তদ্দ্বারা তণ্ডুলাদি কিনিয়া এক কদলী-বনে রন্ধনাদি করিলেন। এদিকে অভিরাম তাঁহার নিকট দুইজন বৈষ্ণব পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস যখন তাঁহার পাচিত অন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া আচমন দিলেন, তখনই সেই দুই বৈষ্ণব সেই স্থানে উপনীত হইয়া প্রসাদ চাহিলেন—তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। ভোগের অন্ন তিনজনে বণ্টন করিয়া খাইলেন (প্রেমবিলাস, ৫ম বিলাস, ৫১ পৃঃ) শ্রীনিবাসের তখনও দীক্ষা হয় নাই; শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার পরে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত ঘটনার সময় দীক্ষা না হইয়া থাকিলেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সংজ্ঞা অনুসারে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ-নিবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহার পাচিত ও নিবেদিত অন্ন বৈষ্ণবদ্বয় গ্রহণও করিয়াছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গয়াতে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের পরে একদিন রন্ধন করিয়া সব প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর পাচিত অন্ন ঈশ্বরপুরী আহার করিলেন। তখনও লৌকিক লীলায় প্রভুর দীক্ষা হয় নাই।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার পথে প্রভু যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণ একদিন প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার দশহাজার শিষ্যকে ভোজন করাইয়াছিলেন—নিজ গৃহে। প্রভুও তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দশহাজারেরও বেশী লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করা দু'চার জন লোকের সাধ্যাতীত। অথচ তখন তপন মিশ্রাদি দু'তিন জন লোক-ব্যতীত প্রভুর অনুগত বৈষ্ণব কাশীতে কেহ ছিলেন না; কাশীতে তখন অন্য বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। এত লোকের জন্য রন্ধন করিলেন কাহারা? যাঁহারাই করিয়া থাকেন, প্রভুও তাঁহাদের পাচিত অন্ন (ভাত, বা লুচি তরকারী আদি) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনগ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। কেহ কেহ এসমস্ত আচরণের সঙ্গে বৈষ্ণব-সমাজের বর্ত্তমান আচরণের তুলনা করিয়া থাকেন। এসমস্ত আচরণ অনুকরণীয় কিনা, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

সামাজিক আচার মাত্র। তথাপি বর্ত্তমান-বৈষ্ণব-সমাজে ইহা সাধনাঙ্গের ন্যায়ই পালনীয়—সম্ভবতঃ সাধনাঙ্গ হইতেও ইহার স্থান উর্দ্ধে। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান কেহ করিতেছেন কিনা প্রায়ই কেহ তাহার সন্ধান লয় না—এমন কি প্রায়শঃ গুরুদেবও সে খোঁজ লন না, কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজের সামাজিক আচারের কেহ লঙ্ঘন করিলে সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবে কিনা সন্দেহ।

কেবল বৈষ্ণব-সমাজে কেন, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই এইরূপ কতকগুলি সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক আচার আছে; যাহা সকলেরই পালন করিতে হয়। এইরূপ আচারগুলিও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বস্তুতঃ. যাহা সর্ব্বসাধারণ অনায়াসে পালন করিতে পারে না, তাহা কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না।

আরও একটী গুরুতর বিষয়ে বিবেচনা দরকার; তাহা এই। প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মধর্ম্ম সমাজের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে- আক্ষরিক বিচারে আত্মধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও কার্য্যতঃ আত্মধর্ম্মের উপরে সমাজেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিরাজিত; আত্মধর্ম্ম সমাজধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে, সমাজ-ধর্ম্ম যেন আত্মধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আত্মধর্ম্মের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে স্বরূপতঃ সকলের অধিকার থাকিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু এক এক সমাজের জন্য এক একটী ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—এক সমাজের লোক অন্য সমাজের আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া কেহ মহম্মদের বা যীশুখৃষ্টের উপদিষ্ট মুখ্য সাধনাঙ্গেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে না, মুসলমান বা খৃষ্টান-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও হিন্দু সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না! বস্তুতঃ সামাজিক আচার গ্রহণ না করিলে আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কেহ সমাজে স্থান পাইতে পারে না—সাধারণ লোক আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজের জন্যই বেশী ব্যস্ত—কারণ, সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহ সংসারে চলিতে পারে না। অথচ কোনও সমাজের বিশিষ্ট আচারই সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। এইরূপে সমাজের সহিত জড়িত হওয়ায় এবং সামাজিক আচারগুলিও অধিকাংশ-স্থলে আত্মধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপে গৃহীত হওয়ায়, কোনও ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, কোনও অনাত্মধর্ম্ম সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। আত্মধর্ম্মের সাধ্যাংশেও বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন বৈচিত্রী আছে বলিয়া তাহাও সার্ব্বজনীন হইতে পাবে না; তবে বিভিন্ন বৈচিত্রীর মধ্যেও এইটুকু মাত্র সাধারণ যে সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। সম্বন্ধেরও আবার বিভিন্ন বৈচিত্রী আছে; এই সকল বিভিন্ন বৈচিত্রীর প্রত্যেকটীতেই স্বরূপানুবন্ধী অধিকার হিসাবে প্রত্যেক জীবেরই অধিকার থাকিলেও বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি বলিয়া কোনও বৈচিত্রীই সার্ব্বজনীন ভাবে গৃহীত হইতে পারে না। সাধন-ধর্ম্মেরও আবার বহু বৈচিত্রী, সমস্ত সাধনাঙ্গের মূল ভিত্তি—ভগবৎস্মৃতি; ইহা সার্ব্বজনীন বটে; কিন্তু সাধ্যধর্ম্মের বৈচিত্রী-অনুসারে স্মৃতিরও বৈচিত্রী আছে বলিয়া কার্য্যতঃ ভগবৎস্মৃতির কোনও একটী প্রকারও লোকের রুচিভেদবশতঃ সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। নামকীর্ত্তন, প্রার্থনাদি সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িতার প্রভাব সেস্থলেও বিঘ্ন জন্মাইতে পারে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নাম-কীর্ত্তনাদির বিভিন্ন রীতি। যে সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বাহিরের উপকরণাদির প্রয়োজন, সে সমস্ত সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। আবার যাহা স্বরূপতঃ সাধনাঙ্গ নহে, বস্তুতঃ সামাজিক আচার, অথচ যাহা সাধনাঙ্গের ন্যায়ই সম্মানিত, তাহাও কখন সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; তাহা বরং প্রায়শঃই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, এবং ধর্ম্মানুরাগের নামে ধর্ম্মান্ধতারই প্রশ্রয় দান করিয়া লোক-সমাজে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলতঃ কোনও ধর্ম্মই ব্যবহারিকভাবে সার্ব্বজনীন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। প্রামাণ্য শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন বলা হইয়াছে, আমাদের মনে হয়—জীবের স্বরূপানুবন্ধী অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা বলা হইয়াছে—জীবের সামর্থ্য বা ঐ সকল ধর্ম্মের সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা হয় নাই।

গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা

কাম এবং প্রেম এই দুইটী শব্দেরই অর্থ ইচ্ছা—সুখের ইচ্ছা। তথাপি কিন্তু এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যে পার্থক্য আছে; ইচ্ছার গতির পার্থক্য অনুসারেই তাৎপর্য্যের পার্থক্য। যে সুখ-বাসনার গতি নিজের দিকে, তাকে বলা হয় কাম; আর যে সুখ-বাসনার গতি পরের দিকে—প্রীতির বিষয়ের দিকে—তাকে বলা হয় প্রেম। নিজের সুখের জন্য বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, তার নাম কাম; আর প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁর সুখের জন্য, বা তাঁর দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, তার নাম প্রেম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥ ১।৪।১৪১॥"

সুখ-বাসনার গতি-পার্থক্যের হেতু আছে। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত বাসনার মূলেই আছে মায়া। মায়া আমাদের দেহেতে আবেশ জন্মাইয়া আমাদের চিত্তে দেহের এবং দেহের ইন্দ্রিয়বর্গের সুখের জন্য বাসনা জন্মায়; ইহাই কাম। এই কাম হইল মায়া জনিত বাসনা; ইহাই কামের স্বরূপ। আর প্রেম থাকে ভগবানের মধ্যে এবং তাঁহার পরিকর ভক্তদের ও অন্য মায়ামুক্ত ভক্তদের মধ্যে। মায়া ইহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। ভগবানের বা ভক্তের সমস্ত বাসনাই হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা বাসনার গতিই থাকে প্রীতির বিষয়ের দিকে। ভক্তের মধ্যে যে প্রীতি বা সুখের বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে—ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ; আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে প্রীতি বা সুখ-বাসনা, তাহার লক্ষ্য হইতেছে তাঁহার ভক্ত। ভগবানও নিজের সুখ চাহেন না, তাঁহার ভক্তগণও নিজেদের সুখ চাহেন না। ভক্ত চাহেন ভগবানের সুখ এবং ভগবান্ চাহেন ভক্তের সুখ। এই জাতীয়-প্রীতিতে বিষয়ের সুখের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাকেই বলে প্রেম। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং কাম মায়া-শক্তির বৃত্তি বলিয়া কাম প্রেমে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য আছে। প্রেম সূর্য্যের মত হইলে কাম হইবে অন্ধকারের মত—একেবারে বিপরীত। প্রেম বিশুদ্ধ স্বর্ণ, আর কাম যেন লৌহ। "কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ ১।৪।১৪০॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ ১।৪।১৪৭॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রীতি এবং গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিও এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেম—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত প্রেম; ইহার সহিত মায়ার কোনও স্পর্শ বা স্পর্শাভাস পর্য্যন্ত নাই; তাই এই প্রেমের সহিত কাহারও পক্ষেই স্বসুখ-বাসনার ছায়া পর্য্যন্ত মিশ্রিত নাই। এই পারস্পরিকী প্রীতি একেবারে বিশুদ্ধ—নির্ম্মল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার জন্য; তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র এই সেবার মূলে নাই। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সহিত মিলিত হন—কেবলমাত্র গোপীদিগের সুখ-বিধানের নিমিত্ত; এই মিলনের পশ্চাতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। ইহা বিশুদ্ধ-প্রেমেরই স্বরূপগত-ধর্ম্ম, স্বরূপ-শক্তিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মায়াবদ্ধ জীবের সঙ্গে স্বরূপ-শক্তির এবং স্বরূপ-শক্তির ধর্ম্মের পরিচয় নাই; তাই বিশুদ্ধ প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মের ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আমাদের পরিচয় মায়ার সঙ্গে, তাই আমরা অনেক সময় মনে করি—ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনও প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মিলনের অনুরূপই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে পশুবৎ ভাব কিছু নাই। উজ্জ্বল-নীলমণির মুখ্যসম্ভোগ-প্রকরণের মূল শ্লোকের টীকায় এবং অন্যত্রও বহুস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"পশুবচ্ছৃঙ্গারঃ ব্যাবৃত্তঃ।"

ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিক্রীড়ার কথা, তাঁহাদের পারস্পরিক আলিঙ্গন চুম্বনাদির কথা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতেও জুগুপ্সিত কিছু নাই। রতি-শব্দের অর্থ হইল অনুরক্তি, অনুরাগ বা প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ এবং

ব্রজসুন্দরীগণ—ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ় অনুরাগ বা প্রেম বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে সমস্ত ক্রীড়ার বা ক্রিয়ার যোগে, তৎসমস্তই রতিক্রীড়া বা প্রেমের খেলা। প্রেমে যখন কামগন্ধ নাই, এ-সমস্ত প্রেমের খেলাতেও কামগন্ধ থাকিতে পারে না। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি এ-সমস্ত প্রেমের খেলার অঙ্গমাত্র—অঙ্গী নহে; অর্থাৎ আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই এ-সমস্ত প্রেমখেলার লক্ষ্য নহে; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি হইল—তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রকাশের দ্বার মাত্র। প্রাকৃত জগতেও শিশু পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী আদির আলিঙ্গন-চুম্বনাদির দ্বারে প্রীতি প্রকাশের রীতি দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যেও পারস্পরিক আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু কামময় মায়িক জগতে এ-সমস্তের লক্ষ্য হইল কামময়-সম্ভোগ। মায়াতীত ব্রজধামের প্রেমময়ী লীলায় যে কামময়-সম্ভোগের স্থান নাই তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু ব্রজলীলায় কামময় সম্ভোগ না থাকিলেও আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপ প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ তাহাতে বিদ্যমান। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥" কিন্তু বাহ্যলক্ষণে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সমতা আছে বলিয়া গোপীদের প্রেম কোনও কোনও সময়ে কাম-নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক ইহা কাম নহে। তাহা বুঝা যায়, পরম-ভাগবতগণের অনুভবের দ্বারা। তাই শাস্ত্রও বলেন—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ॥—(কামক্রীড়ার সহিত বাহ্যিক লক্ষণে সাম্য আছে বলিয়া) গোপরামাদিগের প্রেমকেই কাম-নামে অভিহিত করার প্রথা চলিত আছে; (কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ কাম নহে; এজন্য) উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন।"

উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় সখা, ঐশ্বর্য্যভাবের একান্ত-ভক্ত; বৃহস্পতির শিষ্য, মহাবিজ্ঞ, যদুরাজদের মন্ত্রী। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইলেন—ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়া সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীদিগের অপূর্ব্ব প্রেমের চরম-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া উদ্ধব মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিছুকাল ব্রজে বাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমের অপূর্ব্বত্ব আস্বাদনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গোপীভাবে লুব্ধ হইয়া মথুরায় ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে "আসামহো চরণরেণুজুষামহংস্যাম্"-ইত্যাদি বাক্যে প্রার্থনা করিলেন—যেন তিনি বৃন্দাবনে লতাগুল্ম হইয়া জন্মিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রজগোপীদিগের চরণরেণু লাভ করার সৌভাগ্য হয়তো হইতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যেষাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥ আমি এই ব্রজবালাগণের চরণ-রেণু বন্দনা করি; ইঁহাদের উদ্গীত হরিকথা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে।" যদি ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রীতিতে কামগন্ধ থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবের ন্যায় মহাবিজ্ঞ ভক্ত তাঁহাদের প্রেমেরও এত প্রশংসা করিতেন না, তাঁহাদের চরণ-রেণু প্রাপ্তির জন্য এত ব্যাকুলতাও প্রকাশ করিতেন না।

কেবল বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা জিনিস চেনা যায় না। বাহ্যিক লক্ষণে লবণ ও মিশ্রী প্রায় এক রকম; তথাপি কিন্তু লবণও মিশ্রী এক জিনিস নয়। তদ্রূপ কাম ও প্রেমে বাহ্যিক লক্ষণের সমতা থাকিলেও তাহারা একই বস্তু নয়। লবণ বা মিশ্রী যেমন চেনা যায় স্বাদের দ্বারা, তদ্রূপ প্রেমকেও চেনা যায় তার প্রভাবের দ্বারা। গোপী-প্রেমের এক প্রভাব উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন, করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—উহা কাম নহে; আর এক প্রভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন শ্রীশুকদেব-গোস্বামী॥ রাসলীলা-বর্ণনের শেষে তিনি বলিয়াছেন, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই সকল কেলিবিলাসের কথা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, অচিরেই তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয়

এবং তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়।" কামক্রীড়ার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে কাহারও কাম প্রশমিত হইতে পারে না। তাই শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই জানা যায়, ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে।

ব্রজ-গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার শ্রোতা এবং বক্তা কে, তাহা বিবেচনা করিলেও উক্ত লীলকথার স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। শ্রোতা হইতেছেন—মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে স্বীয় মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণে নিবিষ্ট। আর বক্তা হইতেছেন—ব্যাসদেবের তপস্যা-লব্ধ সন্তান আজন্ম-বিরক্ত দেবর্ষি মহর্ষি-রাজর্ষি-গণসেবিত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। ব্রজলীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহা হইলে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষিতও এই লীলার কথা শুনিতেন না এবং বিরক্ত-শিরোমণি শুকদেবও তাহা বর্ণনা করিতেন না।

আর, যিনি স্ত্রী-শব্দটী পর্য্যন্ত কখনও মুখে উচ্চারণ করিতেন না এবং কখনও শুনিতেও চাহিতেন না, যিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে॥" সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রজবধূদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস আস্বাদন করিতেন। এই লীলা যদি কামক্রীড়াই হইত, তাহা হইলে কখনও প্রভু তাহা এইভাবে আস্বাদন করিতেন না।

এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—গোপীপ্রেম ছিল কামগন্ধহীন, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, ত্রিভুবন-পাবন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কয়েকটী বিশেষত্বের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

(১) ভগবানের মাধুর্য্যের সংবাদ। সাধারণ লোক পাপীর শাস্তিদাতা-রূপেই ভগবান্‌কে জানিত ; সুতরাং ভগবৎস্মৃতিতে অধিকাংশ লোকের মনেই একটা আতঙ্কের উদয় হইত। ইহার হেতু এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রায় প্রত্যেকেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চিত্রটাই জীবের সাক্ষাতে বিশেষরূপে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের মাধুর্য্যের দিক্‌টা—তাঁহার রস-স্বরূপত্বের দিক্‌টা মনোমোহন-জাজ্জ্বল্যমানরূপে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের অধিপতিই বটেন ; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাঁহার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত ; এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি কণিকা, প্রতি অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত ; তাই তাহাতে সঙ্কোচ নাই, ত্রাস নাই, জ্বালা নাই—আছে সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতি। পাপীর শাস্তিদাতারূপে ভগবানকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই ; তাঁহার পক্ষে পাপের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনও হয় না ; কারণ, তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার নামের স্মৃতির কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেই পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করে। তাঁহার স্মৃতিতে জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়; জীব শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে এই অভয়বাণী প্রচারিত হইতেই জীবের চিত্ত হইতে যেন একটা গুরুভার প্রস্তর দূরে অপসারিত হইল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত হইল।

পরম-করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—"ভগবানের মাধুর্য্যের তুলনা নাই, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমন একটা আকর্ষণ যে, অন্যের কথা তো দূরে, স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবানের চিত্তেও দুর্দ্দমনীয়া লালসা জন্মে।" আরও জানাইলেন—"ভগবানের কৃপায় জীবও তাঁহার সেবা করিয়া এই পরম-লোভনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারে।" শুনিয়া জীবের চিত্তে লোভের সঞ্চার হইল, সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা জীব উপলব্ধি করিতে পারিল।

(২) অপূর্ব্ব কারুণিকত্বের সংবাদ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—"শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ।" ভগবানের করুণার কথা সকল দেশের সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার করুণার চরম-বিকাশের সীমার কথা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কেহই জানান নাই—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"—মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধার করা ভগবানের স্বভাব, তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত জীবের যত না উৎকণ্ঠা, নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত ভগবানের তদপেক্ষা অনেক বেশী উৎকণ্ঠা ; যেহেতু, জীব-নিস্তারই তাঁহার স্বভাব—এতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার বিকাশ। কলিহত জীবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভরসার কথা আর কি আছে ? শ্রীমন্ মহাপ্রভুই জগতে এই ভরসার বাণী সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিলেন।

বাস্তবিক, জীব-নিস্তারের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ; মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিও স্বতঃ স্ফূরিত হইতে পারে না ; তাই পরমকরুণ ভগবান্ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সময় সময় তিনি জীবকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার একদিনে তিনি স্বয়ং একবার সপরিকরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া পরম-লোভনীয় সেবা-সুখকে জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করেন, ভজনের উপদেশ দেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিরা জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী করুণার কথা শুনিয়া এবং চক্ষুর সাক্ষাতে ভজনের চিত্তাকর্ষক আদর্শ দেখিয়া জীবের চিত্তে ভরসার উদয় হইল, লোভনীয় বস্তুটী লাভ করার নিমিত্ত জীব পরমোৎসাহে যত্নবান্ হইল।

(৩) উদারতা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অন্যান্য সাধন-পন্থার অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্ফলতা কীর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা বলেন, সকল সাধন-পন্থারই সফলতা আছে ; তবে এই সফলতা এক রকম নহে। জ্ঞান-যোগাদিদ্বারাও ভগবদনুভব লাভ হইতে পারে ; তবে সম্যক্ অনুভব লাভ করিতে হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক ; কারণ, পরম-স্বতন্ত্র-ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত, তিনি জ্ঞান-যোগাদির বশীভূত নহেন।

বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন-উপাস্য-স্বরূপকেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা বলেন—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাস্য-স্বরূপও মিথ্যা নহেন ; তাঁহারা সকলেই সত্য ; তবে তাঁহাদের সকলের মূল—শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান।

বাস্তবিক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনই বৈষ্ণবাচার্য্যদের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করাকেই সমন্বয় বলা যায় না, যথাযথ সামঞ্জস্য-বিধানেই সমন্বয়ের পর্য্যাপ্তি ও সার্থকতা। বাগানের যেখানে যে গাছটী শোভা পায়, সেখানে সে গাছটী রক্ষা করিলেই বাগানের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা বৃদ্ধি পায়।

এই গেল অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতার কথা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধন-সম্বন্ধীয় উদারতাও অতুলনীয়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥—চৈ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ॥" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ; আবার হরি-ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণও শ্বপচাধম। বৈষ্ণব-মতে, ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। যবন হরিদাস-ঠাকুর ভক্তি-প্রভাবে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন ; স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরের শব-দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, নিজে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার বিরহোৎসব করিয়াছিলেন। কত যবন, কত কোল-ভীল-আদি পার্ব্বত্য-জাতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সকলেরই যে কেবল ভজনের অধিকার আছে, তাহা নহে ; পরন্তু ভজন করাইবার অধিকারও আছে। অন্য কোনও ধর্ম্মেই ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্যত্বের কথা প্রায় শুনা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যোগ্য হইলে যে কোনও জাতির লোকই আচার্য্য হইতে পারেন। স্বয়ং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ॥"
ইহা কেবল কথার কথা নহে, এই বাক্যের অনুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যবন-হরিদাস দ্বারা নামপ্রচার করাইয়াছেন ; শূদ্র রামানন্দরায়-দ্বারা শাস্ত্র প্রচার করাইয়াছেন, ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছেন ; গৃহী-রামানন্দের নিকটে সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু নিজেও শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তমদাস ছিলেন কায়স্থ, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। শ্যামানন্দ ঠাকুর সদ্‌গোপ, তাঁহারও অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

(৪) ভজনাঙ্গের উপাদেয়তা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন, তাহারও একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞান-যোগাদি-সাধনে সকলের অধিকার নাই ; যাহাদের অধিকার আছে, তাহাদের পক্ষেও এ সকল প্রায়ই কষ্টসাধ্য। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এমনি একটা ভজনের উপদেশ দিলেন—যাহা দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে অবলম্বনীয় ; যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারে। এমন সার্ব্বজনীন, সনাতন ও সার্ব্বত্রিক ধর্ম্ম ইতঃপূর্ব্বে আর জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই।

এই সাধনের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে ; এই সাধনে সময়-বিশেষে সামান্য একটু আয়াস স্বীকার করিতে হইলেও, ঐ আয়াসের মধ্যেই একটা অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পাওয়া যায় ; তাহাতেই সাধক সাধনে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন।

সাধারণ লোকের পক্ষে ত্যাগই বিশেষ কষ্টসাধ্য। ভক্তিমার্গে আয়াস-পূর্ব্বক ত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয় নহে ; নারিকেল-গাছ স্বাভাবিক-গতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে আপনা-আপনিই যেমন তাহার ডগাগুলি খসিয়া পড়ে, তাহাতে যেমন গাছের কোনও অনিষ্ট বা কষ্টই হয় না—তদ্রূপ, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কৃষ্ণ-প্রীতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনিই বিষয়-বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে ; আপনা-আপনিই ত্যাগ আসিয়া উপস্থিত হইবে ; তজ্জন্য কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, জোর করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্টকময় ত্যাগের আলিঙ্গন-কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।
সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহা আবার নিতান্ত সহজ-সাধ্যও। কারণ, শ্রীনাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে কোনওরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ে যে কোনও লোক শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিতে পারে। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥—চৈ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ॥"

গুণ-লীলানুসারে শ্রীভগবানের অনন্ত নাম ; সকল নামে হয়তো সকলের রুচি হয় না ; সকল নাম হয়তো সকলের বাসনা-সিদ্ধির অনুকূল বলিয়াও বিবেচিত হয় না। তাই বিভিন্ন লোক শ্রীভগবানের বিভিন্ন নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; কাহারও কীর্ত্তনই নিষ্ফল হয় না ; কারণ, পরম-করুণ শ্রীভগবান্ সকল নামেই স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। "অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ * * সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ॥" সুতরাং যে কোনও লোকই যে কোনও ভাবে নাম-কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রীভগবানের অনেক নাম থাকিলেও এবং প্রত্যেক নামেরই অচিন্ত্য-শক্তি থাকিলেও সকল নাম-কীর্ত্তনের ফল সমান নহে। ভক্তি-শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমাই সর্ব্বাধিক ; কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়, আনুষঙ্গিক-ভাবে সংসার ক্ষয় হয়। (নামমাহাত্ম্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

নামাপরাধ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে ; কারণ, অপরাধ জন্মিলে বহুবার নাম কীর্ত্তন করিলেও প্রেমোদয় হয় না। চিত্ত যদি নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই প্রেমোদয় হইতে

পারে। বহুবার নাম-কীর্ত্তন করিলেও যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, নয়নে অশ্রু প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, চিত্তে অপরাধ আছে। তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে নাম-কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—"যেরূপে করিলে নাম প্রেম উপজায়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০ পঃ॥"

অষ্টকালীয়-লীলাস্মরণ-পদ্ধতি বৈষ্ণবাচার্য্যদের একটা অপূর্ব্ব দান। ভজনের এমন সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা অন্য কোনও সম্প্রদায়ে আছে বলিয়া জানি না।

সকল সম্প্রদায়েই উপাস্যের স্মৃতি বিহিত এবং অষ্টপ্রহরই ঐ স্মৃতির ব্যবস্থা ; এ বিষয়ে অপরের সঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যদের পার্থক্য কিছু নাই ; পার্থক্য কেবল স্মরণীয় বস্তুর স্বাভাবিক-চিত্তাকর্ষকতা-বিষয়ে। জ্ঞান-মার্গের উপাসক সর্ব্বদা ব্রহ্ম-চিন্তা করেন ; যোগমার্গের উপাসক সর্ব্বদা পরমাত্মার চিন্তা করেন ; কিন্তু ব্রহ্মের কোনও চিত্তাকর্ষক রূপ নাই ; পরমাত্মার রূপ আছে, তাহা চিত্তাকর্ষকও বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও লীলা নাই ; সুতরাং এতাদৃশ চিন্তনীয় বিষয়ে কোনও বৈচিত্রীর অবকাশ নাই ; অবশ্য যাঁহারা সাধনে উন্নত, যাঁহারা ভজনীয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বা পরমাত্মার চিন্তাতেও তাঁহারা আনন্দানুভব করিতে পারেন এবং ঐ আনন্দ-প্রভাবেই তাঁহাদের মনের নিবিষ্টতা রক্ষিত হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণ লোকের মন সর্ব্বদা বৈচিত্রীরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে ; বৈচিত্রীহীন বিষয়ে সাধারণ লোক মনকে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট রাখিতে পারে না। তাই জ্ঞান-যোগমার্গের উপাস্য-স্মরণ লোকের তত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যদের অষ্ট-কালীয়-লীলাস্মরণ-পদ্ধতি সর্ব্বসাধারণেরই চিত্তাকর্ষক। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলাই মাধুর্য্যে সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক—সকল ভগবৎ-স্বরূপের এবং লক্ষ্মীগণেরও চিত্তাকর্ষক। তাতে আবার অষ্টকালীয়-লীলা নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ ; এ সমস্ত বৈচিত্রী আবার জীব-চিত্তের অনুকূল। কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নর-লীল ; এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ-চিত্ত স্বচ্ছল-অবস্থাপন্ন লোক যাহা করিয়া থাকে, নর-লীল শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিনী লীলাও সাধারণতঃ তদনুরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুস্মরণ জীব চিত্তের অনুকূল। আবার এই লীলা নানাবিধ চিত্তাকর্ষক-বৈচিত্রীপূর্ণ বলিয়া বৈচিত্রী-পিপাসু জীবচিত্ত সহজেই তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। এখানে জীব যেমন যথাবস্থিত-দেহে ঘর-সংসারের কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে, লীলা-স্মরণেও প্রায় তদ্রূপ ঘর-সংসারের কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয় ; তবে পার্থক্য এই যে, এখানকার ঘর-সংসার মায়ার, সেখানকার ঘর-সংসার শ্রীকৃষ্ণের ; এখানকার ঘর-সংসারের কাজে অবসাদ আছে, নিরানন্দ আছে,—শ্রীকৃষ্ণসংসারের কাজে—শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়-অবসাদ নাই, নিরানন্দ নাই, আছে পূর্ণ আগ্রহ, বলবতী-সেবা-লালসা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উল্লাস। ইহাই লীলা-স্মরণ-পদ্ধতির পরমোপাদেয়তা ও সর্ব্বজনানুসরণ-যোগ্যতা।

(৫) ভগবানের সহিত নিকটতম-সম্বন্ধের সংবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভজন-পন্থায় যে স্বরূপের সেবা পাওয়া যায়, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্য্যের পরম-আকর্ষণ ; গৌরব-বুদ্ধিতে দূরে সরিয়া যাইতে হয় না, নিতান্ত আপনজন-বোধে সর্ব্বদা তাঁহার অত্যন্ত নিকটে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তিনিও আগ্রহের সহিত সখারূপে, পুত্ররূপে পতিরূপে তাঁহার ভক্তের প্রতি অজস্র প্রীতি-বর্ষণ করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার আচরণদ্বারা তাঁহার ভক্তকে জানাইয়া দেন—তাঁহার মতন পরম-আত্মীয়, তাঁহার মতন নিতান্ত আপন-জন জীবের আর কেহ নাই।

ভগবান্ সম্বন্ধে জীবের মদীয়তাময় ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব আবিষ্কার। "আমি ভগবানের"—এইরূপ তদীয়তাময় ভাব অপেক্ষা, "ভগবান্ আমার"—এইরূপ মদীয়তাময় ভাবই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ ; ভক্তের নিকটে ভগবান্ কিরূপ আপন-জন, এই মদীয়তাময়-ভাবেই তাহা ব্যক্ত হইতেছে।

(৬) মাতৃভাষায় শাস্ত্র-প্রচার। যে ভাষায় লোক স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ করে, যে ভাষায় লোক হাসে, কাঁদে, গান করে—সেই প্রাণ-স্পর্শিনী মাতৃভাষাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজন সম্বন্ধীয়

অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের গ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হইলেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত। যাঁহারা তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে বিশেষ বিচারের অনুসন্ধান করেন, শ্রীরূপ-সনাতনাদির গ্রন্থালোচনা তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে পারে ; কিন্তু ভজনার্থীর পক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই যথেষ্ট ; ইহাতেই অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্য অন্তরঙ্গ-সেবানুসন্ধিৎসু বৈষ্ণবের প্রতি মহাজনগণের এক অপূর্ব্ব দান। বাস্তবিক, ভজনের নিমিত্ত যাহা কিছু দরকার, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তৎ-সমস্তই বাঙ্গালা-গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। অর্চ্চনাঙ্গ ও দীক্ষামন্ত্রজপ ব্যতীত অপর কোনও ভজনাঙ্গেই সংস্কৃতের বড় সম্বন্ধ নাই ; বাঙ্গালা-ভাষাতেই সমস্ত নির্ব্বাহিত হইতে পারে ; সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করার ব্যর্থ প্রয়াসে সাধারণ লোককে হতাশ হইতে হয় না। ইহাই বোধ হয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিস্তৃতির একটা মুখ্য কারণ।

পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নানাবিধ পরমলোভনীয় বস্তুর সংবাদ জীবকে জানাইয়া গেলেন ; তাহা পাইবার সহজ এবং চিত্তাকর্ষক উপায়ও বলিয়া দিলেন।

জ্যোতিষের গণনা

প্রবন্ধে উল্লিখিত জ্যোতিষের গণনাগুলি এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমাদের পঞ্জিকার মতে এক বৎসরে ৩৬৫'২৫৮৭ দিন। এক চান্দ্র মাসে গড়পড়তা ২৯'৫৩০৫ দিন।

সূর্য্যকে গতিহীন মনে করিয়া সূর্য্য হইতে ১২° ডিগ্রি দূরে যাইতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক তিথি ; সূর্য্যেরও গতি আছে, দিনে প্রায় এক ডিগ্রি—চন্দ্র যে দিকে যায়, সেই দিকে। বিভিন্ন রাশি অতিক্রম করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল (সংখ্যাগুলি দিনবাচক) :—

মেষ ...২'৪৪২৫৯৭	তুলা...২'১২৭৫৪১
বৃষ......২'৪৯০৩৭০	বৃশ্চিক...২'০৯৭৫৬৪
মিথুন...২'৪৬৮৩১৪	ধনু......২'১১১৪০৭
কর্কট...২'৩৮৯১৪৩	মকর ...২'১৬২৭১৭
সিংহ...২'২৮২৩৯৮	কুম্ভ ...২'২৪৪১৫৭
কন্যা...২'১৯১০০৯	মীন ...২'৩৪৫৬৯৮
১৪'২৬৩৮৩১	১৩'০৮৮৭৮৪

সমষ্টি = ২৭'৩৫২৬১৫......

বিভিন্ন মাসের পরিমাণও দিনবাচক সংখ্যায় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৈশাখ...৩০ ৯৪৬৩৯	কার্ত্তিক ...২৯,৮৮১৯৪
জ্যৈষ্ঠ ...৩১'৪২৬৬৭	অগ্রহায়ণ...২৯'৪৮৪১৭
আষাঢ় ...৩১'৬৪১৯৪	পৌষ ......২৯'৩ ০২৮
শ্রাবণ ...৩১'৪৬৫৮৩	মাঘ ......২৯'৪৫৬৯৪
ভাদ্র ...৩১'০০৫২৮	ফাল্গুন......২৯'৮৩৪৭২
আশ্বিন...৩০'৪২৭২২	চৈত্র ......৩০'৩৬৭৫০
১৮৬'৯১৩৩৩	১৭৮'৩৪৫৫৫

সমষ্টি = ৩৬৫'২৫৮৮৮ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইয়াছে বৃহস্পতিবার বেলা দং ১২। ৪৮ পলের সময় ; সেই দিনের অবশিষ্ট রহিয়াছে দং ৪৭। ১২ পল ; অর্থাৎ মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় ৪৭।১২ পল বা '৭৮৬৭ দিন।

১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখ দং ৪৪। ৩১। ২০ বিপল পর্য্যন্ত অমাবস্যা ; সুতরাং ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ১০'৭৪২০৩ দিন পরে অমাবস্যা শেষ।

উল্লিখিত বিষয়গুলিই পরবর্ত্তী গণনার ভিত্তি।

(ক) ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী কোন্‌ বারে হইয়াছিল।

১৫০৩ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষসংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ৩৫২ বৎসর
= ৩৬৫·২৫৮৭ × ৩৫২ দিন
= ১২৮৫৭১·০৬২৪ দিন

যোগ, ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় = ০·৭৮৬৭ দিন.

১৫০৩ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় } = ১২৮৫৭১·৮৪৯১ দিন

সংক্রমণ-দিনের শেষ ·৮৪৯১ অংশ উক্ত দিনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ; উহা বাদ দিলে, ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় = ১২৮৫৭১ দিন।

বার নির্ণয় :—

১২৮৫৭১ ÷ ৭ = ১৮৩৬৭, অব ২

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্ববর্ত্তী দিন (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার) হয় দ্বিতীয় দিন ;

সুতরাং ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ হইল বুধবার।

এক্ষণে মেষ-ভোগ (বৈশাখ মাস) = ৩০·৯৪৬৪ দিন

১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে সংক্রমণ-দিনে মেষ-ভোগ গত = ·৮৪৯১ ,,

∴ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া মেষ-ভোগ বাকী = ৩০·০৯৭৩ দিন

সংক্রমণ-দিন-পূরণে = ·৯০২৭ ,,

∴ সৌর বৈশাখ মাস = ৩১·০০০০ দিন

সুতরাং বৃষ-সংক্রমণ (জ্যৈষ্ঠে-সংক্রমণ) হইয়াছে ১লা বৈশাখ হইতে একত্রিংশ দিনে ; কাজেই বৈশাখ-মাস ৩১ দিনে। ১লা বৈশাখ বুধবার হওয়াতে **১৫০৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠ হইবে শনিবারে।**

তিথি নির্ণয় :—

১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় ... ... ১২৮৫৭১·০০০০০

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় ... ১০·৭৪২০৩

∴ ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত ... ... ১২৮৫৮১·৭৪২০৩ দিন

১২৮৫৮১·৭৪২০৩ ÷ ২৯·৫৩০৫ = ৪৩৫৪, অব ৫·৯৪৫০৩ ;

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ৫·৯৪৫০৩ দিন পরে একটা অমাবস্যা শেষ হইয়াছে।

∴ ১৫০৩ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে যতদিন পরে বৈশাখের অমাবস্যা শেষ (এই অমাবস্যায় চন্দ্র ছিল মেষের প্রায় ৬°তে), তাহার পরিমাণ ... ... ৫·৯৪৫০৩ দিন

তৎপরবর্ত্তী চান্দ্র মাস (জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় ; এই চান্দ্র মাসে চন্দ্রকে মেষের ৬° হইতে আরম্ভ করিয়া একবার আবর্ত্তন শেষ করিয়া বৃষের প্রায় ৬° পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছে ; তাহাতে যে সময় লাগিয়াছে, তাহা) ... ... ২৯·৮০৪৮২ দিন

তৎপরবর্ত্তী পুর্ণিমা পর্য্যন্ত (জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষ ; এই শুক্লপক্ষ চন্দ্রকে বৃষের ৬° হইতে বৃশ্চিকের ২১° ডিগ্রি পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছে ; তজ্জন্য সময়) ... ... ১৪'২১৯০০ দিন

পুর্ণিমার পরবর্ত্তী পাঁচ তিথিতে (জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্য্যন্ত ; চন্দ্রকে বৃশ্চিকের ২১° হইতে মকরের ২৬° পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছে ; তজ্জন্য সময়) ... ... ৪'৬১৫০৩ দিন

১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীর শেষ পর্য্যন্ত সময়, পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটী অঙ্কের সমষ্টি } = ... ৫৫'২৮৩৮৮ দিন

বাদ, বৈশাখের সৌর মাস-পরিমাণ ৩১'০০০০০ দিন

১লা জ্যৈষ্ঠ সূর্য্যোদয় হইতে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীর শেষ পর্য্যন্ত সময় } = ... ২৪'২৮৩৮৮ দিন

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫শে তারিখ '২৮৩৮৮ দিন বা প্রায় ১৭ দণ্ড পর্য্যন্ত কৃষ্ণাপঞ্চমী ছিল ; ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার হওয়ায় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ছিল মঙ্গলবার।

∴ ১৫০৩ শকের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ **মঙ্গলবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী** ছিল। সৌর জ্যৈষ্ঠ। চান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীও ঐ তারিখেই।

(খ) ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী কি বারে হইয়াছিল ?

১৫৩৭ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ... ৩১৮ বৎসর

=৩৬৫'২৫৮৭×৩১৮ দিন

=১১৬১৫২ '২৬৬৬ দিন

যোগ, ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় ... ০'৭৮৬৭ দিন

∴ ১৫৩৭ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় ... } = ... ১১৬১৫৩'০৫৩৩ দিন

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫৩৭ শকের মেষ-সংক্রমণ-দিনের শেষ '০৫৩৩ অংশ মাত্র উক্ত দিনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং সংক্রমণ হইয়াছে মধ্যরাত্রির পরে ; তাই প্রচলিত রীতি অনুসারে, সংক্রান্তি হইবে সংক্রমণের পরের দিন— সংক্রমণ-সময়ের ১'০৫৩৩ দিন পরে ১লা বৈশাখ।

∴ ১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় ... ... =১১৬১৫৩'০৫৩৩ – ১'০৫৩৩

=১১৬১৫২ দিন

বার নির্ণয় :—

১১৬১৫২কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ১ ;

∴ ১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনও (অর্থাৎ বৃহস্পতিবারও) হইবে সপ্তাহের প্রথম দিন,

∴ ১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখ ছিল বৃহস্পতিবার।

এক্ষণে, মেষভোগ (বৈশাখ মাস) ... ... =৩০'৯৪৬৪ দিন

১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে মেষ-ভোগ গত, বাদ ... ... ১'০৫৩৩ দিন

∴ ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় হইতে মেষভোগ-সময় =২৯'৮৯৩১ দিন

অর্থাৎ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ২৯'৮৯৩১ দিন পরে বৃষ-সংক্রমণ; এস্থলেও সংক্রমণ মধ্যরাত্রির পরে হওয়ায় পরের দিন হইবে সংক্রান্তি: অর্থাৎ সংক্রমণের ১+(১—'৮৯৩১) বা ১'১০৬৯ দিন পরে হইবে ১লা জ্যৈষ্ঠের সূর্য্যোদয়।

∴ ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯'৮৯৩১+১'১০৬৯ বা ৩১ দিন পরে ১লা জ্যৈষ্ঠের সূর্য্যোদয়।

সুতরাং বৈশাখ মাস ৩১ দিনে। ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইয়াছে বলিয়া **১লা জ্যৈষ্ঠ হইবে রবিবার।**

তিথি নির্ণয়ঃ

১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১১৬১৫২'০০০০০ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময় ... ... =১০'৭৪২০৩ দিন

∴ ১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখ অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময় } ... =১১৬১৬২'৭৪২০৩ দিন

১১৬১৬২'৭৪২০৩÷২৯'৫৩০৫=৩৯৩৩, অব ১৯'২৮৫৫৩

∴ ১৫৩৭ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৯'২৮৫৫৩ দিন পরে একটী অমাবস্যা শেষ।

∴ ১৫৩৭ শকের সূর্য্যোদয় হইতে বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় (এই অমাবস্যায় চন্দ্রের স্থিতি মেষের প্রায় ২০° তে) ... ... ১৯'২৮৫৫৩ দিন

তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের সময় পূর্ণিমা পর্য্যন্ত (চন্দ্র মেষের ২০° হইতে বৃশ্চিকের প্রায় ৫° তে গেলে পূর্ণিমা হইবে; তজ্জন্য সময়) .. .. ১৫'০৮৩৩৩ দিন

তৎপরবর্ত্তী চারি তিথিতে (কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত; চন্দ্রকে বৃশ্চিকের ৫° হইতে ধনুর প্রায় ২৭° পর্য্যন্ত যাইতে হইবে; তজ্জন্য সময়) ... ... ৩'৬৪৮২৪ দিন

∴ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্থীর শেষ পর্য্যন্ত সময় } ... ... =৩৮'০১৭১০ দিন

বাদ, বৈশাখের ৩১ দিন ... ... ৩১'০০০০০ দিন

∴ ১লা জ্যৈষ্ঠ সূর্য্যোদয় হইতে কৃষ্ণাচতুর্থীর শেষ পর্য্যন্ত সময় } ... ... =৭'০১৭১০ দিন

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ৮ তারিখে '০১৭১০ দিন, প্রায় একদণ্ড পর্য্যন্ত চতুর্থী ছিল। তারপর সমস্ত দিনই কৃষ্ণাপঞ্চমী। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার থাকায় ৮ই জ্যৈষ্ঠও রবিবার।

∴ ১৫৩৭ শকের ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী ছিল।

সৌর জ্যৈষ্ঠ। চান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমী হইবে সৌর আষাঢ়ের ২রা শুক্রবার শেষ রাত্রি হইতে ৩রা শনিবার দিন।

(গ) ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল কিনা।

১৫১৪ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ সময়=৩৪১ বৎসর

=৩৬৫'২৫৮৭×৩৪১ দিন

=১২৪৫৫৩'২১৬৭ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়
পর্য্যন্ত সময়, যোগ(পূর্ব্বপৃষ্ঠার শেষ অঙ্কের সহিত) ... = ·৭৮৬৭ দিন

∴ ১৫১৪ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় = ১২৪৫৫৪·০০৩৪ দিন

ইহা হইতে বুঝা যায়, সংক্রমণদিনের শেষ ·০০৩৪ অংশ মাত্র বাকী থাকিতে, অর্থাৎ মধ্য রাত্রির পরে সংক্রমণ হইয়াছে ; তাই সংক্রমণের ১·০০৩৪ দিন পরে ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইবে।

∴ ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়
= ১২৪৫৫৪·০০৩৪—১·০০৩৪
= ১২৪৫৫৩ দিন

বার নির্ণয় ঃ

১২৪৫৫৩ কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ২ ; সুতরাং ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্ববর্ত্তী (বৃহস্পতিবার) দিন হইবে সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। সুতরাং **১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ ছিল বুধবার।**

তিথি নির্ণয়ঃ

১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ
সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় ... . = ১২৪৫৫৩·০০০০০ দিন
১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যার
শেষ পর্য্যন্ত সময় ... ... = ১০·৭৪২০৩ দিন

∴ ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখের অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময় ... = ১২৪৫৬৩·৭৪২০৩ দিন

১২৪৫৬৩·৭৪২০৩ ÷ ২৯·৫৩০৫ = ৪২১৮, অব ৪·০৯৩০৩

অর্থাৎ ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ৪·০৯৩০৩ দিন গতে একটী অমাবস্যা শেষ হইয়াছে।

∴ ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় (এই অমাবস্যা সময়ে চন্দ্র ছিল মেষের প্রায় ৫° তে) = ৪·০৯৩০৩ দিন

তৎপরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় (চন্দ্রের পক্ষে মেষের ৫° হইতে তুলার ২০° পর্য্যন্ত যাওয়ার সময়) ... ... = ১৫·২৭৫০৯ দিন

∴ ১৫১৪ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় ... ... = ১৯·৩৬৮১২ দিন

অর্থাৎ ২০শে বৈশাখ প্রায় ২১ দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল।

∴ **১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবার পূর্ণিমা ছিল** প্রায় ২১ দণ্ড ; ২১শে মঙ্গলবার প্রতিপদ প্রায় ১৬ দণ্ড এবং ২২শে বুধবার দ্বিতীয়া ছিল প্রায় ১১ দণ্ড পর্য্যন্ত।

(ঘ) ১৪৯৫ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল কিনা।

১৪৯৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময়

=৩৬০ বৎসর

=৩৬৫·২৫৮৭×৩৬০ দিন

=১৩১৪৯৩·১৩২০ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় = ·৭৮৬৭ ”

১৪৯৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় } =১৩১৪৯৩·৯১৮৭ দিন

∴ ১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১৩১৪৯৩ দিন

বার নির্ণয়ঃ

১৩১৪৯৩কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫; সুতরাং ১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখে পূর্ব্বের (বৃহস্পতিবার) দিন হয় সপ্তাহের ৫ম দিন।

∴ ১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ হইল রবিবার।

তিথি নির্ণয়ঃ

১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১৩১৪৯৩ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় } = ১০·৭৪২০৩ দিন

∴ ১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় } =১৩১৫০৩·৭৪২০৩ দিন

১৩১৫০৩·৭৪২০৩÷২৯·৫৩০৫=৪৪৫৩,

অব ৪·৪২৫৫

∴ ১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ৪·৪২৫৫ দিন পরে একটা অমাবস্যা শেষ।

১৪৯৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময়

= ৪·৪২৫৫ দিন

তৎপরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় =১৫·২৭৫১ ”

(মেষের ৫° হইতে তুলার ২০° পর্য্যন্ত যাওয়ার সময়)

১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় =১৯·৭০০৬

∴ ২০শে বৈশাখ ·৭০০৬ বা প্রায় ৪২ দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা। সেই দিন শুক্রবার।

∴ ১৪৯৫ শকের ২০শে বৈশাখ শুক্রবার পূর্ণিমা।

(ঙ) ১৫৪১ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল কিনা।

১৫৪১ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় =৩১৪ বৎসর
=৩৬৫.২৫৮৭×৩১৪ দিন
=১১৪৬৯১.২৩১৮ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় = .৭৮৬৭ দিন

∴ ১৫৪১ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১১৪৬৯২.০১৮৫ দিন

সংক্রমণ-দিনের শেষ .০১৮৫ অংশমাত্র উক্ত দিনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং সংক্রমণ মধ্যরাত্রির পরে হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; তাই সংক্রান্তি হইবে সংক্রমণের পরের দিন এবং সংক্রমণ-সময় হইতে ১.০১৮৫ দিন পরে হইবে ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়।

∴ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১১৪৬৯২.০১৮৫ − ১.০১৮৫
=১১৪৬৯১ দিন।

বার নির্ণয়:

১১৪৬৯১কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৩; অর্থাৎ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বের দিন (বৃহস্পতিবার) সপ্তাহের তৃতীয় বার হইল। সুতরাং ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখ ছিল মঙ্গলবার।

তিথি নির্ণয়:

১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =১১৪৬৯১.০০০০০ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১১ই বৈশাখের অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময় = ১০.৭৪২০৩ দিন

∴ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১১ই বৈশাখের অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় =১১৪৭০১.৭৪২০৩ দিন

১১৪৭০১.৭৪২০৩÷২৯.৫৩০৫=৩৮৮৪, অবশিষ্ট ৫.২৮০০

∴ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ৫.২৮০০ দিন পরে অমাবস্যা শেষ।

∴ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় =৫.২৮০০ দিন

তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষ (মেষের প্রায় ৬° হইতে তুলার ২১° পর্য্যন্ত যাইতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহা) =১৫.২৬৪৬ দিন

∴ ১৫৪১ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী পূর্ণিমার শেষ পর্য্যন্ত সময় =২০.৫৪৪৬

অর্থাৎ ২১শে বৈশাখের প্রায় ৩৩ দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল; **২০শে বৈশাখ রবিবার প্রায় ৩৭ দণ্ডের পরে পূর্ণিমা আরম্ভ হইয়াছে।**

(চ) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইদিন কি বার এবং মাসের কয় তারিখ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

১৪০৭ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ৪৪৮ বৎসর

= ৩৬৫.২৫৮৭ × ৪৪৮ দিন

= ১৬৩৬৩৫.৮৯৭৬ দিন

১৮৫৫ শকের মেষ সংক্রমণ হইতে ১লা বৈশাখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় = ০.৭৮৬৭ দিন

১৪০৭ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় } = ১৬৩৬৩৬.৬৮৪৩ দিন

বাদ, ১৪০৭ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে কুম্ভ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ৩০৫.০৫৬৭ দিন

∴ ১৪০৭ শকের কুম্ভসংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় } = ১৬৩৩৩১.৬২৭৬ দিন

বাদ, ১৪০৭ শকের কুম্ভ-সংক্রমণ দিনের অংশ ০.৬২৭৬ "

∴ ১৪০৭ শকের ১লা ফাল্গুন সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত } = ১৬৩৩৩১.০০০০ দিন

বার নির্ণয় :—১৬৩৩৩১ কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং ১৪০৭ শকের ১লা ফাল্গুনকে সপ্তাহের প্রথম বার ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্ববর্ত্তী দিন (বৃহস্পতিবার) সপ্তাহের শেষ দিন হয়।

∴ ১৪০৭ শকের ১লা ফাল্গুন হইল শুক্রবার।

তিথি নির্ণয় :—

১৪০৭ শকের ১লা ফাল্গুন সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় = ১৬৩৩৩১.০০০০০০০ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৬ই মাঘ পূর্ণিমা (দণ্ড ৩৮।৩৩।২৫, চন্দ্রগ্রহণ) পর্য্যন্ত সময় = ২৯১.৬৪২৬১৫৭ "

∴ ১৪০৭ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১৬ই মাঘ পূর্ণিমার শেষ পর্য্যন্ত সময় } = ১৬৩৬২২.৬৪২৬১৫৭ দিন

দশমিকের সপ্তমস্থান পর্য্যন্ত এক চান্দ্রমাসের পরিমাণ

= ২৯.৫৩০৫৮৮৭ দিন।

১৬৩৬২২.৬৪২৬১৫৭ ÷ ২৯.৫৩০৫৮৮৭ = ৫৫৪০ ;

অব ২৩.১৮১২১৭৭ দিন।

∴ ১৪০৭ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে

মাঘমাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় = ২৩.১৮১২১৭৭ দিন

তাহার পরের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় = ২৯.৫৩০৫৮৮৭ "

∴ ১৪০৭ শকের ১লা মাঘ হইতে ফাল্গুনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি } =৫২·৭১১৮০৬৪ দিন

এক্ষণে, ১৪০৭ শকের
মেষ-সংক্রমণ হইতে মকর সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় } =২৭৫·৫৯৯৭ দিন
মেষ-সংক্রমণ দিনে মেষভোগ, গত = ·৬২৭৬ "

∴ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে মকর-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় } =২৭৪·৯৭২১ দিন
মকর-সংক্রমণ দিন পূরণে =০·০২৭৯ "

∴ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় } =২৭৫·০০০০ দিন
আবার, মেষ-সংক্রমণ হইতে কুম্ভ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় =৩০৫·০৫৬৭ দিন
মেষ-সংক্রমণ দিনে মেষভোগ, গত = ·৬২৭৬ "

∴ ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে কুম্ভ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় } =৩০৪·৪২৯১ দিন
কুম্ভ-সংক্রমণ দিনপূরণে = ·৫৭০৯ "

∴ ১লা বৈশাখ হইতে ১লা ফাল্গুন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় =৩০৫·০০০০ দিন
বাদ, " " মাঘ " " " =২৭৫·০০০০ "

∴ মাঘ মাসের দিনসংখ্যা =৩০ দিন
এক্ষণে, পূর্ব্বনির্দ্ধারণমতে, ১৪০৭ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে ফাল্গুনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় =৫২·৭১১৮০৬৪ দিন
বাদ, মাঘ মাসের দিন সংখ্যা =৩০·০০০০০০০ "

∴ ১৪০৭ শকের ১লা ফাল্গুন সূর্য্যোদয় হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় } =২২·৭১১৮০৬৪ দিন

∴ ২৩ শে ফাল্গুন শনিবার ·৭১ দিনাংশ বা প্রায় ৪২ দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা-ছিল। দিনমান প্রায় ২৯ দণ্ড সন্ধ্যা সময় সিংহলগ্নে প্রভুর আবির্ভাব; তখন পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল। (আদিলীলা, ১।১৩।৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(চ) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়।

১৪৩১ শকের মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন (শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময়-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সেই দিন কি বার কি তিথি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে

১৪৩১ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় =৪২৪ বৎসর
=৩৬৫·২৫৮৭ × ৪২৪ দিন
=১৫৪৮৬৯·৬৮৮৮ দিন
১৮৫৫ শকের মেষ-সংক্রমণ দিনপূরণে = ·৭৮৬৭ "

∴ ১৪৩১ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের } = ১৫৪৮৭০.৪৭৫৫ দিন
১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময় (পূর্ব্ব সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টি)

বাদ, ১৪৩১ শকের মেষ-সংক্রমণ হইতে মকর সংক্রমণ
পর্য্যন্ত সময় = ২৭৫.৫৯৯৭ দিন

১৪৩১ শকের মকর-সংক্রমণ হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ } = ১৫৪৫৯৪.৮৭৫৮ দিন
সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়

বাদ, মকর-সংক্রমণ দিনের অংশ = ০.৮৭৫৮ দিন

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ } = ১৫৪৫৯৪.০০০০ দিন
শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত

বার নির্ণয় :

১৫৪৫৯৪ কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৬ ; অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরিলে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন (বৃহস্পতিবার) হয় সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন।

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ হইল শনিবার।

তিথি নির্ণয় :

১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয়
পর্য্যন্ত সময় = ১৫৪৫৯৪.০০০০ দিন

১৮৫৫ শকের ১লা বৈশাখ সূর্য্যোদয় হইতে
১লা মাঘ অমাবস্যা (দং ৩৩।৪৮।৪৪ = .৫৬৩৫ দিন) পর্য্যন্ত সময় = ২৭৬.৫৬৩৫ দিন

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে ১৮৫৫ } = ১৫৪৮৭০.৫৬৩৫ দিন
শকের ১লা মাঘ অমাবস্যার শেষ পর্য্যন্ত সময়

১৫৪৮৭০.৫৬৩৫ ÷ ২৯.৫৩০৫ = ৫২৪৪, অব, ১২.৬২১৫ দিন।

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে মাঘের অমাবস্যার
শেষ পর্য্যন্ত সময় = ১২.৬২১৫ দিন

তৎপরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় (মকরের ১৩ হইতে } = ১৫.৪৪৬২ দিন
কর্কটের ২৮° ডিগ্রি পর্য্যন্ত চন্দ্রের যাওয়ার সময়)

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় } = ২৮.০৬৭৭ দিন
হইতে মাঘ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়

∴ **২৯শে মাঘ শনিবার প্রায়** চারি দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল।

মকর-সংক্রমণ হইতে কুম্ভ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ২৯.৪৫৬৯ দিন

১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে
মকরের ভোগ গত = ০.৮৭৫৮ দিন

∴ ১৪৩১ শকের ১লা মাঘ হইতে কুম্ভ-সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় = ২৮.৫৮১১ দিন

১৪৩১ শকের ১লা মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে মাঘী
পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় = ২৮.০৬৭৭ দিন

∴ মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে } = ০.৫১৩৪ দিন
পূর্ণিমান্তে সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময় } **প্রায় ৩০ দণ্ড। দিনমান ২৮ দণ্ডের কিছু বেশী।**

ছয়-গোস্বামী

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথভট্ট এবং শ্রীরঘুনাথদাস—এই ছয় জনই বৈষ্ণব-সমাজে "ছয়গোস্বামী" বলিয়া পরিচিত। এক সঙ্গে এই ছয় জনের নাম সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় কবিরাজ-গোস্বামীই তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখের হেতুও চরিতামৃত হইতে জানা যায়—ইঁহারা সকলেই কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ছিলেন। "শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥ ১।১।১৮-১৯॥" কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি হইতেই "ছয়-গোস্বামী" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই ছয়-গোস্বামীর নামও সাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্তবে এবং নরোত্তমদাস-ঠাকুরের প্রার্থনায়ও ছয়-গোস্বামীর নাম দৃষ্ট হয়। তাহার হেতু বোধ হয় এই। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীরূপ-সনাতন প্রকট ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নযোগে শ্রীনিবাসকে দর্শন দিয়া বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং শ্রীজীবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদি-প্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। শ্রীলনরোত্তমও কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে উপনীত হন, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত হন এবং শ্রীজীবের নিকটে গোস্বামিগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদির গ্রন্থ হইতে, শ্রীজীবের সঙ্গ এবং শিক্ষা হইতে, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর সঙ্গ এবং কৃপা হইতে তাঁহারা উভয়েই সাধন-ভজন-সম্বন্ধে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাদের উপজীব্য হইয়াছিল। ব্রজভাবের সাধন-প্রণালীতে শ্রীলরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর যে অসাধারণ দান ছিল, কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতের প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে উক্ত "শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপসেবাফলে দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গাদ্গতে। কাব্যে শ্রীরঘুনাথ-ভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে"—ইত্যাদি ভণিতা হইতেই জানা যায়। এখন পর্য্যন্ত নিত্য কীর্ত্তনীয় এবং শ্রীলনরোত্তমের নামে প্রচলিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে 'জয় রূপ-সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ এ ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥"—ইত্যাদি যে পদগুলি গীত হয়. তাহাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজন-প্রণালীতে এই ছয় গোস্বামীর অসাধারণ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ছয় গোস্বামিদ্বারা শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তমদাস-ঠাকুর ভজন-বিষয়ে এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রচার-বিষয়ে বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের স্তবে, প্রার্থনায় এবং বন্দনায় ছয় গোস্বামীর নাম দৃষ্ট হয়।

বাস্তবিক এই ছয় গোস্বামী এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পন্থায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট ভজন-প্রণালীর নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে ; ইঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই হিসাবে ইঁহারা বৈষ্ণব সাধকমাত্রেরই শিক্ষাগুরু।

অতি সংক্ষেপে এস্থলে এই ছয় গোস্বামীর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন। শ্রীসর্ব্বজ্ঞ নামে কর্ণাটের একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। চারিবেদেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; চারিবেদের অধ্যাপনাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাট দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি বিশেষ পূজা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া "জগদ্গুরু"-নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ, ইনিও বেদজ্ঞ ছিলেন। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বহু শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দুই পুত্রকে রাজত্ব ভাগ করিয়া দিয়া অনিরুদ্ধ পরলোক গমন করেন। কিছু দিন পরে অনুজ হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া সপত্নীক পৌরস্ত্য দেশে পলায়ন করেন এবং পৌরস্ত্যের রাজা শিখরেশ্বরের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সাঙ্গ যজুর্ব্বেদে, সমস্ত উপনিষদে এবং রসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শেষ বয়সে গঙ্গাবাসের উদ্দেশ্যে শিখরেশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতট-নিকটবর্ত্তী নবহট্ট (কালনার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি রাজা দনুজমর্দ্দনের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। পদ্মনাভের আঠারটী কন্যা ও পাচটী পুত্র। পাচপুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; তাঁহার পরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। কোনও কারণে তিনি নৈহাটী হইতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে থাকেন, যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীঅনুপম—এই তিন জনই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা তিন জনেই গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের অধীনে রাজকার্য্য করিতেন। তাঁহাদের গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত পদানুযায়ী নাম ছিল যথাক্রমে সাকর মল্লিক, দবীরখাস এবং অনুপম মল্লিক।

নীলাচল হইতে মহাপ্রভু যখন একবার বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, তখন রামকেলিতে শ্রীশ্রীরূপ সনাতন তাঁহার চরণ দর্শন করেন। তাহার পরেই তাঁহারা বিষয় ত্যাগের উপায় চিন্তা করেন। শ্রীরূপ অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের সহিত পৈত্রিক বাড়ী বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। শ্রীসনাতন রাজকার্য্যে না গিয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া গৃহে অবস্থান করিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। হুসেনশাহ তাঁহার গৃহে আসিয়া রাজকার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, তিনি সম্মত না হওয়ায়, তিনি তাঁহার গৃহে বন্দী হয়েন। তখন উড়িষ্যারাজের সঙ্গে হুসেন শাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পুর্ব্বেও গৌড়েশ্বর আর একবার সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সনাতনকে অনুরোধ করিলেন। সনাতন সম্মত না হওয়ায় গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে চলিয়া যায়েন।

এদিকে শ্রীরূপ দেশে আসিয়া, নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলনের জন্য অনুপমকে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং এক চিঠি লিখিয়া সনাতনকে তাহা জানাইয়া অনুরোধ করিলেন—তিনিও যেন কোনও কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন। সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইহার পুর্ব্বেই প্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রয়াগে তাঁহার সহিত শ্রীরূপের মিলন হইল। দশ দিন পর্য্যন্ত শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়া, ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার

করিয়া তাঁহাকে প্রভু বৃন্দাবন পাঠাইলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু যখন কাশীতে আসিয়া ছিলেন, তখন সেখানে সনাতনের সহিত তাঁহার মিলন হয়। সনাতনকেও দুই মাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া গ্রন্থ প্রচারের এবং বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রভু তাঁহাকেও বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। ইহার পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া কয়েক মাস প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে ছিলেন : প্রভু পুনরায় তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। ইহার পরে শ্রীসনাতনও একবার নীলাচলে আসিয়া কয়েক মাস প্রভুর চরণ সন্নিধানে অবস্থান করেন; পরে প্রভু তাঁহাকেও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীরূপ সনাতন আর কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। প্রভুর উপদেশ অনুসারে তাঁহারা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের পুত্র হইতেছেন শ্রীজীব। রামকেলি হইতে শ্রীরূপ যখন অনুপমকে নিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসেন, তখন শ্রীজীব এবং তাঁহার মাতাও সেই সঙ্গে আসেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ যখন নীলাচলে আসিতে ছিলেন, তখন অনুপমও সঙ্গে ছিলেন। বাংলায় আসিলে অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হয়। ইহারও কয়েক বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে একদিন রাত্রিতে শ্রীজীব স্বপ্নযোগে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে এবং পরে সেই কৃষ্ণবলরামকেই গৌর নিত্যানন্দরূপে দর্শন করিয়া অধীর হইয়া পড়েন। পরে তিনি অধ্যয়নের ছল করিয়া নবদ্বীপে আসেন এবং সেস্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন গমনের পথে কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। শ্রীপাদ জীব বৃন্দাবনে স্বীয় পিতৃব্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের চরণ আশ্রয় করেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভক্তি-শাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র ছিলেন। শ্রীজীব বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ষট্‌সন্দর্ভ নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন শ্রীজীবের এক অমর কীর্ত্তি।

শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেঙ্কটভট্টের পুত্র। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট-ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন গোপালভট্ট প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরের মতে, পিতামাতার আদেশেই তাঁহাদের অপ্রকটের পরে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের, সহিত মিলিত হয়েন। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীশ্রীরাধারমণ পূর্ব্বে ছিলেন শালগ্রাম। এক সময়ে কোনও ধনী ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি দেবমন্দিরেই শ্রীবিগ্রহের জন্য বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধারমণকেও দিয়া ছিলেন; কিন্তু গোপালভট্ট গোস্বামী ভাবিলেন—"এত সব বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা শালগ্রামকে কিরূপে সাজাইবেন? যদি শালগ্রাম না হইয়া অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় করচরণাদিবিশিষ্ট বিগ্রহ হইতেন, তাহা হইলে মনের মত সাজাইতে পারিতেন।" শালগ্রামের শয়ন দিয়া তিনিও অন্যান্য দিনের ন্যায় শয়ন করিতে গেলেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া যখন শালগ্রামকে জাগাইলেন, দেখেন—শালগ্রামের স্থলে কর-চরণবিশিষ্ট অপূর্ব্বসুন্দর এক শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রাম এমন ভাবে বিরাজিত যে, দেখিলেই বুঝা যায় শালগ্রাম হইতেই শ্রীবিগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে, শ্রীশ্রীরাধারমণের গোস্বামিগণ এই শ্রীবিগ্রহেরই সেবা করেন এবং এই শ্রীবিগ্রহের পশ্চাদ্‌ভাগে শালগ্রাম এখনও বিরাজিত।

শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সঙ্কলিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহার টীকা লিখিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—গোপালভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণবদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তত্ত্বাদি কোনও স্থলে যথাক্রমে, কোনও স্থলে বা ক্রমভঙ্গ ভাবে, আবার কোনও স্থলে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত ছিল। শ্রীজীব তৎসমস্তেরই পর্য্যালোচনা করিয়া যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভ (ষটসন্দর্ভ) লিখিয়াছেন। গোপালভট্ট অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

শ্রীলরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী। ইঁহার পিতা—তপন মিশ্র, মহাপ্রভুর আদেশে যিনি কাশীতে বাস করিতেন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন 'তপন মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা করিতেন; তখন রঘুনাথ ভট্টের পক্ষে প্রভুর সেবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রভুর চরণসান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; কয়েক মাস পরে প্রভু কিন্তু তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইলেন এবং বলিলেন—"পিতামাতার সেবা করিবে, বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িবে, বিবাহ করিবেনা।" পিতামাতার অপ্রকটের পরে তিনি আবার নীলাচলে আসেন। তখন প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠান এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ দেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর সভায় শ্রীভাগবত পাঠ করিতেন।

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী। সপ্তগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা গোবর্দ্ধন দাস; জ্যেঠা—হিরণ্য-দাস। এই দুই ভাই ছিলেন সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিপতি, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। হিরণ্যদাস নিঃসন্তান; গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র সন্তান এই রঘুনাথ দাস—সুতরাং বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিষয়ে অনাসক্ত। বাল্যকালেই তিনি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন; তাহার ফলেই তাঁহার বিষয়ে অনাসক্তি। তাঁহার মনকে বিষয়ের দিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই পিতামাতা একটী পরমাসুন্দরী কিশোরীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। মহাপ্রভুর নিকটে যাওয়ার জন্য তিনি বারবার পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করেন; কিন্তু বারবারই ধরা পড়েন। পরে পিতা-জ্যেঠা তাঁহাকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু দুইবার শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন; দুইবারই রঘুনাথ পিতা-জ্যেঠার অনুমতি লইয়া শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥" আরও বলিয়াছিলেন—"আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন কোনও ছলে পলাইয়া তুমি আমার নিকটে যাইও। পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তখন তোমাকে সেই সুযোগ দিবেন।" গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ প্রভুর উপদেশের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকটে যাওয়ার জন্য রঘুনাথ আবার উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু সুযোগ মিলেনা। তাহার পরে নিত্যানন্দ প্রভু যখন পাণিহাটীতে আসেন, তখন পিতা-জ্যেঠার অনুমতি লইয়া রঘুনাথ তাঁহার দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া রঘুনাথের চিড়ামহোৎসব অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন—"শীঘ্রই তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপদামোদরের হস্তে অর্পণ করিবেন।' ইহার পরে তাঁহার গৃহত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইল, পদব্রজে বার দিন চলিয়া তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন; স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোলবৎসর প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। প্রভুর এবং পরে স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতনের আশ্রয়ে বাস করেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য এক অপূর্ব্ব বস্তু। নীলাচলে অবস্থানকালে কিছু দিন রাত্রি দশ দণ্ডের পরে জগন্নাথের সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন; তখন কেহ মহাপ্রসাদাদি কিছু দিলে তাহা খাইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে সিংহদ্বারেও দাঁড়াইতেন না, ছত্রে গিয়া মাগিয়া খাইতেন। পরে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। দুই তিন দিনের বাসি প্রসাদ পঁচিয়া দুর্গন্ধময় হইলে পসারীরা তাহা জগন্নাথের গাভীদের সম্মুখে দিয়া আসিতেন; গাভীও যাহা খাইতে পারিত না, রঘুনাথ তাহা আনিয়া জল দিয়া ধুইয়া লবণ দিয়া মাখিয়া খাইতেন। যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন সামান্য কতটুকু মাঠামাত্র গ্রহণ করিতেন, আর কিছু না। সর্ব্বদা ভজনে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি কয়েকখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। শেষ সময়ে তিনি এবং কবিরাজ গোস্বামী এক সঙ্গেই রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন।

বহু কাল পর আবার প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান
শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ। ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরন্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।
দুই খণ্ড—১৫০০ টাকা
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে
শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্ষদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত।
মূল্য ঃ ৪০০ টাকা
ষট্‌সন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ
মূল্য ঃ ৯০০ টাকা।
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২১৯৩১০০/৯৪৩২২২৬২২০
বৃন্দাবনের ছয় গোস্মামী - নরেশচন্দ্র জানা মূল্য ঃ- ৪০০ টাকা